নবীয়ে রহমত
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

অনুবাদ

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।

নবীয়ে রহমত ﷺ

মূল : সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ আব্দুর রউফ

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা।

ফোন : ০২-৭১২ ১১২১

সেল : ০১১৯০-৫২৯৪১১; ০১৮২২-৮০৬১৬৩

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১২

আষাঢ় ১৪১৯

শাবান ১৪৩৩

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ

মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস

৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

ISBN : 984-622-026-2

বিনিময় : অফসেট : ৪০০.০০ মাত্র
সাদা : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

Nabiye-Rahmat (The Prophet of Mercy) : Written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Arabic, translated by Abu Sayeed Muhammad Omar Ali (R) into Bengali and published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone : 88-02-7121121 Cell : 01190-529411, 01822-806163; e-mail: roufster@gmail.com

Price : Offset Tk. 400.00 & White Print Tk. 350.00

উৎসর্গ

মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত
দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহূর বুযূর্গ,
আমার রূহানী উস্তাদ, মুফাক্কির-এ ইসলাম
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর
অমর রূহের ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশে যিনি ১৯৯৯ সালের
৩১ ডিসেম্বর/২২ রমযান। শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন
শরীফের সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর আহ্বানে
তাঁর প্রিয় সান্নিধ্যে গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন।

সূচিপত্র

আযওয়াজে মুতাহ্হারাত / ৪১৬-৪২৫

আখলাক ও শামায়েল / ৪২৬-৪৫৮

وما ارسلناك الا رحمة للعلمين / ৪৫৯-৪৮১

প্রকাশকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে অসংখ্য হামদ ও শোকর, যিনি আমাদেরকে আরো একটি সীরাত গ্রন্থ প্রকাশ করার তৌফিক দান করলেন, এটি ছিল আমাদের প্রকাশনার চতুর্থ সীরাত গ্রন্থ। অত:পর রাসূলে আরাবী খাতিমুল আম্বিয়া, রাহমাতুল-লিল আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

রাসূল ﷺ-এর মধ্যে মানবজাতির জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এবং তিনি মহান চরিত্রের অধিষ্ঠিত বলে আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে রহমাতুল-লিল আলামীন হিসাবে দুনিয়াতে পাঠান হয়েছে বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য নাজাত ও হেদায়েতের উৎস। তাঁর সীরাত মুবারক কেবল আমাদের জন্যই নয় গোটা মানবজাতির জন্য আলোর মশাল স্বরূপ। এর থেকে প্রয়োজনীয় আলো পেতে হলে রাসূল ﷺ-এর জীবনী সম্পর্কে আমাদের গভীর ভাবে জানতে হবে, অনুসরণ ও অনুকরণের উদ্দেশ্যে প্রচুর গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে, এর কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান গ্রন্থটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। মূলত: গ্রন্থটি আরবী ভাষায় আস-সীরাতুল নাববিয়্যা নামে প্রকাশিত হয় এবং আরবদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যতালিকায় স্থান করে নেয়। এদিক থেকে গ্রন্থটির অসাধারণ জনপ্রিয়তার প্রমাণ করে। গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এ গ্রন্থ রচনায় কোন গতানুগতিক ধারা বর্ণনা করেন নি, বরং তিনি প্রাচীন ও বর্তমান যুগের সীরাতের ওপর যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা এবং পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রামানিক ও মৌলিক গ্রন্থ থেকে পর্যাপ্ত পরিমান তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এদিক থেকে গ্রন্থটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

হিজরী ১৪৩১ ররজব মাসের প্রথম দিকে আমরা অনুবাদকের বাসায় সাক্ষাতের জন্য গেলে তিনি আমাদেরকে নবীয়ে রহমত কিতাবটি দ্রুত প্রকাশের কথা বলেন, সেই সাথে কারওয়ানে যিন্দেগীর ১-৭ খণ্ড অনুবাদেরও আশাপোষণ করেন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বর্তমান গ্রন্থটি নতুন করে সম্পদনা করা হয়েছে তাই পূর্বের তুলনায় অনেকটা সাবলীল হয়েছে যা পাঠক মাত্রই অনুধাবন করবেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদক হযরত মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী গত ৩রা রমযান, ১৪৩১ হি., ১৫ই আগষ্ট ২০১০ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত ও তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তকি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অবশেষে আল্লাহর দরবারে এ দু'আ ও মুনাজাত করি, তিনি যেন এ গ্রন্থ সকলের জন্য উপকারী বানান, এ কাজটুকু কবুল করেন, সীরাতের পাঠ ও অধ্যায়নের মাধ্যমে উপকৃত হবার সোপান হয়। আর হে মেহরবান মালিক তুমি গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদককে তোমার ছায়াতলে আশ্রয় দান কর। আমীন!

প্রকাকশক

অনুবাদকের আরয

بسم الله الرحمن الرحيم واصلی واسلم علی رسوله الكريم

মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের দরবারে লাখো কোটি 'হামদ্ ও শোকর যিনি তাঁর এই অধম বান্দাকে তাঁরই প্রিয় হাবীব সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতেমুন নাবিয়্যিন, শাফীউল মুযনিবীন, রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর জীবনী গ্রন্থ 'আস-সীরাতু'ন-নাববিয়্যা'র উর্দূ তরজমা থেকে বাংলায় অনূদিত 'নবীয়ে রহমত' বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবার সৌভাগ্য দান করলেন। ১৪১৩ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল জুমু'আর রাতে এ অধম এর অনুবাদে হাত দিয়েছিল। অবশেষে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ ১৪১৮ হি. সেই একই ১২ রবিউল আউয়াল জুমু'আর দিনে সে অনুবাদকের আরয লিখছে। রাহমানুর রাহীমের পক্ষ থেকে এই বিরল সৌভাগ্য দানের জন্য দীনাতিদীন অনুবাদক তাঁর মহান দরবারে আবারও হা'মদ্ ও শোকর পেশ করছে। একই সঙ্গে সীরাতুন্নবী ﷺ-এর এই মুবারক দিনে রহমতে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওযায়ে আকদাসের উদ্দেশে পেশ করছে অজস্র দরূদ ও সালাম।

সীরাত তথা নবী-চরিতমূলক গ্রন্থ রচনার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ ও সুপ্রাচীন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় ভাষাতেই সীরাত গ্রন্থ্ রচনার ধারাবাহিকতা বর্তমান। তবে আরবী ভাষার স্থান এ বিষয়ে শীর্ষে। আস-সীরাতু'ন-নাববিয়্যাঃ এই ধারাবাহিকতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি আরব জাহান থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর এ যাবত এর দশটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। আরব জাহানের অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি অন্যতম পাঠ্যগ্রন্থ। বর্তমান গ্রন্থের এ কেবল অসাধারণ জনপ্রিয়তারই প্রমাণ বহন করে না, যে কোন লেখকের জন্য এটা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়ও। আর তা যদি লেখকের জীবদ্দশায় ঘটে তাহলে তা হয় লেখকের পক্ষে আরও গৌরবের। গ্রন্থটি পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনূদিত হয়ে ইতোমধ্যেই পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। আমাদের জানা মতে উর্দূ ভাষায় লাখনৌ থেকে চারটি, করাচী থেকে দু'টি, ইংরেজী ভাষায় দু'টি এবং ইন্দোনেশীয়, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় এর একটি করে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

১৪১৩ হিজরীর মাহে রমাযান মূল গ্রন্থের লেখক আমার পরম শ্রদ্ধেয় রূহানী উস্তাদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা.জি.আ.)-এর পবিত্র

সোহবতে আমি থাকি। এ সময় তিনি এরই উর্দূ সংস্করণের একটি কপি হাদিয়া পেশ করেন এবং এর তরজমার অনুমতি দিয়ে অধমকে অনুগৃহীত করেন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বেই কয়েকটি বইয়ের অনুবাদসূত্রে লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের সম্পর্কের সূচনা হয়। অধম তাঁর বাণী, শিক্ষা ও আদর্শ তাঁর পূর্বপুরুষ শহীদে বালাকোট সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)-এর অন্যতম কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশের জনগণের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমেই কেবল সেই সম্পর্ক সূত্র ধরে রাখতে পারে একথা ভেবেই 'নবীয়ে রহমত'-কে তরজমার জন্য বেছে নেয়। অতঃপর সুদীর্ঘ দিনের নিরন্তর মেহনতের ফসল প্রকাশের সাফল্যের মুখ দেখতে পারল বলে অধমের হৃদয়-মন আনন্দ, পরম প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে আজ ভরপুর! এ আনন্দ, এই তৃপ্তি কোন্ ভাষায় প্রকাশ করা চলে, কোন্ নিক্তিতে তা পরিমাপ করা চলে, অধমের তা জানা নেই। অধম তার সমগ্র দেহ-মন উজাড় করে আন্তরিকভাবেই কেবল উচ্চারণ করতে পারে, আল-হামদুল্লিাহ! বলতে পারে :

وما توفيقى الابالله عليه توكلت واليه انيب -

বাংলা ভাষায় এই পর্যায়ে সীরাত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যা-ও বা আছে, তা-ও খুব একটা সহজলভ্য নয়, অথচ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যত বেশিই বলা যাক না কেন, তা কম হবে। কুরআনুল কারীম বোঝার জন্য সীরাত গ্রন্থ দরকার, ইসলামকে জানতে গেলে হুযুর আকরাম ﷺ-এর পবিত্র জীবন-চরিত পাঠ করা আবশ্যক। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এড়িয়ে, তাঁকে গভীরভাবে না জেনে আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ বোঝা যায় না, ইসলামকে জানা হয় না। কেননা তিনি ছিলেন কালাম পাকের বাস্তব নমুনা। সমগ্র কুরআন মজীদ তাঁর জীবন, তাঁর আখলাক ও তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর গোটা জীবন ছিল ইসলামের জীবন্ত ব্যাখ্যা। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা জীবন-যিন্দেগীর ওপর তথ্যনির্ভর ও সহীহ-শুদ্ধ বর্ণাঢ্য গ্রন্থ পাঠ করার প্রয়োজন যে কত বেশি তা সহজেই অনুমান করা চলে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এক্ষেত্রেও আমাদের অবহেলা ও উদাসীনতা ব্যাপক। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক বাদে অনেক আলেম-উলামাও নবী করীম ﷺ-এর জীবন-যিন্দেগীর ওপর পড়াশোনা অবিশ্বাস্য রকম অল্প! ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে আমার এই ধারণা জন্মেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। আর এ থেকেই সীরাত গ্রন্থ রচনা, সংকলন, অনুবাদ ও প্রকাশনার প্রতি অধমের আগ্রহ জন্ম নেয় এবং উত্তরোত্তর তা বাড়তেই থাকে। এরই এক পর্যায়ে উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত জেনারেল আকবর

খানের মহানবী ﷺ-এর ওপর, বিশেষ করে তাঁর পরিচালিত যুদ্ধ-জিহাদের ওপর লিখিত 'হাদীছে দেফা' নামক পুস্তকটির অনুবাদে হাত দিই যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল' শিরোনামে প্রথম সংস্করণ এবং 'মহানবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (বর্তমান মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত)। বর্তমান গ্রন্থটি ছিল এ ধারার দ্বিতীয় গ্রন্থ। এছাড়া ইসলামী বিশ্বকোষের প্রয়োজনে উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষে প্রকাশিত 'মুহাম্মদ' ﷺ শীর্ষক নিবন্ধটি সম্মিলিতভাবে অনুবাদে হাত দিই যা ইসলামী বিশ্বকোষের ২০তম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটি অত্যন্ত বিস্তৃত, তত্ত্ব ও তথ্যবহুল। কাজেই সাধারণ পাঠক যেন এর থেকে উপকৃত হতে পারেন, সেজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগ থেকে পৃথকভাবে পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

সুধী পাঠকবর্গের খেদমতে নিবেদন করছি, অধমের একান্ত কামনা, বাংলাভাষী সকলের, বিশেষ করে মুসলমানদের প্রত্যেকের ঘরে দয়ার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিতের একটি করে কপি যেন স্থান পায় এবং তা পঠিত হয়। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর মাঝে 'ইনসানে কামিল' তথা পরিপূর্ণ মানুষ ও মানবতার ত্রাণকর্তা হিসাবে এই একজন ব্যক্তিই আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর জীবন এক বিশাল মহীরুহ যার ছায়ায় মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সকলেই আশ্রয় নিতে পারে আর আশ্রয় নিয়ে পেতে পারে কাম্য শান্তি ও স্বস্তি। পাপী, সমস্যাপীড়িত আর আশাহত মানুষ তাঁর পবিত্র বাণী ও শিক্ষা অনুসরণের মাঝ দিয়ে মুক্তি পেতে পারে। তিনি কেবল মুসলমানের সম্পদ নন, তিনি মানবতার সম্পদ। তাঁকে এড়িয়ে মানবতা তার পরম পাওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, পারবে না। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে বিপর্যস্ত মানবতার জন্য তাঁর প্রয়োজন অনেক অনেক বেশি। আক্রোশ আর বিদ্বেষে অন্ধ না হলে যে কেউ তা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। অধমের ঐকান্তিক কামনা পূরণে সহৃদয় পাঠকের খাস দু'আ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের সুবিপুল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অবসর মুহূর্তে আমি আমার কাজ করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারের ভার পাঠকের কাছে ছেড়ে দিলাম। সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখলে বাধিত হব। একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে চেষ্টার কোন কসুর আমি করিনি। এ কাজে অনেকেই অধমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট আলেম মওলানা আবদুর রায্যাক নদভী লেখকের বিস্তৃত ভূমিকা ও মওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী পুস্তকের শেষাংশটি অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি, তদুপরি শারীরিক অসুস্থতা

নিয়ে দ্বিতীয় সংশোধনের সঙ্গে সম্পাদনার কঠিন দায়িত্ব পালন করে বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক আমার সহকর্মী বিশ্বকোষ প্রকল্পের প্রকাশনা কর্মকর্তা মওলানা মুহাম্মদ মূসা যেভাবে আমাকে ঋণী করেছেন কোনভাবেই সে ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তৃতীয়বারে সংশোধন করার সময় অগ্রজপ্রতিম মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ভাইয়ের ওপর সর্বশেষ পরশ বুলিয়ে একে অধিকতর সুন্দর ও নির্ভুল করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে বইটির দ্রুত প্রকাশ সহজ হয়েছে। অতঃপর মজলিসে নাশরিয়াত-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল লেখক আল্লামা নদভী (মা.জি.আ.)-র গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ, যাঁদের শীর্ষে আছেন এদেশের খ্যাতনামা আলেম ও মুহাদ্দিছ, আরবী ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিত রাবেতা আদবে ইসলামী'র সদস্য ও বাংলাদেশ ব্যুরোর প্রধান মাওলানা সুলতান যওক নদভী এই বই প্রকাশের দায়িত্ব সানন্দে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁরা এ বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে নবী প্রেমের প্রকাশ ঘটাবার সাথে রূহানী উস্তাদের প্রতি তাঁদের ভক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন এবং শায়খ নদভীর সকল বই অনুবাদ করে পর্যায়ক্রমে এদেশের উৎসুক পাঠকের সামনে তুলে ধরার আগ্রহ ও সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। বন্ধুবর মওলানা আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও অনুবাদকের পরিচিতি লিখে অধমকে কৃতজ্ঞ করেছেন। অবশেষে আমার জীবন-সঙ্গিনী বেগম জেবুন্নেসা অনেক কয়টি বছর ধরে বহুবিধ জুলুম সয়ে যেভাবে আমার কাজে সহযোগিতা যুগিয়ে চলেছেন তাও ভোলবার নয়। পুস্তকের শেষাংশের গ্রন্থপঞ্জী কপি করেছে আমার পুত্র জাবিদ ইকবাল এবং বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছে কন্যা জামিলা কুলছুম শিরীন, জামিলা, যয়নব তামান্না ও রুকাইয়া নার্গিস ওরফে নাহিদ।

আমার মুনাজাত! রাহমানুর রাহীম আল্লাহ! তোমার প্রিয় হাবীবের সীরাত মুবারক নিয়ে লিখিত এই বইটিকে তোমার অপার করুণায় কবুল করে নাও এবং একে এ বই প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের ওসিলা বানাও। কাল কেয়ামতের ময়দানে তোমার মাহবুব নবীর ঝাণ্ডাতলে একটু আশ্রয় যেন পাই, তাঁর শাফায়াত লাভ করতে পারি– এটুকু ভিক্ষাই কেবল তোমার রহমতের শাহী দরবারে। মেহেরবান মালিক! রিক্ত ও সর্বহারা মুসলিম উম্মাহর নেয়ামত আল্লামা নদভীকে তুমি নিরোগ দীর্ঘায়ু দান কর! তাঁর বরকতময় সান্নিধ্য ও ছায়ায় থেকে আমরা তথা গোটা উম্মত যেন আরও দীর্ঘকাল ধরে উপকৃত হই এবং ফয়েয লাভ করি, 'নবীয়ে রহমত'-এর প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে রাব্বুল-আলামীনের দরবারে এটাই আমাদের মুনাজাত।

১২ই রবিউল আওয়াল — আহকার

শুক্রবার ১৪১৮ হি. — **আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী**

রহমতপুর (কোনাপাড়া), ডেমরা, ঢাকা।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

الحمد الله رب العلمين ـ والصلوة ولسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ـ امابعد:

"নবীয়ে রহমত"-এর লেখকের কলম ও কলব আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহের শুকরিয়া হিসাবে সিজদাবনত ও প্রশংসামুখর যে, লেখক "আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যার" (আরবী) সপ্তম সংস্করণ ও "নবীয়ে রহমত" (উর্দূ)-এর তৃতীয় সংস্করণ পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছে। আরবীতে "আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা" হি. ১৩৯৭ (১৯৭৭ খৃ.) সনে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় হি. ১৪০৭ (১৯৮৭ খৃ.) সনে দারুশ-শুরূক, জেদ্দা থেকে।

সাধারণ পাঠক ছাড়াও বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাঁরা বিশেষ গবেষণাসুলভ জ্ঞান ও পেশাদারী সম্পর্ক রাখেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের নিকটও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রন্থটি যে সমাদর লাভ করেছে এজন্য লেখক আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছে। আরবী ভাষায় রচিত এই সীরাত গ্রন্থের ইতোমধ্যে উর্দূ, হিন্দী, ইংরেজী, তুর্কী ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় তরজমা প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐসব ভাষায় ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। আরবী সীরাত গ্রন্থটি বিশেষভাবে কয়েকটি আরব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে। ইতোমধ্যে লেখক সীরাতে নববী ও এর ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক নিয়ে নতুন গ্রন্থ ও আরবী, উর্দূ ও ইংরেজীর আধুনিক উৎস থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং এর আলোকে গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মূল্যবান তথ্য যুক্ত করেছিল। কোথাও কোথাও ঘটনাবলীর পটভূমির ওপর অধিকতর আলোকপাত করেছে এবং তুলনামূলক পাঠের ফলাফল পেশ করেছে। তাছাড়া সীরাতের ঘটনাসমূহের কিছু কিছু ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক ও দাওয়াতী দিকগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন যা প্রথম সংস্করণে করার সুযোগ হয়নি।

লেখক প্রথম থেকেই একক ঘটনার বিবরণী দানকারী, আইন-কানুন ও রীতিনীতির একজন ইতিহাস লেখক হিসাবে কেবল ঘটনা ও তথ্যের নিরস ও নিষ্প্রাণ তালিকা পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করে নি, বরং সীরাতের ঘটনাসমূহ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহীত পদক্ষেপে সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং সেই সব গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতের দিকেও মনোনিবেশ করার প্রয়াস পেয়েছে। তাই আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের সীরাত, বিশেষত সায়্যিদুল-মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়াসাল্লামের সীরাত ও দাওয়াতের পাঠ, মানুষের মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও সমাজ বিজ্ঞানে বিরাট গুরুত্ববহ যার মাধ্যমে প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি স্থানে দাওয়াত ও তরবিয়তের কাজ, জাতিগোষ্ঠী ও মানব সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শন এবং জীবনের জটিল থেকে জটিলতর সমস্যা ও সংকটের সমাধানে মূল্যবান উপকার লাভ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে বর্তমান সংস্করণ সীরাতের প্রাচীন বুনিয়াদী তথ্য-উপকরণের সাথে বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন তথ্য, ঐতিহাসিক উপাদান ও তাত্ত্বিক গবেষণা, সেই সঙ্গে এতে ঈমানী ও দ্বীনী আবেগের সান্ত্বনা, নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র সত্তার সঙ্গে আত্মিক ও রূহানী সম্পর্ক শক্তিশালী করবার খোরাকও রয়েছে যা নবী করীম ﷺ সম্পর্কিত সীরাত গ্রন্থের মূল সওগাত তা হলো জীবনের আসল পুঁজি ও স্বাদ।

در خرمن کائنات کردیم نگاه
يك دانه محبت است باقی ہمه کاه

এই কথাগুলো কোনরূপ বাহুল্য ও কল্পনার রঙ চড়ানো ছাড়াই পেশ করা হয়েছে। কেননা সীরাতে এর কোন প্রয়োজন নেই। এর বিশ্বজয়ী সৌন্দর্য মনকে আকর্ষণ করার নিজস্ব যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে।

تکلف سے بری ہے حسن ذاتی
قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے

পরিশেষে লেখক আরেকবার আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে, তিনি তাকে এর অবকাশ ও তৌফিক দিয়েছেন এবং এর জন্য সেসব তথ্য সরবরাহ করেছেন যার ফলে লেখক তার গ্রন্থে কিছুটা সংযোজন করতে পেরেছে। তেমনি সে দারুশ-শুরূক-এর মুহতারাম স্বত্বাধিকারী সুপ্রিয় শায়খ মুহসিন আহমদ বারূমকে তাঁর ঐকান্তিক মনোযোগ প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এবং আল্লাহর দরবারে এ উভয় জগতের জন্য চিরন্তন তৌফিক ও সর্বোত্তম কবুলিয়তের দু'আ করছে।

২৮ শাবান, ১৪০৭ হি.
২৮ এপ্রিল, ১৯৮৭ ঈ.

ওয়াস-সালাম
আবুল হাসান আলী নদভী
লাখনৌ, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين.

অধম গ্রন্থকারের কলম ও যবান আল্লাহ্ তায়ালার সেই পুরস্কারের শুকরিয়া ও প্রশংসা জ্ঞাপনে অক্ষম যে, সীরাতে নববী তথা নবী-চরিতের ধারাবাহিকতার একটি প্রয়াস (স্বীয় উন্নত নিসবতের ভিত্তিতে নগণ্য লেখকের পক্ষে যা লেখার কোনভাবেই হিম্মত হতো না) জ্ঞানী ও ধর্মীয় মহলে উপেক্ষিত মনে করা হয়নি। গ্রন্থটি মূলত আরবী ভাষায় লিখিত হয়েছিল যা সীরাতের বিস্তৃত, প্রাচীন ও আধুনিক, তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক সব ধরনের তথ্যে পরিপূর্ণ। বর্তমান গ্রন্থ হি. ১৩৯৬ সালে যী-কা'দা/২৯ অক্টোবর, ১৯৭৬ সমাপ্ত হওয়ার পর মাত্র চার বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে কায়রো ও বৈরূত থেকে এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় যার প্রতিটি সংস্করণই ছিল কয়েক হাজারের এবং দেখতে দেখতে জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। গ্রন্থকারের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং সেই সঙ্গে গর্ব ও কৃতজ্ঞতার বিষয়, বর্তমান গ্রন্থ সেই ভূখণ্ডে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যেখানে সেই পবিত্র জীবন ও সত্তার এক একটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছিল এবং সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় যা ছিল ওহী নাযিলের স্থান ও রাসূল করীম ﷺ-এর জন্ম ও শেষ বিশ্রামস্থলের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে।

بریں مثردہ گرجاں فشانم رواست

আরবী থেকে উর্দূতে অনুবাদের খেদমতে আঞ্জাম দিয়েছেন গ্রন্থকারের কলিজার টুকরা ও চোখের মণি প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আল-বা'ছুল-ইসলামীর সম্পাদক সাইয়েদ মুহাম্মাদ আল-হাসানী পরম যত্নে ও আগ্রহের সাথে। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাঁর শেষ অবদান। এটি প্রকাশের পর তাঁর আর বেশি দিন পৃথিবীর আলো-বাতাসের মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি এবং তাঁর সম্পর্কে ভারতবর্ষের সীরাত নববীর মহান গ্রন্থকার 'আল্লামা শিবলী নু'মানীর নিম্নোক্ত চরণ দু'টি অত্যন্ত প্রযোজ্য:

مگراب لکھ رہاہوں سیرت پیغمبر خاتم
خداکا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہوناتھا

অনুবাদের ওপর চোখ বোলাবার এমন এক সময় সুযোগ মিলল যখন গ্রন্থকার চোখ থেকে অনবরত পানি পড়ার দরুন পাণ্ডুলিপি পড়ার ও মুদ্রণ ভুল ধরার পুরোপুরি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। ফলে এতে এমন কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল যা কেবল গ্রন্থকার কিংবা গভীর নিষ্ঠাবান ও সতর্ক পাঠক সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিটি শব্দ খুঁটে খুঁটে পাঠরত কোন সমালোচকের পক্ষেই ধরা সম্ভব। গ্রন্থকারের কর্মব্যস্ততা ও বার বার দীর্ঘ সফরের দরুন এর ওপর পুনরপি চোখ বোলাবার সত্বর সুযোগ হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ! এক্ষণে সেই সুযোগ ও অবকাশ মিলেছে। উর্দূ অনুবাদের প্রতিটি শব্দ আমি পাঠ করেছি, প্রয়োজনে মূল কিতাব ও আরবী উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি এবং দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি করে দিয়েছি। কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষত ফুটনোটে কতকগুলো উপকারী ও প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করেছি। কয়েকজন সুধী পাঠক কতকগুলো ব্যাপারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা আমি আবার বিবেচনায় এনেছি। গ্রন্থকার সে সব বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞ এবং এজন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারেও বিনিময় ও পুরস্কার লাভের হকদার যাঁরা কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মওলানা বুরহানুদ্দিন সম্ভলী (উস্তাদ, তফসীর ও হাদীছ বিভাগ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে এই দ্বিতীয় সংস্করণটি যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত, অধিকতর বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গরূপে পাঠকের সামনে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন এবং একে এর লেখক, অনুবাদক, পাঠক এবং মুদ্রণ ও প্রকাশে কোন না কোনভাবে অংশ গ্রহণকারী সকলের নাজাত ও উন্নত মর্যাদা লাভের ওসীলা বানান!

২২ মুহাররম, ১৪০১ হি.
১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ ঈ.

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ
রায়বেরেলী

পূর্ব কথা

সর্বপ্রথম পাঠশালা যেখানে এ গ্রন্থের লেখক পড়াশোনা করে তা ছিল সীরাতুন্নবীর পাঠশালা। লেখক এমন বয়সে সেখানে প্রবেশ করে যখন সাধারণত শিশুদের পাঠশালায় ভর্তি করা হয় না। এটা ছিল তাঁর পারিবারিক পরিবেশের ফসল যা সে সময়ে সেখানে বজায় ছিল। দীর্ঘকাল থেকেই সীরাত তার পারিবারিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাড়ির প্রতিটি শিশুর জীবনকে সীরাতের রঙে রঞ্জিত করাকে জরুরী বলে মনে করা হতো। এ পরিবারের শিশুদের সভ্য হিসাবে গড়ে তোলার পেছনে সদা ভ্রাম্যমাণ ক্ষুদ্র পাঠাগারের অবদান ছিল অসামান্য। সেখানে গদ্য-পদ্য সব ধরনের বই-পুস্তক থাকত। এরপর লেখকের জীবনে যে মহামনীষীর অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন তার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ডা. হাকিম মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল আলী (র)। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশিক্ষণ, পথ নির্দেশনা ও সস্নেহ তত্ত্বাবধানে লেখক খুব অল্প বয়সেই উর্দূ ভাষায় রচিত অনবদ্য গ্রন্থসমূহ পড়ে ফেলার সুযোগ পায়। আরবী সাহিত্যের পরই ছিল উর্দূ ভাষায় সীরাতের ঐশ্বর্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সংরক্ষিত। কারণ নিকট অতীত উর্দূ ভাষায় সীরাতের ওপর যত কাজ হয়েছে অন্য কোন ভাষায় ততটা হয়নি।

লেখক তার الطريق الى المدينة (মদীনার পথে) নামক গ্রন্থে এর (যে কিতাবের অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই) চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছে। সেখানে বিশেষভাবে কাযী সুলায়মান মনসুরপুরী (র) বিরচিত অনবদ্য গ্রন্থ رحمة للعالمين (রাহমাতুল্লিল-আলামীন)-এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছে।

এরপর যখন তিনি আরবী ভাষা সাহিত্যের রসাস্বাদন ক্ষমতার অধিকারী হলেন তখন নিজের সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে আরবী ভাষায় রচিত সীরাতের মৌলিক গ্রন্থসমূহের দিকে। এগুলোর মধ্যে দু'টি গ্রন্থ শীর্ষস্থানীয় এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি ইবনে হিশামের বিখ্যাত গ্রন্থ السيرة النبوية (সীরাতুন নাবাবিয়্যা) আর দ্বিতীয়টি ইবনুল-কায়্যিম রচিত زاد المعاد (যাদুল মা'আদ)। এসব গ্রন্থ পাঠ করতে গিয়ে গতানুগতিক অধ্যয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়নি, বরং এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না, এসব গ্রন্থ ছিল তাঁর দিবানিশির সঙ্গী। এগুলো ছিল তার যাবতীয় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু যা দিয়ে লেখক ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করত এবং ঈমান ও য়াকীনের সাথে তার পরিচয় ঘটত। এতে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা নবীপ্রেমের বাগান সিক্ত করত, নবীর প্রতি তার প্রেম ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে করত আরও সমৃদ্ধ। এ কারণেই জীবন গড়ার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভে ও পথ নির্দেশনার ক্ষেত্রে সীরাতের মর্মস্পর্শী ঘটনাবলীর কোন বিকল্প নেই।

মানুষের মন-মানসিকতার গঠন ও বিকাশে 'কুরআন' পাকের পর সীরাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। উল্লিখিত গ্রন্থ দু'টির পর আরবী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত সীরাতের আধুনিক ও প্রাচীন যে কোন গ্রন্থ হাতের কাছে পেয়েছি তা পাঠে একটুও আলসেমি করিনি। সীরাত পাঠের কারণে লেখকের যে কোন গ্রন্থে ও লেখনীতে সীরাত একটি মৌলিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং তাতে সীরাতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। লেখকের লেখায় হাসি-কান্না, শোভা-সৌন্দর্য ও রূপ-রস সমস্তই সীরাতের অবদান। সীরাতের অনুসরণের বরকতেই লেখনী থাকত সদা সজীব এবং তার শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস এ সীরাত। স্বীয় মনোভাব ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতে ও বর্ণনা করতে শক্তিশালী প্রমাণ ও উপযুক্ত উদাহরণ সীরাতের অনুপম ঘটনাবলীর মাঝেই অনুসন্ধান করা হতো। সীরাত দ্বারাই তার মন-মেজাজে সৃষ্টি হতো শক্তি, প্রেরণা ও গতি, জেগে উঠত ঘুমন্ত প্রতিভা। তাই লেখকের এমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও লেখা নেই যাতে সীরাতে মুহাম্মদীর গভীর প্রভাব নেই।

সীরাতের বিভিন্ন দিক ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও মানব বিশ্বে এর বিস্ময়কর প্রভাব ও ফলাফলের বিবরণ মদীনার পথ/মদীনার কাফেলা নামক গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। লেখক লেখালেখির দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থই রচনা করেছে, কিন্তু বিশেষভাবে সীরাতের ওপর স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ আজও লেখার সুযোগ হয়নি, অথচ তার এ চিন্তাটুকু ছিল, সীরাতের ওপর রচিত এমন একটি গ্রন্থের তীব্র প্রয়োজন যা আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার রীতি নিয়েই লিখিত হবে এবং আধুনিক ও প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থরাজির জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু সীরাতের প্রাচীন মৌলিক (original) গ্রন্থের ওপর হবে তার ভিত্তি। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত তথ্য চুল পরিমাণ হেরফের করা হবে না। আবার এ গ্রন্থ বিশ্বকোষের পদ্ধতিতেও লেখা হবে না যেখানে কোন প্রকার বাছ-বিচার ও চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই সকল জ্ঞানের সকল বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়। জ্ঞানের নানা বিষয়কে একত্র করাই সেখানে মুখ্য।

গ্রন্থ রচনার এ পদ্ধতি ও রীতিকে শেষ যুগের বেশির ভাগ লেখক ও পূর্ববর্তী অনেকেই অনুসরণ করেছেন, অথচ এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কারণ এই পদ্ধতি এমন সব অবান্তর প্রশ্ন ও অভিযোগের জন্ম দেয় যা থেকে সীরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। সহজ সরল মুসলমানের এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ জ্ঞান-গবেষণা, মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন ভাবধারার অধিকারী পাশ্চাত্যের সন্দেহবাদীদের সকল প্রকার সন্দেহ ও অভিযোগ থেকে সীরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পবিত্র ও মুক্ত করার কাজ সম্পাদন করে ফেলেছে। এ গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রতিও সচেতন নজর দিতে হবে, এটা দীনের সকল সর্বসম্মত মৌলনীতির সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হবে। এ আলোর পথ নির্দেশনা ব্যতীত আসমানী কিতাবসমূহ, আম্বিয়ায়ে কেরাম

(আ)-এর সীরাত ও গায়েবী বিষয়সমূহে ঐ সব লেখকের জন্য আরও মুশকিল। তাঁরা হৃদয়ে এ নীতি ও আকীদা পোষণ করেন, এটা পৃথিবীর কোন জাতীয় লিডার ও নেতার জীবনী নয়, বরং এটা এমন এক মহান নবীর জীবনী যিনি সমগ্র পথহারা মানবতাকে সঠিক পথ দেখানোর ও পরিচালিত করার মহান দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, যিনি আল্লাহ্ পাকের সার্বক্ষণিক সাহায্য ও সমর্থনে ধন্য। এটা এমন এক চরিত্র যা কোন প্রকার সাবধানতা, সংরক্ষণ (reservation) ও কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই একজন নিরপেক্ষ মন-মানসিকতার অধিকারী সুশিক্ষিত (চাই সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান) মানুষের সামনে দ্বিধাহীন চিত্তে উপস্থাপন করা যায়।

লেখক এ গ্রন্থে এ ধরনের বর্ণনা ও সীরাতের মৌলিক প্রাথমিক ভিত্তিসমূহের ওপর নির্ভর করেছে। এই গ্রন্থকেও এ অবকাশ দিয়েছে, নিজেই নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে এবং পাঠকের মন-মেজাজে আপনিতেই রচিত হয় পথ-নির্দেশ। লেখক স্বীকৃত সত্য ও জীবন্ত বাস্তবতাকে দার্শনিক রং দেয়ার এবং বাস্তব ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে কোন দীর্ঘ ভূমিকার বর্ণনা দেয়নি। সত্য কথা হলো, সীরাত স্বীয় শোভা-সৌন্দর্য, উপযুক্ততা, প্রভাব বিস্তারের অপূর্ব ক্ষমতা ও চিত্তাকর্ষক হওয়ার কারণে কোন মহামানবের সুপারিশ, কোন জ্ঞানীর বিদ্যা-বুদ্ধি, কোন লেখক-সাহিত্যিকের চমৎকার সাহিত্যকর্ম মনোমুগ্ধকর বর্ণনার প্রত্যাশী নয়। লেখকের জন্য যে জিনিসের প্রয়োজন তা হলো সুন্দর উপস্থাপনা ও বর্ণনা, অপূর্ব বিন্যাস ও ঘটনাবলীর সঠিক নির্বাচন ও শব্দ চয়ন। সেই সাথে মনে রাখতে হবে, লেখার সময় বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তরের ভক্তি-ভালোবাসা ও আবেগ-উচ্ছ্বাস দু'টোই এক সাথে সমগতিতে চলতে থাকবে যাতে কোন মুহূর্তে এটা ভারসাম্য না হারিয়ে ফেলে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা যেন সীরাতের প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় না করে দেয়।

সীরাতের তুলনায় কাব্যসৌন্দর্য থেকে উপকৃত হয়ে স্বীয় অন্তরকে আলোকিত করে নিজকে সৌভাগ্যবান করা। তা থেকে সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ উপকৃত হতে পারা এবং সীরাতের বিধান, ঘটনাবলী ও সীরাতের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বুঝতে পারা। এটা সঠিক ফলাফল ও দিক নির্দেশনা পাওয়ার পথে এক শর্ত। যদি সীরাতের কোন গ্রন্থ ভক্তি-ভালবাসা, ঈমান ও আবেগশূন্য হয় তবে তা হবে জীবন স্পন্দনহীন এক শুষ্ক কাষ্ঠনির্মিত কাঠামো, যাতে জীবনের স্নিগ্ধতা, সিক্ততা ও উষ্ণতার কোন কিছুই থাকে না। আবার ভক্তি-ভালবাসা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের আধিক্য যেন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সকল দাবিকে উপেক্ষা না করে বসে! আবার সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তি ও সঠিক মৌলনীতির পরিপন্থীও যেন না হয়! তাহলে এটা হবে নিতান্তই ধর্মবিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণের ওপর লিখিত এক গ্রন্থ, যেখানে উজাড় করে ঢেলে দেয়া হয়েছে অন্তরের আবেগ-উচ্ছ্বাস, ভক্তি-ভালবাসা, নিংড়ে দেয়া হয়েছে হৃদয়ের অর্ঘ্য। প্রগাঢ়

ঈমানের অধিকারী জন্মগত মুসলমান এবং সুগভীর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী ওলামায়ে কেরাম ছাড়া আর কারও পক্ষে বোঝা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এ এমন ইসলামী পরিবেশে জন্ম ও লালিত-পালিত হয়েছে এবং এদের সাথে বহির্বিশ্বের আধুনিক সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই, এই মহব্বত আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত ও রহমতী দান। কিন্তু এও ভুলে গেলে চলবে না, এটা এমন এক নবীর সীরাত যাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের মুক্তির দিশারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং একে জানার ও বোঝার দরজা সকলের জন্য খোলা রাখতে হবে। পরিস্থিতি যাদের ইসলামী পরিবেশে জন্ম ও লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি এমন সব মানুষের জন্য নিষিদ্ধ ও তালাবদ্ধ করে রাখা যাবে না। আল্লাহর হিকমত ও তাকদীরের ফয়সালা এই ছিল, এরা অনৈসলামী পরিবেশে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেখানেই লালিত-পালিত হবে। অতঃপর আল্লাহ পাকের সহযোগিতার হাত তাদের প্রতি সম্প্রসারিত হবে এবং সীরাতে মুহাম্মদীর কোন উজ্জীবনী স্নিগ্ধ হাওয়া প্রবাহিত হবে। এর আকর্ষণ তাদের টেনে এনে স্থান দেবে ঈমানের সুশীতল ছায়াতলে। সত্য কথা হলো, সীরাতের ওপর কোন অমুসলমানের অধিকার এমন একজন মুসলমানের চেয়ে কোন অংশে কম নয় যার জন্ম ঈমানী ও ইসলামী পরিবেশে হয়েছে। কারণ ঔষধের প্রয়োজন সুস্থ ব্যক্তির চেয়ে অসুস্থ ব্যক্তিরই বেশি। যারা নদী পার হয়ে গেছে তাদের চেয়ে পুলের প্রয়োজন ওদেরই বেশি যারা এখনও নদী পার হতে পারেনি।

একজন লেখক সীরাত গ্রন্থ রচনার সময় সে পরিবেশ ও যুগ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারেন না অথবা ভুলে যেতে পারেন না যে পরিবেশে যে যুগে নবুওয়াতে মুহাম্মদী ﷺ-এর সূর্য সর্বপ্রথম উদিত হয়েছিল। তাই সে সময়কার জগত জুড়ে বিস্তৃত জাহিলিয়াতের পূর্ণ ছবি আঁকা প্রয়োজন যা ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সারা বিশ্বব্যাপী দেখা যায়। লেখককে অবশ্যই এ সময়কার সামাজিক বিপর্যয়, নৈতিক অবক্ষয় ও মানব মনের অস্থিরতা কোন্ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কেমন ছিল তখনকার নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কী কী কারণ ক্রিয়াশীল ছিল, কেমন সব জোর-জুলুমের রাজত্ব, বিকৃত ধর্ম, উগ্রবাদী কল্পনা, বিলাসী দর্শন, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন ও দাওয়াতসমূহ স্ব স্ব ময়দানে ছিল কর্মতৎপর, এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে হবে। এ গ্রন্থের লেখক যখন স্বীয় গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين-এর দীর্ঘ ভূমিকায় জাহিলী যুগের বিস্তারিত চিত্র আঁকার চেষ্টা করে তখন এমন সব সঙ্কট ও জটিলতার সম্মুখীন হয় যা আজ স্মৃতিপটে ভেসে উঠলে দেহমন শিউরে ওঠে! এজন্য তাকে পাশ্চাত্যের সমগ্র প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করতে হয়েছে যেখানে ইসলামের ঊষালগ্নে পৃথিবীতে অবস্থিত সভ্য দেশ ও জাতিসমূহের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। লেখক

সেই সকল গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীকে এমনভাবে অনুসন্ধান করে একত্র করেছে যা অসংখ্য পিপীলিকার মুখ থেকে চিনির দানা একত্র করার মতই ছিল কঠিন!

এ ভূমিকা, যা কিছু সবিস্তার লেখা হলো, সীরাত পাঠকের জন্য কাজ করবে এবং পাঠকের সামনে ভেসে উঠবে মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের গুরুত্ব, মহত্ত্ব, ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি এবং নবুওয়াতের মহান দায়িত্বের জটিলতা, গুরুত্ব ও এর বিস্ময়কর ফলাফলের সংক্ষিপ্ত, অথচ পরিপূর্ণ চিত্র। আর এটা বর্তমান যুগের প্রত্যেক সীরাত রচয়িতার জন্য অত্যন্ত জরুরী। কোন সীরাতকর্মকে ততক্ষণ পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না যতক্ষণ গবেষণা ও পর্যালোচনার উক্ত রীতি অবলম্বন করা না হবে এবং ইসলামের সূচনায় তৎকালীন জাহিলী যুগের দৃশ্য ও তথাকার সামাজিক বিপর্যয়, নৈতিক অবক্ষয়, মানব মনের চরম অস্থিরতা, আত্মবিকৃতি ও আত্মহত্যার জীবন্ত ও চলমান চিত্র অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও নিপুণতার সাথে নির্ভুলভাবে না আঁকা হবে।

এটা সেই শহরের চিত্র যেখানে ইসলামের সর্বপ্রথম আলো দীপ্তিমান হয়েছিল, যেখানে মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটে, দাওয়াতে হকের কাজে সর্বপ্রথম কদম সম্মুখে অগ্রসর হয়, যেখানে তাঁর জীবনের তিপ্পান্ন বছর অতিবাহিত হয়, যেখানে ইসলামী দাওয়াতের কঠিন ও প্রাণবন্ত তেরটি বছর অতিবাহিত হয়।

সীরাতের পাঠকের জন্য সে যুগের অধিবাসীদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কৃষ্টি-কালচারের পর্যায়গুলো জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সেই সাথে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো, যুদ্ধ ও সামরিক শক্তির ধরন সম্পর্কে অবগতি লাভ করাও জরুরী যাতে বুঝতে পারা যায়, সে দেশের অধিবাসীদের সঠিক ধ্যান-ধারণা, ভাবধারা ও মন-মানসিকতা। তবেই বোঝা যাবে ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে কী কী সঙ্কট ও প্রতিবন্ধকতা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াছরিব' সম্পর্কে এ কথা অথবা এর চেয়ে কিছু বেশিই বলা যায় যেখানে ইসলাম স্থানান্তরিত হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ হিজরত করেছিলেন এখানেই এবং তকদীরে ইলাহী একেই ইসলামের সর্বপ্রথম কেন্দ্র ও ঘাঁটি হিসাবে নির্বাচিত করেন। তাই মদীনার পটভূমি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা বোঝা ছাড়া ইসলামের সাফল্য ও বিজয়ের সুগভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ ছাড়া আমরা বুঝতে পারব না মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে কিভাবে এক নব জীবনে উজ্জীবিত করেছিলেন, বিভিন্নমুখী সমস্যা কিভাবে সমাধান করেছিলেন, পরস্পর সংঘাত ও বিদ্রোহমুখর মানুষগুলোকে কিভাবে এক অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এ ব্যাপারে নবুওয়াতে মুহাম্মদী ﷺ-এর ভূমিকা ছিল কত বিস্ময়কর! ভগ্ন অন্তরসমূহে কিভাবে শান্তির ঝরনা প্রবাহিত করেছিলেন, শত্রুভাবাপন্ন মানুষগুলোর মাঝে কিভাবে অন্তরঙ্গতার পরশ বুলিয়ে দিয়েছিলেন,

তাদের তালীম-তরবিয়ত, আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রকরণের দায়িত্ব কত নিপুণতার সাথে সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং তাতে তিনি কী বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করেছিলেন! এটা বোঝা যাবে তখনই যখন মানুষের সামনে সেই অবিশ্বাস্য রকমের জটিল ও প্রতিকূল পরিবেশের নিখুঁত চিত্র থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ এরই মুকাবিলা করেছেন পাঠকের সামনে সীরাত ও হাদীসের কিতাবসমূহে অনেক ঘটনা ও ফয়সালা নজরে আসবে। পাঠক ততক্ষণ এসব বুঝতে সক্ষম হবেন না যতক্ষণ না তার সামনে মদীনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সেখানকার মাটির বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থান, সেখানকার ক্ষুদ্র ও আঞ্চলিক শক্তিবর্গ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সন্ধির চুক্তিপত্র, হিজরতপূর্ব তাদের লেনদেন, জাতীয় দস্তুর, নিয়ম-প্রথা ও রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত না হবেন। যদি কোন ব্যক্তি এ সব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ছাড়াই সীরাতের এ 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু'তে পা বাড়ায় তবে তার অবস্থা হবে এমন ব্যক্তির মত, যে এক অচেনা সুড়ঙ্গ পথে যাত্রা করল, অথচ সে জানে না তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। পথের যাত্রা কোত্থেকে এবং শেষ কোথায়?

এসব নীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমসাময়িক সভ্য রাষ্ট্র ও প্রতিবেশী দেশসমূহের বেলায় প্রযোজ্য। সমকালীন সেই সব সাম্রাজ্য ও সালতানাত যাদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান জারী করেছিলেন, তাদের সাম্রাজ্যের সুবিশাল পরিধি, তাদের লৌহ-প্রাচীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তাদের দোর্দণ্ড প্রতিপত্তি, তাদের অপরাজেয় ক্ষমতা ও শক্তি, তাদের চোখ ধাঁধানো সুপ্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, তাদের স্বাধীনতা ও জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকবে ততক্ষণ তার সামনে ইসলামী দাওয়াত যে সুউচ্চ মনোবল, সৎ সাহস ও নির্ভীকতা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল তার অপরিসীম গুরুত্ব ও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠা দুষ্কর। আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা এ সব দেশ ও জাতির ওপর প্রচুর আলোকপাত করেছে। এতে এমন ঘটনা ও রহস্যের দুয়ার খুলে গিয়েছে যা ইতিপূর্বেকার মানুষের সামনে এত স্পষ্টভাবে ছিল না। এ সকল জ্ঞান-গবেষণার ফসল থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করা এ যুগের সীরাত রচয়িতাদের জন্য অত্যধিক জরুরী। ইতিহাস, ভূগোল ও তুলনামূলক (Comparative studies) আলোচনার জগতে যেই সর্বাধুনিক জ্ঞান-গবেষণার ফসল আমাদের সামনে উপস্থিত তা থেকে আমাদের পূর্ণরূপে সহযোগিতা নেয়া ও উপকৃত হওয়া অত্যন্ত দরকার।

লেখক এসব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। সেই সাথে বিভিন্ন সময় দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় সীরাত রচয়িতাদের রচনা ও স্মরণীয় খিদমত, তাঁদের রচনার মূল্য, গুরুত্ব ও উপকারিতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লেখকের অন্তরে বিরাজমান। এরপরও "সীরাতের

মতো এ প্রিয় ও মহামর্যাদাপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরে যাঁরা নিজেদেরকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান করেছেন তাঁদের একজন হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত ও ধন্য করার সদিচ্ছায় এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ও প্রচেষ্টা এবং এ নতুন গ্রন্থের অবতারণা।”

দৃষ্টিশক্তির দুবর্লতা ও সময়ের স্বল্পতার কারণে লেখকের সাহস হচ্ছিল না যে, সন্তুষ্ট চিত্তে এ বিষয়ের ওপর কলম ধরতে পারবে। কারণ লেখকের খুব ভালভাবে এ কথা জানা ছিল, কোন মনীষীর জীবনী লেখার মতো দুঃসাধ্য কর্ম কোন লেখকের জন্য আর দ্বিতীয়টি নেই। নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয় তো আরও জটিল, আরও কঠিন! কারণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক মহামনীষী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জীবনী, তাঁদের অবদানের ওপর লেখার ও বলার সুযোগ সমসাময়িক বন্ধুদের তুলনায় লেখকের অনেক বেশি হয়েছে, লেখক যৌবনের প্রারম্ভেই নয়, বরং কৈশোরেই, যখন থেকে কলম ধরা শিখেছে তখন থেকেই সত্যের দিশারী জাতির সংগ্রামী সংস্কারক ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিকদের কর্মবহুল জীবনী রচনার মধ্যে দিয়ে তার লেখার ময়দানে চলা শুরু।

সীরাত ও জীবনীর ওপর নিজের কলমে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখে নিজের কলমকে উজ্জ্বল করার সুযোগ লেখকের বহুবার হয়েছে, আল্লাহর শোকর, বাল্যকাল থেকেই যত সব হিদায়াতের অকুতোভয় সৈনিক, মহান পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে পাঠ করার, জানার ও লেখার সৌভাগ্য ও সুযোগ তার হয়। এ কারণে সীরাতের ওপর কিছু লেখার জটিলতা ও এ দায়িত্বের গুরুভার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তার ছিল। অনেক সময় এমনও হয় লেখকের ওপর কোন বিশেষ ভাবধারা ও প্রবণতার প্রভাব থাকে। তিনি কারও জীবনী লিখতে বসলে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সেখানে সেই প্রভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে আসল চিত্রের পরিবর্তে প্রবণতার তুলিতে নিজের চিত্রই এঁকে ফেলেন। তিনি চান ঘটনার নিরপেক্ষ আলোচনা করতে, কিন্তু মনের অগোচরে স্বীয় চিন্তা-চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটান। মোটকথা, তিনি নিরপেক্ষভাবে কোন বিচার করতে পারেন না। নিজস্ব মানদণ্ড ও ধ্যান-ধারণার নিরিখে প্রতিটি বিষয়কে বিচার করতে থাকেন। এতে আসল বিষয় হয়ে যায় অস্পষ্ট; তলিয়ে যায় তা ব্যক্তির ধ্যান-ধারণার অতলে।

মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক চরিত্রতত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা পাঠ করেছেন এবং দেখেছেন সমসাময়িক ব্যক্তিদের, তাঁদের সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, কাটিয়েছেন একান্ত সংসর্গে তাঁরা সহজে অনুমান করতে পারেন মানব মনের গভীরে প্রবেশ করা এবং তার মনোরাজ্যের মহাশূন্যে বিচরণ করা এবং সে রাজ্যের নিখুঁত ছবি আঁকা ভাষা ও সাহিত্য বিজ্ঞানের সর্বাধিক জটিল ও কঠিনতম কাজ। এ জটিল দায়িত্ব একমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই কিছুটা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব যে ব্যক্তি মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, প্রেমপ্রীতি, শত্রুতা-মিত্রতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মার আর্দ্রতা-উষ্ণতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তাঁর এও জানার

সুযোগ ও ক্ষমতা থাকতে হবে, লোকটি কিভাবে দিবানিশি অতিবাহিত করেন. নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে কিভাবে কাটান, বন্ধু-বান্ধব ও সহচরদের সাথে কী আচরণ করে থাকেন। সে তাকে দেখেছে যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, সন্ধি ও যুদ্ধবন্দীদের সাথে, দেখেছে রাগ, উত্তেজনা ও প্রশান্তির মুহূর্তে। দুর্বলতা-সবলতা, সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য সব অবস্থায় তাকে দেখেছে। কারণ মানুষের মাঝে এমন সব গুপ্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি এবং অদৃশ্য ধরাছোঁয়া, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির বাইরে এমন সব প্রতিভা ও সৌন্দর্য রয়েছে যা প্রকাশ করার ভাষা ও শব্দ দুনিয়ার কোন ভাষার অভিধান আজও সৃষ্টি করতে পারেনি। এ অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের মনোরম দৃশ্য আঁকা এবং ভাষার মাধ্যমে তা পেশ করা দুনিয়ার কোন সমৃদ্ধতম কোন ভাষা ভাণ্ডারের পক্ষেও সম্ভব নয়।

সীরাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জটিলতা, সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা ও পূর্ণতার দিক থেকে আর সব মহামানবের জীবনী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এর হিফাজত ও সংরক্ষণ এবং জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে এর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসশাস্ত্রের বরকতেই জানা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর আর কোন নবী-রাসূল ও মহামানবের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা এভাবে সংকলিত, সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়নি।

সীরাত গ্রন্থ শামায়েল এবং রাতে ও দিনে পঠিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাসনুন দু'আ ও ওজীফা, শেষ রজনীর আহাজারি, অশ্রু বিসর্জন, উম্মাত তথা গোটা বিশ্বমানবতার শেষ পরিণতির চিন্তায় অস্থিরতা ও বেকারারীর যে নমুনা তাঁর মাসনুন দু'আ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে সীরাতে সংরক্ষণে এর প্রভাব ও অবদান অপরিসীম। এমনিভাবে তাঁর অন্যান্য সাধারণ বাণী, তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম, আখলাক-চরিত্র, গঠন-আকৃতি ও অপূর্ব গুণাবলীর নিপুণ ও নিখুঁত বর্ণনাকারী ও মহাত্মা পরিবারবর্গ তাঁর যে অপরূপ চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাস এর চেয়ে অধিক নিপুণ ও সূক্ষ্ম চিত্র এবং মানবীয় আচার-আচরণ, চারিত্রিক মাধুর্য ও মহত্ত্বের এত সুগভীর অপূর্ব বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সংরক্ষিত করতে সক্ষম হয়নি।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত রচনা করতে কোন প্রকার কিয়াস-অনুমান ও মনগড়া সব নিয়ম-নীতির অনুসরণ ও এর ওপর নির্ভর করার আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর প্রয়োজন পৃথিবীর মহামনীষীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী আর সব মনীষীর জীবনীর চেয়ে পরিপূর্ণ, ঐশ্বর্যময় ও অপরূপ শোভাময়। উৎস-মূল কুরআন পাকের তাবৎ সুস্পষ্ট বর্ণনা, ইতিহাসের অনস্বীকার্য সাক্ষ্য, তাঁর আখলাক-চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা বিদ্যমান যার অধিক আর কল্পনা করা যায় না। এ ছাড়া এ সীরাত বাস্তবতার এত নিকটবর্তী যা অকল্পনীয়!

মহানবী ﷺ-এর জীবনী অন্য নবী-রাসূল ও মহামনীষীদের জীবনীর মাঝে এক বিশাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনীর এ অকল্পনীয় ব্যাপকতা, জটিলতা ও খুঁটিনাটি বিষয়ের এ বর্ণনায় তাঁর আখলাক ও চরিত্রের অপূর্ব বিবরণ পওয়া যায়। তাঁর সীরাত, দাওয়াত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যে সকল অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে যা মানবীয় গুণাবলীর চূড়ান্ত বিকাশ। তাঁর অপূর্ব দৈহিক গঠন ও আকৃতি, তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শোভা-সৌন্দর্য, তাঁর স্নেহ-ভালবাসা, মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ও তাদের সেবা, তাঁর দু'আ ও আল্লাহর দরবারে মুনাজাত, মানুষ ও সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যত চিন্তায় তাঁর মনের অস্থিরতা ভাষায় পূর্ণ রূপ দেয়া সম্ভব নয়। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী, বক্তৃতা ও অলঙ্কার ভাষা-সাহিত্য এবং জীবনের অসংখ্য অবিনশ্বর ঘটনা, এ সব কিছুর নিখুঁত ছবি আঁকা মোটামুটি অসম্ভব।

সীরাত ও শামায়েল গ্রন্থসমূহ যা কিছু সংকলন ও সংরক্ষণ করে আমাদের দিয়েছে (সীরাত ও শামায়েল লেখকদের যাবতীয় প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিনয়ের সাথে বলতে হয়) এটা তাঁর সুবিশাল সীরাতের অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের ও সুমহান নবুওয়াতের যে পরিপূর্ণতা দিয়ে আল্লাহ্ পাক তাঁকে মহিমান্বিত করেছিলেন তার এক সামান্য ঝলকমাত্র। সীরাত ও শামায়েলের মহান লেখক ও রচয়িতাদের মর্যাদাপূর্ণ খেদমত সম্পর্কে এতটুকু বলা যায়, তাঁরা অনাগত কালের সীরাত প্রেমিকদের নিকট, বিশেষভাবে অগণিত সত্যানুসন্ধানী মানুষের নিকট সাধারণভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁদের সকল কর্ম প্রচেষ্টা সর্বকালের চরম প্রশংসিত, চিরঅম্লান, চিরসুন্দর প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হতে থাকবে।

আল্লাহ তাঁদের প্রচেষ্টার যথাযোগ্য প্রতিদান দান করুন! তাঁরা সীমাহীন নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন। এটা মানব ইতিহাসে বিস্ময়কর এক ঘটনা! সীরাত সমগ্র মানব জাতির সর্বকালের সর্বজাতির সকল ব্যক্তির সম্মিলিত সম্পদ যেখানে সবার অংশ ও অধিকার বিদ্যমান। সকলেই এ থেকে জীবন চলার পথের আলোক ও পথ নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে:

لقدكان فى رسول الله اسوة حسنة. لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا.

"আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাত ও কিয়ামত দিবসের আশা রাখে এবং যারা আল্লাহকে অনেক স্মরণ করে।" [সূরা আল-আহযাব : ২১]

এ সকল কথা চিন্তা করেই আমি সীরাতের এ জটিল বিষয়ের ওপর নতুন করে কলম ধারণ করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমি এ মহান কাজকে নিজের যোগ্যতার

অনেক ঊর্ধ্বে মনে করি। কিন্তু আমার অনেক গণ্যমান্য বন্ধু[১] আমাকে এ কথা বলে অনুপ্রাণিত করেন, আরবী ভাষায় এমন একটি সীরাত গ্রন্থ রচনা করি যেটাতে রুচি ও চাহিদার দিক দিয়ে নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতা ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি সচেতনভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যা সমকালীন জিজ্ঞাসার দাবি ও চাহিদা পূরণ করতে পারে। ফলে লেখা ও গবেষণা রীতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের প্রচলিত পদ্ধতির অনুকরণ করা হবে। কারণ প্রতিটি যুগের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণনারীতি থাকে যাতে সে বলতে ও কাজ করতে অভ্যস্ত। এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অত্যধিক প্রয়োজন। যেমন প্রতিটি যুগের চিকিৎসা ও খানাপিনার নিজস্ব স্টাইল থাকে, অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যার পরিরর্তন হতে থাকে। আর এসব কাজ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে করতে হবে। স্বীয় প্রবৃত্তির ও হীন স্বার্থ উদ্ধার করার মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সীরাতকে সদা পরিবর্তনশীল মতবাদ ও মতাদর্শের ঊর্ধ্বে রেখে এবং বেশির ভাগ সময় ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, গোঁড়ামি ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির মানসিকতা থেকে সৃষ্ট সকল সন্দেহ ও অভিযোগ থেকে সীরাতকে পাক-পবিত্র রেখে এ মহান কাজের আঞ্জাম দিতে হবে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি একাগ্র চিত্তে এ কাজে মনোনিবেশ করলাম। আমার প্রতিটি মুহূর্ত সীরাতুন্নবীর পরিবেশে কাটতে লাগল। পাঠ্যক্রমে আমি শুধু কুরআন ও হাদীসের ওপরই নির্ভর করিনি, বরং প্রাচীন ও আধুনিক সীরাতশাস্ত্র ও জ্ঞানভাণ্ডারের যে কোন প্রয়োজনীয় উপকরণ আমার হস্তগত হয়েছে তা থেকেও আমি পূর্ণরূপে উপকৃত হয়েছি। এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আমি নির্ভর করেছি সেই সব প্রামাণিক গ্রন্থের ওপর যেগুলো সর্বকালের সীরাতশাস্ত্রের মৌলিক ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সীরাতে ইবনে হিশাম, ইবনুল কাইয়িম রচিত 'যাদু'ল-মা'আবাদ', 'সীরাতে ইবনে কাছীর' (যা মূলত তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' গ্রন্থের অংশ ছিল, পরে তা চার খণ্ডে স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ নেয়)।

তা ছাড়া বর্তমান যুগেও সীরাতের ওপর যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলো এবং পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক ও মৌলিক গ্রন্থসমূহ যেসব দ্বারা সীরাতের অনেক দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যুগ ও সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়, সেসব গ্রন্থ থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণ সহযোগিতা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থে সীরাতের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও দাওয়াত-এ দু'টি দিকই সমভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে; তার কোন এক দিক অন্যটির ওপর প্রাধান্য না পায় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এতে সীরাতের জীবন-স্পন্দন ও আবেগ-অনুভূতিপূর্ণ এমন সব বিরল নির্বাচিত অংশসমূহের অধিক হারে সমারোহ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এর নজির অন্য কোন সীরাতে, কোন মহামানবের জীবনী, কোন জাতি-ধর্মের দাওয়াত ও আন্দোলনের ইতিহাসে নেই। আর এ সকল ঘটনা ও অংশের উল্লেখ করতে গিয়ে কোন প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া হয়নি, বরং তার স্বাভাবিক ও নিজস্ব রূপেই ফুটে উঠেছে। কারণ যা প্রাকৃতিক রূপ-রস ও শোভা-সৌন্দর্যবিমণ্ডিত তার কোন কৃত্রিম রঙ ও রূপের প্রয়োজন পড়ে না, যেমন প্রয়োজন হয় না প্রাকৃতিক সুগন্ধ-সুবাসিত ফুটন্ত সতেজ ফুলে কৃত্রিম সুবাসের।

গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করার পর থেকে এটাই আমার কর্ম ব্যস্ততা ও চিন্তা-গবেষণার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১৩৯৬-১৩৯৭ শাওয়াল (১৯৭৫-৭৬ অক্টোবর) এ দীর্ঘ এক বছরে আর অন্য কোন কাজ করিনি। এর ভেতর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দীর্ঘ সফরে কিছু সময় অতিবাহিত করতে হয় আর কিছু সময় রোগশোকে কাটাতে হয়। আল্লাহর অপার করুণাময় ১৩৯৭ হি.-এর প্রারম্ভেই এ গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে যা আজ পাঠকমণ্ডলীর হাতে।

এ মুহূর্তে আমি সেই সকল একনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা জরুরী মনে করছি যাঁরা এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আমাকে ঋণী করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন মাওলানা বুরহান উদ্দিন সাহেব, উস্তাদ, হাদীস ও তফসীর বিভাগ নদওয়াতুল উলামা, যিনি হাদীস অনুসন্ধান ও তার মূল সূত্র খুঁজে বের করার কাজে এবং সীরাতের গ্রন্থসমূহের জটিল স্থানের ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে এর উপযুক্ত বিনিময় দান করুন! দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন জনাব মুহিউদ্দিন সাহেব যিনি পাশ্চাত্য ভাষার প্রামাণিক গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস, বিভিন্ন ধরনের বিশ্বকোষ (Encyclopedias) তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের মতো জটিল কাজে তাঁর অমূল্য সহযোগিতাকে ও মেহনতকে স্বীকার করেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। নিজের অক্ষমতার কারণে দীর্ঘদিন যাবত স্বহস্তে লিখতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। তাই অন্যের সহযোগিতায় লেখার ওপর আমার নির্ভর করতে হয়।

এ গ্রন্থ রচনার সময় আমার দুই প্রিয়ভাজন মুহাম্মদ মায়াজ ইন্দোরী নদভী ও আলী আহমদ গুজরাটি নদভী আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। প্রিয় মাওলানা নূর আলম খলীল আমীনী নদভী, উস্তাদ, নদওয়াতুল-উলামা, গ্রন্থের চূড়ান্ত কপি তৈরির গুরু দায়িত্বের আঞ্জাম দেন। আল্লাহ এঁদের উত্তম প্রতিদান দিন! এই সীরাত গ্রন্থে মানচিত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ মানচিত্রের সাহায্যে অনেক জটিল বিষয় এত সহজে বোঝা যায় যা দীর্ঘ বাক্য ব্যয়েও বোঝা যায় না। এসব মানচিত্রে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমসাময়িক ইতিহাসের সুগভীর অধ্যয়নের আলোকে রচিত হয়েছে। এসব মানচিত্র যাতে তথ্যনির্ভুল, পরিপূর্ণ, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও আধুনিক যুগের উপযোগী হয় তার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মানচিত্র

প্রণয়নের এ দুরূহ কাজে বন্ধুবর জনাব মুহাম্মদ আনসারী (এম. এ, ভূগোল) ও প্রফেসর শফী সাহেব, সহকারী ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রধান, ভূগোল বিভাগ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, এ বিভাগে কর্মরত সকলেই এ কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করে এ কাজকে দ্রুত করতে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ এঁদের সকলকে সমুচিত প্রতিদান দিন! তাঁরা সকলেই এ কাজকে সীরাতুন্নবীর এক গুরুত্বপূর্ণ খিদমত মনে করেছেন। প্রিয়ভাজন রাবে নদভী, লেখক, 'জযীরাতুল আরব' (আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক পরিচিতি) ও প্রধান, আরবী ভাষা সাহিত্য বিভাগ, নদওয়াতুল-উলামা-এর মূল্যবান পরামর্শ এ কাজের অংশীদার। আল্লাহ এ সকল মুখলিস বন্ধু-বান্ধবের যথাযোগ্য প্রতিদানে ভূষিত করুন! লেখকের গুরুত্বপূর্ণ আরবী গ্রন্থসমূহের উর্দূ অনুবাদক প্রিয় মুহাম্মদ আল-হাসানী, সম্পাদক, আল-বা'ছ আল-ইসলাম, নিজের সৌভাগ্য মনে করে জান-প্রাণ দিয়ে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এ গ্রন্থের বেলায়ও তিনি মন-প্রাণ দিয়ে হাজির ছিলেন। আল্লাহ তাঁকেও উত্তম পুরস্কার দান করুন!

অবশেষে আল্লাহর দরবারে এ দু'আ ও মুনাজাত করি, তিনি যেন এ গ্রন্থ সকলের জন্য উপকারী বানান, এ আমলটুকু কবুল করে নেন, এটা যেন আখেরাতের সঞ্চয় হয়, সীরাতের পাঠ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে উপকৃত হবার পথের সোপান হয়! এ গ্রন্থ যদি কোন মুমিনের অন্তরে নবীপ্রেমের একটি স্ফুলিঙ্গও জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং এটা পাঠের পর কোন অমুসলিমের অন্তরে যদি নবীয়ে রহমতের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও সৃষ্টি হয়, তাঁর ভালবাসা তার অন্তরকে করে তোলে আন্দোলিত এবং তার অন্তরের প্রত্যন্ত কোণে ইসলামকে বোঝবার এতটুকু সদিচ্ছাও উঁকি মারে, আর এর চেয়েও বড় কথা, এ গ্রন্থখানি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় এবং লেখকের ক্ষমা ও শাফায়াতের উসিলা হয়, তবে এ কথা মনে করে আনন্দাপ্লুত হব, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব, আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। তখন এ কথা বলার সাহস ও অধিকার অনুভব করব!

স্বীয় জীবনের প্রতি আনন্দিত ভাই;
একটি ভাল কাজ করতে পেরেছি তাই।

জুমু'আর দিন — আবুল হাসান আলী নদভী

৫-১১-১৩৯৬ হি. — দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ (র)

২৯-১০-১৯৭৬ ঈ. — রায়বেরেলী

অন্ধকার যুগ

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধর্ম ও সেগুলোর অনুসারিগণ: এক নজরে

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দি পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সেসবের বিধি-বিধানসমূহ (যেগুলো ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা ও জ্ঞানের ময়দানে বিভিন্ন সময় তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালন করেছিল) শিশুদের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল এবং বিকৃতির পতাকাবাহী, মুনাফিক, খোদাভীতিহীন ও বিবেকহীন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বার্থের লক্ষ্যে ও কালের কুটিল চক্রান্ত ও বিপর্যয়ের এমন শিকারে পরিণত হয়েছিল যে, সেসবের আসল রূপ চিনে নেয়া কষ্টকরই নয়, বরং বলা চলে, অসম্ভব ছিল। যদি ঐসব ধর্মের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা, পতাকাবাহী ও সম্মানিত নবীগণ পুনরায় ফিরে এসে এই অবস্থা দেখতেন তবে তাঁরা তাঁদের রেখে যাওয়া ধর্মকে নিজেরাই চিনতে পারতেন না এবং ঐসব ধর্মের সঙ্গে নিজদের জড়িত করার জন্য কখনো প্রস্তুত হতেন না।[১]

ইয়াহূদী ধর্ম ছিল কতকগুলো নিষ্প্রাণ রীতিনীতি ও কিংবদন্তীর সমাহার যার মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন মোটেই ছিল না। এ ছাড়া ইয়াহূদী ধর্ম স্বয়ং একটি বংশীয় ও সম্প্রদায়গত ধর্ম বিধায় এর নিকট বিশ্বের জন্য কোন পয়গাম, পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর জন্য কোন আবেদন এবং মানবতার জন্য তার রোগ মুক্তির জন্য কোন প্রতিকার ও প্রতিষেধক ছিল না।

এই ধর্ম স্বীয় তৌহিদী আকীদার ওপরও বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচিতি ছিল যার ভেতর তার সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রাচীনকালে বনী ইসরাঈলের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত রয়েছে এবং যার ওসিয়্যত করেছিলেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইয়া'কূব (আ) তাঁদের পুত্রদেরকে দৃঢ়পদ থাকতে পারেনি। ইয়াহূদীরা তাদের প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীর

---

১. ঐ সব প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর (যারা বড় বড় বিখ্যাত ধর্মের পতাকাবাহী ছিল) ধর্মগ্রন্থসমূহ যে নির্মম ও নির্দয়ভাবে বিকৃতির শিকার হয়েছিল, বরং যেভাবে সেবরের রূপ ও মূল বিষয়বস্তু কদাকার করা হয়েছিল, এর বিস্তারিত বিবরণ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেয এবং স্বয়ং তাদের জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের স্বীকারোক্তির আলোকে তাওরাত ও ইনজীল-এর যাত্রা থেকে নিয়ে ইরানের ধর্মগ্রন্থ আভেস্তা ও ভারতবর্ষের বেদ পর্যন্ত মিলবে। আমার লেখা منصب نبوت اور اسکے عال مقام حالین নামক গ্রন্থের ৭ম অভিভাষণ (খতমে নবূওয়াত), ২২৮-২৪২ দেখুন। (ই.ফা. থেকে এর বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়েছে)।

প্রভাবে অথবা বিজয়ী জাতিগোষ্ঠীগুলোর চাপে তাদের বহু আকীদা তথা ধর্মবিশ্বাস কবুল করে নেয় এবং তাদের বহু অভ্যাস, শির্কমূলক, পৌত্তলিক ও জাহিলী গালগল্প তথা কিংবদন্তী গ্রহণ করে, বিবেকবান কোন কোন ইয়াহূদী ঐতিহাসিক এর স্বীকারোক্তি করেছেন। Jewish Encyclopaedia-এর নিবন্ধকার লিখছেন :

মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে নবীদের ক্রোধ ও কুপিত হওয়া থেকে একথা প্রকাশ পায়, দেবতার পূজা-অর্চনা ইসরাঈলী জনসাধারণের অন্তর-রাজ্যে আসন গেড়ে বসেছিল এবং ব্যবিলনের নির্বাসন থেকে ফেরার সময় পূর্ণরূপে এর নির্মূল হয়নি। কল্পনা পূজা ও যাদুর মাধ্যমে বহু শির্কমূলক ধ্যান-ধারণা ও রসম-রেওয়াজ আবারও জনগণ গ্রহণ করেছিল। তালমূদ থেকেও এর সাক্ষ্য মেলে, মূর্তি পূজার মধ্যে ইয়াহূদীরা বিরাট আকর্ষণ খুঁজে পেত।[১]

ব্যবিলনের তালমূদ[২] (যাকে ইয়াহূদীদের মধ্যে সীমাতিরিক্ত পবিত্র জ্ঞান করা হতো এবং কোন কোন মুহূর্তে তাওরাতের ওপরও একে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে যা খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়াহূদীদের মধ্যে জনপ্রিয় ও প্রচলিত ছিল) স্বল্প বুদ্ধি, কটুকাটব্য, খোদার নিকটে ধৃষ্টতা ও গোস্তাখী প্রদর্শন, মূলতত্ত্ব ও স্বীকৃত সত্যের সঙ্গে এবং দীন ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরার এমন সব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর নমুনা দ্বারা পূর্ণ যা দেখে ঐ শতাব্দীতে ইয়াহূদী সমাজের চেতনা ও ভাবনার অধঃপতন এবং ধর্মীয় রুচি বিকৃতির পূর্ণ পরিমাপ করা যায়।[৩]

খৃস্টবাদ তার জন্ম ও বিকাশের প্রথম প্রভাতেই চরমপন্থীদের সৃষ্ট বিকৃতি, মূর্খ জাহিলদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রোমক খৃস্টানদের পৌত্তলিকতার শিকার হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর সহজ-সরল তথা অনাড়ম্বর ও পবিত্র শিক্ষামালা ঐ সমস্ত ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তওহীদ ও ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদতের নূর গভীর মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষে খৃস্টান সমাজের ত্রিত্ববাদের আকীদা-বিশ্বাস কিভাবে ঢুকে পড়েছিল এবং কিভাবে তা সংক্রমিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একজন খৃস্টান মনীষী লিখেছেন :

"এই আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস, 'এক আল্লাহ তিনটি মৌলিক বস্তুর সংমিশ্রণ' চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকেই খৃস্টান বিশ্বের গোটা যিন্দেগী ও চিন্তাধারায় ঢুকেছিল

---

১. Jewish Encyclopaedia

২. তালমূদ অর্থ ইয়হূদীদের ধর্ম ও আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রন্থ। এটি প্রকৃতপক্ষে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের শরীয়ত গ্রন্থ আল-মুশাল্লাহর টীকা-ভাষ্যের সংকলন যা বিভিন্ন যুগে প্রচলিত ছিল।

৩. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন 'তালমূদের আলোকে ইয়াহূদী সম্প্রদায়" ড. রোহলিঙ্গ কৃত, ড. য়ুসুফ হান্নাকৃত এর আরবী তরজমা– الكنز المرصود فى قواعد التلمود।

এবং দীর্ঘকাল যাবত সরকারী ও স্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাস হিসাবে, যা গোটা খৃস্টান বিশ্ব মান্য করত, অবশিষ্ট থাকে, এমন কি খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেএই আকীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন ও এই আকৃতি ধারণ পর্যন্ত পৌঁছুবার গোপন রহস্যভেদ হয়।"[১]

একজন সমসাময়িক খৃস্টান ঐতিহাসিক খৃস্টান সমাজে পৌত্তলিকতার সূচনা, এর নিত্য নতুন রূপ এবং অপরাপর মুশরিক ও পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠীর (তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় প্রথা-পদ্ধতি ও নিদর্শনসমূহ, আচার-অভ্যাস, পালা-পার্বণ ও অনুষ্ঠানগুলোতে) অন্ধ আনুগত্য, ভয়-ভীতি কিংবা মূর্খতার ভিত্তিতে তাদের হুবহু নকল করবার প্রবণতা এবং এ ব্যাপারে খৃস্টানদের নিত্য নতুন কলা-কৌশল আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর The History of Christianity in the light of Modern Knowledge নামক গ্রন্থে বলেন :

"পৌত্তলিকতা শেষ হলো বটে কিন্তু একেবারে ধ্বংস হলো না, বরং তা আত্মস্থ করে নেয়া হলো। প্রায় সব কিছুই, যা পৌত্তলিকতার মধ্যে ছিল, তা খৃস্ট ধর্মের নামে চলতে লাগল। যে সমস্ত লোকের তাদের দেবদেবী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের থেকে হাত গুটাতে হয়েছিল তারা অবচেতনভাবে খুব সহজেই ধর্মের জন্য জীবন দানকারী কোন শহীদকে প্রাচীন দেবতার গুণে গুণান্বিত করে কোন স্থানীয় প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্মিত প্রতিকৃতিকে তার নামে নামকরণ করল এবং এভাবে কুফরী মতবাদ ও পৌরাণিক কাহিনী ঐ সব স্থানীয় শহীদের নামে নামাংকিত হয়ে গেল এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত ওলী-আওলিয়ার আকীদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। ঐ সব ওলী-আওলিয়া একদিকে তো আরাইউসীনদের আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ ও তার স্রষ্টার মাঝে স্বর্গীয় ঐশ্বরিক মর্যাদার অধিকারী মানুষের রূপ ধারণ করল এবং অপরদিকে এ মধ্যযুগের পবিত্রতা ও সাধুতার প্রতীকে পরিণত হলো। পৌত্তলিক হোলী ও দেয়ালী উৎসব গ্রহণ করে সে সবের নাম পাল্টে দেয়া হয়, এমন কি ৪০০ খৃ. পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে সূর্য দেবতার প্রাচীন উৎসব যীশু খৃস্টের জন্মদিনের রূপ ধারণ করল।"[২]

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে সিরিয়া ও ইরাকের খৃস্টান ও মিসরের খৃস্টানদের যুদ্ধ পূর্ণ শক্তিতে চলছিল। আর এই যুদ্ধ চলছিল যীশু খৃস্টের হাকীকত ও মাহিয়ত নিয়ে অর্থাৎ যীশুর পবিত্র সত্তা ঐশ্বরিক অথবা পার্থিব ও তাতে কোন্ অংশ কতটা এবং এই যুদ্ধের দরুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গির্জা ও বাড়িঘর সব কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যারা একে অপরকে কাফির তথা অবিশ্বাসী ঘোষণা করত।

---

১. New Catholic Encyclopaedia. Vol. 14 1961 থেকে উদ্ধৃত, নিবন্ধ তিন পবিত্রাত্মা, ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃ. সংক্ষেপিত।

২. Rev. James Houston Bexter-কৃত, গ্লাসগো, ১৯২৯, পৃ. ৪০৭।

তারা একে অপরের রক্ত পিপাসুতে পরিণত হয়েছিল। তাদের যুদ্ধরত দেখে মনে হচ্ছিল, এ বুঝি দু'টি ভিন্ন ধর্ম ও বিরোধী জাতিগোষ্ঠীর যুদ্ধ![১] সেজন্য খৃস্টানদের এ অবকাশ ছিল না, পৃথিবী জুড়ে অরাজকতা, বিপর্যয়রোধে ও অবস্থার সংশোধনে তারা চেষ্টা চালাবে এবং মানবতাকে কল্যাণ ও মুক্তির জন্য পয়গাম দেবে।

মজূসীরা (ইরানের অগ্নিউপাসক পার্শী সম্প্রদায়) প্রাচীনকাল থেকে সৃষ্টির মৌলিক উপাদান চতুষ্টয়ের বৃহত্তম উপাদান অগ্নির পূজা করত এবং তারা এর জন্য নির্দিষ্ট অগ্নিকুণ্ডলী ও উপাসনাগৃহ তৈরি করেছিল। দেশের সর্বত্র অগ্নি পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এজন্য সুশৃঙ্খল আইন ও সূক্ষ্ম বিধি-বিধান নির্ধারিত ছিল এবং সে অনুসারে আমল করা ছিল বাধ্যতামূলক। অগ্নি পূজা ও সূর্যকে পবিত্র জ্ঞান করা ছাড়া আর সব দর্শন ও ধর্মবিশ্বাস সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাদের নিকট ধর্ম কয়েকটি প্রথা-পদ্ধতি কিংবা আচার-অনুষ্ঠানের বেশি আর কোন মূল্য বহন করত না যেগুলো তারা নির্দিষ্ট জায়গায় পালন করত। উপাসনাগৃহের বাইরে তারা ছিল একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন যেখানে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশী ও মর্জি মুতাবিক জীবন যাপন করত। একজন অগ্নিউপাসক ও একজন বেদীন, বিবেকহীন ও অপদার্থের মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক ছিল না।[২]

"সাসানী আমলে ইরান" গ্রন্থের লেখক আর্থার ক্রিস্টিনসেন সে যুগের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন, "সরকারী কর্মচারীদের জন্য দিনে চারবার সূর্য পূজা করা আবশ্যিক কর্তব্য ছিল। চন্দ্র পূজা, অগ্নি পূজা ও পানি পূজা ছিল এর অতিরিক্ত। শয়ন, জাগরণ, গোসল, পৈতা পরিধান, খানাপিনা, হাঁচি দেয়া, চুল ছাঁটা, নখ কাটা, পেশাব-পায়খানা, প্রদীপ জ্বালানো, মোটকথা সকল কাজের জন্যই মন্ত্র ছিল এবং এগুলো করা তাদের জন্য ছিল জরুরী। তাদের ওপর এও নির্দেশ ছিল, অগ্নি শিখা সদা প্রজ্বলিত ও অনির্বাণ থাকবে, কোন অবস্থাতেই তা নেভানো যাবে না এবং আগুন ও পানি একে অপরের সঙ্গে যেন না মেশে আর ধাতব পদার্থে যেন মরিচা না পড়ে! কেননা ধাতব পদার্থ তাদের দৃষ্টিতে পবিত্র ছিল।"[৩]

ইরানের লোকেরা আগুনের দিকে মুখ করে পূজা করত। ইরানের শেষ সম্রাট ইয়াযদগির্দ একবার সূর্যের কসম খেয়ে একথা বলেছিল :

"আমি সূর্যের কসম খাচ্ছি যিনি সবচেয়ে বড় উপাস্য।" তিনি সেসব খৃস্টানকে, যারা খৃস্ট ধর্ম থেকে তওবা করেছিল, বাধ্য করেছিলেন তাদের ধর্মনিষ্ঠা প্রমাণের

---

১. আলফ্রেড বাটলারের গ্রন্থ Arabs, Conquest of Egypt and Last Thirty years of Roman dominion, অক্সফোর্ড ১৯০২, পৃ. ৪৪-৫।

২. সাসানী আমলে ইরান, ১৫৫ পৃ.।

৩. সাসানী আমলে ইরান, ১৫৫ পৃ.।

জন্য সূর্যের পূজা করতে।[১] ইরানের লোকেরা সর্বকালে ও সর্বযুগেই দ্বিত্ববাদের শিকার ছিল অর্থাৎ তারা দুই খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল, এমন কি এটাই তাদের আলামত ও পরিচয় দানকারী চিহ্নে পরিণত হয়। তারা দুই খোদার সমর্থক ছিল। এক খোদা আলোর বা কল্যাণের যাকে তারা আহূরমর্যাদা বা য়াযদান বলত। দ্বিতীয় খোদা অন্ধকার বা মন্দের যার নাম রেখেছিল তারা আহরিমান। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই দুই খোদার মধ্যে নিজেদের দ্বন্দ্ব ও শক্তি পরীক্ষা আগাগোড়া চলে আসছে।[২]

"ইরানী ধর্মের এসব ঐতিহাসিক তাদের উপাস্য মা'বূদদের সম্পর্কে যেসব কাহিনী লিখেছেন এবং গোটা পৌরাণিক উপাখ্যান তৈরি করেছেন তা তাদের অত্যুদ্ভুৎ বিস্ময়প্রিয়তা এবং বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ে গ্রীক কিংবা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী থেকে কোনভাবেই কম নয়।"[৩]

বৌদ্ধ ধর্ম, যা ভারতবর্ষ ও মধ্যএশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছিল, তাও একটি পৌত্তলিক ধর্ম হয়ে গিয়েছিল। মূর্তি বৌদ্ধ ধর্মের লাগাম ধরে পথ চলছিল। যেখানেই তাদের কাফেলা বিশ্রাম মানসে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছাউনি ফেলত সেখানেই গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা হতো এবং দেখতে না দেখতেই একটি উপাসনাগৃহ তৈরি হয়ে যেত।[৪]

জ্ঞানী পণ্ডিতমহল এখন পর্যন্ত এই ধর্ম ও এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সন্দিহান, আসমান-যমীন, এমন কি স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বে তার বিশ্বাস ছিল কি না অর্থাৎ তিনি স্বয়ং স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কি না। তারা তো বিস্মিত, স্রষ্টার প্রতি ঈমান ও গভীর বিশ্বাস ছাড়া এই বিরাট ধর্ম কি করে টিকে রইল![৫]

থাকল হিন্দু ধর্ম! এ হিন্দু ধর্ম তো দেবদেবীর সংখ্যার দিক দিয়ে অপরাপর ধর্মের তুলনায় অনেক অগ্রসর। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মূর্তি পূজার ছিল রমরমা রাজত্ব। এই শতকে তাদের উপাস্য দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছিল। মোটের ওপর প্রতিটি বৃহৎ কিংবা ভয়াবহ অথবা উপকারী বস্তুই ছিল তাদের উপাস্য দেবতা। মূর্তি নির্মাণ ও ভাস্কর্য তৈরি বিদ্যা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং এ ক্ষেত্রে নিত্য নতুন কলাকৌশল বের হচ্ছিল।[৬]

---

১. প্রাগুক্ত, ১৮৬-৮৭ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, অধ্যায়, যরদশত ধর্ম : সরকারী ধর্ম, ১৩৩ পৃ.।

৩. প্রাগুক্ত, ২০৪ + ২-৯ পৃ.।

৪. দ্র. "হিন্দুস্তানী তামাদ্দুন" উর্দূ অনুবাদ, ঈশ্বরী টোপাকৃত, ২০৯ পৃ. অধ্যাপক তাহযীব হিন্দ, হায়দারাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়; তাছাড়া পণ্ডিত নেহরুর Discovery of India, ২০১-২ পৃ.।

৫. দ্র. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটনিকার বৌদ্ধ ধর্মের ওপর লিখিত নিবন্ধ।

৬. দ্র. আর. সি. দত্তের গ্রন্থ Ancient India, ৩য় খ., ২৭৬ পৃ. ও L.S.S O Mattey; Popular Hinduism- The Religion of the Masses (Cambridge 1935) পৃ., ৬-৭.।

একজন হিন্দু মনীষী (সি. ভি. বৈদ্য) তার History of Medieval Hindu India নামক গ্রন্থে রাজা হরিশ (৬০৬-৬৪৮ খৃ.) সম্পর্কে লিখেছেন। মনে রাখতে হবে, এ সেই যুগ যার পরেই আরব উপদ্বীপে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।

"এ যুগে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধমত উভয়ই সমভাবে পৌত্তলিক ছিল, বরং খুব সম্ভব পৌত্তলিকতার দিক দিয়ে বৌদ্ধমত হিন্দু ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ ধর্মের যাত্রাই শুরু হয়েছিল আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুদ্ধকেই সবচে' বড় খোদার আসনে বসিয়ে দিল। পরে আরও অন্যান্য খোদা, যেমন Bodhisatvas-এর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখায় পৌত্তলিকতা চূড়ান্তভাবে আসন গেড়ে বসে। ভারতবর্ষে তা এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয় যে, প্রাচ্য ভাষাগুলোতে বুদ্ধের নাম পৌত্তলিকতার এক অর্থেই পরিণত হয়।[১]

এতে কোনই সন্দেহ নেই, সে যুগে মূর্তি পূজা গোটা পৃথিবী জুড়েই বিস্তৃত ছিল। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী পৌত্তলিকতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। খৃস্ট ধর্ম, সেমিটিক ধর্মসমূহ, বৌদ্ধ ধর্ম মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনে একে অপরকে অতিক্রম করবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।[২]

আরো একজন হিন্দু মনীষী তার Popular Hinduism : The Religion of the Masses নামক গ্রন্থে বলেন :

খোদা তৈরির কর্ম-কৌশল এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং বিভিন্ন যুগে এই খোদায়ী একাডেমী বা কাউন্সিল এত বিরাট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে, তার পরিমাপ করাই কঠিন। এগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন বাসিন্দাদের বহু উপাস্য দেবতাও ছিল যেগুলোকে হিন্দু ধর্মের দেবতা ও ভগবানগুলোর সাথে একীভূত করে নেয়া হয়েছিল। কালক্রমে এসব দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে গিয়ে পৌঁছে।[৩]

আরবদের সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায়, প্রাচীনকালে তারা দীনে ইবরাহীম (আ)-এর ধারক-বাহক ছিল এবং তাদের ভূখণ্ডেই আল্লাহর সর্বপ্রথম ঘর নির্মিত হয়। কিন্তু নবুয়ওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে কালের দূরত্ব ও আরব উপদ্বীপে কেন্দ্রীভূত হবার কারণে তারা খুবই নিম্নস্তরের পৌত্তলিকতার মধ্যে লিপ্ত

---

১. Vol I, Ponna 1921 P. 101 ফারসী ও উর্দূ সাহিত্যে মূর্তি শব্দটি যেরূপ অধিক হারে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে করে এর সত্যতার সমর্থন মেলে। এমনিতেও বুদ্ধ ও বুত শব্দ শুনতেও কাছাকাছি মনে হয়।

২. C.V. Vaidya. History of Medical Hindu India. Vol. Poona 1921, P. 101.

৩. L.S.S. O. Malley C.I.F. ICS. Popular Hinduism : The Religion of the Masses (Cambridge 1935), পৃ. ৬, ৭।

হয়ে পড়েছিল যাদের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের মূর্তি পূজক ও মুশরিক ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যেত না। তারা শিরক ও মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল এবং এক আল্লাহর পরিবর্তে বহু উপাস্য দেবতায় তারা বিশ্বাস করত। এসব নিজেদের তৈরী উপাস্য দেবতা গোটা সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানে আল্লাহর সঙ্গে শরীক, কল্যাণ-অকল্যাণ ও লাভ-ক্ষতির মালিক এবং কাউকে জীবিত রাখার বা মারার ব্যক্তিগত ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। গোটা আরব জাতিগোষ্ঠী পৌত্তলিকতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল। প্রতিটি গোত্র ও প্রতিটি এলাকার পৃথক উপাস্য দেবতা ছিল। যদি বলা হয়, আরবের প্রতিটি ঘরই একেকটি পুতুল গৃহে পরিণত হয়েছিল এবং তা বলা অত্যুক্তি হবে না।[১]

কাবা শরীফের ভেতরে ও এর প্রাঙ্গণে, যে গৃহ হযরত ইবরাহীম (আ) কেবল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর জন্যই নির্মাণ করেছিলেন, তিন শত ষাটটি মূর্তি স্থান পেয়েছিল।[২]

তারা মূর্তি পূজা ও দেবদেবীর পূজা-অর্চনা থেকে অগ্রসর হয়ে শেষকালে সব ধরনের পাথরকেই পূজা করতে শুরু করেছিল। তারা ফেরেশতা, জিন ও তারকারাজিকেও তাদের উপাস্য মনে করত। তারা বিশ্বাস করত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান এবং জিনেরা আল্লাহর অংশীদার। এজন্য তারা এসবের শক্তি ও প্রভাবে বিশ্বাসী ছিল এবং এর পূজা-অর্চনাকে কোনক্রমেই বাদ দিত না।[৩]

এক নজরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠী

এই ছিল সেই সব ধর্মের অবস্থা যা আপন আপন যুগে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবার জন্য পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিল, যেসব দেশ সুসভ্য হিসাবে পরিচিত ছিল, যেসব দেশে বিশাল হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল, নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের সরব চর্চা ছিল এবং যেসব দেশকে সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প ও কৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে চর্চার কেন্দ্র মনে করা হতো, সেসব দেশে ধর্মের অবয়ব ও আকৃতি ছিল একেবারেই বিকৃত। সেসব ধর্ম আপন মৌল সত্তা, মূল্য ও মর্যাদা, শক্তি ও কল্যাণের ইচ্ছা খুইয়ে বসেছিল। সংস্কারক ও চরিত্র ও নৈতিকতার শিক্ষকের বহু দূর পর্যন্ত দেখা মিলছিল না।

---

১. দ্র. ইবনুল-কলবীর কিতাবুল-আসনাম।

২. সহীহ বুখারীর কিতাবুল-মাগাযী, মক্কা বিজয় শীর্ষক অধ্যায়।

৩. কিতাবুল-আনাম, পৃ. ৪৪।

প্রাচ্যের রোমক সাম্রাজ্য

প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যে[১] ট্যাক্সের বোঝা এতই দুর্বহ হয়ে পড়েছিল যে, দেশের গণমানুষ আপন হুকুমতের মুকাবিলায় বিদেশী শাসনকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিল। বারবার বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দিত। কেবল ৫৩৩ খৃস্টাব্দে একটি দাঙ্গায় কনস্টাটিনোপলের ত্রিশ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল।[২] তাদের রাত দিনের সবচেয়ে বড় ভাবনা ও আকর্ষণই ছিল, যে কোন উপায়েই হোক, সম্পদ অর্জন, অতঃপর অর্জিত সম্পদে আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন যাপনে ব্যয় করা। ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্ত বিনোদনের মাঝে তারা এত দূর অগ্রসর হয়েছিল যে, তা অন্ধত্ব ও বর্বরতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।[৩]

Civilization : Past and Present নামক গ্রন্থের লেখক বায়যান্টাইন সমাজের এই অদ্ভুত বৈপরীত্য, নৈতিক অরাজকতা ও চারিত্রিক বিপর্যয়, খেল-তামাশাপ্রিয় স্বভাব ও চিত্ত বিনোদন প্রীতির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন, "বায়যান্টাইনীয় সমাজ জীবনে বিরাট বৈপরীত্য পাওয়া যেত। ধর্মীয় ঝোঁক তাদের মন-মস্তিষ্কে গভীরভাবে ঢুকে গিয়েছিল। দুনিয়া বর্জন ও বৈরাগ্যবাদ সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল এবং সাধারণ স্তরের একজন নাগরিকও গভীরতর ধর্মীয় আলোচনায় উৎসাহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করত। এরই সাথে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ওপর লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা ও গোপনীয়তার ছাপ লেগেছিল। কিন্তু এর বিপরীতে এই সব লোকই আবার সর্বপ্রকার খেল-তামাশার প্রতি অস্বাভাবিক রকম আগ্রহীও ছিল।

সার্কাসের ছিল বিশাল ময়দান যেখানে একই সঙ্গে আশি হাজার দর্শক বসতে পারত। এখানে রথের বিরাট দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। জনসাধারণকে 'নীল' ও 'হরিৎ' দুই গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। বায়যান্টীয়দের মধ্যে রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসাও ছিল, আবার জুলুম-নিপীড়ন, মালিন্য ও কদর্যতার প্রতি আকর্ষণও ছিল। তাদের ক্রীড়া-কৌতুক অধিকাংশ সময় রক্তাক্ত ও কষ্টদায়ক হতো। তাদের যন্ত্রণা ও কষ্ট ভয়ানক ও ভীতিপ্রদ হতো এবং তাদের বিশিষ্ট

---

১. প্রাচ্যের রোমক সাম্রাজ্যের উল্লেখ ইতিহাসে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য নামেই করা হয়েছে। আরবরা একে রোম বলে। যে যুগের আলোচনা আমরা করছি সে যুগে সাম্রাজ্যের অধীন নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলো ছিল ঃ গ্রীস, বলকান, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, গোটা রোম সমুদ্র এলাকা ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকা। এর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিপোল। ৩৯৫ খৃ.-এ এর সূচনা এবং ১৪৫৩ খৃ. উছমানী তুর্কীদের বিজয়ের মাধ্যমে এর সমাপ্তি।

২. ইনসাইক্লো-ব্রিটানিকা, জাস্টিনিয়ান নিবন্ধ।

৩. এডওয়ার্ড গিবন-এর Decline and Fall of the Roman Empire.

লোকদের (Elites) জীবনে ছিল আনন্দ-আয়েশ, ষড়যন্ত্র, লৌকিকতা ও যাবতীয় মন্দের জগাখিচুড়ি।[১]

মিসর ছিল (প্রাচুর্যের অধিকারী বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ) ভয়ানক ধর্মীয় নিপীড়ন ও নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক জোর-যবরদস্তির শিকার এবং এরই সাথে সাথে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাচুর্যের এক বিরাট মাধ্যম ছিল, ছিল এর উৎসও। এর উদাহরণ ছিল সেই গাভীর মত যাকে বেশ ভালভাবে দোহন করা হবে বটে, কিন্তু খোরাক দেয়া হবে স্বল্প থেকে স্বল্পতর পরিমাণ।[২]

সিরিয়া ছিল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রদেশ। এ ছিল রোমকদের সম্প্রসারণশীল ও সাম্রাজ্যলিপ্সু মানসিকতার শিকার, যেখানে কেবল শক্তির জোরে বিদেশীদের মতই শাসন ক্ষমতা চালান হতো এবং শাসিত প্রজাবর্গ কখনও স্নেহ ও ভালবাসার মুখ দেখতে পেত না। দরিদ্রের অবস্থা ছিল, অধিকাংশ সিরিয়াবাসী তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের শিশু সন্তানদেরকে বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। বিভিন্ন রকম জুলুম-নির্যাতন, অধিকার হরণ, ক্রীতদাসে পরিণত করা এবং লোকদের বেগার শ্রম দানে বাধ্য করা ছিল সাধারণ রেওয়াজ।[৩]

পারসিক সাম্রাজ্য

ইরানের প্রাচীনতম ধর্ম মাযদাইয়্যাত ধর্মের স্থান দখল করল যরদশ্‌ত ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যরদশ্‌ত খৃ. পূ. সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। পারসিক সাম্রাজ্য প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় (মহান রোম সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হওয়ার পর) আপন আয়তন, আয়-আমদানির উপায়-উপকরণ ও শান-শওকতের ক্ষেত্রে অনেক বড় ছিল। এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সম্রাট আর্দেশীরের হাতে ২২৪ খৃস্টাব্দে। আপন উত্থানকালে আসিরিয়া, খুযিস্তান, মিডিয়া, পারস্য, আযারবায়জান, তাবারিস্তান, সারখস, মারজান, কিরমান, মার্ভ, বলখ, সুগাদ, সীস্তান, হেরাত, খুরাসান, খাওয়ারিযম, ইরাক ও য়ামন– সবটাই তার শাসনাধীনে ছিল। কোন এক যুগে সিন্ধু নদের অববাহিকার মধ্যবর্তী জেলাসমূহ ও তার গতিপথের আশপাশের প্রদেশগুলো অর্থাৎ কচ্ছ, কাথিয়াওয়াড়, মালব ও সেসবের গোটা এলাকা তাদের অধিকারে ছিল।

তেসিফোন (আল-মাদায়েন) ছিল এই সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং তা ছিল শহরসমূহের এক সমষ্টি যা তার আরবী নাম থেকেই অনুমান করা যায়। পঞ্চম

---

১. T. Walter Wall Bark and Alastar M. Taylor এর Civilization : Past and Present, 1954. P 261-62.

২. বিস্তারিত দ্র. আলফ্রেড বাটলারের The Arab conquest of Egypt ও Historians' History of the world, P.VII.

৩. বিস্তারিত দ্র. খিতাতু'শ শাম, কুর্দ আলীকৃত, ১ম খ., ১০১ পৃ।

শতাব্দী ও এর পরবর্তীকালে মাদায়েন আপন কৃষ্টি, উন্নতি, প্রগতি, বিলাস ও প্রাচুর্যের শীর্ষদেশে পৌঁছেছিল (বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন অধ্যাপক আর্থার ক্রীস্টিনসেনকৃত 'সাসানী আমলে ইরান' নামক পুস্তক)।

যরথুস্ত্র ধর্ম প্রথম দিন থেকেই আলো ও অন্ধকার, ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব এবং ভালোর খোদা ও মন্দের খোদার মধ্যকার সংঘাত-সংঘর্ষের মতবাদের ওপর কায়েম ছিল। খৃস্টীয় ৩য় শতাব্দীতে "মানী" নামক একজন দার্শনিক এই ধর্মের সংস্কারক হিসাবে আবির্ভূত হন।[১] এরপর সম্রাট শাহপূর [সাসানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট আর্দেশীয় (মৃ. ১৪১ খ্রি.)-এর পরবর্তী শাসক] প্রথমে এই ধর্মের অনুসারী ও আহ্বায়ক, অতঃপর এর বিরোধী হয়ে যান। বিরোধী হওয়ার কারণ, মানী দুনিয়া থেকে যাবতীয় মন্দ ও অন্যায়-অরাজকতার বীজ নির্মূল করবার জন্য নিঃসঙ্গ ও একক জীবন যাপনের আহ্বান জানাতেন। তার আহ্বান ছিল, আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণ স্বয়ং নিজেই এমন এক অন্যায় ও মন্দ যার হাত থেকে মুক্তি লাভ করা মানুষের জন্য জরুরী। তিনি আত্মবিলুপ্তি ও নাস্তির মধ্যে বিলীন হবার জন্য ও অন্ধকারের ওপর আলোর প্রাধান্য লাভের জন্য মানব বংশের ধারা খতম করা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক নিঃশেষ করার পন্থা অবলম্বন করেন। কয়েক বছর তিনি নির্বাসনে কাটান। এরপর ইরানে ফিরে আসেন এবং ১ম বাহরামের শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার প্রদত্ত শিক্ষামালা তার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে এবং ইরানী চিন্তা-পদ্ধতি ও ইরানী সমাজকে বহুকাল ধরে প্রভাবিত করতে থাকে।

ঈসায়ী ৫ম শতাব্দীর সূচনায় মাযদাক আবির্ভূত হন। তিনি বিত্ত-সম্পদ ও নারীর ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্য ও সম-শরীকানার প্রকাশ্য ও খোলাখুলি আহ্বান জানান এবং এসব বস্তুর অগাধ ভোগ-ব্যবহার সমগ্র মানব সমাজের জন্য কোনরূপ বাধা-বন্ধন ছাড়াই বৈধ ঘোষণা করেন। তার এই আহ্বান খুব দ্রুত জোরদার হয়ে ওঠে। অবস্থা এই দাঁড়াল, মানুষ যে ঘরে যার ঘরে যখন ইচ্ছা অবাধে ঢুকে পড়ত এবং তার মাল-আসবাব ও মহিলাদের জোর করে দখল করে নিত। একটি প্রাচীন ইরানী দস্তাবীযে যা নামায়ে তানাস্যুর নামে পরিচিত- এই অবস্থার চিত্র অংকন করা হয়েছে যা মাযদাকী মতবাদের উত্থান, একচ্ছত্র শাসন ও ক্ষমতার যুগে দেখা যায় :

"লোকলজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ উঠে গেল। এমন সব লোকের জন্ম হলো যাদের ভেতর না ছিল ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ, আর না ছিল মৌরসী জমি-জিরাত। তাদের ভেতর বংশ, পরিবার কিংবা জাতিগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধও ছিল না। তাদের ভেতর শিল্প ও কৃষিও ছিল না, ছিল না কোনরূপ চিন্তা-ভাবনার লেশ। তাদের কোন পেশা ছিল না। তারা যত রকমের চোগলখুরী ও শয়তানীতে সিদ্ধহস্ত, গালিগালাজ ও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারে পটু এবং অপরের দোষারূপ করতে উস্তাদ ছিল। এটাই

১. সাসানী আমলে ইরান, মানী ও তার ধর্ম, ২৩৩-৬৯ পৃ.।

ছিল তাদের জীবন-জীবিকা আর এসব মাধ্যম বা পুঁজি করেই তারা পদ ও সম্পদ লাভে চেষ্টা করত।”[১]

আর্থার ক্রীস্টিনসেন তার ‘সাসানী আমলে ইরান’ নামক গ্রন্থে বলেন, ফল এই দাঁড়াল, চারদিকে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। লুটতরাজকারীরা আমীর- উমারার বাড়ি-ঘরে ঢুকে পড়ত এবং মালমাত্তা লুট করে নিয়ে যেত। মেয়েদেরকে জোর করে ছিনিয়ে নিত এবং জমি-জায়গা দখল করে নিত। এভাবে ক্রমান্বয়ে জমি-জিরাত পতিত ও অনাবাদী থাকতে শুরু করল। কেননা নতুন যারা জমির মালিক হলো তারা কৃষি সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিফহাল ছিল না।

এসব থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, প্রাচীন ইরানে চরমপন্থী আহ্বান আন্দোলনে সাড়া দেবার বিস্ময়কর যোগ্যতা ছিল। তারা সব সময় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে এবং চরম পন্থা গ্রহণে আগ্রহী ছিল। একদিকে তারা ‘খাও, দাও ও ফুর্তি কর’-এর মত চরম ভোগবাদ, অপরদিকে সর্বোচ্চ ধরনের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের মাঝে ঘড়ির পেন্ডুলামের মত আন্দোলিত হতে থাকে। কখনও বা তারা খান্দানী ও মৌরাসী সামন্তবাদী ব্যবস্থা, আবার কখনও বা ধর্মীয় ইজারাদারির চাপের মুখে অবস্থান নেয়, কখনো নেয় তারা বল্গাহীন সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ ও অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা, বেআইনী কার্যক্রম ও অরাজকতার মত পরিবেশের ছত্রছায়া। এজন্য তাদের মধ্যে কখনোই ভারসাম্য ও শান্তি-সমঝোতাবোধ জন্ম নিতে পারেনি যা স্বাভাবিক ও সুস্থ সমাজের জন্য আবশ্যিক।

এই আমলে (বিশেষ করে সাসানী শাসনামলে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত) অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গোটা দেশ ঐ সব রাজা-বাদশাহর দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল যারা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজমুকুট ও শাহী তখতের মালিক হতেন এবং নিজেদের সাধারণ গণমানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাবত। সম্রাটকে আসমানী খোদার বংশধর বলে মান্য করা হতো। শেষ পারস্য সম্রাট ২য় পারভেয নিজের নামের সঙ্গে নিম্নোক্ত উপাধিসমূহ ব্যবহার করতেন:

“ঈশ্বরমণ্ডলীর মধ্যে অবিনশ্বর, মানব ও মানবমণ্ডলীর মাঝে অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তার নামের বিকাশ, সূর্যের সঙ্গে উদিতকারী, রাত্রির চক্ষুর সূর্যালোক।”[২]

দেশের সমস্ত সম্পদ ও আয়-আমদানির উপায়-উপকরণ বা মাধ্যমসমূহকে ঐসব রাজা-বাদশাহর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মনে করা হতো। সম্পদ মজুদকরণ, উপহার-উপঢৌকন ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী জড় করার পাগলামি, জীবন মানের সমুন্নতি, নিত্য নতুন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ, জীবনকে ভোগ করা, খেলাধুলা ও ভোগ-বিলাসের প্রতি আগ্রহ, ধনী হবার ও দুনিয়ার মজা লুটবার

---

১. নামায়ে তানাস্যুর থেকে উদ্ধৃত, মীনাবী সং, পৃ. ১৩।

২. সাসানী আমলে ইরান, ৩৩৯ পৃ.।

প্রতিযোগিতা এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, এর ওপর কল্পনাবৃত্তি ও কাব্যের সংশ জাগে এবং এর কল্পনা কেবল তিনিই করতে পারবেন যিনি প্রাচীন ইরানের ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য খুব গভীরভাবে পাঠ করেছেন।

মাদায়েন শহর, শাহী প্রাসাদ, বাহার-ই কিসরা [১] (সেই কার্পেট যার ওপর বসন্ত মৌসুমে পারস্য সম্রাটগণ মদ পান করতেন), কিসরার রাজমুকুট ও পারস্য সম্রাটদের সঙ্গে যুক্ত খাদেম ও অনুচরবর্গ, স্ত্রী ও দাসীকুল, বালক ও কিশোর সেবকবৃন্দ, বাবুর্চি ও খানসামামণ্ডলী, পশু ও পক্ষীকুলের পরিচর্যাকারী, শিকারের উপকরণ ও বাসন-কোসনের সেসব রূপক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে[২] যিনি ওয়াকিফহাল তিনি কেবল এই একটি ঘটনা থেকেই এর পরিমাপ করতে পারবেন যে, মুসলিম বিজয়ের পরিণতিতে ইরানের শেষ শাসক সম্রাট ইয়াযদগিরদ স্বীয় রাজধানী মাদায়েন থেকে যখন পালিয়ে যান তখন সেই অবস্থায়ও তাঁর সাথে এক হাজার বাবুর্চি, এক সহস্র গায়িকা, এক হাজার চাপাতি ব্যবস্থাপক, এক হাজার শকর (বাজ পাখী) দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত অনুচরবর্গ ও মোসাহেবদের একটি বিরাট দল ছিল।

এত বড় বিরাট লোক-লস্কর সত্ত্বেও তিনি একে খুবই নগণ্য সংখ্যক এবং নিজেকে খুবই মামুলী ও তুচ্ছ একজন আশ্রিত মনে করতেন। তিনি অনুভব করতেন, মোসাহেব ও চাকর-বাকরের সংখ্যা, বিলাস-ব্যসন ও ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণের কমতির দরুন তাঁর অবস্থা নিতান্তই করুণার যোগ্য।

অপরদিকে গরীব জনসাধারণের ছিল অত্যন্ত দরিদ্র দশা ও বিপদ। নিজেদের দুর্দশায় কান্নাই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। ক্ষীণ প্রাণ ও জীর্ণশীর্ণ দেহটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হতো। নানা রকম ট্যাক্স, রকমারি বিধি-নিষেধ ও বেড়ি-বন্ধন তাদের জীবনকে সাক্ষাত জাহান্নামে পরিণত করে দিয়েছিল এবং তারা পশুর ন্যায় জীবন কাটাচ্ছিল। দুঃখ-কষ্টে ও জুলুম-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঐসব ট্যাক্স ও সৈন্যবিভাগে বাধ্যতামূলক ভর্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বহু কৃষক খেত-খামার ছেড়ে দেয় এবং সাধু-সন্তদের খানকাহ ও মঠে গিয়ে আশ্রয় নেয়।[৩] তারা প্রাচ্যের সাসানী সাম্রাজ্য ও পাশ্চাত্যের বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষে (যা ইতিহাসের বিভিন্ন বিরতিতে চলতে থাকে এবং যে সংঘর্ষে না জনসাধারণের কোন কল্যাণ নিহিত ছিল আর না এতে ছিল তাদের কোন আকর্ষণ) নগণ্য ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৪]

---

১. তারীখে তাবারী, ৪র্থ খ., ১৭ পৃ.।

২. শাহীন ম্যাকারিয়সকৃত তারীখে ইরান, আরবী সং. ১৮৯৮, পৃ. ।

৩. শাহীন ক্যাকারিয়সকৃত তারীখে ইরান, ৯৮ পৃ.।

৪. সামানী আমলে ইরান, ৫ম অধ্যায়।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে গণিতশাস্ত্রে, জোতির্বিজ্ঞানে, চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে পৃথিবী জোড়া খ্যতি অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সাধারণ অভিমত হলো, এর ধর্মীয়, নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক দিক অন্ধকারতম ও নিকৃষ্টতম যুগ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু হয়।[১] অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তাদের উপাসনাগৃহ পর্যন্ত মুক্ত ছিল না এবং এসব কর্মে কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করত না। কেননা ধর্ম একে পবিত্র ও উপাসনার রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছিল।[২] নারীর কোন মূল্য, ইযযত-সম্মান ও সতীত্ব-সম্ভ্রম কিছুই ছিল না। জুয়া খেলায় স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়েও বাজি ধরত এবং হেরে গেলে স্ত্রী বিজয়ীকে দিয়ে দিত।[৩] স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে জীবন্মৃত অবস্থায় কাল কাটাতে হতো। সে না আর বিয়ে করতে পারত আর না তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো! স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার প্রথা উচ্চ ও সচ্ছল পরিবারগুলোতে প্রচলিত ছিল। আর এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রকাশ এবং লজ্জা ও অবমাননার হাত থেকে মুক্তি। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরই কেবল এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়।[৪]

ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশী ও পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলোর মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য এবং মানুষের মধ্যে জাতপাত ও ভেদ-বৈষম্যের ক্ষেত্রে ছিল অনেক এগিয়ে। এ ছিল এক কঠিন ও নির্দয় সমাজ ব্যবস্থা যেখানে দয়া-মায়া ও কোমলতার কোন স্থান ছিল না। এই বিশেষ আচার-আচরণের পেছনে ধর্মের ও ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের সমর্থন ছিল। আর্য আক্রমণকারীদের উপযোগিতা ও বিচক্ষণতা এবং ধর্ম ও পবিত্রতা রক্ষার ইজারাদার ব্রাহ্মণদের স্বার্থ চিন্তারও এটাই ছিল দাবি। এ সমাজ ব্যবস্থা ঐসব পেশার ভিত্তির ওপর কায়েম ছিল যা বিভিন্ন জাতপাত ও শ্রেণীর ভেতর বংশপরম্পরায় চলে আসছিল। এর পেছনে সেই সব রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আইনের শক্তি ছিল যেগুলোকে ঐসব হিন্দু আইন প্রণেতাগণ রচনা করেছিলেন যারা ধর্মীয় মর্যাদারও অধিকারী ছিলেন। এই আইন অক্ষরে অক্ষরে গোটা সমাজে প্রচলিত ছিল এবং একেই জীবন বিধান মনে করা হতো। এই জীবন-সংহিতা তথা সংবিধান[৫] ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল :

---

১. দ্র. Ancient India, ৩য় খ., R.C. Datta.

২. দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত, সত্যরথ প্রকাশ, ৩৪৪ পৃ.।

৩. দ্র. মহাভারতের প্রাথমিক অংশ।

৪. ফরাসী পর্যটক বার্নোয়ার-এর সফরনামা। অধিকন্তু মধ্যযুগের রাজন্যবর্গের ইতিহাস।

৫. এই সংবিধান সম্পর্কে জানতে হলে পাঠ করুন মনু-সংহিতা, অধ্যায়-১/২/৮/৯/১০/১১।

১. ধর্মের ইজারাদার ও পুরোহিতশ্রেণী যাদেরকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হতো।

২. সেনাদলে কর্মরত লোকজন যাদেরকে 'ক্ষত্রিয়' বলা হতো।

৩. কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যাদেরকে 'বৈশ্য' বলা হতো।

৪. চাকর-বাকর ও সেবকশ্রেণী অর্থাৎ অচ্ছুৎ বা শূদ্র সম্প্রদায়।

এই শেষোক্ত শ্রেণীটিই ছিল (যারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ) অধঃপতনের চূড়ান্ত ধাপে উপনীত। তাদের সম্পর্কে বলা হতো, তারা স্রষ্টার পা থেকে সৃষ্ট বিধায় উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীর সেবা করা ও তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করাই কেবল তাদের কাজ।

এই সংবিধান ব্রাহ্মণদেরকে এত বেশি অধিকার দিয়েছিল এবং তাদেরকে এত বেশি উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছিল যে, অপর কেউ এক্ষেত্রে তাদের সমকক্ষ ছিল না। ব্রাহ্মণের ছিল সাত খুন মাফ। আকাশ-পাতাল নিজেদের হাজারো পাপে ভরপুরও করে দিলেও, লক্ষ অন্যায়-অপকর্মে ত্রিভুবন দূষিত ও কলুষিত করলেও তারা ছিল ধোয়া তুলসীর পাতা। তাদের ওপর কোনরূপ ট্যাক্স ধার্য করা যেত না। কোন প্রকার পাপ কিংবা গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেও তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেত না। এর বিপরীতে শূদ্র কিংবা অস্পৃশ্যদের উপার্জনের অধিকার ছিল না, না ছিল বিত্ত-সম্পদ সঞ্চয়ের অধিকার, ব্রাহ্মণের পাশে বসার অধিকারও ছিল না, অধিকার ছিল না তাদেরকে স্পর্শ করার। ধর্মগ্রন্থ পাঠেরও অধিকার ছিল না তাদের।[১]

পেশাজীবী ও কামলাশ্রেণী (যাদেরকে চণ্ডাল বলা হতো)-কে শহরের বাইরে থাকতে হতো। রাতের বেলা শহরের বুকে অবস্থান ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। সূর্যোদয়ের পর তারা শহরে প্রবেশ করত কাজের জন্য আর সূর্য ডোবার আগেই শহর ছেড়ে তাদের বেরিয়ে আসতে হতো।[২]

গোটা দেশ ছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার শিকার এবং তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। এতে শত শত রাজ্য ও সরকার ছিল যারা ছিল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত। অশান্তি ও অব্যবস্থাপনা এবং প্রজাদের পক্ষ থেকে বেপরোয়া মনোভাব ছিল সর্বত্র, ব্যাপক ছিল জুলুম-নিপীড়নের রাজত্ব।

এ ছাড়াও এই দেশটি গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে জীবন অতিবাহিত করছিল। এখানকার জীবন ছিল স্থবির, আচার-অভ্যাস, প্রথা-পদ্ধতির গভীর শেকলে ছিল বন্দী এবং শ্রেণী সংঘাত ও শ্রেণী বৈষম্যের শিকার ছিল। রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় অহংকারে সে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক

---

১. এই শাস্ত্রবিধি সম্পর্কে জানার জন্য মনুশাস্ত্র, পরিচ্ছেদ ১, ২,. ৮, ৯ ও ১১ পড়া যেতে পারে।

২. কুতবুদ্দীন আয়বাকের রাজত্বকালে এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং তারা শহরের বাইরের পরিবর্তে ভেতরেই বসবাসের সুযোগ পায়। অতঃপর আমীর-উমারার প্রাসাদোপম অট্টালিকার পাশে গরীবের ঝুপড়িও একই সঙ্গে দেখা যেতে থাকে।

অধ্যাপক বিদ্যাধর মহাজন নামে একজন হিন্দু ঐতিহাসিক ইসলাম আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

"ভারতবর্ষের জনগণ গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা নিজেদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ এবং দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে বেখবর। তাদের এই বেখবর অবস্থা তাদের অবস্থান খুবই দুর্বল করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে জড়তা স্থবিরতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং পরাজয় ও অধঃপতনের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। সে যুগের সাহিত্যের ভেতর কোন প্রাণ ছিল না। স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য ও অন্যান্য সূক্ষ্ম শিল্পকলাও ছিল অধঃপতনের দিকে। জাতিভেদের বেড়াজাল ছিল কঠিন। বিধবাদের বিয়ে করা হতো না এবং তাদের আহার্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কঠিন গৎবাধা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। অচ্ছ্যুৎ ও অস্পৃশ্যরা জনপদের বাইরে থাকতে বাধ্য ছিল।"[১]

জাযীরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ)

আরবদের নৈতিক চরিত্রও বিগড়ে গিয়েছিল। তারা শরাব ও জুয়ায় ছিল আসক্ত। তাদের হৃদয়হীনতা ও জাহিলী আত্মমর্যাদাবোধের পরিমাপ করা যাবে আপন কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফন করা থেকেই। কাফেলা লুণ্ঠন করা, নিরপরাধ লোকদেরকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করা ছিল তাদের প্রিয় নেশা। তাদের নিকট নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। তাদের ঘরের অন্যান্য সামগ্রী ও আসবাবপত্রের মত কিংবা পশুর ন্যায় যেখানে খুশি স্থানান্তরিত করা হতো অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মতই নারীও বণ্টিত হতো। কিছু খাদ্য পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, নারী তা ব্যবহার করতে পারত না। পুরুষ যত খুশি বিয়ে করতে পারত। কেউ কেউ দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক পেরেশানীর ভয়ে আপন সন্তানকে হত্যা করত।[২]

গোত্রীয়, বংশীয় ও পারিবারিক, রক্ত সম্পর্কীয় স্বজনপ্রীতি ছিল সীমাতিরিক্ত। যুদ্ধ ছিল তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে এবং একে অপরকে হত্যা করা তাদের কাছে ক্রীড়া-কৌতুকের বেশি ছিল না। অনেক সময় মামুলি ঘটনাও বিরাট রক্তপাত ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণ হতো। কোন কোন যুদ্ধ চল্লিশ বছর ধরে চলেছে এবং হাজার হাজার মানুষ এতে জীবন হারিয়েছে।[৩]

য়ূরোপ

য়ূরোপীয় জাতিগোষ্ঠী, যারা উত্তর ও পশ্চিমের এলাকায় বহু দূর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করেছিল, মূর্খতা ও অশিক্ষার ভয়াবহ অন্ধকারে বসবাস করছিল এবং রক্তাক্ত লড়াই-সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। মানবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কাফেলার পশ্চাতে ও দুনিয়ার

---

১. বিদ্যাধর মহাজনকৃত Muslim Pule in Idia (New Delhi 270). 33.

২. বিস্তারিত জানতে চাইলে কুরআন মজীদ, হাদীছ, আরবী কিতাব, হামাসা, সাব'আ মুআল্লাকা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩. দ্র. জাহিলী কবিতা, আরবদের ইতিহাস ও আরবদের সম্পর্কিত গ্রন্থ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগত থেকে বহু দূরে ছিল তাদের অবস্থান। যেমন তার সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তেমনি তার কাছেও তাদের চাওয়া-পাওয়ার ছিল না। তাদের দেহ ছিল পূতিগন্ধময় আর মস্তিষ্ক ছিল অলীক কল্পনা বিলাসে ভরপুর।[১] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। পানি তারা খুব কমই ব্যবহার করত। তাদের পাদরী ও বিশপ শরীরকে কষ্ট দিত আর সমাজ থেকে পালাবার[২] ক্ষেত্রে তারা ছিল কঠোর ও চরমপন্থী। তাদের কাছে তখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়নি, নারী মানুষ না পশু, তাদের অবিনশ্বর আত্মা আছে কি না, তাদের মালিকানা ও ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার আছে কি না?

Robert Brifalt বলেন, "পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিয়ে খৃস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত য়ূরোপ গভীর অন্ধকারে ডুবে ছিল আর এই অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর ও ভয়ানক থেকে ভয়ানকতর হতে চলেছিল। সেই যুগের বর্বরতা প্রাচীনকালের বর্বরতার তুলনায় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা তাদের উদাহরণ ছিল সেই মরা লাশের মত যা ফুলে ফেঁপে ফেটে গিয়েছিল। সেই সংস্কৃতির নাম-নিশানা লোপ পাচ্ছিল আর তার ওপর ধ্বংসের মোহর মারা হয়েছিল। সেই সমস্ত দেশ যেখানে এই সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়েছিল এবং অতীতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, যেমন ইটালী, ফ্রান্স, যেখানে চলছিল অরাজকতা ও ধ্বংসের রাজত্ব।"[৩]

গাঢ় অন্ধকার ও গভীর হতাশা

সংক্ষেপে বলা যায়, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, যে শতাব্দীতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটে, তা ছিল ইতিহাসের নিকৃষ্টতম যুগ এবং মানবতার ভবিষ্যত, তার স্থায়িত্ব ও উন্নতির দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্ধকার ও হতাশাব্যঞ্জক। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক H.G. Wells সাসানী ও বায়যান্টাইন রাজত্বের আলোচনা করতে গিয়ে সেই যুগের চিত্রাংকন করেছেন। তাঁর ভাষায়–

"বিজ্ঞান ও রাজনীতি দু'টোই সংঘর্ষমুখর ও ধ্বংসোন্মুখ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৃত্যুর ঘুমে ছিল বিভোর। এথেন্সের শেষ দিককার দার্শনিকগণ তাদের ধ্বংস পর্যন্ত, যা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, প্রাচীন যুগের সাহিত্যিক পুঁজিকে, যদিও কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কিন্তু সীমাহীন শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করেছিল। কিন্তু এখন পৃথিবীতে মানুষের এমন কোন শ্রেণী বাকী ছিল না যারা প্রাচীন কালের অভিজাতগণের মত নির্ভীক ও মুক্ত চিন্তার সমর্থক হতো এবং প্রাচীনদের রচনাবলীর ন্যায় অনুসন্ধান ও গবেষণা কিংবা নির্ভীক মতামত প্রকাশের বাহক

---

১. Thilly, History of Philosophy. New York, 1945.
২. Lueky, W. E. , History of European morals. New York 1855.
৩. The Making of Humanity. P, 1169.

হতো। এই শ্রেণীর নির্মূল হওয়ার বিশেষ কারণ হলো রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা। কিন্তু এর আরও একটি কারণ ছিল যদ্দরুন ঐ আমলে মানবীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা ভোঁতা ও শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ইরান ও বায়যান্টাইন এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে অসহযোগিতা ও অসহিষ্ণুতা বিরাজ করছিল। উভয় সাম্রাজ্যই ছিল এক নতুন ধরনের ধর্মীয় রাষ্ট্র যেখানে স্বাধীন মতামত প্রকাশের ওপর কড়া পাহারা বসানো হয়েছিল।"

বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর পারসিক সাম্রাজ্যের আক্রমণ ও পারসিক সাম্রাজ্যের ওপর বায়যান্টাইনদের বিজয় কিছুটা বিস্তারিত আকারে আলোচনার পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন :

যদি কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বক্তা সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার বিচার করে দেখতেন তাহলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন যে, মাত্র কয়েক শতাব্দীর ব্যাপার, গোটা য়ূরোপ ও এশিয়া মোঙ্গলদের পদানত হবে। পশ্চিম য়ূরোপে না ছিল কোন শৃঙ্খলা, আর না ছিল একতা। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য ও পারসিক সাম্রাজ্য একে অপরকে ধ্বংস করার ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছিল। ভারতবর্ষও ছিল বিচ্ছিন্নতা ও বিপর্যয়ের শিকার।"[১]

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ও অরাজকতা

মোটকথা, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে সমগ্র মানবতা আত্মহত্যার পথে ছিল দ্রুত ধাবমান। মানুষ তার খালিক ও মালিককে ভুলে গিয়েছিল এবং নিজেকে, নিজের ভবিষ্যত ও পরিণতিকে ভুলে গিয়েছিল। তার ভেতর ভাল-মন্দ ও উত্তম-অধমের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতাও আর বাকী ছিল না। মনে হচ্ছিল, মানুষের দিল ও দিমাগ তথা মন-মস্তিষ্ক কোন কিছুর গভীরে হারিয়ে গেছে। তাদের দীন ও আখেরাতের দিকে মাথা তুলে চাইবারও বুঝি ফুরসৎ নেই! আত্মা ও হৃদয়-মনের খোরাক, পারলৌকিক কল্যাণ, মানবতার সেবা ও অবস্থার সংস্কার-সংশোধনের জন্য তাদের একটি মুহূর্তেরও বুঝি অবকাশ নেই! অনেক সময় গোটা দেশে এমন একটি লোক চোখে পড়ত না যার অন্তরে আপন দীনের জন্য সামান্যতম চিন্তা-ভাবনাও আছে, যে এক আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করে না, যার অন্তরে মানবতার জন্য ব্যথা রয়েছে, দরদ রয়েছে এবং এই অন্ধকার ও ভয়াল পরিণতির ব্যাপারে যার অস্থিরতাও রয়েছে। এ ছিল আল্লাহ তায়ালার সেই ঘোষণার হুবহু প্রতিচ্ছবি :

---

১. A short history of the world, London 1924, PP.140, 141, 144.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ -

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।" [সূরা রূম, ৪১ আয়াত]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব উপদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন?

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও হিকমতের ফয়সালা ছিল, মানবতার হেদায়াত ও নাজাত তথা পথ প্রদর্শন ও মুক্তির এই সূর্য যার জন্য সমগ্র সৃষ্টিজগতে আলো বিস্তার লাভ করে, জাযীরাতুল-আরবের দিগন্ত থেকে উদিত হবে যা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে অন্ধকার ভূভাগ আর যে ভূ-ভাগের এই প্রখর আলোক-রশ্মির সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তায়ালা এই দাওয়াতের জন্য আরবদেরকে নির্বাচিত করেন এবং তাদেরকে সমগ্র বিশ্বে এর তাবলীগ তথা প্রচার-প্রসারের যিম্মাদার বানান এজন্য যে, তাদের হৃদয়পট ছিল একেবারেই স্বচ্ছ ও নির্মল। পূর্ব থেকে কোন অংকিত ছবি কিংবা চিত্র এতে ছিল না যা মুছে ফেলা কঠিন হতো। এর বিপরীতে রোমক, পারসিক অথবা ভারতীয়দের, যাদের নিজেদের উন্নতি-অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা এবং নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শনের ব্যাপারে বিরাট গর্ব ছিল, আর এর দরুন তাদের ভেতর এমন কিছু মানসিক গ্রন্থি ও চিন্তাগত জটিলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা দূর হওয়া সহজ ছিল না। আরবদের দিল ও দিমাগ তথা মন-মস্তিষ্কের নিষ্কলংক পট কেবল সেই মামুলী ও হাল্কা রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিল যা তাদের মূর্খতা, অশিক্ষা ও বেদুঈন জীবন তার ভেতর অংকিত করে দিয়েছিল যা ধোয়া ও মুছে ফেলা এবং সে জায়গায় নতুন চিত্র অংকন করা খুবই সহজ ছিল। বর্তমান শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তারা অকাট ও নির্ভেজাল মূর্খতার শিকার ছিল, আর এটাই ছিল সেই ভুল যার শোধন করা যেত। অপরাপর সুসভ্য ও উন্নত জাতিগোষ্ঠী ছিল মিশ্রিত তথা ভেজাল মূর্খতার ভেতর লিপ্ত যার চিকিৎসা ও প্রতিকার এবং তা ধুয়ে নতুন হরফ লেখা সব সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে।

এই আরবরা তাদের আপন প্রকৃতিতে ছিল সমুজ্জ্বল। মজবুত ও লৌহসম সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল তারা। যদি হক কথা তারা বুঝতে সক্ষম না হতো তাহলে তারা এর বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে তুলে নিতে এতটুকু ইতস্তত করত না। আর যদি সত্য স্বচ্ছ-সুন্দর আয়নার ন্যায় তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ত তাহলে তা তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করত, প্রাণের অধিক ভালবাসত, তাকে বুকের

সাথে জড়িয়ে ধরত এবং এর জন্য প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতেও এতটুকু দ্বিধা করত না।

এই আরবীয় মন-মানসিকতা সুহায়ল ইবন আমরের সেই কথার ভেতর প্রতিফলিত হয় যা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির সময় তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল। সন্ধি চুক্তির সূচনা হয়েছিল নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা :

هذا ماقضى عليه محمد رسولالله

অর্থাৎ এ সেই ফয়সালা যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ করেছেন। এতে সুহায়ল বলে ওঠে :

والله لوكنا نعلم انك رسول الله ماصددناك عن البيت ولا قاتلناك .

অর্থাৎ আল্লাহর কসম! যদি আমরা জানতাম ও মানতাম, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে কখনো আপনাকে আল্লাহর ঘর যিয়ারতে বাধা দিতাম না, আর আপনার সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তাম না। এই একই মন-মানসিকতা ইকরিমা (রা) ইবন আবী জাহলের কথায়ও ফুটে ওঠে যখন ইয়ারমুক যুদ্ধ প্রবল তুঙ্গে। তখন তাঁর ওপর প্রতিপক্ষের প্রবল চাপ। রোমক সৈন্যরা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে হযরত ইকরিমা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন, জ্ঞানবুদ্ধির দুশমনেরা! (যত দিন পর্যন্ত আমার মাথায় এ সত্য আসেনি) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুকাবিলায় সর্বত্র প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে মুখোমুখি হয়েছি। আর আজ আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে যাব? এরপর তিনি হাঁক ছেড়ে বলে ওঠেন, এমন কেউ আছে আমার হাতে মৃত্যুর শপথ নিতে পার? এতে কিছু সংখ্যক লোক এগিয়ে এলেন এবং বায়আত নিলেন। এরপর সকলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অতঃপর আহত হয়ে শাহাদত লাভ করলেন।[১]

আরবের লোকেরা ছিল বড়ই বাস্তবতাপ্রিয়, চিন্তাশীল, মননশীল, ধীরস্থির প্রকৃতির, স্পষ্টভাষী, কঠোরপ্রাণ ও সহিষ্ণু। তারা না অন্যকে প্রতারিত করত আর না নিজেদেরকে প্রতারণার মধ্যে রাখা পছন্দ করত। তারা সত্য ও পরিপক্ব কথায় অভ্যস্ত, কথার সম্মান রক্ষাকারী এবং সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল। এর একটি সুস্পষ্ট নমুনা ও প্রমাণ আমরা দেখতে পাব আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতে যার পরই হিজরতের সূচনা হয় মদীনা তায়্যিবার দিকে।

---

১. তারীখে তাবারী, ৪খ., ৩৬ পৃ.।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আকাবা উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণের উদ্দেশে সমবেত হয় তখন আব্বাস ইবন উবাদা আল-খাযরাজী স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করে বলেন, হে খাযরাজের লোকেরা! তোমাদের কি জানা আছে, তোমরা মহানবী ﷺ-এর হাতে কোন্ বিষয়ের ওপর বায়আত গ্রহণ করতে যাচ্ছ? উত্তরে তারা বলল, আমরা জানি। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর হাতে সাদা-কালো সকল বর্ণের মানুষের সাথে যুদ্ধের ওপর বায়আত করছ) অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যুদ্ধের শপথ নিতে চলেছ)। যদি তোমরা ভেবে থাক, তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হবে, ধ্বংস ও বরবাদ করা হবে, তোমাদের অভিজাত সন্তান ও গোত্রের নেতৃবর্গ নিহত হবে, সেক্ষেত্রে তোমরা তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা সরে দাঁড়াবে তাহলে শুরুতেই এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাক। আর তা এজন্য যে, যদি এমন কিছু কর, তবে আল্লাহর কসম! দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই তোমরা লজ্জিত ও অপমানিত হবে।

আর তোমাদের ফয়সালা যদি এই হয়ে থাকে, যে বস্তুর জন্য তোমরা তাঁকে দাওয়াত দিয়েছ তা তোমরা পূরণ করবে, এতে তোমাদের গোটা বিত্ত-সম্পদ তছনছ হয়ে গেলেও তোমাদের নেতা ও অভিজাত সম্পদায় মারা গেলেও তবুও তোমরা পরওয়া করবে না, তবে তোমরা তাঁর হাতে হাত দিও। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কসম! এতে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই তোমাদের জন্য সাফল্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তারা সকলেই সমস্বরে বলল, আমরা আমাদের বিত্ত-সম্পদের ধ্বংস ও নেতৃবর্গের মৃত্যু সকল কিছুর বিনিময়েও আপনার হাতে বায়আত করতে চাই। কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করি সেক্ষেত্রে এসবের বিনিময়ে কী পাব? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, জান্নাত। তারা বলল, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি দস্ত মুবারক সামনে বাড়িয়ে দিলে সকলেই বায়আত করল।[১]

প্রকৃত ব্যাপার হলো, তারা সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিল যে প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত নিয়েছিল। হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা) তাঁর বিখ্যাত উক্তির মধ্যে সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আপনি যদি চলতে চলতে বারকুল-গিমাদ[২] পর্যন্ত পৌঁছে যান তখনও আমরা আপনার সাথে চলতে থাকব।

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১খ., ৪৪৬ পৃ.।

২. বারকুল গিমাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। একটি মত , এটা য়ামনের একটি দূরবর্তী এলাকা। সুহায়লী বলেন, এটাতে আবিসিনিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ, যদি দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত এগিয়ে যান তুবও আমরা আপনার সঙ্গে থাকব, সঙ্গ পরিত্যাগ করব না।

যদি আপনি সমুদ্র পার হতে চান তবে সেক্ষেত্রেও আমরা আপনার সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।[১]

অটুট সংকল্প ও সুদৃঢ় এই ইচ্ছাশক্তি ও সততা, কর্মের স্থিরতা, সত্যের সামনে মস্তক অবনত করে দেয়ার মেযাজ ও মানসিকতা সেই বাক্য থেকেও স্পষ্ট প্রতিফলিত যা মুসলিম ফৌজের বিখ্যাত সিপাহসালার উকবা ইবনে নাফে (রা) উচ্চারণ করেছিলেন, যখন বিজয়ের পর বিজয়ের মাধ্যমে সম্মুখে এগোতে গিয়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্র তাঁর পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! এই মহাসমুদ্র আমার অগ্রযাত্রার পথের বাধা, নইলে আমার মন চায়, সমান্তরাল গতিতে আমি সামনে এগিয়ে যাই এবং জলে-স্থলে তোমার নামের মহিমা গাই।[২]

এর বিপরীতে গ্রীস, রোম ও পারস্যের লোকেরা যুগস্রোতে ভেসে যেতে ও হাওয়ার অনুকূলে পাল তোলাতে অভ্যস্ত ছিল। কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ি তাদের ভেতর আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারত না। নীতিপরায়ণতা ও সত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ তাদের ভেতর ছিল না। কোন দাওয়াত বা আহ্বান ও আকীদা-বিশ্বাস তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারার ও তাদের আবেগ-অনুভূতির ওপর এভাবে ছাপ ফেলত না যার জন্য নিজেদের সত্তাকে তারা ভুলে যেতে পারে এবং নিজেদের আরাম-আয়েশ ও পার্থিব ভোগ-বিলাসকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

আরবগণ সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভোগ-বিলাস ও আরামপ্রিয়তা থেকে সৃষ্ট এই সব রোগ-ব্যাধি ও খারাপ অভ্যাস থেকে ছিল মুক্ত যার চিকিৎসা বড় কঠিন। এটা কোন ঈমান-আকীদার জন্য উত্তাপ সৃষ্টিতে ও আত্মদানের ক্ষেত্রে সব সময় বাধা হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় মানুষের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়।

তাদের ভেতর সত্যবাদিতা ছিল, আমানতদারীও ছিল, ছিল বীরত্বও। মোনাফেকী, গাদ্দারী ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাদের প্রকৃতির মিল ছিল না। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে জীবন বাজি রেখে লড়াকু যোদ্ধা, অশ্বপৃষ্ঠে অধিকক্ষণ বসে থাকা, কঠোর প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সহ্য শক্তির অধিকারী, সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহপ্রিয় যা এমন এক সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর জন্য জরুরী শর্ত যাকে দুনিয়ায় কোন বড় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে যেতে হবে, বিশেষত সেই যুগে যখন লড়াই-সংঘর্ষ ও অভিযান পরিচালনার ধারা চলতে থাকে এবং বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের সাধারণ প্রচলন ঘটতে থাকে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, তাদের চিন্তাধারাগত ও কার্যকর সমূহ শক্তি এবং স্বভাবজাত প্রাকৃতিক যোগ্যতাসমূহ নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল এবং কাল্পনিক দর্শন,

---

১. যাদুল-মাআদ, ২খ.,: সীরাত ইবনে হিশাম, ১খ., বুখারী ও মুসলিমেরও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

২. কামিল, ইবনে আছীর, ৪র্থ।

ক্ষতিকর যুক্তিতর্কের কচকচানি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি, ইলমে কালামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও নাযুক অধ্যায়সমূহে অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক গৃহযুদ্ধগুলোতেও তা বিনষ্ট হয়নি। এটি একটি উর্বর এবং এই দিক দিয়ে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জাতিগোষ্ঠী ছিল। তাদের জীবন উত্তাপ, আবেগ-উদ্দীপনা, আনন্দ-প্রফুল্লতা, অটুট সংকল্প ও লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ছিল ভরপুর।

স্বাধীনতা ও সাম্য, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ভালবাসা, অনাড়ম্বর ও সরলতা তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে ছিল। তাদেরকে কখনো বিদেশী শক্তির সামনে মাথা নত করতে হয়নি। এই জাতি গোলামী, একজন আরেক জনের ওপর ছড়ি ঘোরাবে এবং প্রভুত্ব করবে এগুলো তাদের অজানা ছিল। তারা ইরানী ও রোমক রাজতন্ত্রের গর্ব ও অহংকার এবং মানুষ মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখবে এরূপ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এর বিপরীতে পারস্য সম্রাটদেরকে (যারা আরব উপদ্বীপের প্রতিবেশী ছিল) অতিমানব জ্ঞান করা হতো। যদি পারস্য সম্রাট রক্ত মোক্ষণ করাতেন কিংবা কোন ঔষধ ব্যবহার করতেন তবে রাজধানীতে ঘোষণা প্রদান করা হতো, আজ মহামান্য সম্রাট রক্ত মোক্ষণ করিয়েছেন কিংবা ঔষধ ব্যবহার করেছেন। এই ঘোষণার পর শহরে কোন পেশাজীবী আপন পেশায় রত হতে কিংবা কোন সরকারী কর্মকর্তা বা সভাসদ কাজ করতে পারত না।[১]

যদি কখনও সম্রাটের হাঁচি আসত তবে তার জন্য কোন মঙ্গলবাণী উচ্চারণের অধিকার ছিল না। যদি তিনি নিজে কোন মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করতেন তবুও এর সমর্থনে কিছু বলা যেত না। যদি তিনি কখনও কোন উযীর কিংবা আমীরের বাসভবনে গমন করতেন তবে এই দিনটিকে খুবই অস্বাভাবিক ও গুরুত্ববহ মনে করা হতো। সেদিন থেকে সেই খান্দানের নতুন বর্ষপঞ্জী শুরু হতো এবং চিঠিপত্রে নতুন তারিখ বসানো হতো। একটি নির্ধারিত সময়সীমার জন্য তার ট্যাক্স মাফ করা হতো। সেই ব্যক্তিকে নানা রকমের সম্মান, পুরস্কার, ক্ষমা ও পদোন্নতি দেয়া হতো কেবল এজন্য যে, সম্রাট পদধূলি দ্বারা তাকে ধন্য করেছেন।[২]

এ সেই সব আদব, বন্দেগী ও সম্রাটকে তাজীম দেখানোর আবশ্যকীয় শর্তের অতিরিক্ত যেগুলো দেখানো সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা, দরবারের সভাসদবর্গ ও অপরাপর সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। যেমন সম্রাটের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা[৩] (অর্থাৎ বুকের ওপর হাত রেখে আদবের সাথে মাথা নীচু করে দেয়া), তাঁর সামনে এভাবে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা যেভাবে নামাযে আল্লাহর সামনে কেউ

---

১. দ্র. সাসানী আমলে ইরান, পৃ. ৫৩৫-৩৬।

২. সাসানী আমলে ইরান।

৩. এ জন্য আরবী ভাষায় একটি স্থায়ী বাগধারা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বলা হতো, كفر فلان অর্থাৎ অমুক নত হয়ে নিজ হাত বুকের ওপর রেখে শ্রদ্ধাবশে মাথা নুইয়ে দিল। এটা ছিল ইরানের সাধারণ রেওয়াজ এবং সেখান থেকেই এই পরিভাষা সৃষ্টি হয়ে আরবী ভাষায় প্রবেশ করে। [পরের পৃ. দেখুন]

...য়। এ সেই সম্রাটের আমলের কথা বলা হচ্ছে যিনি নওশেরওয়ানে ‘আদিল’ বা ...বিচারক নওশেরওয়াঁ নামে পৃথিবী খ্যাত অর্থাৎ খসরু ১ম (৫৩১-৫৭৯ খৃ.)। ... থেকে পরিমাপ করা যেতে পারে, ইরানের সেই সম্রাটদের অবস্থা কী হবে যারা জুলুম-নিপীড়ন ও নির্দয়তার ক্ষেত্রে স্ব স্ব আমলে কুখ্যাত ছিলেন।

মুক্ত চিন্তা ও মতামত প্রকাশ (সমালোচনা নয়) বিস্তৃত ইরানী সাম্রাজ্যের প্রায় ...রিয়েই গিয়েছিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক তাবারী ‘ন্যায়বিচারক’ সম্রাট নওশেরওয়াঁর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা থেকে আমরা পরিমাপ করতে পারি, ইরানী প্রজাতন্ত্রে মতামত ও চিন্তার স্বাধীনতার ওপর কত কঠিন বাধা-নিষেধ আরোপিত ছিল এবং শাহী দরবারে মুখ খোলার কি মূল্য পরিশোধ করতে হতো! ঘটনাটি “সাসানী আমলে ইরান” নামক গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক তাবারীর সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন :

“সম্রাট একট কাউন্সিল সভার আয়োজন করেন এবং রাজস্ব বিভাগের পরিচালক/সচিবকে নির্দেশ দেন জমির খাজনার নতুন ভাষ্য সজোরে পাঠ করে শোনাতে। তিনি তা পাঠ করলে সম্রাট খসরু (নওশেরওয়াঁ) উপস্থিত লোকদেরকে ...বার জিজ্ঞেস করেন. কারো কোন আপত্তি নেই তো? সকলেই ছিল নিশ্চুপ। যখন সম্রাট তৃতীয়বারের মত একই প্রশ্ন করলেন তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে সসম্মানে জিজ্ঞেস করল, সম্রাটের ইচ্ছা কি এই যে, অস্থাবর জিনিসের ওপর কর বসাবেন যা কালক্রমে অবিচার ও বে-ইনসাফীতে পরিণত হবে? এতে সম্রাট ক্রোধে চিৎকার করে বলে ওঠেন, ওহে অভিশপ্ত বেআদব! তোর পরিচয় কী? কোত্থেকে এসেছিস তুই? সে উত্তরে জানাল, সে রাজস্ব কর্মকর্তাদের একজন। সম্রাট তখন নির্দেশ দেন কলমদানি দিয়ে পিটিয়ে তাকে মেরে ফেলতে। এরপর পরিচালক/সবিচদের সকলেই তাকে কলমদানি দিয়ে পেটাতে শুরু করে। ফলে বেচারা সেখানেই মারা যায়। এরপর সকলেই বলল, সম্রাট! আপনি যে কর আমাদের ওপর ধার্য করেছেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ানুগ হয়েছে।[১]

ভারতবর্ষে সম্মান ও সম্ভ্রমের অপমান ও অবমাননা এবং সেসব পশ্চাৎপদ শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার ব্যাপারটা (যাদেরকে বিজয়ী আর্য জাতিগোষ্ঠী ও দেশীয় আইন একটি নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করেছিল এবং যারা গৃহপালিত পশু থেকে কেবল এ দিক দিয়ে ভিন্ন ছিল, এরা দু’পায়ে ভর দিয়ে চলত এবং

...মান] লিসানুল-আরব গ্রন্থে আছে, كفر-এর অর্থ ইরানীদের তাদের সম্রাটকে সম্মান করা এবং আহলে কিতাবদের تكفير এই যে, আদাব ও তসলীম হিসাবে মানুষ তার মাথা নুইয়ে দেবে। তারা জারীরের সেই কবিতা থেকে সনদ পেশ করত فضعوا السلاح وكفر والتكفير। লিখেছেন যে, যেমন কোন গ্রাম্য কৃষক আপন মুখ্য ও যিম্মাদারের সামনে বুকে হাত বেধে সম্মান প্রদর্শনার্থে মাথা নইয়ে দেয় (লিসানু'ল-আরব, ৭ম খণ্ড, ৪৬৬ كفر শিরো.)।

১. সাসানী আমলে ইরান, ৫১১ পৃ.।

দেখতে মানুষের মত) চিন্তাই করা যেত না। উক্ত আইনে এটি নিয়মিত ধারা হিসাবে বর্ণিত ছিল, যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে মারার জন্য হাত ওঠায় কিংবা লাঠি ওঠায় তবে তার হাত কেটে দিতে হবে। যদি লাথি মারে তবে তার পা কেটে দিতে হবে। যদি সে দাবি করে, সে ব্রাহ্মণকে লেখাপড়া শেখাতে পারে, তবে তাকে ফুটন্ত তেল পান করানো হবে। এই আইনের দৃষ্টিতে কুকুর, ব্যাঙ, গিরগিটি, কাক, উল্লুক ও অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য শ্রেণীর কাউকে হত্যা করলে তার জরিমানা ছিল একইরূপ।[১]

রোমকরাও এ ব্যাপারে ইরানীদের থেকে বেশি কিছু ভিন্ন ছিল না, যদিও নির্লজ্জতা ও মানবতাকে অপমানিত-অপদস্থ করার ক্ষেত্রে এই সর্বনিম্ন পর্যায়ে তারা পৌছুতে পারেনি। একজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক Victor Chopart তার The Roman World নামক গ্রন্থে বলেন,

"রোম সম্রাট কাইজারকে উপাস্য মনে করা হতো। বিষয়টি মৌরসী ও পারিবারিকভাবে ছিল না, বরং যিনিই সিংহাসন ও রাজমুকুটের মালিক হতেন তাকেই খোদার আসনে বসানো হতো যদিও তার ভেতর এমন কোন নিশানী কিংবা চিহ্ন থাকত না যা তাকে এই স্তরে বসবার দিকে ইঙ্গিত দেয়। Augustus-এর শাহী উপাধি এক সম্রাট থেকে অপর সম্রাট পর্যন্ত সংবিধান ও আইন অনুযায়ী স্থানান্তরিত হতো না, বরং রোমক সরকারী সংসদের কাজ কেবল এতটুকুই ছিল, এমন প্রতিটি নির্দেশ যা তরবারির তীক্ষ্ণ ধারের জোরে প্রচারিত হবে তা প্রচারিত হতে দেয়া। এই রাজত্ব ও বাদশাহী ছিল কেবল এক ধরনের সামরিক একনায়কতন্ত্রেরই রূপ।[২]

যদি এর তুলনা করা হয় আরবদের সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মসম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানোর ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে, যা ইসলাম আসার পূর্বে তাদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে এই দুই জাতিগোষ্ঠীর মেযাজ এবং আরব ও অনারব সমাজের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বোঝা হবে। তারা কখনো ও কোন সময় তাদের বাদশাহকে ابیت اللعن ও عم صباحا (অর্থাৎ আপনি সব রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকুন এবং আপনার প্রভাত কল্যাণময় হোক)-এর মত শব্দ দিয়ে সম্বোধন করত। এই স্বাধীনতা ও আত্মপরিচিতি, আপন মান-সম্ভ্রমের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ আরবদের মধ্যে এই পরিমাণে ছিল যে, তারা তাদের বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহ কোন কোন দাবী ও ফরমায়েশ পূরণ করতেও অনেক সময় আপত্তি করত। এই সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত হয়েছে, একবার এক আরব বাদশাহ বনী তামীমের এক ব্যক্তির নিকট একটি ঘোটকী চেয়ে

১. মনু সংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

২. The Roman World, London 1928. P. 418.

বসে, যার নাম ছিল সিকাব। লোকটি ঘোটকী দিতে পরিষ্কার অস্বীকার করে এবং নিম্নোক্ত বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করে :

ابيت اللعن ان سكاب علق * نفيس لا تعار ولا تباع

فلا تطمع ابيت اللعن فيها * ومنعكها بشئ يستطاع

"হে রাজন! এ বহু দামী ও সুন্দরী ঘোটকী; একে না ধারে দেয়া যায়, না বিক্রয় করা যায়। আপনি একে পাবার জন্য চেষ্টা করবেন না; আপনার হাত থেকে একে ফেরানো আমার পক্ষে সম্ভব।" দীওয়ান-ই-হামাসা, বাবুল-হামাসা, পৃ. ৬৭-৮।

এই স্বাধীনতা, আত্মশাসন, আত্মমর্যাদা, আভিজাত্য ও অটুট মনোবল সর্বস্তরের জনগণের মধ্যেই বর্তমান ছিল এবং নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই পাওয়া যেত। এর একটি নমুনা আমরা হীরার শাসনকর্তা আমর ইবন হিন্দ-এর হত্যার ঘটনায় দেখতে পাই। আরব ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমর ইবন হিন্দ বিখ্যাত আরব ঘোড়সওয়ার কবি আমর ইবন কুলছুমকে দাওয়াত দেন এবং আগ্রহ ব্যক্ত করেন, তার (কবির) মা শাসনকর্তার মা'র সঙ্গে দাওয়াতে যেন শরীক হন! এরপর আমর ইবন কুলছুম বনূ তাগলিবের একটি জামাতের সঙ্গে জযীরা থেকে হীরা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তার মা লায়লা বিনতে মুহালহিলও বনূ তাগলিবের কিছু সংখ্যক দায়িত্বশীল লোকের সঙ্গে রওয়ানা হয়।

আমর ইবন হিন্দের তাঁবু হীরা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়। একদিকে আমর ইবন হিন্দ আপন তাঁবুতে প্রবেশ করেন এবং অপরদিকে লায়লা ও হিন্দ তাঁবুর এক পৃথক কামরায় একত্র হন। আমর ইবন হিন্দ তার মাকে বলে দিয়েছিলেন, যখন খাবার পরিবেশন করা হবে তখন নওকরদের একটু আলাদা করে দেবে এবং কোন প্রয়োজন দেখা দিলে লায়লাকে দিয়ে তা করিয়ে নেবে। অতঃপর আমর ইবনে হিন্দ দস্তরখান বিছানোর নির্দেশ দিলেন, এরপর খাবার পরিবেশন করলেন। এরই ভেতর হিন্দ লায়লাকে সম্বোধন করে বলল, বোন! এই পাত্রটা আমাকে একটু উঠিয়ে দাও তো! লায়লা বলল, যার প্রয়োজন সে নিজেই উঠিয়ে নিক। এরপর হিন্দ দ্বিতীয়বার চাইল এবং পীড়াপীড়ি করতে থাকল। এ সময় লায়লা চিৎকার করে উঠল, হায় লজ্জা ও অপমান! ওহে বনূ তাগলিব! এই আওয়াজ আমর ইবন কুলছুম শুনতেই তার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে। তিনি এক লাফে আমর ইবনে হিন্দের সামনে ঝুলন্ত তরবারি টেনে নেন এবং তা দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত হানেন। সেই সাথে বনূ তাগলিব তাঁর তাঁবু লুট করে এবং জযীরার দিকে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই আমর ইবন কুলছুম সেই বিখ্যাত কাসীদা পাঠ করেন ("ঝুলন্ত সপ্তক" সাব'আ মু'আল্লাকা)।[১]

---

১. কিতাবুশ-শিরওয়াশ-শু'আরা, ইবন কুতায়বা, পৃ. ৩৬।

ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটে যখন হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে পারসিক সেনাপতি রুস্তমের দরবারে গিয়েছিলেন। রুস্তম পূর্ণ জাঁকজমক ও শাহী ঠাঁটবাটের সঙ্গে স্বীয় সিংহাসনে বসে ছিলেন। মুগীরা ইবনে শুবা (রা) আরবদের অভ্যাস মাফিক রুস্তমের পাশাপাশি কুরসীতে গিয়ে বসে পড়েন। তার দরবারীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে টেনে নীচে নামিয়ে আনে। এতে তিনি বলেন, আমরা খবর পেয়েছিলাম, তোমরা নাকি খুবই বুদ্ধিমান! কিন্তু আমার চোখে তোমাদের চেয়ে বেওকুফ আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা আরবরা তো সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকি! আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে গোলাম বানায় না একমাত্র যুদ্ধের সময় ছাড়া। আমার ধারণা ছিল, তোমরাও তোমাদের জাতির সঙ্গে ঠিক তেমনি সাম্যের আচরণ করে থাকবে। এর চেয়ে এই ভাল ছিল, তোমরা আমাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখতে, তোমরা একে অপরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে রেখেছ এবং এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে নিষ্পত্তি হবে না। এ অবস্থায় আমরা তোমাদের সঙ্গে এই আচরণ করতাম না, আর তোমাদের নিকটও আগমন করতাম না। কিন্তু তোমরা নিজেরাই আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছ।[১]

আরব উপদ্বীপে শেষ নবী প্রেরণের দ্বিতীয় কারণ হলো, আরব উপদ্বীপে ও মক্কা মু'আজ্জমায় কাবার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি যা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) এজন্যই নির্মাণ করেছিলেন যেন তাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং এই জায়গাটি চিরদিনের তরে তওহীদের দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হয়!

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ -

বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) গ্রন্থে ব্যাপক পরিমাণ বিকৃতি সত্ত্বেও "বাক্কা[২] উপত্যকা" শব্দটি আজ পর্যন্ত বর্তমান, কিন্তু অনুবাদকগণ একে 'বুকা' উপত্যকা বানিয়ে দিয়েছেন এবং একে নির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট অর্থে পরিণত করেছেন। مزامير ذاؤد-এর শব্দ যা আরবী ভাষায় এসেছে তা এই :

طوبى لاناس عزهم بك طرق بيتك فى قلوبهم عابرين فى وادى البكاء يصرونه ينبوعًا .

"বরকতময় ও পবিত্র সেই মানুষ যার ভেতর তোমার পক্ষ থেকে শক্তি নিহিত, যাঁর অন্তরে রয়েছে তোমার ঘরের রাস্তা যিনি বুকা উপত্যকা পার হওয়ার সময়

---

১. তারীখে তাবারী, ৪খ. ,১০৮।

২. বাক্কা, পবিত্র মক্কার অপর নাম। বাক্কা ও মক্কা উভয় নামই ব্যবহৃত হয় এজন্য যে, আরবী ভাষায় মীম ও বার মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন।

তাকে একটি কুয়া বানান” (গীত সংহিতা, ৮৪ : ৫,৬,৭; পবিত্র গ্রন্থ, বৃটিশ এন্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি)।

কিন্তু ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ কয়েক শতাব্দী পর অনুভব করতে সক্ষম হন যে, এই অনুবাদ ভুল। অতঃপর Jawish Encyclopaedia-তে এই স্বীকারোক্তি আছে, এটি এক নির্দিষ্ট উপত্যকা যেখানে পানি পাওয়া যেত না। যারা এসব কথা লিখেছেন তাদের চিন্তায় এমন একটি উপত্যকার ছবি ছিল যার ছিল বিশেষ কুদরতী অবস্থা, তারা যার উক্ত শব্দ দ্বারা করেছেন।[১]

ঐ সব সহীফার ইংরেজি অনুবাদকগণ অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবী অনুবাদকদের তুলনায় অধিকতর বিশ্বস্ততা ও সতর্কতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁরা “বাক্কা” শব্দটিকে মূল সহীফার ন্যায় অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় হুবহু ঠিক রেখেছেন এবং ইংরেজি 'ঠ' অক্ষরে না লিখে বড় 'ঈ' অক্ষরে লিখেছেন, যেমন সাধারণত Noun-এর ক্ষেত্রে লেখা হয়ে থাকে। ইংরেজি অনুবাদ নিম্নে দেয়া গেল :[২]

Blessed is the man whose strength is in thee in whose heart are the ways of them, who passing through the Valley of Baca make it a well. Psalm. 84, 5-6

মুবারকবাদ সেই সব লোকের প্রতি যাদের সম্মান ও শক্তি রয়েছে তোমার সাথে, যাদের অন্তরে তাদের রাস্তা রয়েছে যা বাক্কা উপত্যকা পার হবে এবং তাকে একটি কুয়া বানাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র আবির্ভাব ছিল হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর সেই দু'আর ফল যা তাঁরা কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে ও তা নির্মাণ করার সময় করেছিলেন। দু'আটি এই :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

“হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা বাকারা : ২২৯ আয়াত]

---

১. VOL 11, P. 415.

২. মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকৃত তফসীরে মাজেদী, কাযী সুলায়মান মনসুরপুরীর রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খ., থেকে গৃহীত।

আল্লাহ তায়ালার এক চিরন্তন নিয়ম হলো, তিনি তাঁর মুখলিস (একনিষ্ঠ), সাদিকীন (সত্যনিষ্ঠ) ও আপন মহান সত্তার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা ও ক্ষমা ভিক্ষার আঁচল বিস্তারকারীদের দু'আ নিশ্চিতভাবে কবুল করে থাকেন। আম্বিয়া-ই কিরাম ও নবীয়ে মুরসালাদের মরতবা তো তাঁদের চেয়েও উচ্চে!

আসমানী সহীফা ও সত্য সংবাদসমূহ ঐসব উদাহরণে ভরপুর। স্বয়ং তাওরাতের প্রমাণ আছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই দু'আ কবুল করেন। পুস্তকে (২০) পরিষ্কারভাবে লেখা আছে,

"এবং ইসমাঈলের অনুকূলে আমি তোমার কথা শুনলাম। দেখ, আমি তাকে প্রাচুর্য দান করব, তাকে সৌভাগ্যশালী করব এবং তাকে খুব বর্ধিত করব; তার থেকে বার জন সর্দার জন্ম নেবে এবং তাকে বিরাট বড় জাতি (قوم) বানাব।"

এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতেন, انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى "আমি ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের ফসল।" তাওরাত (ওল্ড টেস্টামেন্ট বা পুরাতন নিয়ম)-এ বিকৃতি সত্ত্বেও আজও এর সাক্ষ্য মিলবে, এই দু'আ কবুল হয়। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে (১৫-১৮) মূসা (আ)-এর ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে-

يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى له تسمعون .

"খোদাওয়ান্দ তোমার প্রভু তোমার রব তোমার জন্য তোমারই ভেতর থেকে তোমারই ভাইদের থেকে আমার মত একজন নবী পাঠাবেন; তোমরা গভীর মনোযোগের সাথে তার কথা শুনবে।" اخوتك। (তোমার ভাই) শব্দ নিজে থেকেই বলে দিচ্ছে, এ দ্বারা বনী ইসমাঈলকেই বোঝানো হচ্ছে, বনী ইসরাঈলের চাচার বংশধর। উক্ত সহীফাতেই দু'টি শ্লোকের পর এই বাক্য লিখিত রয়েছে :

قال لى الرب قد احسنوا فيما تكلموا اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ماأوصيه به .

"আর খোদাওয়ান্দ আমাকে বললেন, তারা যা বলেছে তা ভালই বলেছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে তোমার মত একজন নবী পাঠাব, আর আমি আমার বাক্য তার মুখে নিক্ষেপ করব এবং যা কিছু আমি তাকে বলব সে তা সব তাদেরকে বলবে।" [যাত্রাপুস্তক-২,১৮ : ১৭-১৮]

اجعل كلامى فى فمه .। (আমি আমার কথা তার মুখে নিক্ষেপ করব) এই বাক্যটি মুহাম্মদ ﷺ-কে নির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেননা তিনিই একমাত্র নবী

যাঁর ওপর আল্লাহর কালাম শব্দগত ও অর্থগতভাবে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা তার ঘোষণাও দিয়েছেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَاِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى .

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না; এতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়।" [সূরা নাজম : ৩-৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

لاَ يَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ .

"কোন মিথ্যা এতে ঢুকে পড়বে না, সামনে থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।"

[হামীম আস সাজদা-৪২ আয়াত]

এর বিপরীতে বনী ইসরাঈলের নবীদের সহীফাসমূহ আদৌ এ দাবি করে না, সেগুলো শব্দগত ও অর্থগতভাবে আল্লাহর কালাম। তাদের পণ্ডিতগণও সেসবকে তাদের নবীদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। Jewish Encyclopaedia-তে বলা হয়েছে,

"ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম)-এর প্রথম পাঁচটি পুস্তক (যেমন প্রাচীন ইয়াহূদী ধর্মীয় বর্ণনাসমূহ আমাদেরকে বলে) মূসা নবীর রচনা। শেষ আটটি শ্লোক বাদে [যেগুলোতে মূসা (আ-)-এর ইনতিকালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে] রিব্বী (ইয়াহূদী আলিম)-এর বিপরীতে ও একে অপরের থেকে ভিন্ন বর্ণনার ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যা এসব সহীফায় এসেছে এবং এর মধ্যে আপন প্রজ্ঞা ও মেধার সাহায্যে সংস্কার-সংশোধন করে থাকে।"[১]

ইনজীল চতুষ্টয়ের সম্পর্ক যতখানি, যেগুলোকে "নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়ম" বলা হয়, সেগুলো শব্দগত ও অর্থগতভাবে আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে দূরতম সম্পর্কও নেই। এ ব্যাপারে তারাই সন্দেহ দূর করতে পারে যারা এগুলো পড়ে দেখেছেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এসব পুস্তক জীবনী ও কাহিনীমূলক পুস্তক হিসাবেই বেশি পরিচিত। আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব হিসাবে, যার ভিত্তি হয় ওহী ও ইলহাম, তা এতে খুবই কম দেখা যায়।[২]

---

১. Jewish Encyclopaedia

২. বিস্তারিত দ্র. লেখকের منصب نبوت-এর ৭ম বক্তৃতা ختم نبوت -এর "আসমানী সহীফা ও কুরআন জ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে" নামক অধ্যায়।

এর পরে আসে জযীরাতুল আরবের তথা আরব উপদ্বীপের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের যা একে দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে উপযোগী রূপ দান করেছে, যেখান থেকে এই দাওয়াত ও পয়গাম সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দেয়া যায় এবং পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা যায়। একদিকে এটি এশিয়া মহাদেশের একটি অংশ, অপরদিকে তা আফ্রিকা মহাদেশ, এরপর য়ূরোপেরও কাছাকাছি এবং এসব সেই এলাকা যা সভ্যতা ও কৃষ্টি, জ্ঞান ও শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শনের সব সময়ই কেন্দ্র থেকেছে যেখানে বিরাট বিস্তৃত ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে। অতঃপর এই এলাকা দিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা চলাচল করত যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের লোক একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতো। এটি ছিল কয়েকটি মহাদেশের সঙ্গমস্থল এবং এক জায়গার নির্দিষ্ট বস্তুসামগ্রী ও উৎপাদিত দ্রব্য, যেখানে এর প্রয়োজন পড়ত, সেখানে স্থানান্তরিত করত।[১]

এই আরব উপদ্বীপ দুই বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মাঝে অবস্থিত ছিল: খৃস্টান শক্তি ও অগ্নি উপাসক শক্তি, প্রাচ্য শক্তি ও পাশ্চাত্য শক্তি। কিন্তু এরপরও তারা নিজস্ব স্বাধীনতা ও আপন ব্যক্তিত্বের সর্বদাই হেফাজত করেছে এবং নিজেদের কয়েকটি সীমান্ত এলাকা ও কতগুলো গোত্র ছাড়া তারা কখনো ঐ সব শক্তির অধীনতা স্বীকার করেনি। আরব উপদ্বীপ বিনা প্রশ্নে দ্বিধা না করে নবুওতের এমন এক বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারত যা আন্তর্জাতিক রেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, মানবতাকে সমুন্নত মঞ্চ থেকে সম্বোধন করবে, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক চাপ ও বিদেশী প্রভাব থেকে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন হবে।

এই সমস্ত কারণে আল্লাহ্ তায়ালা আরব উপদ্বীপ ও মক্কা মুকাররামাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব, আসমানী ওহীর অবতরণ এবং দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রচারের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র ও সূচনাবিন্দু হিসাবে নির্বাচিত করেন।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.

"আল্লাহই বেশি জানেন তাঁর পয়গাম কোথায় ও কাকে সোপর্দ করা হবে।"
[সূরা আনআম : ১২৪ আয়াত]

---

১. ড. হুসায়ন কামালুদ্দীন রিয়াদ ভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি। তিনি এক সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন, তিনি এক নতুন ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে উপনীত হয়েছেন যা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, মক্কা মুকাররামা পৃথিবীর শুষ্ক অংশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তিনি তাঁর গবেষণার সূচনা করেছেন এমন একটি চিত্র দ্বারা যেখানে মক্কা মুকাররামা থেকে পৃথিবীর অপরাপর স্থানের দূরত্ব দেখানো হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প মূল্যের এমন একটি যন্ত্রের নির্মাণ যা কেবলার দিক নির্ধারণ করবে। ইতোমধ্যে তাঁর কাছে এই সত্যও দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মক্কা মুকাররামা ঠিক দুনিয়ার মাঝখানে অবস্থিত। এই গবেষণা দ্বারা তাঁর এই রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে যে, মক্কা মুকাররামাকে বায়তুল্লাহর কেন্দ্র ও আসমানী হেদায়াতের সূচনা বিন্দু বানাবার মধ্যে আল্লাহর কী রহস্য ও কুদরত নিহিত ছিল। (দৈনিক আল-আহরাম, ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং)।

আরবের অন্ধকারতম যুগ ও একজন স্থায়ী নবী প্রেরণের আবশ্যকতা

এই সব যোগ্যতা ও উত্তম গুণ সত্ত্বেও যা দিয়ে আল্লাহ্ পাক আরবদেরকে ধন্য করেছিলেন এবং যদ্দরুন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রেরণ ও ইসলামের আবির্ভাবের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন, আরব উপদ্বীপে সচেতনতা ও অস্থিরতার কোন চিহ্ন দেখা যেত না এবং হুনাফা[১] ও সত্য অন্বেষণের প্রেরণা ও আবেগ পোষণকারী কতিপয় ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল এবং যাদের অবস্থান বর্ষাঘন শীতল রাত্রির গভীর অন্ধকারে জোনাকি পোকার চেয়ে বেশি ছিল না। যারা না কোন পথহারা পথিককে পথ দেখতে পারত আর না পারত কাউকে উষ্ণতা ও উত্তাপ প্রদান করতে। এই যে যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবির্ভূত হন আরব উপদ্বীপের ইতিহাসে অন্ধকারতম যুগ ছিল। এই ভূখণ্ডটি অন্ধকার ও অবনতির চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হয়েছিল যখন সংস্কার ও সংশোধনের সকল আশা-ভরসা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ ছিল সেই শক্ত কঠিন হৃদয় চূর্ণকারী ও সঙ্গীন পর্যায় যা কোন নবীর আবলীগের রাস্তায় এসে থাকবে।

নবী করীম ﷺ -এর একজন ইংরেজ জীবনীকার (Sir William Muir) যিনি ইসলামের মহানবী হুযূর আকরাম ﷺ -এর সম্পর্কে মনগড়া কাহিনী রচনায় ও কলঙ্ক লেপনে কুখ্যাত, সে যুগের খুব সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং পাশ্চাত্য লেখকদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখান করেছেন, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে লাভা নির্গত হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ﷺ কেবল সঠিক মুহূর্তে ও যথার্থ স্থানে পৌঁছে আগুনের উত্তাপ বৃদ্ধি করেন। ফলে নির্গত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন :

"মুহাম্মদ-এর যৌবনের ঊষালগ্নে 'আরব উপদ্বীপ একেবারেই পরিবর্তনের অযোগ্য অবস্থায় ছিল। সম্ভবত এর চেয়ে বেশি নৈরাশ্যজনক অবস্থা আর কোন যুগে ছিল না।"[২]

একই লেখক অন্যত্র বলেন,

"খৃস্ট ধর্মের বিস্তারের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা আরব ভূ-পৃষ্ঠে সময় সময় মামুলী কাঁপন সৃষ্টি করেছিল বটে এবং তুলনামূলকভাবে কঠিনতর ইয়াহূদী প্রভাবসমূহ কখনো

---

১. হুনাফা তাদেরকে বলা হয় যারা মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করেছিল এবং নিজেদের জ্ঞান ও উপলব্ধি মুতাবিক ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মবিশ্বাসের ওপর কায়েম ছিল।

২. William Muir, The Life of Mahmet, Vol. I. London 1858, P. ccxxv-iii.

কখনো অভ্যন্তরীণ ভাগেও চোখে পড়ত। কিন্তু স্থানীয় মূর্তি পূজা ও ইসমাঈলীদের কল্পনাপূজার খরস্রোত সব দিক থেকে কাবার দিকে দু'কূলপ্লাবী হয়ে আছড়ে পড়ছিল এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণ সরবরাহ করছিল, মক্কার মাযহাব ও উপাসনার তরীকা-পদ্ধতি আরবদের মস্তিষ্কের ওপর শক্তভাবে ও অন্যের অংশ গ্রহণ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ জেঁকে বসেছিল।"[১]

এই ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতাকে বোসওয়ার্থ স্মিথ (Bosworth Smith) সংক্ষেপে কিন্তু জোর দিয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

"সবচেয়ে বেশি দার্শনিক প্রবণতার অধিকারী একজন ঐতিহাসিক বলেন, এই সমস্ত বিপ্লবে, যে সব বিপ্লব মানুষের সামাজিক ইতিহাসের ওপর অবিনশ্বর ছাপ ফেলেছে, তার ভেতর কারুর আবির্ভাব ও প্রকাশ মানবীয় জ্ঞানের জন্য এতটা অপ্রত্যাশিত ছিল না যতটা ছিল আরবের এই ধর্মের।

"আমাদের প্রথম দৃষ্টিতেই এ কথা স্বীকার করতে হয়, ইতিহাসশাস্ত্র (যদি ইতিহাসশাস্ত্র নামে কোন বস্তু থেকে থাকে) এতে অক্ষম যে, সে কার্যকারণের সেই সব কড়ি তালাশ করবে যা তালাশ করা তার জন্য ফরয।"[২]

নবীর আবশ্যকতা

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে অবস্থার বিকৃতি এতটা বেড়ে গিয়েছিল এবং মানবতার অবনতি ও অধঃপতন সেই সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তার আর কোন সংস্কার (Refor) ও চরিত্র শিক্ষকের সাধ্যের ভেতর ছিল না। সমস্যা কোন এক 'আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন, কোন বিশেষ অভ্যাসের পরিবর্তন অথবা কোন ইবাদত-বন্দেগীর তরীকার প্রচলন কিংবা কোন সমাজের সামাজিক সংস্কারের ছিল না, এর জন্য সেই সংস্কারক ও চরিত্র শিক্ষক যথেষ্ট ছিলেন যা থেকে কোন যুগ ও কোন এলাকা কখনো মুক্ত ছিল না। সমস্যা ছিল, জাহিলিয়াতের শেরেকী ও মূর্তি পূজামূলক ও মানবতার এই ধ্বংসাত্মক আবর্জনাকে কিভাবে সরানো হবে এবং পরিষ্কার করা হবে যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশানুক্রমে জমা হচ্ছিল যার নিচে আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর বিশুদ্ধ শিক্ষামালা ও সংস্কারকদের চেষ্টা-সাধনা ও খেদমত ছিল। অতঃপর সে স্থানে সেই নতুন সুদৃঢ়, বিশাল ও সমুন্নত প্রাসাদের মতে অট্টালিকা কিভাবে কায়েম করা হবে যার রহমতের ছায়াতলে গোটা মানবতা আশ্রয় গ্রহণ করবে। সমস্যা ছিল, সেই মানুষ কি করে বানানো যাবে যে তার সামনের মানুষের তুলনায় সকল ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হবে এবং এমনটি দেখা যাবে, সে যেন কেবল জন্মলাভ করেছে কিংবা সে নব জীবন লাভ করেছে!

---

১. William Muir, The life of Mahomet Vol. 1, London 1858 p.ccxxxix.

২. Mohammad and Mohammadanism London 1876,P. 105.

اَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا.

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলো দিয়েছি- সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেই স্থান থেকে বের হবার নয়?" [সূরা আন'আম : ১২২ আয়াত]

এই সমস্যা ও ফেতনা-ফাসাদের জড় চিরদিনের জন্য খতম করা এবং মূর্তি পূজার বুনিয়াদকে জড়েমূলে এমনভাবে বিনাশ করার ছিল যে, দূর-দূরান্তেও এর কোন চিহ্ন ও নাম-নিশানাও যেন থাকতে না পারে এবং তৌহিদী 'আকীদা-বিশ্বাস মানুষের মনের গহীনে কার্যত এমনভাবে যেন বদ্ধমূল ও দৃঢ়মূল করে দেয়া যায় যার বেশি কল্পনা করাও কষ্টকর! তার ভেতরে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা, ইবাদত-বগেন্দীর প্রতি আগ্রহ ও ঝোঁক, মানবতার সেবা, হক-পরস্তীর আবেগ-উদ্দীপনা, প্রতিটি অশুভ ও মন্দ কামনার মুখে লাগাম দেবার ক্ষমতা, যোগ্যতা ও শক্তি পয়দা করতে হবে। সংক্ষেপে মানবতাকে (যা আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, বরং তার জন্য কোমর বেঁধে তৈরী ছিল এবং এক্ষেত্রে সজ্ঞানে চেষ্টার কোন কসুর সে করেনি) কোমর ধরে দুনিয়া ও আখিরাতের জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে এবং তাকে শাহী সড়কে টেনে তুলতে হবে যার প্রথম সূচনা সেই পবিত্র জীবন যা আল্লাহ প্রেমিক আরিফ ও ঈমানদারগণ এই দুনিয়াতেই লাভ করে থাকেন এবং দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত সূচনা সেই চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি জীবন যাপনকারীকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির যে উপকার করেছেন তার উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে যেই ইরশাদ করেছেন এর চেয়ে অধিক সেই অবস্থার কোন চিত্র ও প্রতিনিধিত্ব হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে :

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا.

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর : তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে

তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে ছিলে, আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।" [সূরা আল ইমরান : ১০৩ আয়াত]

মানুষের সমগ্র ইতিহাসে এর চেয়ে অধিক নাযুক ও জটিল কাজ এবং এর থেকে বিরাট ও 'আজীমু'শ-শান যিম্মাদারী আর চোখে পড়ে না যা একজন নবী ও আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি হিসাবে মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর চাপনো হয়েছিল। কোন জমিও এতটা উর্বর প্রমাণিত হয়নি এবং সজীব শ্যামলিমা নিয়ে আসতে পারেনি যেমনটি তিনি পেরেছিলেন। কোন চেষ্টা-সাধনাও এতটা ফলপ্রসূ ও কামিয়াব হয়নি যতটা তাঁর চেষ্টা-সাধনা সাধারণ মানবতার জন্য উপকারী, জীবনদায়ক ও প্রাণসঞ্চারক প্রমাণিত হয়েছে। এই সব বিস্মকয়কর বস্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিস্ময় এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুজিযা। একজন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ও কবি অত্যন্ত জোরের সাথে আলংকারিক ভাষায় সুস্পষ্টভাবে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই কবি ও সাহিত্যিক হলেন ল্যামার্টিন (Lamartine)। তিনি নবুওতে মুহাম্মদীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা পেশ করতে গিয়ে বলেন :

"কোন মানুষই কখনো চেতনভাবে কিংবা অবচেতনভাবে নিজের জন্য এত বড় উচ্চ ও মহত্তর লক্ষ্য নির্বাচিত করেনি। কারণ তা ছিল মানুষের শক্তির বাইরে। অলীক ধারণা ও খোশ কল্পনা, যা মানুষ ও তার স্রষ্টার মাঝে আড়াল ও পর্দা করে রাখে, তাকে পরাজিত করা, মানুষকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা এবং তাঁর সামনে এনে দাঁড় করানো, সেই যুগের মূর্তি পূজকদের বস্তুগত খোদার স্থলে এক আল্লাহর পবিত্র ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করা, এসবই ছিল সেই মহান লক্ষ্য। কোন মানুষ কখনো এত বড় বিরাট কাজ, যা কোন অবস্থায়ই মানবীয় শক্তির আওতাধীন ছিল না, এত দুর্বল উপকরণের সাথে কাঁধে তুলে নেয়নি।"

তিনি এগিয়ে গিয়ে বলেন :

"এ থেকেও অধিক তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হলো, তিনি কুরবানাগাহ, দেবতা, ধর্মবিশ্বাস, কল্পনা, আকীদা-বিশ্বাস ও অন্তঃরাজ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি করলেন এমন একটি গ্রন্থকে ভিত্তি বানিয়ে যার প্রতিটি হরফ আইনের মর্যাদা রাখে। তিনি এমন কোন রূহানী মিল্লাত তথা আধ্যাত্মিক জাতি গঠন করলেন যা প্রতিটি বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল ও ভাষাভাষী মানুষ নিয়ে গঠিত। এই মুসলিম মিল্লাতের বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উম্মাহ মুহাম্মদ ﷺ আমাদের জন্য উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেলেন তা হলো এই: এই উম্মাহ্ মিথ্যা খোদাগুলোর প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে এবং বস্তুর ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর প্রতি গভীর আকর্ষণ ও টান অনুভব করে। এই প্রেম ও ভালবাসাই তাঁকে এক আল্লাহর প্রতি অবজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে বাধ্য করে এবং এই ভালবাসাই মুহাম্মদের অনুসারীদের সৎ গুণাবলীর ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। স্বীয় আকীদা-বিশ্বাসকে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দ্বারা গ্রহণ করিয়ে নেয়া তাঁর

এক বিরাট মুজিযা! কিন্তু অধিকতর সঠিক কথা হলো, এটা ব্যক্তির নয়, বরং বুদ্ধির মুজিযা। আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদের এমন এক যুগে ঘোষণা করা হলো, যখন দুনিয়া অসংখ্য কৃত্রিম ও মিনি খোদার পূজার ভারে চাপা পড়ে ছিল, স্বয়ং এক শক্তিশালী মুজিযা ছিল। মুহাম্মদের মুখ দিয়ে যখনই এই আকীদা-বিশ্বাস ঘোষিত হলো অমনি মূর্তির সমস্ত প্রাচীন মণ্ডপগুলোতে ধুলো উড়তে লাগল এবং এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবী ঈমানী উত্তাপে ভরপুর হয়ে গেল!"[১]

এই ব্যাপক ও বিশ্বজোড়া বিপ্লব এবং মানবতার নতুনতর জীবন, নবতর গঠন ও বিনির্মাণের মহান কাজ এক নতুন নবুওয়াত ও রিসালাতের আকাঙ্ক্ষী ছিল যা সমস্ত নবুওয়াত ও রিসালাতের চেয়ে হবে অধিক বলিষ্ঠ এবং এমন এক নবীর প্রার্থী ছিল যিনি হেদায়াত ও সত্য-সুন্দর দীন তথা দীনে হকের পতাকা গোটা বিশ্বজাহানে চিরকালের জন্য উড়িয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً. فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.

"কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা ও মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত, আল্লাহর নিকট থেকে এক রাসূল যে তেলাওয়াত করে পবিত্র গ্রন্থ, যাতে আছে সঠিক বিধান।"

[সূরা বায়্যিনা : ১-৩ আয়াত]

---

1. Lamertine, History de la Turquie, ২য় খ., পৃ. ২৭৬-৭৭, প্যারিস-১৮৫।

জাযীরাতুল-আরব[১]

জাযীরাতুল আরবের সীমা

জাযীরাতু'ল-আরব দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। আরব পণ্ডিতগণ পরোক্ষভাবে এই এলাকার নামকরণ করেছেন জাযীরাতুল-আরব।[২] এর তিন দিকেই পানি। এই ভূখণ্ডটি এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর পূর্বে আরব উপসাগর য়াকে গ্রীকগণ পারস্য উপসাগর নামে জানে। এর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও এর পশ্চিমে লোহিত সাগর যা এর আধুনিক মানচিত্রে দেখানো হয়ে থাকে। গ্রীক ও ল্যাটিন পরিভাষায় একে আরব উপসাগর (Sinus Arabicus) নামকরণ করা হয়েছে এবং প্রাচীন আরবী গ্রন্থে একে বাহর-ই-কুলযুম নামে স্মরণ করা হয়। এর উত্তর সীমান্ত সেই কাল্পনিক সীমান্ত যা (আরব পণ্ডিতদের পরিভাষায়) আকাবা উপসাগর থেকে আরব উপসাগরে শাতিল আরবের মোহনা পর্যন্ত অতিক্রম করে।

মুসলমানরা জাযীরাতুল-আরবকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছে। ১. হেজায, আয়লা (আকাবা) থেকে ইয়ামান পর্যন্ত এবং তাদের মতে একে হেজায এজন্যই বলা হয়, এটি সেই পাহাড়ী সিলসিলা নিয়ে গঠিত যা তিহামাকে (যা লৌহিত সাগরের উপকূলীয় বেলাভূমি) নজদ থেকে পৃথক করে। ২. তিহামা যার কথা এইমাত্র বলা হয়েছে। ৩. য়ামন, ৪. নজদ; এ সেই উচ্চ অংশ যা হেজাযের পাহাড়গুলো থেকে

১. আমরা এই অংশে সীরাত পাঠকদের জন্য সেই সব মৌলিক জ্ঞাতব্য তথ্য বাছাই ও মনোনীত করেছি যেগুলো জানা জরুরী। যেমন এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা, ভৌগোলিক বিবরণ, জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মসমূহের ইতিহাসে এর স্থান, এর বাসিন্দাদের প্রবণতা প্রভৃতি। এতে করে সীরাত পাঠক সেই পরিবেশ সম্পর্কে একেবারে জমা থাকবে না যেই পরিবেশে নবুওয়াতের কর্মকাণ্ডের মহাঅভিযান সম্পন্ন করা হয়েছিল। গ্রন্থের এ বিষয়বস্তুটি সেসব প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যেসব গ্রন্থ জাযীরাতুল-আরবের ওপর লেখা। আমরা, বিশেষ করে ড. জাওয়াদ আলীর পুস্তক المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام (১-৯) থেকে বেশি উপকৃত হয়েছি। এর চেয়ে বেশি চেলেবরে সেসব গ্রন্থ যা জাযীরাতুল-আরবের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে লেখা হয়েছে অথবা আরব কৃষ্টি ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে। এর সংখ্যা অনেক।

২. আরব দেশের ক্ষেত্রে জাযীরাতুল-আরবের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে ব্যাপকভাবে চলে আসছে। বস্তুত প্রাচীনকালে জাযীরা ও জাযীরা-নুমার মধ্যে পার্থক্য করার এবং এর জন্য আলাদা শব্দ বলার রেওয়াজ ছিল না। কোন কোন পণ্ডিত একে আধুনিক ভৌগোলিক পরিভাষায় জাযীরা প্রমাণিত করার জন্য চেষ্টা করেছেন যার একট নমুনা 'আল্লামা খাদরীর' তারীখুল-উমাম আল-ইসলামিয়া নামক গ্রন্থে দেখা যাবে। কিন্তু এই প্রয়াস লৌকিকতামুক্ত নয় এবং এতে করে জাযীরাতুল-আরবের সীমান্ত বহু দূর অবধি নিয়ে যাবার দরকার হয়।

শুরু হয়ে পূর্ব দিকে বাহরায়ন প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বিস্তৃত ও উচ্চ এলাকায় বহু মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত অবস্থিত। ৫. আরূদ, এর পূর্ব দিকে বাহরায়ন ও পশ্চিম দিকে হেজায অবস্থিত। য়ামান ও নজদের মধ্যখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে একে আরূদ বলা হয়। একে য়ামামাও বলা হয়।[১]

জাযীরাতুল আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা ও এর অধিবাসী

এই গোটা উপদ্বীপের ওপর মরুপ্রান্তীয় প্রভাব প্রবল এবং প্রাকৃতিক সে ভূমিগত বিপর্যয় ও নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন এর ওপর শুষ্ক আবহাওয়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এজন্যই অতীত ও বর্তমানকালে এর অধিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম থেকেছে এবং সভ্য সমাজ ও বিরাট কেন্দ্রীয় হুকুমতের অস্তিত্ব এখানে লাভ করতে পারেনি। বেদুঈন জীবনধারা ও এর দেহাতী রঙ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি প্রবল ঝোঁক এবং নানা গোত্রের লড়াই-সংঘর্ষের কারণে কৃষ্টি-সভ্যতা শ্যামল-সবুজ এলাকা ও ঐসব জায়গায় গিয়ে জড় হয় সেখানে বেশ ভাল বৃষ্টিপাত হয় অথবা যেখানে স্রোতস্বিনী ও ঝরনাধারা উৎসারিত হয় কিংবা যেখানে পানি ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি পাওয়া যায় এবং সেখানে কুয়া খনন করা যায়। এজন্য বলা দরকার, আরব উপদ্বীপে জীবনের স্পন্দন পানির বদৌলতেই বেঁচে থাকত। অনন্তর কাফেলা সেদিকেই তার গতি পরিচালিত করত, এরই খোঁজে ব্যাপৃত থাকত এবং প্রকৃতি বেদুঈনদেরকে সব জায়গা থেকে নিয়ে এসে শ্যামল সবুজ এলাকায় জড় করত। তারা কৃষকদের মত যমীনের এক অংশে মাটি কামড়ে পড়ে থাকত না, বরং তারা কোন ভূখণ্ডে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করত যতক্ষণ সেখানে পশুখাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাসপাতা ও পানি পাওয়া যেত। এই সুবিধা খতম হতেই তারা নতুন জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়ত।

এজন্য তাদের জীবন ছিল কষ্টসহিষ্ণুতা ও কঠোরতার প্রতীক এবং তাদের সমাজ গোত্রের রূপ ধারণ করত। একজন বেদুঈনের কাছে গোত্র হুকুমত ও জাতীয়তা একই অর্থ বহন করত। এই গোত্রীয় জীবন আরামপ্রিয়তা, স্থিতি ও সংহতি সম্পর্কে হতো অজ্ঞ ও অপরিচিত এবং তা কেবল শক্তির ভাষা বুঝত। এ ছিল এমন এক জীবন যা মানুষের জন্য কষ্ট ও দুর্ভোগই ডেকে নিয়ে আসত এবং প্রতিবেশী সুসভ্য জনবসতি এদের কারণে বিপদ হয়ে থাকত। অতএব, তারা নিজেদের মধ্যেও লড়াই করত এবং এর থেকে ফুরসৎ মিলতেই সভ্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হতো।

কিন্তু অন্য দিক থেকে একজন আরব আপন গোত্রের আদব ও প্রথা-পদ্ধতির প্রতি হতো অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ। কখনো কোন সময় সে হতো অত্যন্ত

---

১. ভৌগোলিক বর্ণনাকারিগণ এই বন্টনের সবচেয়ে পুরনো বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত নিয়ে যান।

উদারচিত্ত ও সহৃদয় মেযবান, যে মেহমানদারীর সব রকমের দায়িত্ব অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে আনজাম দিত! যুদ্ধ শেষে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে অনুগত থাকত, বন্ধুত্বের হক আদায় করত, প্রচলিত রসম-রেওয়াজ তথা প্রথা-পদ্ধতির শেষ সীমা অবধি সম্মান করত। এসব বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য তাদের কাব্যে ও সাহিত্যে, তাদের বিচার ব্যবস্থায়, দৃষ্টান্তে, তাদের উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, তাদের রীতিনীতি ও চলনে-বলনে খুব বেশিই পাওয়া যায়।

একজন আরব সাম্যের ভক্ত, স্বাধীনতাপ্রিয়, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, কর্মতৎপর ও কর্মী পুরুষ হতো। সে নীচ ও হীন কাজ এড়িয়ে চলত। সে তার সীমিত জিন্দেগী ও বেদুঈন জীবনের ওপর কেবল সন্তুষ্টই ছিল না, বরং গর্বিত ছিল, আপন ভাগ্যে খুশী ও তৃপ্ত ছিল। ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অধিকাংশ সময় দুর্বল হতো। তাদের গোত্রীয় প্রথা ও পিতৃপুরুষের আচার-পদ্ধতির প্রতি ঈমান হতো এর তুলনায় অনেক বেশি মজবুত। তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক লক্ষ্য সেই অভিজাতসুলভ ও পুরুষোচিত গুণাবলী দ্বারা স্ববিখ্যাত ছিল যাকে তারা মুরুওয়াত বা মনুষ্যত্ব শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করত। নিজেদের কাব্যে ও সাহিত্যে এর গুণ গাইত এবং এর প্রশংসা কীর্তন করত।

তমদ্দুন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ

যে সব জায়গায় বৃষ্টি, ঝরনা কিংবা কুয়ার পানি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত সেখানে গ্রাম, পল্লী, মৌসুমী বাজার ও মেলার আকারে একটি তমদ্দুন গড়ে উঠত। এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে আরবদের জীবনের ওপর একটি সাধারণ প্রভাব পড়ত। জীবনের এসব কেন্দ্রে যে সমাজ ও পরিবেশের উদ্ভব হতো তার একটি বিশেষ রঙ ও স্বতন্ত্র ধারা হতো, তার মধ্য দিয়েই আবহাওয়া, শিল্প, পেশা ও সে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রঙ ফুটে উঠত। অনন্তর মক্কায় এক বিশেষ সমাজ ছিল যার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঠিক তেমনি হীরা ও ইয়াছরিববাসীদের সমাজও স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ইয়ামনের সমাজ আরব সমাজগুলোর মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও নতুন সব রাজনৈতিক কারণে সবচেয়ে বেশি উন্নত ছিল এবং খাদ্যোৎপাদন, পশু পালন, খনিজ সম্পদ আহরণ, নগর ও দুর্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর ছিল। বিভিন্ন শিল্প ও জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য তারা বাইরে থেকে নানা রকম সামান ও বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানী করত এবং ইরাক, সিরিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করত।

আরবদের স্তর বিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ

বর্ণনাকারী ও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত, প্রাচীন আরবগণ নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত : ১. আরব বায়েদাহ, যারা ইসলামের পূর্বেই খতম হয়ে গিয়েছিল, ২.

আরব আরিবা, এরা হচ্ছে বনূ কাহতান যারা আরব বায়েদার পর এসেছিল, ৩. আরব মুস্তারিবা, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর যারা হেজাযে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা বংশধারার দিক দিয়ে আরবদেরকে দু'ভাবে বিভক্ত করেন : ১. কাহতানী যাদের আবাদীর প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল য়ামন এবং ২. আদনানী যারা প্রথমে হেজাযে বসতি স্থপন করেছিল। এভাবেই বংশ বিশেষজ্ঞগণ আদনানের দু'টি উপশাখা আছে বলে মত ব্যক্ত করেন। একটি রবীআ ও অন্যটি মুদার। বনূ কাহতান ও বনূ আদনান ছিল সেই প্রাচীনকাল থেকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী। ঠিক তেমনি রবীআ ও মুদার গোত্রের মাঝেও শতাব্দী কাল থেকে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল। বংশ বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত, কাহতানীগণ হলো আসল এবং অধিকতর প্রাচীন আর আদনানীগণ এর শাখা[১] যারা তাদের থেকে আরবী শেখে এবং এরপর তাদেরকে হযরত ইসামাঈল (আ)-এর বংশধরগণ হেজাযে হিজরত করবার পর আপন করে নেয়। হযরত ঈসমাইল (আ) আরব মুস্তারিবা অর্থাৎ আদনানীদের পূর্বপুরুষ।

আরবের লোকেরা বংশধারার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখত এবং একে বিরাট গুরুত্ব দিত। এর স্বীকৃতি অনারব পণ্ডিতগণও সর্বদাই দিয়ে এসেছেন। তারপর ইরানী সেনাপতি রুস্তম তার সভাসদদেরকে, যখন তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে আগত দূত হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা)-এর ছিন্ন বস্ত্র ও জীর্ণ অবস্থার দরুন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল, সতর্ক করেন, তোমরা তো দেখছি আজীব আহম্মক আর আশ্চর্য রকম বোকা! তোমরা এও জান না, আরবের লোকেরা খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছেদকে আদৌ গুরুত্ব দেয় না, বরং তারা বংশধারাকে হেফাজত করে থাকে।[২]

ভাষাগত ঐক্য

এই বিরাট এলাকার জন্য যা একটি ছোটখাট মহাদেশের মতই প্রায়, এ বিষয়টি মোটেই আশ্চর্যজনক হতো না যদি এই ভূখণ্ডে ভাষার প্রাধান্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যেত। কেননা গোত্রগুলোর মাঝে বেশ দীর্ঘ দূরত্ব রয়েছে এজন্যও যে, দক্ষিণ অঞ্চলের লোক উত্তর অঞ্চলের লোকের সঙ্গে এবং পূর্বাঞ্চলের লোক পশ্চিমাঞ্চলের লোকের সঙ্গে খুব কমই মিলিত হতো। তারা গোত্রীয় অহমিকা, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যবোধের শিকার হয়ে থাকত এবং রোম ও পারস্য

---

১. বর্তমান যুগের কতক বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো, মূল আরবগণ আদনানী এবং তারাই প্রথম আরব আরিবা। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারণা এর বিপরীত। তাঁদের বক্তব্য হলো, এই বিভক্তি জাহিলী দলীল-প্রমাণের ওপর স্থাপিত নয়, বরং ইসলামী যুগে লিখিত কিতাবাদি থেকে গৃহীত এবং এর অধিকাংশ বর্ণনা সেসব বর্ণনাকারীর বক্তব্যের ওপর স্থাপিত যারা কাহতানী ও ১. বিস্তারিত দ্র. মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীকৃত عرب وهندے تعلقات নামক গ্রন্থ। এই বিষয়ে এটি সর্বোত্তম বিস্তৃত গ্রন্থ।

২. আল-বিদায়া :, ইবন কাছীর, ৭খ., পৃ. ৪০।

সীমান্তের নিকটবর্তী বসবাসরত আরব গোত্রগুলো তাদের ভাষা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই, আর তা কমই হোক বা বেশি, প্রভাবিতও ছিল এবং এটা অবশ্যম্ভাবীও ছিল। অতএব, এ সমস্ত কারণেই মধ্যয়ুরোপ ও ভারত উপমহাদেশের ভাষার বিস্ময়কর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত জাতীয় ভাষার সংখ্যা ১৫টি। এর ভেতর কতক স্থায়ী ভাষাও রয়েছে যেগুলোর ব্যবহারকারীদের দোভাষীর প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা ইংরেজীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু জাযীরাতুল-আরবের আপন বিস্তৃতি ও গোত্রের সংখ্যা সত্ত্বেও শুরু থেকেই এ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রয়েছে, ইসলামের আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত এর একটিই অভিন্ন তথা সাধারণ ভাষা আরবী যা চিরকাল এই উপদ্বীপের অধিবাসী বেদুঈন, সভ্য কাহতানী ও আদনানী লোকদের কথোপথন ও পরস্পরের সম্পর্ক রক্ষার সূত্র হিসাবে চলে আসছে। এ ভাষায় যদিও উচ্চারণগত ও স্থানীয় আঞ্চলিক বুলির মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিক পার্থক্য বর্তমান (যা ভাষা দর্শন, ভৌগোলিক ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় প্রবণতার কারণে জন্ম লাভ করে, দূরত্বের কারণে উচ্চারণ ভঙ্গীর ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিকও বটে), তথাপি এর ভেতর একটি ভাষাগত ঐক্যও থেকে গেছে। ইসলামের দাওয়াতের জন্য সহজ স্বাভাবিক, ইসলাম প্রচারে ত্বরিত গতি, বিপুল জনগোষ্ঠীকে একক (কুরআনী) আরবী ভাষায় সম্বোধন করা এবং এ দ্বারা প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এই ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাসে জাযীরাতুল-আরব

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, জাযীরাতুল-আরবে প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Chellcan) থেকে মানব বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং যেসব পুরাতন কীর্তি পাওয়া গেছে সে সবই প্রস্তর যুগের প্রাথমিক আমলের সম্পর্ক রয়েছে। আরবদের উল্লেখ তাওরাতেও করা হয়েছে যদ্দারা গ্রীকদের আরবদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানা যায়। তাওরাতে আরবদের যে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তার ইতিহাস ৫৭০-২০০ খৃ.পূ. সনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তেমনি তালমূদেও আরবদের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জুযীফস ফিলাফিউস-এর পুস্তকে (যিনি ৩৭ থেকে ১০০ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন) আরবদের সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য ও নাবাতীয়দের অবস্থান সন্ধান মেলে। কিছু কিছু ত্রুটি ও কিছু কিছু ভুল বোঝাবুঝি সত্ত্বেও, যা ঐসব প্রাচীন রচনাতে পাওয়া যায়, ইসলামের পূর্বে লিখিত গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থসমূহেও ঐতিহাসিক অবস্থা, ঘটনাবলী ও মূল্যবান ভৌগোলিক তথ্যাদির প্রমাণ মেলে। সে সবের ভেতর এমন বহু আরব গোত্রের নামও পাওয়া যায়, যদি এসব বই-পুস্তক না থাকত তাহলে আমরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারতাম না। আলেকজান্দ্রিয়া সেই সব গুরুত্বহ কেন্দ্রের মধ্যে বিবেচিত হতো যেখানে আরবদের অবস্থা, অভ্যাসসমূহ ও দেশের

উৎপাদনের অবস্থা ও প্রকৃতি জানার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল যাতে সেখানকার জিনিসপত্র রোম সাগর উপকূলে অবিস্থত দেশগুলোর বণিকদের পর্যন্ত পৌছান যায়।

আরবদের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক আখীলাস (খৃ.পূ. ৫২৫-৪৫৬) ও হেরোডটাস (খৃ.পূ. ৪৮০-৪২৫)। এছাড়া প্রাচীন আমলের আরও কিছু লেখক আছেন যাঁদের বর্ণনায় আরব ও আরব শহরগুলোর দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এসব লেখকের মধ্যে টলেমীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় খৃ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং যিনি অংকশাস্ত্রে আল-মাজেস্তী নামক গ্রন্থ লেখেন যা আরব পাঠ্য তালিকায় একটি পরিচিত পুস্তক। খৃষ্টীয় উৎসেও আরব জাহিলিয়াত ও আরব ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর তথ্য-উপকরণ পাওয়া যায় যদিও এর বেশির ভাগ খৃস্টবাদের প্রচার এবং এর কেন্দ্রগুলোর বিস্তারিত বিবরণে ভরা।

তাওরাতে যেসব আববের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তারা আরাব অর্থাৎ বেদুঈন আরব এজন্য যে, তাওরাতে আরব বেদুঈনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। তেমনি গ্রীক ও রোমকদের পুঁথি-পুস্তকে ও ইনজীল চতুষ্টয়ে (সুসমাচারসমূহে) যেখানে এ ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বেদুঈন আরবদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রোমান সাম্রাজ্যে ও গ্রীক সীমান্ত এলাকাগুলোতে আক্রমণ চালাত, কাফেলা লুট করত এবং ব্যবসায়ী বণিক ও পর্যটকদের নিকট থেকে ট্যাক্স আদয় করত। সিসিলীয় ডেভিড রুম আরবদের সম্পর্কে লিখেছেন, তারা স্বাধীনতাপ্রেমী, উন্মুক্ত ও খোলা পরিবেশে জীবন যাপনকারী, স্বাধীন ইচ্ছা ও অভিরুচির ধারক। এজন্য হেরোডটাস এদের সম্বন্ধে লিখেছেন, তারা সর্বদা এমন সব শক্তির বিরুদ্ধে মুকাবিলা করে যারা তাদেরকে গোলাম বানাতে ও হেনস্থা করতে, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে চেষ্টা করে। স্বাধীনতা আরবদের এমন এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যার জন্য গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের দৃষ্টিতে এক উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যকার সম্পর্কে তেমনি জানাশোনা, বাণিজ্যিক ও এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষ আরবদের নিকট সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব কাছাকাছি ছিল। এটা ভারতীয় ও আরব উৎসসমূহ থেকে ও আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায়।[১]

নবুওয়াত ও আসমানী ধর্মসমূহের সঙ্গে আরব উপদ্বীপের সম্পর্ক

আরব উপদ্বীপ বহু নবীর দাওয়াত ও আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের জন্মস্থান ছিল। কুরাআন পাক বলে :

---

১. বিস্তারিত দ্র. মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীকৃত عرب وهندكے تعلقات নামক গ্রন্থ। এই বিষয়ে এটি সর্বোত্তম বিস্তৃত গ্রন্থ।

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْخَضَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার (অর্থাৎ হূদ-এর) কথা যার পূর্বে ও পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী (ইয়ামানের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উচ্চ উপত্যকার নাম) সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল এই বলে, আল্লাহ ভিন্ন কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি।" [সূরা আহকাফ : ২১]

এই আয়াত দ্বারা হযরত হূদ (আ)-কে বোঝানো হয়েছে যাঁকে আদ গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে আদ গোত্রের সম্পর্ক ছিল আরব বায়েদার সঙ্গে এবং তারা থাকত আহকাফে। حقف বলা হয় বালির উঁচু টিলাকে। আদ সম্প্রদায়ের বসতি ছিল জাযীরার দক্ষিণে উঁচু টিলার ওপর যা আজাল রুবউল-খালীর দক্ষিণ-পশ্চিমে হাদরামাওতের কাছাকাছি অবস্থিত। এখানে এখন জীবনযাত্রার কোন লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই, নেই কোন বসতি, অথচ এককালে তা ছিল শস্যশ্যামল এলাকা ও উদ্যানপূর্ণ শহর। সেখানে আদ-এর মত প্রবল পরাক্রমশালী সম্প্রদায় বাস করত। তাদেরকে আল্লাহ পাক (তাদের অবাধ্যতার দরুন) প্রবল বায়ু দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আর ঝঞ্ঝাবায়ু তাদেরকে বালুর তুফানে ঢেকে ফেলেছিল।[১]

আলোচ্য আয়াত আমাদেরকে এও বলে দিচ্ছে, হযরত হূদ (আ) এই এলাকায় আগমনকারী প্রথম ও শেষ নবী ছিলেন না। তাঁর আগে ও পরেও নবী এসেছেন। এজন্যই কুরআন বলছে :

وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ.

এমনিভাবে ছামূদ জাতির নবী হযরত সালিহ (আ)-এর আবির্ভাবও আরব উপদ্বীপেই হয়। ছামূদগণ আল-হিজর নামক স্থানে বসবাস করত যা তাবুক ও হেজাযের মধ্যবর্তী একটি এলাকা। হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মের পরই মক্কায় এসে গিয়েছিলেন, সেখানেই বসবাস করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। যদি আরব উপদ্বীপকে আরও একটু বিস্তৃত করে মাদয়ানকেও এর আওতায় নিয়ে

---

১. বিস্তারিত জানতে সূরা আল-হাক্কার ৬ ও ৭ নং আয়াত সামনে রাখুন।

বলা হয় তাহলে হযরত শুআয়ব (আ)-ও আরব প্রমাণিত হন। কারণ মাদয়ান সিরিয় এলাকায় আরব সীমান্তে অবস্থিত। আবুল ফিদা বলেন:

"মাদয়ানবাসী ছিল আরব। তারা মাদয়ানেই থাকত যা মাআন-এর নিকটবর্তী এবং সিরিয়ার সেদিকে অবস্থিত ছিল যে দিকটি ছিল হেজায সংলগ্ন। মৃত সাগর (Dead Sea)-এর কাছাকাছি। তারা ছিল লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী কালের।"

আরব ভূখণ্ড ছিল বহু নবী-রাসূলের আশ্রয় ও অবতরণস্থল যাঁদের ওপর আল্লাহর বিশাল বিস্তৃত যমীন সংকীর্ণ করে তোলা হয়েছিল এবং তাঁরা নিজ দেশেই পরদেশী ও পরবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর ঐসব নবী-রাসূল এই দূর-দরাজ ভূখণ্ডকেই বাছাই করেছিলেন যে ভূখণ্ড প্রতাপশালী বাদশাহ ও অত্যাচারী শাসকদের প্রভাব থেকে ছিল দূরে, যেমনটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে মক্কায় এবং হযরত মূসা (আ)-এর ক্ষেত্রে মাদয়ানে ঘটেছিল। এছাড়াও আরও বহু ধর্ম আপন আপন কেন্দ্রগুলোতে ফলে-ফুলে শোভিত হবার সুযোগ না পেয়ে অবশেষে এই উপদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এরপর ইয়াহূদীদের একটি বিরাট দল রোমকদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে য়ামান ও ইয়াছরিবে আগমন করে এবং খৃস্ট ধর্ম রোম সম্রাটের জুলুম ও হত্যার কবল থেকে পালিয়ে এসে নাজরানে আশ্রয় নেয়।[১]

---

১. নিবন্ধনের এই শেযাংশে আমরা শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরার 'খাতামুন্নাবিয়ীন' গ্রন্থের ১ম খ.. ارض। النبوة الاولى هى ارض العرب। নামক অধ্যায় থেকে উপকৃত হয়েছে।

আবির্ভাবের পূর্বে

মক্কায় হযরত ইসমাঈল (আ)

সায়্যিদুনা ইবরাহীম (আ) মক্কার দিকে চলে আসেন। মক্কা ছিল শুষ্ক ও ঘাস-পানিবিহীন পাহাড়বেষ্টিত। এখানে পানি, খাদ্যশস্য ও জীবন যাপনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর এমন কিছু ছিল না যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলও ছিলেন। বস্তুত এ সফর ছিল পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত মূর্তি পূজা থেকে হিজরত এবং এমন এক কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপনের জন্য তা করা হচ্ছিল যেখানে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা হবে এবং অন্য লোকদেরকেও এর দাওয়াত প্রদান করা হবে। এই কেন্দ্র হেদায়েতের একটি আলোকোজ্জ্বল মিনার, মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা, আশ্রয়স্থল ও তাওহীদ, দীনে হানীফ ও নির্ভেজাল দীনের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই নিষ্ঠাপূর্ণ আমলকে কবুল করেন, এই শুষ্ক উপত্যকায় খুব বরকত দান করেন এবং এই ক্ষুদ্র পবিত্র ও বরকতময় খান্দানের জন্য যা কেবল মা ও ছেলেকে নিয়ে গর্বিত ছিল (যাঁদেরকে হযরত ইবরাহিম (আ) এই বিজন ও ঘাসপানিহীন প্রান্তরে আল্লাহর ভরসায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ পানির একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেন যা যমযম কূপ নামে কথিত। তিনি এতে প্রচুর বরকত দান করেন।

ইসমাঈল (আ) যখন কিছুটা বড় হলেন এবং চলতে ফিরতে ও দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন তখন হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তায়ালার প্রেমের ওপর তাঁর ভালবাসাকে কুরবানী দিতে চাইলেন এবং তাঁকে (ইসমাঈলকে) যবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কেননা স্বপ্নে তাঁকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সৌভাগ্যবান পুত্র আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ও প্রশান্তির সঙ্গে এর জন্য তৈরী হলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 'যিবহিন আজীম'-[১] কে এর ফিদয়া হিসাবে কবুল করলেন। পুত্র ইসমাঈলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখেন যাতে দাওয়াত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে স্বীয় পিতাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন ও সায়্যিদুল-মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বোচ্চ পিতামহ, তদুপরি এই মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে

---

১. কুরআন মাজিদে সূরা সফফাত দ্র.।

পারেন। এই উম্মাহর ওপর দাওয়াত ইলাল্লাহ ও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর দায়িত্ব কিয়ামত তক সোপর্দ করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় ফিরে আসেন এবং পিতা-পুত্র মিলে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে শুরু করেন। তাঁদের দু'আ ছিল, আল্লাহ তা'আলা এই ঘরকে কবুল করুন, এতে বরকত দিন এবং তাঁরা দু'জনই যেন ইসলামের ওপর বাঁচেন মরেন এবং তাঁদের ইনতিকালের পর তাঁদের বংশধরগণ এই সম্পদ ও উত্তরাধিকার যেন লাভ করেন! তাঁরা এই দাওয়াতের কেবল হেফাজতই করবেন না, বরং প্রতিটি বদ, প্রতিটি কুদৃষ্টি, এ পথের প্রতিটি কাঁটা ও প্রতিটি কংকর থেকে একে সযত্নে দূরে রাখবেন। শুধু তাই নয়, এই দুনিয়াতে এর পতাকাবাহী হিসাবে থাকবে, একে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেবে, এ পথে কোন কুরবানী দিতেই সে পিছপা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দাওয়াত গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা আরও দুআ করেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের বংশধরদের মাঝে এমন একজন নবীর আবির্ভাব ঘটান যিনি তাঁর সর্বোচ্চ পিতামহ ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতকে নতুনভাবে জীবন দান করবেন এবং এই কাজের পূর্ণতা দান করবেন যে কাজ তাঁরা শুরু করছেন।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ . وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا . اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ . رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ . اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"স্মরণ কর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাঘরের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আর আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে থেকে তাদের নিকট এক রাসূল পাঠাও যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত (আবৃত্তি) করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" [সূরা বাকারা : ১২৭-২৯]

হযরত ইবরাহীম (আ) এও দুআ করেছিলেন, এই ঘর সব সময় যেন শান্তি ও নিরাপত্তার দোলনা হতে পারে! আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরকে মূর্তি পূজা থেকে যেন নিরাপদ রাখেন যার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এত বেশি আর কোন কিছুতে ছিল না এবং যা থেকে বড় বিপদ স্বীয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আর কিছুকে তিনি মনে করতেন না। সেটা এজন্য যে, আম্বিয়াই-কিরামের পর তাঁদের জাতিগোষ্ঠীর পরিণতি তাঁদের চোখের সামনে ছিল এবং তাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনা ও মহান আত্মত্যাগ সত্ত্বেও এসব জাতিগোষ্ঠী কিভাবে তাঁদের পথ থেকে সরে গিয়েছিল এবং তাঁদের দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই শয়তান ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হাঙ্গামাবাজরা স্ব স্ব যুগের দাজ্জাল, মূর্তি পূজক ও জাহিলিয়াতের নিশানবরদাররা তাদেরকে শিকার বানিয়েছে এবং ত্রাসে পরিণত করেছে।

তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন, তাঁদের সন্তান ও সন্তানের সন্তান-সন্ততিরা যেন এই দাওয়াত ও জিহাদের সঙ্গে আগাগোড়া সর্ম্পক কায়েম রাখে এবং তাঁর মূর্তি ভাঙ্গা, শিরক ও মূর্তি পূজার প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ, সত্যের পথে বাধাহীন প্রয়াস ও চেষ্টা-সাধনা, স্বীয় মূর্তি নির্মাণকারী ও মূর্তি বিক্রেতা পিতার মুকাবিলায় তাঁর কোমর বেঁধে দাঁড়ানো, সত্যকথন ও অন্তর্জ্বালা, তাঁর হিজরত ও দেশত্যাগকে সব সময় মনে রাখে এবং এটা অনুভব করে, এত বড় নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এই বিরান, বালুকাপূর্ণ ও যমীন (যা না কৃষি উপযোগী ছিল আর না ছিল যেখানে সভ্যতা-সংস্কৃতির লালন-পালনের ও উন্নতি-অগ্রগতির কোন উপকরণ) মনোনীত করার গূঢ় রহস্য কি এবং পৃথিবীর বড় বড় বসতি ও উদ্যান-পুষ্পোদ্যান, শহর, কৃষি ও বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্যের কেন্দ্রের ওপর, যেখানে সব ধরনের আরাম-আয়েশের উপকরণ মওজুদ ছিল, এই বিজন মরু কান্তার ও নাম-পরিচয়হীন ভূমিখণ্ডকে কেন প্রাধান্য দেয়া হলো?

তিনি (হযরত ইবরাহীম আ) তাঁর আল্লাহর নিকট এও দু'আ করেন, তাঁদের বংশধরদের জনপ্রিয়তা, চিত্তাকর্ষণ, গ্রহণযোগ্যতা, খ্যাতি, সৃষ্টিকুলের আশ্রয়স্থল ও পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার যেন সৌভাগ্য লাভ ঘটে! মানুষের অন্তর যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁরা যেন দুনিয়ার প্রতিটি কোণ থেকে এসে তাঁদের ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁদেরকে পেশ করে, প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ (রিযিক) আপনাআপনি সকল দিক থেকে যেন তাঁদের কাছে পৌঁছতে থাকে, সব রকমের ফলমূল, চেষ্টা-সাধনার সর্বোত্তম ফসল, উপকারিতা ও কল্যাণ লাভ যেন তাঁদের ভাগ্যে ঘটে!

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ

نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ

فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ . رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

"আর স্মরণ কর ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে (মক্কা মুকাররামাকে) নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই সকল প্রতিমা বহু মানুষকে গোমরাহ করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক, এজন্য যে, ওরা যেন সালাত কায়েম করে! অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

[সূরা ইবরাহীম : ৩৫-৩৭ আয়াত]

কুরায়শ গোত্র

এই সব দু'আ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এক এক করে পূরণ হয়। আল্লাহ তায়ালা এই দু'জনের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বরকত দান করেন। ফলে এই ইবরাহীমী আরবীয় খান্দান ফলে ফুলে সুশোভিত হয় এবং শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। ইসমাঈল (আ) জুরহুম গোত্রের[১] সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হন যাদেরকে আরব আরিবার মধ্যে গণ্য করা হয়। ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততির মাঝে খুব বরকত হয়, এমন কি এই বংশে আদনানের জন্ম হয় যাঁর বংশধারা স্মৃতি ও সতর্কতা, ধারাবাহিকতা ও সমাবেশের দিক দিয়ে আরব বংশধারায় সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

আদনানের অনেক ছেলেমেয়ে হয়, তাঁদের মধ্যে মাআদ ইবন আদনান সবচেয়ে বেশি মশহুর। মাআদ-এর বংশে মুদার খ্যাতির অধিকারী হন এবং তাঁর বংশে ফিহির ইবন মালিক খান্দানের নাম উজ্জ্বল করেন। ফিহির ইবন মালিক ইবন

১. কথিত আছে, কবীলা জুরহুমই প্রথম গোত্র যারা মক্কায় সর্বপ্রথম স্থায়ী বসতি গড়ে। তারাই অফুরন্ত পানির উৎস এই ঝরনার অস্তিত্বের কারণ। কতক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) আপন স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে যখন এই উপত্যকায় রেখে যান তখন এই গোত্র এখানে বর্তমান ছিল।

নাদর-এর সন্তানের নাম কুরায়শ হিসাবে পরিচিত হয় আর এই নাম তাঁর সমস্ত নামের ওপর এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, তা কুরায়শ গোত্র হিসাবে কথিত হয়। আরববাসী কুরায়শদের উচ্চ বংশ-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, বাকপটুতা ও ভাষার অলংকার, বর্ণনাশক্তি, উন্নত চরিত্র, বীরত্ব ও অটুট মনোবলের ওপর একমত পোষণ করেছেন এবং এখন এটা এমন এক বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে যে, যা প্রবাদবাক্যের মত বিখ্যাত সকল মতভেদের ঊর্ধ্বে।[১]

কুসায়্যি ইবন কিলাব-এর বংশধর

ফিহিরের বংশে কুসায়্যি ইবন কিলাবের জন্ম হয় আর মক্কার নেতৃত্ব থাকে জুরহুম গোত্রের হাতে। এরপর একদিন বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক খুযাআ তাঁদের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর কুসায়্যি ইবন কিলাব-এর সৌভাগ্য তারকা উদিত হয় এবং তাঁর যোগ্যতা ও খেদমত সামনে আসে। বায়তুল্লাহর খেদমতের এই দায়িত্ব তাঁকে সোপর্দ করা হয়। কুরায়শদের সকলেই তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয় এবং খুযাআ গোত্রকে মক্কা থেকে বেদখল করে এর শাসন-শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কুসায়্যি ইবন কিলাব খুবই সর্বমান্য ও জনপ্রিয় সর্দার ছিলেন। বায়তুল্লাহর দেখাশোনা ও দ্বাররক্ষা ছিল তাঁর যিম্মার অন্তর্গত। এর চাবি ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ এতে প্রবেশ করতে পারত না। এরই সাথে হাজীদের যমযমের পানি পান করানো (সিকায়া) ও বার্ষিক ভোজ (রিফাদা[২]), নদওয়া অর্থাৎ পরামর্শ সভা যা বিভিন্ন পরামর্শ, যুদ্ধের ময়দানে পতাকাবাহী, সেনাপতি নির্বাচন প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন মাফিক অনুষ্ঠিত হতো, সব কিছুই তাঁর এখতিয়ারাধীন ছিল আর এভাবে মক্কার সমগ্র আভিজাত্য ও সর্বপ্রকার মর্যাদা তারা লাভ করেছিল।

তাঁর বংশধরদের মধ্যে আবদ মানাফ সর্বাধিক সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন হাশিম। হাজীদের পানি পান করানো ও বার্ষিক ভোজ প্রদানের দায়িত্ব ছিল তাঁর যিম্মায়। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব-এর পিতা। হাজীদের পানি পান ও বার্ষিক ভোজ প্রদানের মহাদায়িত্ব স্বীয় চাচা আল-মুত্তালিব ইবন আবদ মানাফ থেকে লাভ করেন। তিনি তাঁর গোত্রে যে সম্মান, সুনাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তা তখন পর্যন্ত তাঁর পিতৃ-পিতামহের মধ্যে আর কেউ পাননি।[৩]

---

১. বিস্তারিত দ্র. সীরাতে ইবনে হিশাম ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থ।

২. রিফাদা সেই খাবার ও দাওয়াতকে বলা হয় যা হাজীদের জন্য প্রতি বছর এই হিসাবে করা হতো যে, তারা আল্লাহর মেহমান।

৩. সীরাতুন্নাবাবিয়্যা, ইবন হিশামকৃত, ১ম খ.,।

বনী হাশিম

বনী হাশিম ছিল কুরায়শ গোত্রের সোনালী ও গুরুত্বপূর্ণ অলংকারতুল্য। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ এঁদের যেসব ঘটনা ও অবস্থা আমাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে (যা প্রকৃত অবস্থা থেকে খুবই কম) যদি আমরা তা আলোচনা করি তাহলে আমরা পরিমাপ করতে সক্ষম হব, তাঁদের ভদ্রোচিত মানবিক অনুভূতির কতটা প্রকাশ ঘটেছিল এবং প্রতিটি বিষয়ে ভারসাম্য, সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি, আল্লাহর চোখে বায়তুল্লাহর যে মর্যাদা ও সম্মান– এর পূর্ণ অনুভূতি, জুলুম ও মানুষের অধিকার হরণ থেকে বিরত থাকা, উন্নত মনোবল, দুর্বল ও মজলুম মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি, দানশীলতা ও বীরত্ব, মোটকথা আরবদের নিকট অশ্বারোহণের যতগুলো মহৎ ও প্রশংসনীয় গুণ রয়েছে এবং এতে যতটা সমুন্নত ও সূক্ষ্ম অর্থ লুকিয়ে রয়েছে তার ঝলক তাঁদের জীবনচরিতে আমরা দেখতে পাই। এ সেই জীবনচরিত ও কর্মকৌশল যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের জন্য সব দিক দিয়েই উপযোগী এবং তিনি যেই মহান ও উন্নত চরিত্রের আপন কথা ও কর্মের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন তার সঙ্গে অভিন্ন। কেবল এতটুকু পার্থক্য ছিল যে, তাঁরা ওয়াহয়িবিচ্ছিন্ন যুগে ছিলেন এবং জাহিলিয়াতের আকীদা-বিশ্বাস ও উপাসনাগুলোতে আপন গোত্রের সঙ্গে মোটামুটি শরীক ছিলেন।

মক্কায় মূর্তি পূজা এবং এর মূল উৎস ও ইতিহাস

কুরায়শ গোত্র হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও তাঁদের সর্বোচ্চ পিতামহ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দীনের ওপর আগাগোড়া প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাওহীদ ও এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ ছিল। এভাবে এলো আমর ইবন লুহায়্যি আল-খুযাঈর আমল। সেই ছিল প্রথম ব্যক্তি যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দীনে পরিবর্তন সাধন করে, মূর্তি স্থাপন করে, পশুর প্রতি সম্মান ও একে সাইবা[১] বানানোর প্রথা কায়েম করে এবং হালাল-হারামের নতুন নিয়ম তৈরি করে, ঐশী বিধানের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না এবং যা ছিল ইবরাহীমী শরীয়ত থেকে একেবারে পৃথক। এটা সৃষ্টি হয় এভাবে যে, এই ব্যক্তি মক্কা থেকে সিরিয়ায় যায় এবং দেখতে পায়, সেখানকার লোকেরা মূর্তি পূজা করে। এটি তার খুব পছন্দ হয়। অতঃপর সেখান থেকে কিছু মূর্তি সংগ্রহ করে এনে মক্কায় স্থাপন করে। সে লোকদেরকে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও পূজা করবার নির্দেশ দেয়।[২]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম ১ম খ., ৭৬-৭৭ পৃ.। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি আমের ইবন আমের আল-খুযাঈকে দেখেছি, সে জাহান্নামে তার নাড়ীভুঁড়ি টেনে-হিঁচড়ে চলছে। সে ছিল প্রথম ব্যক্তি যে জানোয়ারগুলোকে মূর্তির নামে ষাঁড় বানিয়ে ছেড়ে দেবার ভিত্তি স্থাপন করে (বুখারী, মুসলিম, আহমদ)। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, সে ছিল ১ম ব্যক্তি যে দীন-ই ইসমাঈলকে পরিবর্তন করে, মূর্তি স্থাপন করে এবং পশুকে সাইবা করার প্রচলন ঘটায়।

২. সাইবা পরিত্যক্ত ও দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ষাঁড়কে বলা হতো।

এও সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়, সে সিরিয়ায় যেতে 'বাতরা' হয়ে অতিক্রম করে যাকে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ বাতরা ও বাতরাহ (Patra) বলে এসেছেন। এটি পূর্ব জর্দানের দক্ষিণে অবস্থিত বিখ্যাত পাহাড়ী কসবা যার উল্লেখ রোমক ও গ্রীকদের এখানে দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একে নাবাতীয়রা, যারা ছিল মূলত আরব, হাজার বছর আগে নির্মাণ করেছিল। বরাবর এরা মিসর, সিরিয়া, ফোরাত উপত্যকা ও রোম সফর করত এবং হতে পারে, ফোরাত উপত্যকায় পৌঁছাতে গিয়ে তারা অবশ্যই হেজায অতিক্রম করে থাকবে। এরা প্রকাশ্য মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। পাথর কেটে তারা মূর্তি তৈরি করত এবং তার পূজা করত। ঐতিহাসিকদের ধারণা, উত্তর হেজাযের বিখ্যাত মূর্তি 'লাত' যাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূর্তিই মনে করা হতো, তা প্রকৃতপক্ষে 'বাতরা' থেকেই আমদানী করা হয়েছিল এবং বিশিষ্ট মূর্তিগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছিল।[১]

ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টির বিখ্যাত গ্রন্থ History of Syria-তেও এর সমর্থন মেলে। এতে ঐসব নাবাতীয় এলাকার (বর্তমান পূর্ব জর্দান) ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য হলো :

"ঐসব উপাস্য দেবদেবীর সর্দার ছিল যু'শ-শারা যা ছিল একটি সমান্তরাল স্তম্ভ কিংবা কৃষ্ণ চতুর্ভুজ পাথরের মত। লাত, আরবরা যার পূজা করত, প্রকৃতপক্ষে যি'শ-শারার সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল। অপর নাবাতী মূর্তি, যার উল্লেখ ঐসব ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রাচীন নাবাতীয় লিপি ও চিত্রে পাওয়া যায় তা 'মানাত' ও 'উয্যা'। ঐ সব লিপিতে 'হুবল' দেবতার উল্লেখও পাওয়া যায়।"[২]

মনে রাখতে হবে, এটা সেই যুগ যে যুগে মূর্তি পূজার বিভিন্ন ধরন আরব উপদ্বীপের চারদিকে জলে-স্থলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হযরত ঈসা মসীহ (আ) ও তাঁর হাওয়ারীদের দাওয়াত তখনও প্রকাশ পায়নি যিনি মূর্তি পূজার এই প্রসার থামিয়ে দেন। তিনি এর দ্রুত গতি ও তৎপরতা হ্রাস করেন। থাকল ইয়াহূদী ধর্ম। ইয়াহূদী ধর্ম সীমিত ও বংশীয় ধর্ম ছিল যে ধর্ম কেবল বনী ইসরাঈলের মধ্যে সীমিত ছিল এবং বনী ইসরাঈল ছাড়া আর কাউকে তওহীদ তথা একত্ববাদের দাওয়াত দেবার অনুমতি এতে ছিল না। Dacy O leary তার Arabia before Muhammad নামক গ্রন্থে বলেন :

"একথা বলা কিছুমাত্র ভুল হবে না, মূর্তির উপাসনা প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ার ধর্ম যা আরব উপদ্বীপ সিরীয় ও গ্রীকদের মিলিত ও মিশ্রিত ঐতিহ্য থেকে পেয়েছে। এটা

---

১. লেখক ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে এই জায়গাটি স্বয়ং দেখেছেন এবং পাহাড়ে পাথরের মূর্তি পূজার ব্যাপারটি বিশেষভাবে নোট করেন। বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. গ্রন্থকারের লিখিত ভ্রমণ কাহিনী 'দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়া-ই য়ারমুক তক' (কাবুল থেকে আম্মান)।

২. P.K. Hitti, History of Syria (London 1951), P. 382-83.

সিরিয়ায় সাধারণ ব্যাপার ছিল এবং সম্ভবত আরবের অবশিষ্ট অংশে এর বেশি রেওয়াজ বা প্রচলন ছিল না।"[১]

ঠিক তেমনি ফোরাত উপত্যকা ও আরব উপদ্বীপের পূর্ব দিকে মূর্তি পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং যেহেতু এই এলাকার সঙ্গে আরব উপদ্বীপের বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সেহেতু কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, আরব উপদ্বীপে মূর্তি পূজার বিস্তার লাভে এই এলাকারও একটা হিস্যা রয়েছে। Georges Roux তার Ancient Iraq নামক গ্রন্থে এ কথা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ইরাকের প্রাচীন ঐতিহাসিক লিপিসমূহ এটা প্রকাশ করছে, মূর্তি পূজা সেখানে খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী এবং এর পর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই দেশ ঐসব মূর্তি ও উপাস্য দেবদেবীর কেন্দ্র ছিল। এখানে বিদেশী মূর্তি যেমন ছিল, তেমনি স্থানীয় মূর্তিও ছিল।[২]

একটি বর্ণনাতে এও পাওয়া যায়, কুরায়শদের মধ্যে মূর্তি পূজার সূচনা ক্রমান্বয়ে হয়েছে। এর একটি ব্যাখ্যা আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকেও পাওয়া যেতে পারে, প্রথমে ঐসব লোক যখন মক্কা থেকে কোথাও সফর করত তখন হারাম শরীফের কিছু পাথর 'তাবাররুক' হিসাবে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যেত। এরপর যে পাথর তাদের বেশি পছন্দ হতো তার ইবাদত করতে থাকত। তাদের সন্তান-সন্ততি ও নতুন বংশধর এর বিবরণ সম্পর্কেও ছিল অজ্ঞ। তারা প্রকাশ্যে মূর্তি পূজা গ্রহণ করে এবং এভাবে অপরাপর পথভ্রষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মত এরাও গোমরাহীর অতলে তলিয়ে যায়। ইবরাহীমী যুগের কিছু অবশিষ্ট আমল ও বিবরণকে তারা নিজেদের বুকে সযত্নে তুলে রাখে। যেমন বায়তুল্লাহর তাজীম, তাওয়াফ, হজ্জ ও ওমরাহ।[৩]

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের ঐতিহাসিক উপায়-উপকরণ থেকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা ভূমিকা থেকে পরিণতি পর্যন্ত তাদের ক্রমিক পর্যালোচনা থেকে ঐসব ঐতিহাসিকের এ কথার সমর্থন মেলে, আরবদের মধ্যে, বিশেষ করে কুরায়শদের ভেতর মূর্তি পূজার সূচনা কিভাবে হয়েছিল। অপরাপর কতক মুসলিম জাতিগোষ্ঠী ও ফের্কার মধ্যে ছবি, প্রতিকৃতি ও মাযারের সঙ্গে সম্পর্ক, পবিত্রতা ও শ্রদ্ধা দেখানোর ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি দেখা যায় সে সব ইতিহাস থেকেও এর সত্যতার সমর্থন মেলে, এজন্যই ইসলামী শরীয়ত সেই সমস্ত রাস্তা ও চোরা পথ প্রথমেই

---

১. Arabia before Muhammad (London 1927), P. 196-97.

২. Ancient Iraq (1972). P 283-84.

৩. এসবের বিস্তৃত বিবরণ, এই সব মূর্তির নাম, সে সবের স্থান, অতঃপর এই সিলসিলার ঘটনাসমূহ, মূর্তি নির্মাণের পেছনের মৌলিক কারণ বোঝার জন্য আল-কালবীর 'কিতাবুল-আসনাম' ও আল্লামা সায়্যিদ মাহমূদ শুকরী আল-আলুসীকৃত 'বুলগুল-আরাব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল-আরাব, ২য় খ., দ্র., পৃ.-২০০।

বন্ধ করে দিয়েছে যা শির্ক অথবা ব্যক্তি, স্থান, স্মৃতিচিহ্নের পবিত্রতা জ্ঞান ও সম্মান করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যায়।[১]

আসহাবুল ফীল-এর ঘটনা

ঐ যুগেই এমন একটি বিপর্যয়কর ঘটনা সংঘটিত হয় যার চেয়ে বড় কোন ঘটনা আরবদের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। এ কথার প্রমাণ, বড় কোন ব্যাপার নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং আল্লাহ তা'আলা আরবদের সঙ্গে কোন কল্যাণকর বিষয়ে সদিচ্ছা করেন এবং কাবার শান ও মর্যাদা এভাবে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠবে যেই শান ও মর্যাদা পৃথিবীর আর কোন ইবাদতগাহের, আর কোন উপাসনাগৃহের হবে না। এরই সাথে এই ঘরের সঙ্গে ধর্মের ইতিহাস ও মানবতার ভবিষ্যতের সেই চিরন্তন পয়গাম, শাশ্বত কর্ম বিজড়িত যা তাকে আনজাম দিতে হবে এবং পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।

আল্লাহর নজরে বায়তুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে কুরায়শদের আকীদা

কুরায়রা এই আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করত, আল্লাহর দৃষ্টিতে এই ঘরের একটি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে এবং তিনিই এই ঘরের সহায়ক, রক্ষক ও

---

১. ইসলামী শরীয়ত ও সহীহ হাদীসসমূহে এর দলীল-প্রমাণ এত বিরাট সংখ্যায় আছে যে, তার গণনা করাও দুঃসাধ্য। এসবের মধ্যকার একটি মশহূর হাদীস হলো : لا تتخذوا قبرى عيدا "আমার কবরকে তোমরা ঈদ ও উৎসবের জায়গায় পরিণত করবে না।" অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, لاتشد الرحال الالى ثلاثة مساجد "কেবল তিনটি মসিজদ যিয়ারতের নিয়তে নিয়মিত সফর করা যায়েজ।" অপর হাদীস হলো, لاتطرونى كما اطرت النصارى المسيح بن مريم "আমার সীমাতিরিক্ত প্রশংসা কর না যেমনটি খৃস্টানরা মসীহ ইবন মারয়ম-এর বেলায় করেছে।" এভাবে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জীবিত প্রাণীর ছবি অংকন হারাম করার পেছনেও একই রহস্য ও হিকমত লুকিয়ে আছে। প্রাচীনকালে বহু জাতিগোষ্ঠী তাদের বুযূর্গদের ছবির ভালবাসা ও সম্মানে প্রতিকৃতি তৈরি এবং শেষ পর্যন্ত মূর্তি নির্মাণ ও তা থেকে মূর্তি পূজায় গিয়ে পৌঁছেছে। ইবন কাছীর নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন:

وقالوا لاتذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولاسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

"আর তারা বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ কর না তোমাদের দেবদেবীকে, পরিত্যাগ কর না ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, য়ুগুছ, য়াউক ও নাসরকে।" [সূরা নূহ ঃ ২৩ আয়াত]।

মুহাম্মদ ইবন কায়স বর্ণনা করেন, আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে সেই সব বুযূর্গ ও নেককার লোক ছিলেন যাঁদের অনুসারী ও ভক্তদের একটা বিশেষ সংখ্যা ছিল। যখন তাদের ইনতিকাল হলো তখন তাদের মুরীদ ও অনুসারীরা ভাবল, যদি আমরা তাদের কোন প্রতিকৃতি ও ছবি বানাই তবে এ দ্বারা তাদের স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠবে এবং ইবাদত-বন্দেগীতে বেশি স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ ঘটবে। এই ধারণায় তারা তাদের ছবি বানায়। যখন এই জেনারেশন খতম হলো এবং নতুন জেনারেশন এল তখন শয়তান তাদের এটা শেখাল, তাদের পিতা ও পিতামহ প্রকৃতপক্ষে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতির পূজা করত এবং তাদের বরকতেই বৃষ্টি হতো। ক্রমান্বয়ে তারা এসবের নিয়মিত পূজা করতে শুরু করে এবং প্রকাশ্য মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটে।

সাহায্যকারী। তাদের এই আকীদা-বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামহ কুরায়শ সর্দার আবদুল মুত্তালিব ও হাবশা (আবিসিনিয়া)-এর বাদশাহ আবরাহার কথোপকথন থেকে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। আব্দুল মুত্তালিবের দু'শ' উট আবরাহার লোকেরা ধরে নিয়ে যায়। এজন্য তিনি আবরাহার সাথে দেখা করতে যান এবং ভেতরে আসার অনুমতি চান। আবরাহা তাঁকে খুবই সম্মান করে, সিংহাসন থেকে নেমে আসে এবং পাশে বসিয়ে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, আমার দু'শ' উট বাদশাহর লোকেরা ধরে নিয়ে এসেছে। আমি সেগুলো ফিরিয়ে নিতে চাই। বাদশাহ আবদুল মুত্তালিবকে এই সামান্য ও ব্যক্তিগত দাবি পেশ করায় অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, তুমি দু'শ' উটের কথা বলতে এসেছ যা আমার লোকেরা নিয়ে এসেছে, অথচ সেই ঘরের কথা ভাবছ না যার ওপর তোমাদের ও তোমাদের পিতামহের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত এবং যে ঘর ধ্বসিয়ে দেবার জন্য আমার আগমন। এর জন্য তুমি কিছু বলছ না?

আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর জওয়াব দেন এবং বলেন, আমি উটের মালিক, সেজন্য আমি আমার মালিকানাধীন বিষয়ের ভাবনা ভাবছি। কাবা ঘরের মালিক যিনি তিনিই তাঁর ঘরের ভাবনা ভাবছেন এবং তিনিই এর হেফাজত করবেন।

বাদশাহ বলল, ঐ ঘর আমার হাত থেকে কি করে বাঁচতে পারে? তিনি উত্তর দেন : انت وذاك। তা তুমি জান আর জানে ঘরের মালিক।[১] (ওটা আমার দেখার বিষয় নয়)।

এরপর যা কিছু ঘটেছে তার বিস্তৃত বিবরণ সামনে আসছে এবং এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, এখন আর কোন আক্রমণকারীর সাহস হবে না এর প্রতি কুনজরে দেখা এবং এর ওপর হাত বাড়াবার। তাঁর ঘর ও তাঁর দীনের হেফাজত আল্লাহ তা'আলার নিজের দায়িত্ব ছিল এবং এ কাজের পূর্ণতা দান তাঁরাই করা দরকার ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, আবরাহা আল-আশরাম আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী কর্তৃক নিযুক্ত সানআর গভর্নর ছিল। সে সানআয় একটি বিরাট গির্জা নির্মাণ করে এবং এর নাম রাখে আল-কুল্লায়স। উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ হজ্জের জন্যে আরবে না গিয়ে সানআয় আসবে। কেননা এটা তার জন্য খুবই মনোকষ্টের কারণ ছিল, কাবা আল্লাহর বান্দাদের আশ্রয়কেন্দ্র ও ফিরে আসার স্থান হিসাবে থাকুক এবং লোকে দূরে-দরাজ এলাকা থেকে কাফেলার পর কাফেলা এসে সেখানে হাজির হোক। সে চাইত, এ মর্যাদা তার নির্মিত গির্জা লাভ করুক।

---

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ৪৯-৫০।

আরবদের জন্য এ ব্যাপারটি ছিল খুবই মর্মপীড়ার কারণ। কেননা কাবার প্রতি ভালবাসা ছিল তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত এবং এ ভালবাসা তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। তারা কোন ঘর, উপাসনালয় ও ধর্মীয় কেন্দ্রকেই এর সমকক্ষ মনে করত না এবং একে ছেড়ে কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সম্পদ গ্রহণ করতেও তারা রাজি ছিল না। এই ব্যাপারটা তাদের মন-মস্তিষ্ককে দারুণভাবে নাড়া দিল এবং সর্বত্র এর গুঞ্জরণ শুরু হলো। এরই মাঝে এক কানানী যুবক এ ব্যাপারে একটা কিছু করার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। উক্ত গির্জায় গিয়ে পায়খানা করল এবং একে অপবিত্র করে দিল। ফলে সঙ্কট এক নতুন মোড় নিল। আবরাহা এতে দারুণভাবে রেগে গেল এবং তক্ষুণি কসম খেল, সে স্বয়ং কাবার ওপর হামলা করবে এবং একে মাটির সাথে না মিশিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে না।[১]

আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে চলল এবং বিরাট সংখ্যক হাতী সঙ্গে নিল। আরবরা হাতী সম্পর্কে আগেভাগেই অনেক কিছু শুনেছিল। এ সংবাদ তাদের নিকট বজ্রপাতের মতই মনে হলো। তারা এই আক্রমণের সংবাদে ভীষণভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হলো। তারা চেষ্টা করল যাতে এই বাহিনীকে সামনে এগোবার পথে বাধা দেয়া যায়। কিন্তু খুব শিগগিরই তারা বুঝতে পারল, আবরাহার সৈন্যবাহিনীকে মুকাবিলা করা তাদের সাধ্যের বাইরে। অতএব, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে গোটা বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করল। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এই ঘরের যিনি মালিক তিনি স্বয়ং একে রক্ষা করবেন।

কুরায়শরা সেনাবাহিনীর আক্রমণ ও জুলুম-নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পাহাড় ও উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং অপেক্ষা করতে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘরের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষায় কী করেন! আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সঙ্গী কুরায়শদের কিছু লোক কাবার দরজার শেকল ধরে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি শুরু করে দেন এবং আবরাহা ও তার বাহিনীর পরাজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আ করেন। এদিকে আবরাহা তার বাহিনীসহ কাবার দিকে এগিয়ে যায়। 'মাহমুদ'

---

১. হতে পারে, আবরাহার হামলা ও সেনাভিযানের কারণ কেবল একটি উপাসনাগৃহের অসম্মান ও অবমাননার চেয়ে বেশি ব্যাপক ও গুরুত্ববহ ছিল। সে মক্কা জয় করতে চাচ্ছিল যাতে সিরিয়ার সঙ্গে য়ামানের সম্পর্ক কায়েম হয় এবং খৃস্টান সাম্রাজ্যের ভিত্তি জাযীরাতুল-আরবে দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়ে যায়। এই পদক্ষেপ ছিল রোম ও আবিসিনিয়ার পক্ষে। কেননা এরা উভয়েই ছিল খৃস্ট ধর্মের অনুসারী। এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, তা এর পেছনে কারণ যা-ই হোক, এই ঘর ও কেন্দ্রকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া এবং মক্কাকে তার আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব থেকে বেদখল করা ছাড়া সম্ভব ছিল না। এর পেছনে তকদীরের ফয়সালা ছিল, একে (কাবাকে) সমগ্র মানবতার জন্য হেদায়েতের উৎস, নিরাপদ আশ্রয় ও শেষ নবুওয়তের কেন্দ্র হতে হবে। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল আরও কিছু। এরও আশংকা ছিল, রোমকরাই আবরাহাকে মক্কা বিজয়ের উস্কানি দিয়েছিল এবং এর পেছনে কতকগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনেরও প্রেরণা ছিল, যেমন ইরানী প্রভাবকে দুর্বল করা। কেননা আরব উপদ্বীপে রোমকদের প্রভাব-প্রতিপত্তির মুকাবিলা এককভাবে ইরানীরাই করছিল।

নামক হাতীকে সে হামলার জন্য তৈরি করে। কিন্তু মক্কার পথে হাতী এক জায়গায় বসে পড়ে। কয়েকবার মারপিট সত্ত্বেও সে উঠতে অস্বীকার করে। কিন্তু য়ামানের দিকে দেখাতে চাইলে সে তক্ষুণি উঠে দ্রুত বেগে সামনে এগোয়। সেই সময় আল্লাহ্ তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। পাখিগুলোর পাঞ্জায় ছিল ছোট ছোট নুড়ি পাথর। পাখির ঝাঁক আবরাহার বাহিনীর ওপর নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। এ সব পাথর যার গায়ে লাগল সেই লাশে পরিণত হলো। এসব দেখে আবিসিনিয়ার লোকেরা যে দিক দিয়ে এসেছিল প্রাণভয়ে সেদিকেই দৌড়ে পালাতে লাগল। পাখিগুলো অবিরত পাথর নিক্ষেপ করছিল আর বাহিনীর লোকেরা লাশে পরিণত হচ্ছিল। আবরাহা নিক্ষিপ্ত পাথরে ঝাঝরা হয়ে যায়। তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়। তার শরীরের এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ে। অবশেষে সান'আয় পৌঁছে তার করুণ মৃত্যু ঘটে।[1] এই ঘটনার কুরআন করীমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

"তুমি কি দেখ নি তোমার প্রতিপালক হাতীওয়ালাদের সঙ্গে কী করেছিলেন? তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তিনি ওদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন, যারা ওদের ওপর প্রস্তর-কাঁকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি ওদেরকে ভক্ষিত ঘাসের ন্যায় করেন।"

ফীল (হাতী)-এর ঘটনা ও তার প্রভাব

আল্লাহ্ তা'আলা যখন আবিসিনিয়ার লোকদেরকে মক্কা থেকে ব্যর্থ ও বিফল করে ফিরিয়ে দিলেন এবং তাদের ওপর এই আযাব অবতীর্ণ হলো তখন আরবদের হৃদয়ে স্বভাবতই কুরায়শদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধের সৃষ্টি হলো। তারা বলতে লাগল, নিশ্চিতই এরা আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ। তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্ পাক তাদের দুশমনকে পরাভূত ও বিধ্বস্ত করেছেন, এমন কি তাদের লড়তে পর্যন্ত হয়নি। তাদের দিলে কাবার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য আগের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র নিকট কুরায়শদের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস বেড়ে যায়।[2]

---

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ৪৩-৫৭।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ৫৭ পৃ.।

এ ছিল আল্লাহর এক প্রকাশ্য নিদর্শন এবং এ কথার ভূমিকা, সত্বর মক্কায় এমন একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে যিনি কাবাকে মূর্তির আবর্জনা ও জঞ্জাল থেকে মুক্ত করবেন, পবিত্র করবেন। তাঁর হাতে এর শান দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাঁর প্রচারিত দীনের এই ঘরের সঙ্গে খুব গভীর, স্থায়ী ও চিরন্তন সম্পর্ক কায়েম হবে। এই ঘটনা থেকে এও পরিমাপ করা যাচ্ছিল, ঐ নবীর আবির্ভাবের পবিত্র দিন খুব বেশি দূরে নয়।

আরবদের মাঝে নিশ্চিতভাবেই এই ঘটনার গভীর প্রভাব পড়ে। এর থেকে তারা নতুন তারিখ গণনা শুরু করে। অতঃপর তাদের লেখায় এ ধরনের রেওয়াজ দেখা যায়, এই ব্যাপারটা আমুল-ফীল অর্থাৎ হাতীর বছরে দেখা গিয়েছিল, অমুক আমুল-ফীলে জন্ম নেয়, এই ঘটনা আমূল-ফীলের এত বছর পরের। আমূল-ফীল ছিল খ্রিস্টীয় ৫৭০ সাল।

মক্কা : রসূল আকরাম ﷺ-এর আবির্ভাবের সময়

মক্কা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর

অনেক লোক যারা হুযূর আকরাম ﷺ-এর আবির্ভাবকালীন অবস্থা সম্পর্কে খুব ভাল রকম ওয়াকিবহাল নন, আরবদের ইতিহাস, সামাজিক জীবন, তাদের কাব্য, সাহিত্য ও তাদের গোত্রীয় প্রথাসমূহের ব্যাপারে যাঁদের খুব বেশি গভীর দৃষ্টি নেই তাঁরা মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের সময় মক্কা একটি ছোট্ট গাঁও-গেরামের মতই ছিল, জীবন যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই শৈশব অবস্থায় ছিল। তা ছিল কতকগুলো গোত্রের কতিপয় জনবসতির নাম যেখানে পশমের তৈরী তাঁবু ও ডেরার (যার চারদিকে উট, ভেড়া, বকরী ও ঘোড়া বাঁধার জায়গা ছিল) ভেতরে তারা জীবন যাপন করত। তারা বেশির ভাগ উপত্যকার ধারে ও পাহাড়-পর্বতের কোলে বা পাদদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। তাদের খাবার ছিল শুকনো রুটি কিংবা উটের গোশত যা তারা ঠিকমত রান্না করতেও জানত না। উটের পশমের কাপড় পরত। তাদের পানাহারের মধ্যে কোন প্রকার নতুনত্ব ছিল না, যেমন ছিল না পোশাকে কোন রকম চাকচিক্য, জীবনে ছিল না উষ্ণতা ও উত্তাপ, অনুভূতিতে ছিল না সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও কমনীয়তা, না চিন্তা-চেতনায় উন্নত মানের চর্চা।

মক্কার এই যে অন্ধকার ও নিকৃষ্ট চিত্র যা সীরাত ও ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় এবং এর বেশির ভাগই অনারব ভাষাগুলোতে বর্ণিত, তা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তকে, সাহিত্যে ও জাহেলী যুগের নানা কবিতায় পাওয়া যায়। সে সবের মধ্যে মক্কা ও মক্কার অধিবাসীদের আচার-অভ্যাস, প্রথা-পদ্ধতি, সংবিধান ও আইন-কানুনের (যা প্রাথমিক গ্রাম্য বেদুঈন জীবন যাপন থেকে প্রাথমিক নাগরিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশ করেছিল) খসড়া পেশ করা হয়েছে।

এই চিত্র কুরআন মজীদের সেসব বৈশিষ্ট্য ও নামের সঙ্গেও কোন সাযুজ্য রাখে না যেখানে মক্কাকে 'উম্মুল-কুরা' নামে স্মরণ করা হয়েছে।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

"আর এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা ও তার চারপাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে আর একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা শূরাঃ ৭ আয়াত]

অন্য জায়গায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ .

"শপথ তীন ও যায়তূনের, শপথ সিনাঈ পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর।" [সূরা তীন ঃ ১-৩ আয়াত]

এক স্থানে বলা হয়েছে :

لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ.

"শপথ করছি এই নগরীর আর তুমি এই নগরের অধিবাসী।"

[সূরা বালাদ : ১-২]

আসলে মক্কা খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগেই অন্ধকার ও মূর্খতার যুগ থেকে সভ্যতার যুগে প্রবেশ করছিল, যদিও এ সভ্যতা আপন সীমিত বৃত্তের মধ্যেই ছিল। এই শহর এমন এক ব্যবস্থাপনার অধীন ছিল যা পরস্পরের সহযোগিতা ও ঐক্য, সাধারণ ও সামষ্টিক সমঝোতা ও শ্রেণী বিভাগের ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল। আর এটা হয়েছিল কুসায়্যি ইবন কিলাবের হাতে যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ।

প্রথম দিকে মক্কার জনবসতি ছিল স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সীমিত। এই স্থানটি ছিল 'জাবাল আবু কুবায়স' (যা ছিল সাফা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত) ও 'জাবাল আহমার'-এর মাঝে। জাহেলী যুগে একে 'আরাফ' বলা হতো যা ছিল "কু'আয়কি'আন" উপত্যকার একেবারে সামনে। কিন্তু বায়তুল্লাহর বদৌলতে এর খাদেম, রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ও অধিবাসীদের সাধারণভাবে যে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তদুপরি সেখানে যে অসাধারণ শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল তজ্জন্য ঐ সব গোত্রের জন্য মক্কায় খুবই আকর্ষণ ছিল। অতঃপর কালের প্রবাহে এর জনসংখ্যা আপন গতিতেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ও ক্ষুদ্র ডেরার স্থলে প্রস্তর ও গুহায় ঘরবাড়ি তৈরি হয় এবং জনবসতির এই চলতি ধারা মসজিদুল-হারাম থেকে মক্কার উচ্চ ও নিম্নভূমি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। প্রথম দিকে এইসব লোক নিজেদের বাড়িঘরের ছাদও বায়তুল্লাহর মত চতুর্ভুজের মত বানাত না। তারা অনুভব করত, এটা এক ধরনের বেআদাবী। অবশ্য ক্রমে ক্রমে এই সম্ভ্রমবোধ আর অবশিষ্ট থাকেনি এবং এক্ষেত্রে নানা রকমের অবকাশ সৃষ্টি করা হতে থাকে।

তথাপি তখন ঘরবাড়ি তৈরির সময় কাবার প্রতি সম্ভ্রমবোধবশত এতটুকু অবশ্যই লক্ষ্য রাখা হতো যাতে ঘরবাড়ি কাবা থেকে উঁচু না হয়।

কতক বর্ণনাকারীর বর্ণনা হলো, মক্কার লোকেরা কাবার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবশত নিজেদের বাড়িঘর গোলাকৃতি বানাত। প্রথম যে ব্যক্তি চতুর্ভুজ আকারে বাড়ি বানায় তার নাম হামীদ ইবন যুহায়র। তার এই কাজ কুরায়শরা পছন্দ করেনি।

মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ও নেতৃবর্গের বাড়িঘর হতো পাথরের তৈরী। এতে কয়েকটি কামরা থাকত এবং সামনাসামিন দু'টো দরজা থাকত যাতে ঘরের একদিকে মেহমান উপস্থিত হলে মহিলারা দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

মক্কার নতুন নির্মাণ ও এর মূল প্রতিষ্ঠাতা

মক্কার এই সিমানা বিস্তারে উন্নতি-অগ্রগতি ও নতুন নির্মাণের ভেতর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কুসায়্যি ইবন কিলাবের। আর তা এজন্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম কুরায়শদেরকে এ উদ্দেশে একতাবদ্ধ করেন এবং বসবাসের জন্য বিভিন্ন জায়গার যথারীতি সীমানা নির্ধারণ করেন। আরবী পরিভাষায় একে রিবা (رباع) বলা হয়।[১] কুরায়শদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বংশকে দিয়ে এসব বাড়িঘরে আবাদ করান। তার বংশধরগণ মক্কার জমিজমার বণ্টন ও সীমানা নির্ধারণের কাজ অব্যাহত রাখে, নিজেরাও বসতি স্থাপন করে এবং জমিজমা অন্যদের নিকট বিক্রি করে। বেচাকেনা ও নির্মাণের এই ধারা কোনরূপ মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ ছাড়াই কুরায়শ ও অপরাপর শাখা-প্রশাখার মধ্যে চলতে থাকে।

জীবন সংগঠন ও পদের বণ্টন

কুসায়্যি স্বীয় জাতিগোষ্ঠী ও মক্কাবাসী উভয়ের ওপর প্রভাবশালী ছিলেন, হিজাবা (বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ), সিকায়া[২] (হাজী ও মুসাফিরদের পানির ব্যবস্থা), রিফাদা (আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হাজীদের বার্ষিক ভোজ প্রদান), নদওয়া (পরামর্শ সভা) ও লিওয়া (যুদ্ধের পতাকা প্রদান তথা সামরিক বিষয়াদি) সব কিছু তাঁরই হাতে ন্যস্ত ছিল।

তিনি দারুন-নদওয়া একেবারে মসজিদুল হারামের কাছেই নির্মাণ করেন এবং এর দরজা রাখেন কাবার দিকে। এটা কুসায়্যি ইবন কিলাবের বাসগৃহও ছিল। কুরায়শদের পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও মক্কার সামাজিক কেন্দ্র ছিল এ ঘর। কুরায়শদের কোন লোক, সে পুরুষ হোক বা নারী, বিয়ে করতে চাইলে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ও

---

১. আবুল-ওয়ালীদ আল-আযরাকী (মু. ২২৩ হি.) তার 'আখবারে মক্কা' নামক গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রিবা ঘরবাড়ি ও এর আশেপাশের অংশকে বলা হয় একবচন ربع।

২. হাজীদের জন্য পানির কিছু হাওয তৈরি করা হতো। এই পানিতে খেজুর ও কিশমিশ মিশিয়ে তা মিষ্টি করা হতো। হাজীগণ যখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে এই পানি পান করত।

তাৎক্ষণিক ব্যাপারে পরামর্শের প্রয়েজন হলে, কোন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে কিংবা এর প্রস্তুতির সময় আসলে, এমন কি কোন মেয়ে শিশু যখন বড় হতো তখন তাকে ওড়না পরানোর অনুষ্ঠান এখানেই সম্পন্ন করা হতো। কুসায়্যির ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবিতকালে ও তাঁর মৃত্যুর পরও যে ধর্মীয় যে মর্যাদা লাভ করেছিল তাতে তাঁর প্রদত্ত সনদ ছাড়া কোন কাজই হতে পারত না। আইন ছিল, দারুন-নদওয়ায় বনী কুসায়্যি ছাড়া অপরাপর গোত্রের কেবল তারাই আসতে পারত যার বা যাদের বয়স ৪০ বছরের কম নয়। অবশ্য বনী কুসায়্যি ও তাদের মিত্র গোত্রের সকল লোক, তা সে বড় হোক অথবা ছোট, এতে অংশ গ্রহণ করতে পারত। দারুন-নদওয়ায় আর যাদের গোত্র ও খান্দানের শরীক হওয়ার অনুমতি ছিল তারা ছিল হাশিম, উমায়্যা, মাখযূম, জুমাহ্, সাহ্ম, তায়ম, আদী, আসাদ, নাওফাল ও যুহরা –এই দশজন বিভিন্ন খান্দানের লোক ছিলেন।

এঁদের ইনতিকালের পর কতকগুলো পদের নতুন বণ্টন ঘটে। বনী হাশিমকে সিকায়া, বনী উমায়্যাকে কুরায়শদের পতাকা ইকাব, বনী নওফালকে রিফাদা[১] বনী আবদুদ্দারকে লিওয়া অর্থাৎ সামরিক বিষয়াদি, সুদানা ও হিজাবা এবং নবী আসাদকে পরামর্শের পদ দান করা হয়।

কুরায়শদের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যারা বিচক্ষণ, দূরদর্শী, বুদ্ধিজীবী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ বণ্টন করা হয়েছিল : (হযরত) আবূ বকর (সিদ্দীক) যিনি তায়ম গোত্রের ছিলেন, এঁর নিকট রক্তপণ, ক্ষতিপূরণ, জরিমানা প্রভৃতি, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ-এর নিকট ছিল কুব্বা ও আ'ইন্নান পদ। তিনি ছিলেন বনী মাখযুম গোত্রের। কুব্বা সেই তাঁবুকে বলা হয় যেখানে সামরিক প্রয়োজনের সাজ-সরঞ্জামাদি রাখা হয়। আইন্না বলা হয় সেই সব সামানকে যা যুদ্ধকালীন কুরায়শদের ঘোড়ার ওপর থাকত। দৌত্যগিরি ছিল (হযরত) ওমর ইবনুল খাত্তাব-এর নিকট। যখন কোন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য হতো তখন তাঁকে দূত হিসাবে প্রতিপক্ষের নিকট পাঠানো হতো। যখন অন্য কোন গোত্র এ বিষয়ে গর্ব করত তখন তার মুকাবিলার জন্য তাঁকে (ওমরকে) নির্বাচিত করা হতো এবং তাঁর মনোনয়নে সকলেই সম্মত থাকত। সাফওয়ান ইবন উমায়্যা (বনী জুমাহ)-এর দায়িত্বে ছিল 'আয়সার ও আযলাম'[২]-এর কাজ। কোন রকেমের বিরাট কোন পদক্ষেপ এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া নেয়া হতো না।

---

১. রিফাদা বলা হয় সেই ভোজকে যা হাজীদের জন্য যিয়াফত হিসাবে তৈরি করা হতো। এর ধরন ছিল এ রকম, কুরায়শ প্রতি বছর কিছু নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ এর ব্যয় নির্বাহের জন্যে কুসায়্যিকে দিত (আল-খিদরী, ৩৬ পৃ.)

২. আয়সার ও আযলাম বলা হয় জুয়ার দু'টো পাশাকে যখন কোন ব্যাপারে কোন একটি দিককে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য নিক্ষেপ করা হতো। পাশার এক পিঠে হ্যাঁ এবং অপর পিঠে না জাতীয় প্রতীক চিহ্ন লেখা থাকত।

বিবি আমেনা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের ওফাত

তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন মা আমেনা তাঁর দাদার মায়ের বংশধরকে দেখবার জন্যে তাঁকে ইয়াছরিব নিয়ে যান। তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামী আবদুল্লাহ ইবন আবদুল-মুত্তালিবের কবর যিয়ারতেও ইচ্ছুক ছিলেন।[১] মক্কায় ফেরার পথে আল-আবওয়া[২] নামক স্থানে বিবি আমেনার ইনতিকাল হয়। এখন একদিকে মাতৃবিয়োগের শোক, অপরদিকে সফরের নিঃসঙ্গতা ও একাকী হয়ে যাওয়া। জন্মের পর থেকেই আগাগোড়া তাঁর সঙ্গে এ ধরনেরই ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। এ ছিল তরবিয়তে ইলাহী তথা খোদায়ী প্রশিক্ষণের সেই গূঢ় রহস্য যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। উম্মে আয়মান বারাকা হাবশিয়া নামক একজন দাসী তাঁকে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং আল্লাহর এই আমানত দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সোপর্দ করেন। এরপর তিনি দাদার স্নেহ ছায়ায় থাকেন যিনি তাঁকে মণপ্রাণ দিয়ে চাইতেন, ভালবাসতেন এবং ক্ষণিকের তরেও তিনি তাঁর এই য়াতীম পৌত্র সম্পর্কে গাফিল হতেন না। কা'বা শরীফের ছায়ায় নিজের ফরাশের ওপর সাথে নিয়ে বসতেন এবং নানাভাবে স্নেহ ও ভালবাসার পরশ বুলিয়ে দিতেন।

তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন দাদা 'আবদুল-মুত্তালিব[৩] ইনতিকাল করেন। ফলে তাঁকে পুনরায় পিতা মারা যাওয়ার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। এটা আগের তুলনায় ছিল অনেক বেশি তিক্ত ও কঠিন। তিনি তাঁর পিতাকে কখনো দেখেন নি। পিতার স্নেহ ও ভালবাসার স্বাদও তিনি পান নি। এজন্য পিতার বিয়োগ ব্যথা স্বাভাবিকের বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু দাদার স্নেহ-যত্ন ও আদর-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং সে বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। আর এই দু'য়ের মধ্যকার পার্থক্য সকলেই বুঝতে পারেন।

চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে

দাদার ইনতিকালের পর তিনি চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তিনি ছিলেন পিতা আবদুল্লাহর সহোদর ভাই। 'আবদুল-মুত্তালিব তাঁকে তাঁর দেখাশোনা ও তাঁর সঙ্গে উত্তম আচরণের জন্যে বরাবর উপদেশ দিতেন। এজন্য তিনি একাগ্র চিত্তে তাঁর দিকে মনোযোগ দেন এবং আপন সন্তান 'আলী, জাফর ও আকীল (রা)-এর চেয়েও বেশি কোমল, স্নেহপরায়ণ, যত্ন-তদবীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাথে রাখেন।[৪]

---

১. রাসূলুল্লাহ (সা) এই সফরের কিছু কিছু ঘটনা বয়ান করতেন। হিজরতের পর তিনি বনী নাজ্জারের ঘরবাড়ি দেখে বলেন, আমার মা এখানেই নেমেছিলেন এবং বনী আদী ইবনু'ন-নাজ্জারের বাওয়ালীতে (সিঁড়িযুক্ত বড় কুয়া) আমি খুব লাফালাফি করেছিলাম (শারহ আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খ., ১৬৭-৬৮ পৃ.।

২. জায়গাটি মস্তুরার নিকটেই যা এখন মক্কা ও মদীনার মাঝখানে মশহুর মনজিল এবং অর্ধেক রাস্তায়।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৬৮-৬৯ পৃ.।

৪. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৭৯ পৃ.।

হরিছ ইবন কায়স-এর যিম্মায় ছিল আইন-শৃঙ্খলা, ব্যবস্থাপনা ও প্রতিমার নামে জমাকৃত মালামাল। এই সব যিম্মাদারী ও উচ্চ পদ তারা তাদের পিতা-পিতামহদের থেকে উত্তরাধিকার ও পারিবারিক সূত্রে লাভ করেছিল।

বাণিজ্যিক তৎপরতা ও আমদানি-রফতানি

কুরায়শরা বাণিজ্যিক উদ্দেশে দু'টো সফর করত। একটি সিরিয়ার দিকে গ্রীষ্ম মৌসুমে, আরকটি শীতকালে য়ামনের দিকে। পবিত্র মাসগুলো (রজব, যী-কা'দা, যুল-হিজ্জা ও মুহাররাম) তাদের নিকট সম্মানিত ও পবিত্র মাস হিসাবে গণ্য হতো এবং এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্জন করা হতো। এ সব মাসে তাদের বাজার বসত বায়তুল্লাহর পাশে হারাম শরীফের ভেতর এবং জাযীরাতুল আরবের দূরদরাজ এলাক থেকে লোকজন এতে অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ ভরে শরীক হতো। এসব বাজারের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী তারা পেত। মক্কার ইতিহাসে আমরা যেসব বাজারের সন্ধান পাই তা থেকে বোঝা যায়, সেখানকার বাসিন্দারা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রগতির কোন্ পর্যায়ে উন্নীত ছিল। ঐসব বাজারের মধ্যে একটি বাজার নির্দিষ্ট ছিল আতর বিক্রেতাদের জন্য, একটি নানা রকম ফলমূলের জন্য, একটি সবজির জন্য, একটি বাজার কেবল হাজ্জামদের জন্যে। এসব বাজার খুবই বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল যেখানে বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো বাইরে থেকে গম, ঘি, মধু ও বিভিন্ন রকমের দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসত। বিরাট পরিমাণে এগুলো মওজুদ থাকত। য়ামামা ছিল মক্কাবাসীদের জন্য খাদ্যশস্যের বাজার।[১] এসব বাজার ছাড়াও একটি বিশেষ গলি জুতার দোকানের জন্য এবং একটি কাপড়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

মক্কার বাসিন্দাদের কিছু কিছু চিত্ত বিনোদন কেন্দ্রও ছিল যেখানে গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা অপরাহ্ণে মক্কার ফুর্তিবাজ ও আমোদপ্রিয় সৌখিন যুবকরা সমবেত হতো। যারা বেশি ধনী ও আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত ছিল তারা শীতকাল মক্কায় কাটাত আর গ্রীষ্মকাল তায়েফে। মক্কার কিছু যুবকও উত্তম বসন-ভূষণ ও সৌন্দর্যের জন্য মশহুর ছিল। তাদের কারো কারো পোশাক কয়েক শত দিরাহামে তৈরি হতো।

বাণিজ্যিক তৎপরতা ও গতিবিধি মক্কায় ছিল তখন চরম বিকাশমান। সেখানকার বণিকরা আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করত এবং সেসব দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, উপহার-উপঢৌকন ও নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি কিংবা সেসব জিনিস

---

১. ছুমামা ইবন আছাল (যিনি বনী হানীফার একজন সর্দার ছিলেন) ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় গম নিয়ে যাবার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে কুরায়শদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে লিখিত দরখাস্ত পেশ করে, তিনি যেন ছুমামাকে খাদ্যশস্যের আমদানি-রফতানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেবার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের অনুরোধ রক্ষা করেন।

যেসবের তাদের দেশ মুখাপেক্ষী ছিল সেগুলো তারা সাথে নিয়ে আসত। আফ্রিকা থেকে যেসব জিনিস তারা আমদানি করত সে সবের মধ্যে গজদন্ত, স্বর্ণ, আবলুস কাঠ, য়ামান থেকে চামড়া, আগরবাতি ও লোবান, ইরাক থেকে গরম মশলা, ভারতবর্ষ থেকে স্বর্ণ, টিন, অলঙ্কারাদি, গজদন্ত, চন্দন কাঠ, যাফরান, মিসর ও সিরিয়া থেকে বিভিন্ন রকমের তৈল, খাদ্যশস্য, বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য, যুদ্ধাস্ত্র, রেশম ও নানা জাতের মদ ছিল এর তালিকায়।

তারা কোন কোন সুলতান ও আমীর-উমারাকে মক্কার উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী সওগাত হিসাবে প্রেরণ করত। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিশিষ্ট সামগ্রী হতো চামড়াজাত। অতঃপর কুরায়শরা যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর দরবারে আবদুল্লাহ ইবন রবীআ ও আমর ইবনুল-আস ইবন ওয়াইলকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠায় এবং যেসব মুসলমান সেখানে হিজরত করে গিয়েছিলেন তাঁদের ফেরত আনবার জন্য চেষ্টা করেছিল তখন তারা মক্কার খাস তোহফা হিসাবে তাঁকে (সম্রাটকে) চামড়াও দিয়েছিল।

মহিলারাও বণিজ্যিক কায়কারবার করত এবং সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে তাদের বাণিজ্য কাফেলা গমন করত। এ ব্যাপারে হযরত খাদীজা (রা) বিনতে খুওয়ায়লিদ ও আবু জাহলের মা হানজালিয়া সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ থেকে এর সত্যতা সমর্থিত হয় :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।" [সূরা নিসা : ৩২ আয়াত]

অর্থনৈতিক অবস্থা, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা

এসব কারণে মক্কা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছিল অনেক এগিয়ে। মক্কার বাসিন্দাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা ছিল খুবই সম্পন্ন ও প্রাচুর্যে ভরা এবং তাদের নিকট একটা বিশেষ পরিমাণের সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল। কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলায়, যা বদর যুদ্ধের আগেই সিরিয়া থেকে ফিরছিল, এক হাজার উট ছিল এবং এসব উটের পিঠে পঞ্চাশ হাজার দীনার মূল্যের মাল-সামানা চাপানো ছিল।

মক্কার লোকেরা রোমান, বায়যান্টাইন, ইরানী ও সাসানী মুদ্রা ব্যবহার করত। মক্কা ও জাযীরাতুল-আরবের তৎকালে দু'ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। একটি ছিল দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এবং অপরটি ছিল দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা)। দিরহাম ছিল দু'প্রকার। এক প্রকার ছিল যার ওপর পারস্যের ছবি ও মোহর ছিল। একে বলা হতো

"বাগলিয়া ও সওদা দামিয়া"। দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রা যার ওপর রোমের ছবি ছিল এবং একে বেশির ভাগ "তাবারিয়া" ও "বায়যান্টিয়া' বলা হতো। এসব ছিল রৌপ্য মুদ্রা। এগুলো বিভিন্ন ওজন ও মাপের ছিল। এজন্য মক্কার লোকেরা এর সংখ্যার ওপর নয়, পরিমাপের ওপর কায়কারবার করত। আলিমদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, দিরহাম, শরীয়তে যা নির্ভরযোগ্য, যবের পঞ্চান্নটি দানার সমান এবং দশ দিরহাম সাত মিছকাল স্বর্ণের সমান। আর নির্ভেজাল স্বর্ণের এক মিছকাল ৭২টি দানার সমান এবং এর ওপর (ইবন খালদূনের ভাষ্য অনুসারে) সকলেই একমত।

নবী যুগে যে মুদ্রা প্রচলিত ও যার বেশি ব্যবহার ছিল তা অধিকাংশই ছিল রৌপ্যের। আলিমদের ভাষ্য, সে যুগে রৌপ্যের প্রচলন ছিল, স্বর্ণের নয় (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ৩য় খণ্ড, ২২২ পৃ.)।

দীনার সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তা হতো স্বর্ণের এবং জাহিলিয়াত ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে সিরিয়া ও হেজাযে এর প্রচলন ছিল। এসব মুদ্রা ছিল রোমক যা রোমেই তৈরি হতো এবং এর ওপর রোম সম্রাটের ছবি অংকিত থাকত। রোমক ভাষায় একে কিন্দাহ্ বলা হতো যা ইবন আবদিল-বার লিখিত আত-তামহীদ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। দীনার শব্দটি আসলে একটি প্রাচীন রোমক মুদ্রা Denarius থেকে আরবী ভাষায় এসেছে এবং কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে শব্দটি আজও প্রচলিত। ইনজীলে এর উল্লেখ কয়েকবার করা হয়েছে। দীনারের ওজন এক মিছকালের সমমানের মনে করা হতো এবং খাঁটি স্বর্ণের এক মিছকাল, যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, মধ্যম ধরনের ৭২টি যবের দানার সমমানের ধরা হতো। এটা বিখ্যাত যে, জাহিলিয়াত ও ইসলাম– কোন যুগেই এতে পরিবর্তন ঘটেনি। দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়াতে বলা হয়েছে, বায়যান্টাইন দীনার ৪/২৫ গ্রাম-এর সমান। প্রাচ্যবিদ Zambaur-এর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হলো, মক্কার মিছকাল ৪/২৫ গ্রামের সমান হতো (দ্র. দীনার শিরো. ৯খ.) দিরহাম ও দীনারের ভেতর আনুপাতিক পার্থক্য ছিল ৭/১০।

এর বিনিময় সম্পর্কে বলা যায়, হাদীছ, ফিক্হ ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে এটা প্রমাণিত হয়, সে যুগে এক দীনার দশ দিরহামের সমতুল্য ছিল। আবূ দাউদ শরীফে আমর ইবন শুআয়ব (র) থেকে বর্ণিত আছে, দিয়াত (রক্তপণ)-এর মূল্য ছিল ৮০০ দীনার অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় ৮০০ দীনার অথবা ৮০০০ দিরহাম। এরপর সাহাবাগণ এরই ওপর আমল করেন, এমন কি এরই ওপর উম্মতের একমত (ইজমা) হন। মশহুর হাদীছগুলোতে দিরহামের নিসাব ও এর ওয়াজিব পরিমাণ নিয়ে যে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে (জমহূর ফকীহদেরও একই অভিমত) তা থেকে পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়, স্বর্ণের নিসাব বিশ দীনার এবং এ থেকে আমরা এও

জানতে পারি, জাহিলিয়াত যুগে ও ইসলামের সূচনায় এক দীনার-এর মূল্য দশ দিরহাম অথবা সমমানের মুদ্রার সমতুল্য ছিল।[১]

ইমাম মালিক (র) তদীয় 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন, "বিশুদ্ধ মত, যে ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন মতভেদ নেই তা হলো, যাকাত বিশ দীনার কিংবা দু'শ দিরহামের ওপর ওয়াজিব"।

পরিমাপের যে তুলাদণ্ড সেই যুগে প্রচলিত ছিল তার মধ্যে ছিল সা', মুদ্দ, রতল, আওকিয়া ও মিছকাল। এরই মধ্যে থেকে আরও কিছু নতুন ধরনের পরিমাপ তারা বের করেছিল। অংকশাস্ত্র সম্পর্কেও তারা জানত এবং মীরাছ বণ্টনের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে তাদের সেই হিসাবের ওপর আস্থা রেখেছে।[২]

কুরায়শদের ধনিকশ্রেণী

যেসব ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য ছিল তাদের মধ্যে বনূ উমায়্যা ও বনূ মাখযূম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ব্যক্তির মধ্যে ওয়ালীদ ইবনুল-মুগীরা, 'আবদুল-উযযা (আবূ লাহাব), আবূ উহায়হা ইবন সাঈদ ইবনুল আস (আবূ সুফিয়ানের কাফেলায় যার ত্রিশ হাজার দীনার পরিমাণ অংশীদারিত্ব ছিল), আবদুল্লাহ ইবন রাবী'আ আত-তায়মী সবচেয়ে মশহুর ছিলেন যাঁর সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি স্বর্ণের পেয়ালায় পানি পান করতেন এবং তাঁর একটি লঙ্গরখানা ছিল যেখানে গরীব ও ক্ষুধার্ত লোকদেরকে খেতে দেওয়া হতো।

'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন কুরায়শ ধনীদের অন্যতম। তিনিও তাঁর ধন-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে দরিদ্র লোকদের জন্য খরচ করতেন। অন্য দিকে তিনি আবার সুদী লেনদেন করতেন। এরপর এল ইসলামের যুগ। সুদ হারাম ঘোষিত হলো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজ্জাতুল-বিদাতে সুদী কায়কারবার নির্মূলের ঘোষণা দিলেন এবং এর সূচনা করলেন আপন চাচা আব্বাস ইবন আবদুল-মুত্তালিব থেকে এবং বলেন : প্রথম সুদ যা আমি রহিত ঘোষণা করছি তা 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ।

তাদের মধ্যে এমন সব বিলাসী আয়েশী ধনী লোকও ছিল যাদের ঘরে রাত্রিকালীন মাহ্ফিল বসত। ফরাশ পাতা কামরায় দস্তরখান সাজান হতো, এরপর চলত শরাব পানের আসর।

---

১. কোন কোন গবেষক বলেন, সে যুগে দীনার মানসম্মত ওজন তাই ছিল যা বায়যান্টীয় সূলাদয়ূস-এর ছিল অর্থাৎ প্রায় ৪/৫৫ গ্রাম। খলীফা 'আবদুল-মালিকের সংস্কারের পর এর ওজন কমিয়ে ৪/২৫ গ্রাম করা হয়।

২. আলূসীকৃত "বুলুগুল-আরাব ফী মা'রিফাতি আওয়ালিল-আরব, 'আবদুল-হায়্যি, আল-কাত্তানী রচিত "আত-তারাতীবুল-ইদারিয়্যা, য়ূসুফ আল-কারযাবীকৃত "ফিকহুয-যাকাত" ও তফসীরে মাজেদী দ্র.।

গোত্রীয় নেতৃবর্গের মাহফিল জমত বেশির ভাগ বায়তুল্লাহর সামনে যেখানে কাব্য চর্চা ও কবিতা পাঠ চলত। জাহিলী যুগের বিশিষ্ট কবি, যেমন লবীদ ইবন রবী'আ', এতে শরীক হতেন। এমনও বর্ণনা আছে যে, আবদুল-মুত্তালিবের ফরাশ কা'বার ছায়ায় বিছানো হতো। তাঁর ছেলেরা তাঁর প্রতি আদব ও শ্রদ্ধবশত ফরাশের বাইরে চারদিকে বসত এবং যতক্ষণ তিনি না আসতেন কেউ ফরাশের ওপর বসত না।

মক্কার শিল্প ও সাহিত্য-সংস্কৃতি

মক্কার লোকদের দৃষ্টিতে শিল্প ও কৃষির খুব বেশি গুরুত্ব ছিল না, বরং এ সবকে তারা অবজ্ঞার চোখেই দেখত এবং নিজেদের জন্য লজ্জা ও অপমানকর মনে করত। তথাপি কতকগুলো শিল্প যেগুলোর প্রয়োজন তারা ভীষণভাবে অনুভব করত সেগুলো সেখানে চালু ছিল এবং মক্কার কিছু কিছু লোক এতে নিয়োজিত ছিল। বর্ণিত আছে, হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) তলোয়ার তৈরি করতেন নির্মাণ প্রভৃতি কর্মে, সকলেই যার প্রয়োজন স্বীকার করত, রোমক ও পারসিক শ্রমিকের সাহায্য গ্রহণ করা হতো। নিরক্ষরতা ছিল ব্যাপক। তবুও কিছু কিছু লেখাপড়া জানা লোক সেখানে ছিল। কুরআন মজীদ এজন্যেই তাদেরকে উম্মী অর্থাৎ নিরক্ষর বলে উক্ত হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ .

"আর তিনিই যিনি নিরক্ষর লোকের মধ্যে তাদেরই ভেতর থেকে একজন রাসূল পাঠালেন।"

মক্কার লোকদেরকে গোটা আরব উপদ্বীপে উত্তম রুচিসম্পন্ন, স্বভাবজাত সৌন্দর্য ও কমনীয় সাজসজ্জাপ্রিয়তার জন্য বিশিষ্ট বলে মনে করা হতো, যেমন প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার দাবিদার রাজধানীর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাদের ভাষা নিয়ে যতটা বলা যায় সে ক্ষেত্রে তারা ছিল সনদ ও মানদণ্ডের অধিকারী এবং জাযীরাতুল-আরবের চারদিকে তাদের ওপর নির্ভর করা হতো। মক্কার অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও অলঙ্কারপূর্ণ কথামালার উস্তাদ ছিল এবং নীচতা ও বাজারিপনা থেকে, তদুপরি অনারব প্রভাব থেকে বহু দূরে ও নিরাপদে অবস্থান করত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য, শারীরিক গঠন, সৌন্দর্য, পরিমিতি, ভারসাম্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অন্যান্য এলাকার তুলনায় তারা ছিল বিশিষ্ট। বীরত্ব ও মহানুভবতার সেই উন্নত গুণাবলী তাদের ছিল যাকে আরবী ভাষায় 'আল-ফুতুওয়া' ও 'আল-মুরুওয়া' বলা হতো যার উল্লেখ আরব কবি ও বক্তাগণ বারবার করেছেন। এজন্য তারা ভাল ও মন্দের উভয় ক্ষেত্রেই সকলের উস্তাদ ছিল।

তাদের আকর্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল ক্রমানুসারে বংশ বৃত্তান্ত, আরবদের সংবাদ বিবরণ, কাব্য ও কবিতা, জ্যোতির্বিদ্যা, পাখির আচরণ থেকে সু ও কু-ধারণা গ্রহণ এবং কিছু পরিমাণ চিকিৎসা যা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রবীণদের বর্ণিত বিবরণের ওপর নির্ভর করত। অশ্বারোহণ, অশ্বের পরিচয় জ্ঞান, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও নানা গুণের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, আকৃতি ও চেহারা দেখে অন্তর্নিহিত ভাব ও শুভাশুভ নিরূপণ বিদ্যার মত জ্ঞানও এদের ছিল। চিকিৎসার যে সব পন্থা-পদ্ধতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে দাগ দেয়া, নষ্ট ও পচে যাওয়া, অঙ্গ কেটে বাদ দেয়া, শিঙ্গা লাগানো ও বিভিন্ন করমের ঔষধ ব্যবহারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

সামরিক শক্তি বা যুদ্ধ ক্ষমতা

সামরিক শক্তি সম্পর্কে বলা যায়, কুরায়শ স্বভাবগতভাবেই শান্তিপ্রিয় এবং তারা নিরাপত্তা চাইত। অপরাপর সমসাময়িক জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় তাদের জীবন ও জীবিকা বেশির ভাগ নির্ভর করত বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তার, কাফেলাসমূহের অবিরত আনাগোনা, হাট-বাজার, বাণিজ্য কেন্দ্রের সংগঠন ও ব্যবসায়ী-বণিক ও পর্যটকদের আগমনের ওপর। ফলে তাদের ধর্মীয় মর্যাদা ও গুরুত্বও বৃদ্ধি পেত, অর্থনৈতিক মুনাফাও অর্জিত হতো এবং সব ধরনের রিযিক তথা জীবনোপকরণ বিভিন্ন দিক থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছুত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

"অতএব তাদের উচিত সেই ঘরের প্রভু প্রতিপালকের ইবাদত করা যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন এবং ভয়ের হাত থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।" [সূরা কুরায়শ : ৩-৪ আয়াত]

আরবের ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে দীর্ঘ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণেও (যেমন জাহিলী যুগের কবি যহায়র ইবনে আবী সুলমা তার 'মু'আল্লাকায়' উল্লেখ করেছেন) হাজারও শিশু য়াতীম, হাজারও মহিলা স্বামীহারা বিধবা হয়ে যেত, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি ও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাদের জানা ছিল না। তারা মক্কার হারব আল-ফুজ্জার' তথা অন্যায় যুদ্ধ ও মদীনার "বু'আছ" যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেছিল, তা তাদের এই দু'টো শহরের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনের ওপর সেগুলো কী প্রভাব ফেলেছিল। এজন্য বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে তারা আরবের অন্য যুদ্ধবাজ গোত্রের মত (যাদের পেশাই ছিল যুদ্ধ) বিনা কারণে যুদ্ধ ডেকে আনার জন্য মোটেই তৈরী ছিল না।

অন্য কথায় আমরা এও বলতে পারি, কুরায়শরা (যতক্ষণ না তাদের গোত্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে) "নিজেও বাঁচ, অপরকেও বাঁচতে দাও" এই নীতির ওপর ছিল। কিন্তু এরই সাথে সাথে সমীহ করবার মত সামরিক শক্তিও তাদের ছিল। বীরত্ব ও বাহাদুরীর ক্ষেত্রে তারা ছিল প্রবাদ বাক্যের মত এবং অশ্বারোহণে ছিল একক ও অনন্য। অনন্তর الغضبة المضرية তথা মুদারী ক্রোধ সমগ্র আরবে ছিল পরিচিত এবং তা ভাষা, সাহিত্যে, উপমা ও বাগধারার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল।

কুরায়শরা কেবল এই ব্যক্তিগত শক্তির ওপর সন্তুষ্ট হয়ে চুপ করে থাকেনি, তারা বরং "আহাবীশ"-এর সমীহযোগ্য শক্তি থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে থাকে। তারা মক্কার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত কতক আরব গোত্র কিনানা ও কুযায়মা ইবন মুদরিকার জন্ম নিয়েছিল। খুযা'আ ছিল কুরায়শদের হালীফ তথা মিত্র গোত্র। এছাড়া কুরায়শদের নিকট এর বিরাট সংখ্যক ক্রীতদাস বর্তমান ছিল যারা বিভিন্ন লড়াই সংঘর্ষে তাদের পতাকাতলে থাকত। তারা একই মুহূর্তে কয়েক হাজার যোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতে পারত। আহযাব (খন্দক) যুদ্ধে এই সংখ্যা দশ হাজার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। আর এটা ছিল জাহিলিয়াত যুগের ইতিহাসে আরব উপদ্বীপের যোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

মক্কা আরব উপদ্বীপের বড় শহর, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কেন্দ্র

এই ধর্মীয় অবস্থান ও উপদ্বীপের কেন্দ্র হওয়ার ফলে এর মর্যাদা, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতির কারণে মক্কা আরব উপদ্বীপের একটি বৃহৎ শহরে পরিণত হয়েছিল এবং য়ামানের বিখ্যাত শরহ সান'আর সমকক্ষ হওয়ার দাবি করছিল। যখন খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে সান'আর ওপর পর্যায়ক্রমে আবিসিনিয়া ও ইরানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হীরা ও গাসসানী সাম্রাজ্যের সেই পূর্বেকার শান-শওকত হারিয়ে যেতে থাকে তখন মক্কা আরব উপদ্বীপের এমন একটি ধর্মীয় ও সামাজিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে যে ক্ষেত্রে তার কোন অংশীদার ও সমকক্ষ ছিল না।

নৈতিক দিক

মক্কার নৈতিক ও চরিত্রগত দিকটি ছিল খুবই দুর্বল। কতিপয় জাহিলী প্রথা ও মূল্যবোধ ভিন্ন সেগুলোকে তারা নিজেদের বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। জুয়ার ছিল ব্যাপক প্রচলন এবং এ ব্যাপারে তারা গর্ব করত। মদ্য পানের সাধারণ প্রচলন ছিল। বিলাসিতা, ইন্দ্রিয় পূজা ও নাচগানের আসর জমত অধিক হারে এবং এতে মদ্য পানের ছড়াছড়ি চলত। বহু রকমের অশ্লীলতা, জুলুম-নির্যাতন, অপরের অধিকার হরণ, বেইনসাফী ও অবৈধ উপার্জনকে তাদের সমাজে খারাপ চোখে দেখা হতো না।

এই নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের (যা সাধারণভাবে আরব উপদ্বীপ, বিশেষভাবে মক্কায় আমরা দেখতে পাই) সবচেয়ে সত্য ও নাযুক চিত্র তাই যা কুরায়শদেরই এক সন্তান এবং মক্কার মূল ও প্রাচীন বাসিন্দা জাফর ইবনে আবী তালিব আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর সামনে পেশ করেছিলেন। সেখানে তিনি তৎকালীন আরব সমাজের ও জাহিলী কর্মকাণ্ডের ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর বর্ণনা ছিল এইরূপ :

"রাজন! আমরা ছিলাম জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতি। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত জীব ভক্ষণ করতাম, সব ধরনের নির্লজ্জ কাজ করতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম এবং শক্তিশালী ও সবল দুর্বলকে শোষণ করত।"[১]

ধর্মীয় দিক

ধর্মীয় দিক (নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে) আরও বেশি দুর্বল ছিল। এর কারণ ছিল এই, নবী যুগ থেকে তাদের দূরত্ব অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। মূর্খতা ছিল ব্যাপক। মূর্তি পূজা, যা তারা তাদের প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে শিখেছিল, তাদের অন্তরে আসন গেড়ে বসেছিল। মূর্তির সঙ্গে তাদের এক ধরনের ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। এরপর কেবল কা'বার ভেতর ও প্রাঙ্গণে ৩৬০টি মূর্তি স্থান পেয়েছিল। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম ছিল 'হুবল' যাকে সম্বোধন করে আবূ সুফিয়ান ওহুদ যুদ্ধে বলেছিল, اعل هبل। -হুবলের জয় হোক! এটি কা'বার ভেতরে একটি গড়ের ওপর স্থাপিত ছিল যার ভেতর (ভক্তদের) পেশকৃত নযরানা জমা হতো। এই মূর্তি লাল আকীক পাথরের তৈরী ছিল, মানুষের আকারে এর ডান হাত ছিল ভাঙা। কুরায়শরা এটি এভাবেই পেয়েছিল। এর সঙ্গে তারা একটি স্বর্ণনির্মিত হাত লাগিয়ে দিয়েছিল। কাবার সামনে থাকত দু'টো মূর্তি যার একটির নাম 'ইসাফ', অপরটির নাম 'নায়েলা'। একটি ছিল একেবারে কা'বার কাছেই আরেকটি ছিল যমযমের কাছে। কুরায়শরা কা'বার এ মূর্তিটাকেও অপর মূর্তিটার কাছে সরিয়ে দেয়। এটা ছিল সেই জায়গা যেখানে আরবরা কুরবানী প্রভৃতি করত। সাফা পর্বতের ওপরও একটি মূর্তি ছিল যার নাম نهيك مجاود الريح এবং মারওয়ার ওপর যে মূর্তিটি স্থাপিত ছিল তার নাম مطعم الطير।

মক্কার প্রতি ঘরেই একটি করে মূর্তি ছিল। ঘরের লোকেরা এগুলোকে পূজা করত। উযযা ছিল 'আরাফাতের কাছে এবং এর কাছে একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। কুরায়শদের নিকট এই মূর্তিটি সমস্ত মূর্তির তুলনায় অধিক সম্মানিত ছিল। তারা এসব মূর্তির সামনে তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্যের ফলাফল জানতে চেষ্টা করত। خلصة। নামক মূর্তিটি মক্কার উচ্চ ভূমিতে স্থাপন করা হয়েছিল। এই

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ ম খ., ৩৩৬ পৃ.।

মূর্তিকে হার পরানো হতো, যব ও গমের নযরানা একে পেশ করা হতো। দুধ দিয়ে একে ধুয়ে দেয়া হতো। এর উদ্দেশে কুরবানী করা হতো এবং এর ওপর উট পাখির ডিম টাঙানো হতো। মক্কার অলিতে-গলিতে মূর্তি ফেরি করে বিক্রি করা হতো। দেহাতী লোকেরা এটা পছন্দ করত, খরিদ করত, এ দিয়ে আপন ঘরের শোভা বাড়াত।

এভাবে এ জাতিগোষ্ঠী (নিজেদের সকল বীরত্ব ও সাহসিকতা, বিশ্বস্ততা, আত্মোৎসর্গ ও নিজেদের উদার আরবীয় গুণাবলী সত্ত্বেও) মূর্তি পূজা, মূর্তির প্রতি ভালবাসা, উদ্ভট ও অলীক কল্পনার প্রতি আকর্ষণ, সঠিক ধর্মীয় বোধের অভাব ও অজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে পবিত্রতা, স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম দীনে হানীফ ও মিল্লাতে ইবরাহীমী থেকে দূরে ও সম্পর্কহীনভাবে এমন এক নিম্নতম পর্যায়ে বাস করছিল যেখানে দুনিয়ার খুব কম জাতিগোষ্ঠীই পৌঁছে থাকবে।

এই হলো খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের মক্কা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব এবং এর শীতল ও অন্ধকার আকাশ হতে ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আমরা যা দেখতে পাই। আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন :

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ .

(এই কুরআন প্রবল পরাক্রান্তশালী ও দয়াময়ের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে) যাতে তুমি সেই সব লোককে ভীতি প্রদর্শন করতে পার যাদের পিতা-পিতামহদেরকে সতর্ক করা হয়নি। ফলে যারা গাফিল হয়ে আছে।"

[সূরা য়াসীন : ৬ আয়াত]

১. এই অধ্যায়ে তাফসীর ও হাদীসে আগত ইঙ্গিতের সাহায্য, তদুপরি বিভিন্ন তথ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে : কালবীকৃত (মৃ. ১৪৬ হি.) كتاب الصنام সীরাত ইবন হিশাম (মৃ. ২১৩ হি.), ইমাম আবিল ওয়ালিদ মুহাম্মদ আযরাকীকৃত "আখবার-ই মক্কা" (মৃ. ২২৩ হি.), সায়্যিদ মুহাম্মদ শুকরী আল-আলুসীকৃত بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب (মৃ. ১৩৪২ হি.) উস্তাদ আহমদ সিবাঈকৃত "তারীখ-ই মক্কা" ও উস্তায ইবরাহীম আশ-শারীফকৃত مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول।

জন্ম থেকে নবূওয়াতের পূর্ব পর্যন্ত

আবদুল্লাহ ও আমেনা

কুরায়শ সর্দার আবদুল-মুত্তালিবের ছিলো দশ পুত্র। এঁদের সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান। তাঁর সকল পুত্রের মধ্যে আবদুল্লাহ খুবই প্রশংসনীয় গুণাবলী ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।[১] তাঁর পিতা তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন বনূ যুহরার সর্দার ওয়াহব-এর কন্যা আমেনার সঙ্গে যাঁকে সে সময় উচ্চ বংশ, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কুরায়শদের ভেতর সবচেয়ে সম্মানিতা মহিলা মনে করা হতো।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাতৃগর্ভে থাকাকালেই পিতা আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। হযরত আমেনা তাঁর জন্মের পূর্বেই এমন বহু নিদর্শন দেখতে পান যাতে বোঝা যেত, তাঁর সন্তানের ভবিষ্যত অত্যুজ্জ্বল ও মর্যাদাকর হবে।[৩]

তাঁর জন্ম ও বংশ

তাঁর জন্ম হয় 'আমুল-ফীলের (মুতাবিক ৫৭০ খৃ.) রবীউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখে[৪] সোমবার দিন। এটি ছিল মানবতার ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বরকতময় দিন।

তাঁর মুবারক বংশধারা

মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল-মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন 'আবদ মানাফ ইবনে কুসায়্যি ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা'ব ইবন লুওয়াঈ ইবন গালিব ইবন ফিহ্র ইবন মালিক ইবন আন-নাদ্র ইবন কিনানা ইবন খুযায়মা ইবন মুদরিক ইবন ইলয়াস ইবন মুদার ইবন নাযযার ইবন মা'আদ্দ ইবন আদনান।

'আদনানের বংশক্রম ঊর্ধ্বে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।[৫] রাসূল ﷺ-এর জন্ম হতেই মা আমেনা এ সংবাদ দাদা

---

১. ইবন হিশাম, ১ম খ., ১০৮।

২. ঐ, পৃ. ১১০। ৩. ঐ, ১৫৮ পৃ.।

৪. এটাই মশহুর বর্ণনা। মিসরের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ মাহমুদ পাশার গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হলো তাঁর জন্ম ফীলের বছর রবীউল আওয়ালের নয় তারিখে মুতাবিক ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল তারিখে।

৫. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১-২; এ ছাড়া সীরাত, ইতিহাস ও বংশপঞ্জীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আমরা আদনান পর্যন্ত তাঁর বংশক্রম এখানে উল্লেখ করলাম যে বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ নেই।

আবদুল মুত্তালিবকে পাঠান। সংবাদ পেতেই তিনি ছুটে আসেন, পরম স্নেহে দেখেন, যত্নের সঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে কা'বার ভেতর প্রবেশ করেন, আল্লাহ তা'আলার হামদ বর্ণনা করেন এবং দু'আ করেন।[১] অতঃপর তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। আরবে এ নাম ছিল একেবারেই নতুন। ফলে লোক খুব বিস্মিত হয়![২]

দুগ্ধ পানকাল

কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁর চাচা আবূ লাহাবের বাঁদী ছুওয়ায়বা তাঁকে দুধ পান করায়। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব স্বীয় পৌত্রের জন্য (এত বেশি ভালবাসা ও স্নেহের পাত্র তাঁর সন্তানদের মধ্যে আর কেউ ছিল না) কোন দেহাতী ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। সে যুগে আরবের লোকেরা তাদের শিশুদের দুধ পান ও প্রাথমিক লালন-পালনের জন্য শহরের তুলনায় দেহাতী এলাকাকেই বেশি পছন্দ করত এজন্য যে, সেখানকার আবহাওয়া সে তুলনায় অধিক স্বচ্ছ নির্মল হতো এবং সেখানকার লোকের চরিত্রে ভারসাম্য ও শান্ত-সমাহিত প্রকৃতির হতো। শহরের ফেতনা-ফাসাদ থেকেও তারা থাকত নিরাপদ এবং তাদের ভাষাও শুদ্ধ ও স্পষ্ট বলে স্বীকার করে নেয়া হতো।

বনী সাদ'-এর মহিলারা এ কাজে পারদর্শিনী এবং ভাষার অলংকার ও স্পষ্টতায় জন্যে বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। এঁদের মধ্যে হালিমা সা'দিয়াও ছিলেন। তিনি এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারিণী হন। তিনি শিশুর খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন। সময়টা ছিল খরা মৌসুম। লোকে ভীষণ পেরেশানীর মধ্যে ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐসব মহিলার সামনে পেশ করা হয়।

কিন্তু অধিকাংশ মহিলাই ভাবল, শিশুটি য়াতীম, যদি শিশুটির বাপ থাকত তাহলে কিছুটা লাভের আশা ছিল, মা আর দাদার কাছ থেকে কী আর মিলবে? ফলে তাঁর দিকে কেউ বেশি নজর দিল না। প্রথম দিকে হালিমও খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি এবং খুব একটা মনোযোগীও হননি। তাঁর আগ্রহ ছিল অন্য শিশুদের দিকে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর অন্তরে শিশুটির প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি হলো। অন্য কোন বাচ্চাও সামনে ছিল না। এর পর তিনি ফিরে আসলেন এবং তাঁকে নিয়ে

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৫৯-৬০ পৃ.।

২. ইবন কাছীর, ১ম খ., ২১০ পৃ.; ইবন হিশাম, ১৫৮ পৃ.; সুহায়লী 'রাওদু'ল-উনফ" ও ইবন ফূরাক-এর "আল-ফসূল" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাসূল (সা)-এর গোটা ইতিহাসে শুধু তিনজন এমন লোক পাওয়া যায় যারা কিতাবীদের নিকট থেকে একথা শোনে, আরব উপদ্বীপে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে যাঁর নাম হবে "মুহাম্মদ"। তাদেরকে এও বলা হতো, তাঁর আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী। তাদের স্ত্রীরা ছিল গর্ভবতী। তারা এই লোভে মানত করে, তার পুত্র সন্তান জন্ম হয় তবে তার নাম "মুহাম্মদ" রাখবে। এরপর তারা তাই করে। কেউ কেউ এ সংখ্যা আরও বেশি হবে বলেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান লেখকের ধারণা, বিষয়টি আরও গবেষণার দাবি রাখে এজন্য যে, কুরায়শদের প্রত্যেক লোক তাঁর এই নামকরণে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল এবং আশ্চর্য হয়েছিল! তার এই রিওয়াতটির শাস্ত্রীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে।

স্বীয় কাফেলায় ফিরে গেলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর বরকত তাঁরা খোলা চোখে দেখতে পেলেন। তাঁদের প্রতিটি জিনিসের ভেতর ভিন্ন আরেকটি চিত্র ফুটে উঠতে লাগল। তাঁরা দুধে, পশুতে, জীবন ও জীবনোপকরণে, মোটের ওপর সব কিছুতেই পরিষ্কার বরকত অনুভব করলেন। তার সাথে আরও যেসব ধাত্রী ছিল তারা তখন বলতে শুরু করল, হালিমা! তুমি খুব বরকতময় বাচ্চা পেয়েছ, খুবই বরকতময়! এখন তারা হালিমাকে হিংসা করতে লাগল।

কল্যাণ ও বরকতের চলমান ধারা বজায় রইল, এমন কি বনী সাদ-এর ঐ গোত্রে তাঁর দু'বছর কেটে গেল। বিবি হালিমা তাঁর দুধ ছাড়িয়ে দিলেন। তাঁর লালন-পালন সাধারণ শিশুদের থেকে একটু ভিন্নভাবে হচ্ছিল। এ সময় তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে নিয়ে তাঁর মায়ের নিকট হাজির হন এবং সাথে সাথেই এই ইচ্ছাও প্রকাশ করেন, শিশুকে আরও কিছু দিনের জন্য তাঁর নিকট যেন থাকতে দেয়া হয়! বিবি আমেনা শিশু মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেন।[১]

ফিরে আসার পর যখন তিনি বনী সা'দ-এ ছিলেন তখনকার এক ঘটনা। দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তাঁর সীনা মুবারক ফেড়ে ফেলা হয়। তাঁর পবিত্র হৃৎপিণ্ড থেকে গোশতের টুকরো কিংবা মাংসপিণ্ডের মত একটি কালো বস্তু বের করে তাঁরা ছুঁড়ে ফেলেন। অতঃপর তাঁর হৃৎপিণ্ড খুব ভাল করে ধুয়ে ও পরিষ্কার করে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলেন এবং তা পুনরায় আগের মতই হয়ে যায়।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুধ ভাইদের সঙ্গে জঙ্গলে বকরী চরাতেন। সেখানে অনাড়ম্বর ও কষ্টসহিষ্ণু নির্ভেজাল প্রকৃতি ও গ্রামের স্বচ্ছ ও নির্মল জীবন, শহরের কদর্য ও মলিন থেকে মুক্ত আবহাওয়ায়, ভাষার অলংকারপূর্ণ পরিবেশে তাঁর প্রতিপালন চলছিল যে ব্যাপারে বনী সা'দের সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল। তিনি কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরামকে বলতেনও, "আমি তোমাদের তুলনায় বেশি আরব কুরায়শী আর আমি সা'দ ইবন বকর গোত্রের দুধ পান করেছি।"[৩]

---

১. দুধ পানের এই দীর্ঘ চিত্তাকর্ষক কাহিনী সীরাত-ইবন হিশামে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। দ্র. ১৬২-৬৬ পৃ.।

২. এ বিস্তারিত বিবরণ সীরাত গ্রন্থগুলোতে দেখুন। ইমাম মুসলিম আনাস ইবন মালিক-এর বর্ণনায় "কিতাবুল-ঈমান'-এর "বাবুল-ইসরা' বি-রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহি ওয়াসাল্লাম" শীর্ষক অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) তাঁর "হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা" গ্রন্থে লিখেছেন, ফেরেশতা আবির্ভূত হন। তাঁরা তাঁর সীনা মুবারক চিরে ফেলে হৃৎপিণ্ড বের করেন এবং তা ঈমান ও হিকমত দ্বারা পূর্ণ করেন। এটি আলমে মিছাল ও আলমে শাহাদতের মধ্যবর্তী অবস্থার ঘটনা। এই বক্ষ ছিড়ে ফেলা সে ধরনের জিনিস ছিল না যাতে ক্ষতির কারণ ঘটে। সেলাইয়ের কোন চিহ্নই তাঁর সীনা মুবারকে ছিল না। আলমে মিছাল ও আলমে শাহাদত যেখানে মিলিত হয় সেখানে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়। হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা, ২য় খ., ১০৫ পৃ.।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৬৭।

বলা হয়ে থাকে, একবার আবূ তালিব বাণিজ্যের উদ্দেশে একটি কাফেলার সঙ্গে হয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি চাচাকে রওয়ানা হতে দেখেই জড়িয়ে ধরেন। আবূ তালিব এতে খুব অভিভূত হয়ে পড়েন এবং ভাতিজাকে সফরসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন।[১]

এই বাণিজ্য কাফেলা 'বুসরা' নামক স্থানে পৌঁছল এবং সেখানে ছাউনি ফেলল। এটি ছিল সিরীয় এলাকায়। এখানে বুহায়রা নামক একজন রাহেব (খৃস্টান সাধু-সন্ন্যাসী)-এর সঙ্গে তাঁর দেখা। রাহেব তাঁর খানকাহতে বসবাস করতেন। সাধু বুহায়রা এই কাফেলাকে দাওয়াত করেন, উষ্ণ আন্তরিকতা সহকারে সকলকে অভ্যর্থনা জানান এবং ভূঁড়িভোজে আপ্যায়িত করেন এজন্য যে, তিনি এই কাফেলার সঙ্গে আল্লাহর বিশেষ রকমের আচরণ ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী দেখতে পাচ্ছিলেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন তখন তিনি আরও বেশি খাতির-যত্ন করেন এবং নিশ্চিত হন, বালকের ভেতর নবূওয়াতের সমূহ লক্ষণ বিদ্যমান। তিনি আবূ তালিবকে তাঁর সমুন্নত মর্যাদা ও 'আলীশান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যান এবং ইয়াহূদীদের হাত থেকে তাঁকে বিশেষভাবে হেফাজত করবেন। কেননা আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। এরপর আবূ তালিব তাঁকে নিয়ে নিরাপদে মক্কায় ফিরে আসেন।[২]

আসমানী প্রশিক্ষণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লালন-পালন বিশেষ নিরাপদ ও কালিমামুক্ত পরিবেশ হয় এবং জাহিলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাসসমূহ থেকে আল্লাহ পাক তাঁকে সর্বদাই দূরে ও মুক্ত রাখেন যাঁকে তাঁর জাতিগোষ্ঠী প্রথম থেকেই সবচেয়ে বেশি

১. অধিকতর বিশুদ্ধ বর্ণনা মুতাবিক।

২. এই ঘটনার সীরাত ইবন হিশাম ও সীরাতের অন্যান্য গ্রন্থে খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ঘটনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিছ সমালোচকগণ বিষয়বস্তু ও বর্ণনাগত উভয় দিক নিয়ে কথা বলেছেন। আল্লামা শিবলী নুমানী "সীরাতুন্নবী"-তে লিখেছেন, ইমাম তিরমিযী এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে পরে লিখছেন, حديث حسن غريب لامن هذا الوجه। হাদীছ হাসান গরীব; এটি উক্ত সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বলে জানি না। হাদীছের বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে 'আবদুর রহমান ইবন গাযওয়ানের নাম পাওয়া যায়, যাঁর সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। 'আল্লামা যাহাবী বলেন, সে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করে থাকে এবং সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মুনকার হাদীছ সেটি যার ভেতর বুহায়রার কিসসা বর্ণিত হয়েছে (১ম খণ্ড, ৮০ পৃ.)।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, এতে আরও উল্লেখ রয়েছে, আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বেলালের সাথে পাঠিয়ে দেন। আল্লামা ইবনুল-কায়্যিম তাঁর "যাদুল-মা'আদ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে এ কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি (আবূ তালিব) তাঁর সঙ্গে বেলালকে পাঠিয়ে দেন যা একেবারেই ভুল এজন্য যে, সে সময় বেলাল উপস্থিত ছিলেন না। আর যদি থেকেও থাকেন, তবুও তাঁর চাচা কিংবা হযরত আবূ বকরের সঙ্গে ছিলেন না কখনোই (যাদু'ল-মাআদ, ১ম খণ্ড, ১৮ পৃ.)।

প্রাচ্যবিদ ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঐতিহাসিকগণ সব সময় এ ধরনের সুযোগের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকেন। অতএব, বুহায়রা সাধুর সঙ্গে তাঁর এই চৌরাস্তার প্রকাশ্য মোলাকাত (যে সাধুর আকীদা, বিশ্বাস

[পরের পৃ. দেখুন]

প্রশংসনীয় গুণাবলী, উন্নত মনোবল, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, লাজনম্র, সত্যবাদী, আমানতদার, কটূক্তি ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ থেকে দূরে বলে মনে করত, এমন কি তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে 'আমীন'[১] (বিশ্বস্ত, আমানতদার) নামে স্মরণ করত।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ঐসব বিষয় ও জাহিলিয়াতের সমস্ত আচার-অভ্যাস থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রেখেছিলেন যেসব তাঁর শান ও মর্যাদার উপযোগী ছিল না। যদিও সেই সমাজে সে সবের মধ্যে কোন খারাপের কিছু আছে বলে মনে করা হতো না, তেমনি এসব বিষয়ের ওপর কারো দৃষ্টিও পড়ত না। তিনি আত্মীয়তার দিকে খেয়াল রাখতেন, লোকের দুর্বহ বোঝা হাল্কা করতেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। তিনি মেহমানের মেহমানদারী করতেন, কল্যাণমূলক ও তাকওয়া-ভিত্তিক কাজেকর্মে অন্যদেরকে সাহায্য করতেন,[২] পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতেন এবং মামুলী ও যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু খাদ্যকেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স তখন চৌদ্দ কি পনেরো কুরায়শ ও কায়স গোত্রের মধ্যে আল-ফিজার-এর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তিনি এই যুদ্ধ খুব কাছে থেকে দেখেন। তিনি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর কুড়িয়ে কুরায়শদেরকে পৌঁছে দিতেন যা যুদ্ধের

(চলমান টিকা) ও বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে কোন নাম-নিশানা পর্যন্ত আমরা পাই না)-কে তারা বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত করে ছেড়েছেন, এর ওপর কল্পনার দুর্গ বানিয়েছেন এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, তাওহীদী আকীদার এই স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ শিক্ষামালা তিনি (রাসূলুল্লাহ (সা)) আসলে একজন খৃস্টান পণ্ডিত থেকে লাভ করেছিলেন। এর চেয়েও বেশি অবাক হওয়ার বিষয় হলো, একজন ফরাসী প্রাচ্যবিদ CARRA DE VAUX এ বিষয়ের ওপর একটি গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা করে ফেলেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন "কুরআনপ্রণেতা"। তিনি এতে দাবি করেছেন, এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের সময় "বুহায়রার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে dictation দেন।

যদি রাহেব বুহায়রার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎকারের কথা সঠিক বলে মেনেও নেয়া হয় তবুও কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষ, যাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি এখনও লোপ পায়নি এবং যাঁর ভেতর ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ছিটেফোঁটাও বর্তমান আছে, সে এ ধরনের কথা কল্পনায় ঠাঁই দিতেও চাইবেন না। এ ধরনের কথা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথায় ঢুকতে পারে না যে, একজন অল্প বয়স্ক বালক যাঁর বয়স সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা মুতাবিক নয় বছর আর বেশি থেকে বেশি বার বছর বলা হয়েছে, এমন একজন বয়স্ক প্রবীণ মানুষের কাছ থেকে যাঁর ভাষার সাথেও তাঁর কোন সংযোগ নেই, যাঁর সঙ্গে কেবল এক বেলা খাবারের সময় একত্রে বসার সুযোগ হয়েছে, তিনি এরূপ সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জায়গাটি মক্কার নিকটেই যা এখন মক্কা ও মদীনার মাঝখানে মশহুর মনজিল এবং অর্ধেক রাস্তায়।

ও নাযুক বিস্তারিত বিষয়াবলী নিয়ে মত বিনিময় করবেন এবং তিনি (রাসূলুল্লাহ (সা)) খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে খৃস্ট ধর্মের বাতিল শিরকমূলক আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সেই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে জেনে যাবেন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের বড় বড় পাদরী ও পণ্ডিত যেখানে প্রবেশ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। অতঃপর ত্রিশ চল্লিশ বছর পর (যখন বুহায়রা সাধুর হাড়-হাড্ডি পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশে গেছে) কুরআন আকারে সে সব বিন্যস্ত ও সংকলিত আকারে পেশ করে দেবে? এ ধরনের কথা কেবল তারাই বলতে পারে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ যাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে অথবা কল্পনা, বিলাস, মনগড়া ও উদ্ভট কথা সৃষ্টিতে যাদের জুড়ি মেলা ভার। যদি সীরাত গ্রন্থগুলোতে এসব না থাকত তাহলে এ ধরনের কথা আলোচনা করবার এখানে প্রয়োজন পড়ত না।

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৮৩ পৃ.।

২. দেখুন হযরত খাদীজা (রা.)-এর সাক্ষ্য যা তিনি হেরা গুহা থেকে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আখলাক সম্পর্কে দান করেছিলেন।

বিশেষ একটা পন্থা। এই সুযোগে তিনি যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং অশ্বারোহণ ও সৈনিকবৃত্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।[১]

এরপর বয়স যখন কিছুটা বাড়ল তখন তিনি জীবিকার দিকে মনোযোগ দেয়া জরুরী মনে করলেন এবং বকরী চরানোর পেশা গ্রহণ করলেন। সেই যুগে এটা জীবিকার একটি অভিজাত উপায় ছিল। সেই সাথে মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ, দুর্বল ও অভাবী লোকদের ওপর স্নেহ ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি, তদুপরি স্বচ্ছ ও নির্মল বায়ুর আমেজ লাভ এবং শরীরের শক্তি ও ব্যায়ামের উপকরণও এর ভেতর পাওয়া যায়। এর থেকেও বেশি যা তা হলো এটা আম্বিয়াই কিরামের সুন্নাত। নবুওয়াত লাভের পর একবার তিনি বলেন, এমন কোন নবী গত হননি যিনি বকরী না চরিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও! বললেন, আমিও।

তিনি এর আগেও বনী সাদে থাকতে আপন দুধ ভাইদের সঙ্গে বকরী চরিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর এ কাজ একেবারে অজনা ও অপরিচিত ছিল না। সিহাহ সিত্তা থেকে প্রমাণিত, মক্কায় থাকাকালে কয়েক কীরাতের[২] বিনিময়ে (যা তিনি বকরীর মালিকদের থেকে নিতেন) তিনি বকরী চরাতেন।

হযরত খাদীজা (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ

যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ-এর সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত খাদীজা (রা) কুরায়শ গোত্রের খুবই প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন এবং বোধশক্তি, দূরদর্শিতা, মহান চরিত্র ও ব্যবহার, এমন কি ধন-সম্পদের দিক দিয়েও খ্যাতনাম্নী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিধবা, তাঁর স্বামী আবূ হালা ইতোপূর্বেই ইনতিকাল করেছিলেন। বিয়ের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর।[৩]

হযরত খাদীজা (রা) তেজারতী কায়কারবারও করতেন। তাঁর থাকত টাকা-পয়সা তথা পুঁজি আর অন্যদের কায়িক শ্রম। বিনিময়ে শ্রমের ফসল হিসাবে তারা পেত পারিশ্রমিক। কুরায়শরা ছিল বিরাট বণিকগোষ্ঠী। হযরত খাদীজা (রা)

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৮৬ পৃ.।

২. আল্লামা শিবলী নুমানী সীরাতুন্নবী'র প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, 'কারারীত' অর্থ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবন মাজার শায়খ সওয়ায়দ ইবন সাঈদ-এর অভিমত হলো, কারারীত 'কীরাতের' বহুবচন যা দিরহাম কিংবা দীনারের একটি অংশ। এদিক দিয়ে তাঁর মতে হাদীছের অর্থ হবে, রাসূলুল্লাহ (সা) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বকরী চরাতেন। আর এজন্যই ইমাম বুখারী ইজারা অধ্যায়ে এর উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম আল-হারাবীর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হলো, এই স্থানটি আজয়াদের নিকট অবস্থিত। ইবন জওযীও এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আল্লামা আয়নী অনুরূপ শক্তিশালী দলীলসহকারে এই মতকেই সমর্থন করেছেন। নূরুন-নাবরাস-এর লেখকও দীর্ঘ আলোচনার পর এই মতই গ্রহণ করেছেন।

৩. সীরাতে ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৮৭-৯০ ও সীরাত ইবন কাছীর, ২৬২-৬৫ পৃ.।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যবাদিতা, উত্তম আখলাক ও কল্যাণকামী আবেগ উদ্দীপনা সম্পর্কে তাঁর সিরিয়া সফর থেকে বেশ ভালভাবেই জানতে পেরেছিলেন যখন তিনি তাঁর (খাদীজার) পণ্যসম্ভার নিয়ে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন এবং এর পূর্বে যে সব ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও তাঁর জানা ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হন, অথচ ইতোপূর্বে তিনি কুরায়শদের বড় বড় সর্দারের বিবাহ প্রস্তাব নামঞ্জুর করেছিলেন। তাঁর চাচা সায়্যিদুনা হামযা এই পয়গাম তাঁকে পৌছে দেন। আবূ তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করেন এবং এখান থেকেই তাঁর দাম্পত্য জীবনের সূচনা ঘটে।[১] তাঁর সন্তান ইবরাহীম ছাড়া (যাঁর ইনতিকাল শৈশবেই হয়েছিল) আর সকলেই ছিলেন হযরত খাদীজার গর্ভজাত।[২]

কা'বার নব নির্মাণ ও একটি বিরাট ফেতনার অবসান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। কুরায়শরা নতুনভাবে কাবা শরীফ নির্মাণ করতে চাইল এবং এর ওপর ছাদ ঢালাই করবার সিদ্ধান্ত নিল। এর আগে এর ধরন ছিল এই রকম, মাটি ও পাথর সঙ্গে না জুড়ে ভারী পাথর ওপরে ও তলায় রেখে দেয়া হয়েছিল যার উচ্চতা মানুষ সমানের চেয়ে বেশি ছিল। এখন সেটা ভেঙ্গে গেলে আবার নতুন করে তৈরি করা দরকার ছিল। দেওয়াল যখন উঁচু করে হাজরে আসওয়াদের উচ্চতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা নিয়ে কুরায়শ নেতাদের মধ্যে বিরাট মতবিরোধ দেখা দিল। প্রতিটি গোত্রই চাচ্ছিল, তার গোত্রই এই সৌভাগ্য লাভ করুক এবং তারা এই পাথর উঠিয়ে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করুক! মতভেদ বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে তা যুদ্ধ-বিগ্রহে উপনীত হবার উপক্রম হলো। জাহিলিয়াত যুগে এর থেকে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও যুদ্ধ বেঁধেছে। আর এটা তো ছিল এক বিরাট ব্যাপার!

মোটকথা, যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। বনী আবদুদ্দার রক্তে পরিপূর্ণ একটি বিরাট বারকোষ (পানির পাত্র) তৈরি করে এবং তারা ও বনূ আদী আমরণ যুদ্ধের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। রক্তে পূর্ণ বারকোষে হাত ডুবিয়ে এই অঙ্গীকার আরও দৃঢ় করে। এটি ছিল এক বিরাট ধ্বংস এবং এক মহাফেতনা ও বিপর্যয়ের ভূমিকামাত্র। কুরায়শরা কয়েক দিন যাবত এই সংকটের মাঝে কাল কাটায়। অতঃপর সকলেই এই বিষয়ে একমত হয়, যে ব্যক্তি অমুক দিন প্রথমে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে এ ব্যাপারে ফয়সালা প্রদান করবে। প্রথমে মসজিদুল হারামের দরজা পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করেন। তাঁকে প্রবেশ করতে দেখেই সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, এই যে আমাদের আল-আমিন আসছেন! আমরা তাঁর ফয়সালায় রাজি আছি।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ১৮৯-৯০।
২. প্রাগুক্ত, ১৯০ পৃ. ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল বৃত্তান্ত শোনার পর একটি চাদর চেয়ে পাঠান। এরপর চাদর বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ নিজ হাতে উঠিয়ে মাঝখানে রাখেন। অতঃপর সকল গোত্রের লোকদের ডেকে চাদরের এক একটি প্রান্ত ধরে ওঠাতে বলেন। সকলেই এ নির্দেশ পালন করল। এরপর যখন পাথরটি স্থাপন জায়গার কাছাকাছি নেয়া হলো তখন তিনি নিজ হাতে উঠিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর বাকি ইমারত নির্মিত হলো।[১]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাশয়দেরকে এক বিরাট রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি যে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এর থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না। নবুওয়াত লাভের পর তিনি সমগ্র মানব সমাজ ও বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠীকে যেভাবে যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী হাত থেকে মুক্তি দেন এই ঘটনা ছিল যেন তারই ভূমিকা ও শুভ সূচনা! এটি তাঁর বোধশক্তি ও বিচক্ষণতা, সর্বোত্তম শিক্ষামালা, নম্রতা ও স্নেহার্দ্রতা এবং বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ও সমঝোতা স্থাপনের মুখপাত্র ও মশালবাহী। এ ছিল তাই যা তাঁকে রাহমাতুললিল-আলামীনের মহামর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল এবং তিনি সেই সহজ-সরল ও নিরক্ষর জাতিগোষ্ঠীর সেই সব যুদ্ধবাজ ও পরস্পরের খুনপিয়াসী গোত্রের জন্য নবীয়ে রহমত তথা দয়ার নবী করুণার ছবি প্রমাণিত হন।

হালাফুল-ফুযূল

রাসূলুল্লাহ ﷺ হালাফুল-ফুযূল-এও শরীক থাকেন যা ছিল আরবদের সবচে' অভিজাত চুক্তি। এর বিবরণ হলো, যাবীদ নামক স্থানের এক লোক মক্কায় কিছু বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আসে এবং কুরায়শদের অন্যতম সর্দার আস ইবনে ওয়ায়েল এসব পণ্য খরিদ করে। কিন্তু সে এসব পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেনি। লোকটি তখন কুরায়শ নেতৃদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়। কিন্তু আস ইবন ওয়ায়েলের সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তারা তাকে সাহায্য-সহায়তা প্রদানে অস্বীকার করে এবং গালমন্দ করে তাকে ফিরিয়ে দেয়। এরপর যাবীদ-এর লোকটি মক্কার লোকদের নিকট ফরিয়াদ জানায় এবং প্রত্যেক সাহসী ও ইনসাফের সমর্থক যার সঙ্গেই দেখা মিলেছে অভিযোগ পেশ করেছে। শেষ পর্যন্ত ঐসব লোকের ভেতর আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে এবং তারা সকলে মিলে আব্দুল্লাহ ইবন জাদআনের ঘরে একত্র হয়। তিনি তাদের সকলকে দাওয়াত ও যিয়াফত করেন। এরপর তারা আল্লাহর নামে এই অঙ্গীকারে করে, তারা সবাই জালিমের মুকাবিলায় ও মজলুমের সাহায্য-সমর্থনে 'এক দেহ এক প্রাণ' হয়ে একত্রে মিলে কাজ করবে যতক্ষণ না জালিম মজলুমের হক প্রদান করে। কুরায়শরা এই অঙ্গীকারে নাম দেয় 'হালাফুল ফুযূল' অর্থাৎ ফুযূলের অঙ্গীকার এবং বলতে থাকে, তারা একটা অতিরিক্ত কাজে, যা তাদের দায়িত্বের আওতায় পড়ে না, হস্তক্ষেপ

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ১৯২-৯৭ পৃ.।

করেছে।[১] এরপর তারা সকলে মিলে আস ইবন ওয়ায়েল-এর নিকট গমন করে এবং যাবীদীর পণ্যদ্রব্যাদি তার নিকট থেকে যবরদস্তী গ্রহণ করে তাকে ফেরত দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অঙ্গীকারে খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও তিনি এর প্রশংসা করেন এবং বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জাদআন-এর ঘরে আমি এমন একটি অঙ্গীকারে শরীক ছিলাম যার ভেতর সেই নামে ইসলামের পর আজও যদি আমাকে আহ্বান করা হয় তবে আমি তাতে সাড়া দেবার জন্য তৈরী আছি। যারা এ ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছিল, তারা হকদারকে তার হক পৌঁছে দেবে এবং এই শপথেও আবদ্ধ হয়েছিল, কোন জালিম মজলুমের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না।[২]

আরব উপদ্বীপের অবস্থা এবং জাযীরার ধর্মীয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত ও রাজনৈতিক কেন্দ্রের (মক্কা মুকাররমার) অবস্থাসমূহের ওপর যাঁরা নজর রাখেন, তাঁরা জানেন, কোন ব্যক্তি কিংবা কয়েকজন লোকের হক নষ্ট হওয়ার কারণ বিবেকবান লোকদের সামাজিক কল্যাণমূলক এমনতর কাজ করার জন্য শপথ নেয়ার প্রেরণা দেয় নি, বরং এর শক্তিশালী কার্যকারণ ছিল অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, নীতিহীনতা ও বেআইনী কার্যকলাপের সেই অবস্থা যা মক্কা ও আশপাশে বিরাজ করছিল। এছাড়াও এর আরও একটি কার্যকারণ ছিল শান্তি ও সংহতির, বিশেষত ফুজ্জার যুদ্ধের পর ও মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং মক্কায় আগত ব্যবসায়ী বণিক ও কারিগরদের হেফাজত ও সাহায্য-সমর্থনের গুরুত্বের অনুভূতি।

অনিশ্চিত অস্থিরতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ভেতর এক ধরনের অদৃশ্য ও অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করতেন যার কারণ ও উৎস এবং যার ভবিষ্যৎ ও পরিণতি তাঁর জানা ছিল না। তাঁর মনে এ কথা কখনো ভুলেও জাগত না, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ওয়াহয়ি ও রিসালাত দ্বারা সরফরায করতে যাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ -

---

১. সীরাত ইবন কাছীর, ১ম খ., ২৫৭-৫৯, এরূপ নামকরণের আরেকটি হেতু হিসাবে বলা হয়, কুরায়শদের আগে জুরহুম গোত্রও এ ধরনের একটি সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এতে যে সমস্ত লোক শরীক হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনজনের নাম ছিল ফযল। এরূপ শপথনামার সাদৃশ্যের কারণে এই শপথেরও অনুরূপ নামকরণ ঘটে। এ ছাড়া মিলের অন্য কারণও হয়েছে।

২. প্রাগুক্ত, ২৫৮ পৃ.।

"এভাবে আমি তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ (ওহী) করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কী ও ঈমান কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত (পথ নির্দেশ) করি, তুমি তো প্রদর্শন কর সরল পথ।" [সূরা শূরা :৫২ আয়াত]

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ـ

"তুমি আশা করনি, তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনো কাফেরদের সহায়ক হয়ো না।" [সূরা কাসাস : ৮৬ আয়াত]

আল্লাহ তাআলার খাস হেকমত ও প্রশিক্ষণ ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালন-পালন নিরক্ষর হিসাবে হয়। তিনি না পড়তে পারতেন, না লিখতে জানতেন। এভাবেই তিনি ইসলামের শত্রুদের অপবাদ আরোপ ও মিথ্যাচার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন এবং নিরাপদ থাকেন। কুরআন মজীদ এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করেছে :

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

"তুমি এর আগে কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখ নি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" [সূরা আনকাবুত :৪৮ আয়াত]

কুরআন মজীদ এজন্যই তাঁকে 'উম্মী' (নিরক্ষর) উপাধি দিয়েছে। বলা হয়েছে:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক নিরক্ষর নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যা তাদের নিকট আছে, তাতে লিখিত পায়।" [সূরা আ'রাফ : ১৫৭ আয়াত]

নবূওয়াত লাভের পর

মানবতার সুবহে সাদিক

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স যখন চল্লিশ পূর্তি হলো বিশ্ব তখন অগ্নিকুণ্ডের একেবারে প্রান্তসীমায়, বরং এ কথা বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে, দোরগোড়ায় উপনীত। গোটা মানবগোষ্ঠী দ্রুতই আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হয়েছিল। এটা ছিল সেই নাযুক মুহূর্ত যখন মানবতার ভাগ্যাকাশে ঘটল সুবহে সাদিকের উদয়। শোষিত, বঞ্চিত ও দুর্ভাগা বিশ্বের ভাগ্য আবার জেগে উঠল এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের মুবারক মুহূর্ত নিকটবর্তী হলো। আল্লাহর নিয়মও তাই, যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়, মানুষের হৃদয়-মন শক্ত ও মৃতপ্রায় হয়ে যায় তখন তাঁর রহমতের স্নিগ্ধ বসন্তের বাতাস বইতে শুরু করে এবং মানবতার শীতল মৌসুমী বাগে আবার বসন্ত আসে।

দুনিয়াতে তখন মূর্খতা ও জাহিলিয়াতের রাজত্ব চলছিল। কল্পনার ফানুস ওড়ানো এবং শির্ক ও মূর্তি পূজার মহামারী চলছিল সর্বত্র। ব্যাপকভাবে এগিয়েছে তাঁর অস্থিরতা সৃষ্টিজগতের ও আসমান-যমীনের স্রষ্টার পথ-নির্দেশনা তথা হেদায়াত ও তাঁর বিধানাবলীর জন্য অপেক্ষা চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল কোন অদৃশ্য শক্তি ও গায়বী আওয়াজ তাঁকে পরিচালনা করছে, পথ দেখাচ্ছে না এবং সেই বিরাট পদের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করছে!

সে সময় একাকী ও নির্জনে থাকাটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিঃসঙ্গ থাকাতেই বিরাট তৃপ্তি পেতেন, শান্তি পেতেন। তিনি মক্কা থেকে বহু দূরে চলে যেতেন, এমন কি শহরের ঘরবাড়ীগুলো তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যেত। তিনি মক্কার বিভিন্ন ঘাঁটি ও এখানকার উপত্যকাসমূহ যখন অতিক্রম করতেন তখন গাছপালা ও প্রস্তরমালা থেকে আওয়াজ ভেসে আসত, "আসসালামু আলায়কা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি সালাম। তিনি ডানে বামে ঘুরে তাকাতেন কিন্তু গাছপালা ও প্রস্তর খণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না।"[১]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ২৩৪-৩৫, সহীহ মুসলিমে তাঁর এই উক্তিও বর্ণিত আছে, আমি মক্কার একটি পাথর এখন চিনি যা নবুওয়াত লাভের আগেই আমাকে সালাম দিত কিতাবুল-ফাদাইল باب فضل نسبت النبى।

হেরা গুহায়

বেশির ভাগ সময় তিনি হেরা গুহায় থাকতেন এবং পর পর কয়েক রাত সেখানেই কাটিয়ে দিতেন। এর ইনতেজামও তিনি আগে থেকেই করে নিতেন। এখানে তিনি ইবরাহীম (আ)-এর তরীকায় ও সুস্থ প্রকৃতির পথ নির্দেশনায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।[১]

নবুওয়াত লাভ

এভাবেই একদা তিনি হেরা গুহায় তশরীফ আনেন এমন সময় তাঁকে নবুওয়াতের পদ মর্যাদা দিয়ে সরফরায করার পবিত্র মুহূর্ত এসে যায়। জন্মের ৪১তম বছরে ১৭ রমযান[২] তারিখের ঘটনা (মুতাবিক ৬ আগস্ট, ৬১০ খৃ.) জাগ্রত ও চৈতন্য অবস্থায় ঘটে। তাঁর সামনে হেরা গুহায় ফেরেশতা আগমন করেন এবং বলেন, পড়ুন! তিনি উত্তর দিলেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর ফেরেশতা আমাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমি কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। এরপর পুনরায় আমাকে ধরলেন এবং এমন জোরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন যে, আমি তাঁর চাপ তীব্রভাবে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি পুনরায় আমাকে ধরে পূর্বের মতই চাপ দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন। বললেন :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষের আলাক থেকে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[৩]

[সূরা আলাক ১-৫ আয়াত]

এটা ছিল নবুওয়াতের প্রথম দিন, পহেলা ওহী ও কুরআনের অংশ।[৪]

---

১. আইশা (রা)-এর হাদীছ দেখুন (সহীহ বুখারী)।

২. ইবন কাছীর, ১ম খ., ৩৯২, আবূ জাফার মুহাম্মদ আল-বাকির।

৩. ইবন কাছীর, ১ম খ., ২৯২, আবূ জাফর মুহাম্মদ আল-বাকির।

৪. অবাক হওয়ার বিষয় যা দুনিয়ার দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়, তা হলো প্রথম অবতীর্ণ ওয়াহীতে কলমের উল্লেখ যা একজন নিরক্ষর লোকের ওপর, একটি নিরক্ষর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন একটি দেশে নাযিল হলো যেখানে কলমের অস্তিত্ব

[পরের পৃ. দেখুন]

হযরত খাদিজা (রা)-এর ঘরে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আকস্মিক ঘটনায় খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা এর আগে আর কখনো এমন ধরনের ঘটনা তাঁর সঙ্গে ঘটেনি। আর এ ধরনের কথাও তিনি আর কখনো শোনেননি। নবুওয়াত ও আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের যুগ দীর্ঘকাল হয় গত হয়ে গেছে। অতএব, তিনি বিপদের আশংকা করতে লাগলেন এবং নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। ভয়ের কারণে তাঁর কাঁধ কাঁপছিল। তিনি ঘরে পৌঁছেই হযরত খাদীজা (রা)-কে বললেন, আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও। আমার বিপদের আশংকা হচ্ছে।

হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে ভয় পাওয়া ও ভীত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তখন সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমতী ও সজাগ সচেতন মহিলা ছিলেন। নবুওয়াত, আম্বিয়া-ই কিরাম ও ফেরেশতাদের সম্পর্কে তিনি অনেক কিছুই শুনে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফলের নিকট (যিনি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, আসমানী সহীফাসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলের ধারক-বাহকদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা ছিল) কখনো কখনো সেখানে যেতেন এবং মক্কার লোকদের অন্যায় ও অসঙ্গত কথাবার্তা ও অভ্যাস পছন্দ করতেন না। আর সেসব কোন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষই পছন্দ করবে না।

তিনি তাঁর স্ত্রী ও দিবারাত্রির সঙ্গিনী হিসাবে তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানার কারণে, বিশেষ আস্থা ও সম্পর্কের দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উন্নত ও মহান চরিত্র সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর গুণাবলী ও স্বভাব-প্রকৃতি দেখে হযরত খাদীজা (রা)-এর পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল, আল্লাহ তায়ালা সাহায্য-সমর্থন ও তৌফিক প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গী। তিনি আল্লাহ তায়ালার মনোনীত মকবুল বান্দা এবং তাঁর সীরাত তথা জীবন-চরিতও প্রিয় পছন্দনীয় সীরাত। যেই ব্যক্তি এরূপ জীবন্ত আখলাক-চরিত্র ও এমন উন্নত ও পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী হবেন তাঁর উপর কোন শয়তান, জিন কিংবা দুষ্ট আত্মার প্রভাব পড়তে পারে না কখনো। এটি আল্লাহ তাআলার হেকমত, রহমত ও স্নেহ-মমতা থেকে দূরে এবং তাঁর প্রচলিত সুন্নাতের বিপরীত। তিনি গভীর আস্থার সঙ্গে ও পূর্ণ শক্তিতে বললেন,

---

চলমান টিকা) কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যেত এবং যেখানে লেখাপড়া জানা লোক আঙুলে গোণা যেত, তা এই ধর্ম ও এর ধারক-বাহক উম্মতের লেখাপড়া ও কলমের সাহায্যে কাজ করার যোগ্যতা এবং এ দ্বারা তার চিরস্থায়ী ও মজবুত সম্পর্ক (অপরাপর প্রাচীন ধর্মগুলোর বিপরীতে) চিহ্নিত করে দিয়েছে যা ছিল এর বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের ও আন্দোলনের গূঢ় রহস্য, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাসে যার কোন দ্বিতীয় নজীর নেই।

সেই গূঢ় রহস্য علم الانسان مالم يعلم আয়াতের এই ওয়াহয়ির মধ্যে ছিল যা জ্ঞান, নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং বিগত কালে সেটা জানতে না পারার কারণ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার এটাও ছিল, প্রমাণিত ইলমী হাকিকতসমূহের স্বীকৃতির অভাব।

"কখনো নয়। আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তায়ালা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে তার বোঝা হাল্কা করেন, অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির-যত্ন ও মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে চলতে গিয়ে তকলীফ ও বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করেন।"[১]

ওয়ারাকা ইবন নওফলের মজলিসে

হযরত খাদীজা (রা) এ কথাগুলো তাঁর সুস্থ প্রকৃতি ও বিশুদ্ধ ফিতরত এবং আপন জীবনের অভিজ্ঞতা ও লোকের সম্বন্ধে জানাশোনার ভিত্তিতে বলেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটি ছিল বড় ধরনের এবং এতে এমন কোন লোকের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল যিনি বিভিন্ন ধর্ম ও সে সবের ইতিহাস, নবুওয়াত ও তার মেযাজ এবং কিতাবীদের সম্পর্কে বেশ ভালভাবে জানা আছে, যার নিকট আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনাবলী ও তাঁদের জ্ঞানের কিছুটা ছিটেফোঁটা হলেও বর্তমান।

তিনি ভাবলেন, তাঁর জ্ঞানী ও মনীষী চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফলের সাহায্য নেয়া দরকার। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাথে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারাকাকে সমগ্র ঘটনা বললেন। ওয়রাকা শুনতেই বলেন, কসম সেই পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন! আপনি এই উম্মতের নবী! আপনার নিকট সেই নামুসে আকবর এসেছিলেন যিনি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। একদিন আসবে যখন আপনার জাতি ও সম্প্রদায় আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং কষ্ট দেবে, আপনাকে বের করে দেবে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ কথা শুনলেন, আপনার জাতি ও সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দেবে তখন কিছুটা আশ্চর্য হলেন! কেননা তিনি জানতেন, কুরায়শ সমাজ তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানে এবং তিনি এও জানতেন, তাঁকে সাদিক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত, আমানতদার) বলতে তাদের মুখে ফেনা উঠে যায়। তিনি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা আমাকে বের করে দেবে!" ওয়ারাকা জওয়াব দিলেন, "হ্যাঁ, আপনি যেই পয়গাম নিয়ে এসেছেন সেই পয়গাম যখনই অন্য কেউ নিয়ে এসেছেন তখন লোকে তাঁর শত্রু হয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে। বরাবরই তাই হয়ে এসেছে। আমি যদি সেদিন থাকি আর আমার হায়াতে যদি কুলায় তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব।"[২]

এরপর অনেক দিন যাবত ওয়াহয়ির সিলসিলা বন্ধ থাকে। পুনরায় এর ধারা শুরু হয় এবং কুরআন মজীদ নাযিল হতে থাকে।

---

১. সহীহ বুখারী, باب كيف كان بدءالوحى الى رسول الله ﷺ

২. সহীহ বুখারী, হযরত আইশা (রা)-এর হাদীছ থেকে গৃহীত, অধ্যায় كيف كان بدء الوحى ও সীরাত ইবনে হিশাম, ২৩৮ পৃ.।

হযরত খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর অবদান

সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। দাম্পত্য সূত্রের কারণে তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত ও সান্নিধ্য এবং সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের বেশ ভাল সুযোগ ছিল। তিনি প্রতিটি মওকায় তাঁর পেছনে দাঁড়ান এবং সহায়তা করতেন। লোকে তাঁকে যে কষ্ট দিত তিনি তা হাল্কা করার সব সময় চেষ্টা পেতেন এবং তাঁকে সাহস যোগাতেন।

হযরত আলী ও যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এরপর হযরত আলী ইবন আবী তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। পেরেশানী ও দুর্ভিক্ষের আমলে চাচা আবূ তালিবের নিকট থেকে তিনি হযরত আলীকে চেয়ে নিয়েছিলেন এবং আপন পরিবারে শামিল করে নিয়েছিলেন।[১] এরপর যায়দ ইবনে হারিছা (যিনি ছিলেন তাঁর গোলাম ও পালক পুত্র) ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

এঁদের ইসলাম গ্রহণ ছিল মূলত এমন সব লোকের সাক্ষ্য যাঁরা ছিলেন তাঁর নিকটতম এবং যাঁরা তাঁর সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে ওয়াকিফহাল এবং পরিবারের লোকদের মত গোপন ও প্রকাশ্য খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারে তাঁর অংশ

হযরত আবূ বকর ইবন আবী কুহাফার ইসলাম গ্রহণও আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এজন্য যে, তাঁর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি, উন্নত মনোবল, চারিত্রিক ভারসাম্য ও মধ্যম পন্থার কারণে কুরায়শদের মাঝে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন তিনি। তিনি ইসলামের ঘোষণা দেন এবং তা প্রকাশও করেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং সহজ সরল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। কুরায়শদের বংশধারা ও তাঁর ইতিহাস তিনি জানতেন। একজন উন্নত নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন তিনি, সফল ব্যবসায়ী তিনি, তাঁর আস্থাভাজন ও চেনাজানা লোকদেরকে এবং আশেপাশে অবস্থানকারী ঘনিষ্ঠ লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন।[৩] বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলমান।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২৪৫ পৃ.।

২. ঐ, ২৪৭ পৃ.।

৩. ঐ, ২৪৯ পৃ.।

কুরায়শ অভিজাতদের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবূ বকর (রা)-এর দাওয়াত ও তাবলীগে কুরায়শদের বহু নামকরা সর্দার ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উছমান ইবন আফফান, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবন আওফ, সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস, তালহা ইবন উবায়দিল্লাহ (রা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। হযরত আবূ বকর (রা) এঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে আসেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

এঁদের পরই কুরায়শদের আরও অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁরা সকলেই প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এঁদের কয়েকজনের নাম: আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আকরাম ইবন আবিল আরকাম, 'উছমান ইবন মাজউন, উবায়দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবন আবদিল-মুত্তালিব, সাঈদ ইবন যায়দ, খাব্বাব ইবনুল-আরাত, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আম্মার ইন ইয়াসির, সুহায়ব প্রমুখ (রাদিয়াল্লাহ আনহুম আজমাইন)।

এরপর বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। গোটা জামাআত ও দলকে দল ইসলাম কবুল করত আর এদের মধ্যে পুরুষরা যেমন থাকত, তেমনি থাকত নারীরাও, এমন কি একদিন ইসলামের আওয়াজ মক্কার আকাশে-বাতাসে পথে-প্রান্তরে ধ্বনিত হতে থাকে এবং সবখানে এর ব্যাপক আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়।[২]

সাফা পর্বতে সত্যের প্রথম ঘোষণা

প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ গোপনে করতে থাকেন। আর এভাবেই কেটে যায় তিনটি বছর। অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে খোলামেলা ও প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ ঘোষিত হয়। ইরশাদ হয়:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"অতএব, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর।" [সূরা হিজর, ৯৪ আয়াত]

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২৫০-৫১ পৃ.।
২. ঐ, ২৬২ পৃ.।

"তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও আর যারা তোমার অনুসরণ সেই সমস্ত মুমিনের প্রতি বিনয়ী হও।" [সূরা শুআরা ঃ ২১৪-১৫]

وَقُلْ اِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ .

"এবং বল, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী!"

এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করলেন এবং সজোরে ডাক দিলেন : يا صباحاه –এই ডাক ছিল আরবদের নিকট পরিচিত। যখন কোন দুশমন কিংবা শত্রুদলের আক্রমণের আশংকা নিকভাবে দেখা দিত তখন এই শব্দে ডাক দেয়া হতো। অতএব, এই ডাক তেই কুরায়শদের সকল গোত্র দৌড়ে এসে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত । যারা কোন কারণে আসতে পারল না তারাও তাদের পক্ষ থেকে কাউকে না কে পাঠিয়ে দিল। সে সময় তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

"ওহে বনী আবদুল মুত্তালিব! হে ফিহির বংশধর! ওহে বনী কা'ব! যদি আমি মাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের অপর পাশে একদল শত্রু সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের ওপর হামলার অপেক্ষা করছে তবে কি তোমরা তা বিশ্বাস রবে?"

আরবরা ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী ও কাজের লোক। তারা একটা লোকের সত্যবাদিতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও কল্যাণ বারবার প্রত্যক্ষ করেছে। তারা দেখতে পেল, সেই ব্যক্তি (যাঁর সম্পর্কে তখন পর্যন্ত এটাই ছিল তাদের মত) পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে আর পাহাড়ের অপর পাশও সে দেখতে পাচ্ছে তারা দেখবে কেবল তাদের সামনের জিনিস, তখন তাদের মেধা, বুদ্ধিমত্তা, পরায়ণতা এবং উল্লিখিত বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী সংবাদদাতার সংবাদ ও তথ্য দের পথ দেখাল। তারা সমস্বরে বলল, "হ্যাঁ, আমরা তা বিশ্বাস করব।"

য়াত ও তরবিয়তের সুবিজ্ঞ ধারা

এই প্রকৃতিসম্মত ও প্রাথমিক পর্যায় যখন অতিক্রম করল এবং শ্রোতাদের ও বিশ্বাসের কথা জানতে পারলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَـ "তাহলে জেনে রেখ, আমি তোমাদেরকে এক শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখাতে এবং সতর্ক ও সাবধান করতে এসেছি যে শাস্তি দের একেবারে সামনে!"

এটি ছিল প্রকৃতপক্ষ নবূওয়াত পদের সঠিক সংজ্ঞা ও পরিচয় জ্ঞাপন। অদৃশ্য ও আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞানের ভেতর নবূওয়াতের যে বিশেষত্ব ও একক দিক রয়েছে তার বিরাট হেকমত ও প্রতিনিধিত্ব যার নজীর আমরা ধর্মসমূহের ও

নবূওয়াতের ইতিহাসে পাই না। ঘটনা হলো, এ থেকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ রাস্তা এব এর চেয়ে বেশি বোধগম্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনা আর কিছু হতে পারত না।

একথা শুনতেই সমবেত জনতার ওপর এক ধরনের নীরবতা ছেয়ে গেল কিন্তু আবূ লাহাব বলে উঠল, গোটা দিনই তোমার জন্য দুঃসংবাদ বয়ে আনুক কেবল একথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকেছিলে?[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তুলনাহীন পয়গম্বরসুলভ কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাদেরকে এই সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে সতর্ক করলেন যে, সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু তাদের ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে এবং তাদের ঘরেই বসে রয়েছে। আসলে তাকে ত্যাগ করা এবং তার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা দরকার। কোন পাহাড়-পর্বতের গুহা কিংবা কোন পাঁচিলের আড়ালে বসে থাকা এবং কঠিন মুহূর্তে হঠাৎ হামলাকারী দুশমনের জানমালের ধ্বংস ও ক্ষতি যা তারা করতে পারে তা এই ধ্বংসাত্মক ও রক্তপিয়াসী দুশমনের মুকাবিলায় তার কতটুকু মূল্য যা তার নিজের ভেতরই লুকিয়ে রয়েছে? এই বিশাল সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও শাসনকর্তা এবং আপন মেহেরবান অনুগ্রহদাতার সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর হক ও দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তাঁর সবচেয়ে উত্তম নামসমূহ (আসমাউল-হুসনা) থেকে গাফিলতি, প্রকাশ্য শির্ক ও প্রতিমা পূজা, অন্ধভাবে বেপরোয়া হয়ে নফস ও কামনা-বাসনার গোলামী, বাজে ও উদ্ভট কল্পনার দাসত্ব, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন, নিষিদ্ধ ও অবৈধ বস্তু, জুলুম-নিপীড়ন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও অন্যায়-অবিচারের ভেতর আগাগোড়া নিমজ্জিত থাকা হঠাৎ আক্রমণের আশায় ওঁৎ পেতে বসে থাকা শত্রুদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর, কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক। এর আশঙ্কায় চোখের ঘুমও পালিয়ে যায় এবং এতটুকু সংবাদ মিলতেই সে পাগলের মতই ঘরবাড়ি ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

শত্রুতা আরম্ভ এবং আবূ তালিবের প্রতিরোধ ও অপত্যস্নেহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন এবং নির্ভয়ে ও শঙ্কাহীন চিত্তে ইসলামের ঘোষণা দিতে লাগলেন তখন পর্যন্ত তাঁর জাতি এ বিষয়ে বেশি গ্রাহ্য করেনি এবং তেমন ভয়ের কারণও তারা বোধ করেনি। তারা এই দাওয়াতকে ফিরিয়ে দেয়া কিংবা এর জওয়াব দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু তিনি যখন তাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করতে শুরু করলেন অমনি তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল এবং একযোগে তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবূ তালিব তাঁকে রক্ষা করতে বুক পেতে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সদয় ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অতঃপর কায়মনে

---

১. এই ঘটনা ইবনে কাছীর, ১ম খ., পৃ. ৪৫৫-৫৬-এ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল-এর সূত্রে গৃহীত হয়েছে যা ইবনে আব্বাস থেকে এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছে। ইবন কাছীর বলেন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও আ'মাশ থেকে এ ধরনের বর্ণনা করেছেন।

...ত, তাবলীগ ও সত্যের প্রকাশ্য ঘোষণায় নির্দিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং কোনরূপ ...-বিঘ্নের প্রতিই একেবারেই তোয়াক্কা করলেন না। অপরদিকে আবূ তালিব তাঁর ... ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রযত্নে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ তালিবের কথোপকথন

এখন কুরায়শদের ভেতর চারদিকে ও সব সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে ...প-আলোচনা ও গুঞ্জরণ শুরু হলো। তারা একে অপরকে তাঁর বিরোধিতায় ও ...নিতে উৎসাহিত করতে লাগল এবং এর জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে লাগল। ...দিন তারা দলবদ্ধ হয়ে আবূ তালিবের নিকট গেল এবং তাঁকে বলল :

"আবূ তালিব! আপনি একজন প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ মানুষ। আমাদের দৃষ্টিতে আপনার একটা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। আমরা এর আগেও আপনার ...মতে আরজ করেছিলাম, আপনি আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করুন। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি কিছুই করেননি। খোদার কসম করে বলছি, এ যাবত যে ধৈর্যের পরিচয় আমরা দিয়েছি এর চেয়ে বেশি ধৈর্য ধারণ আমরা আর করব না। এখন আমরা আমাদের বাপ-দাদার নিন্দার, আমাদেরকে অবুঝ ও বোকা ঠাওরাবার এবং আমাদের উপাস্য দেবদেবীগুলোর দোষারোপ করার চেষ্টা আর বেশি দিন বরদাশত করতে পারছি না। হয় আপনি তাঁকে এ থেকে বিরত রাখুন, অন্যথা আমরা তাঁর ও আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করব যতক্ষণ না আমাদের কোন এক পক্ষ খতম হয়ে যায়।"[১]

আবূ তালিবের পক্ষে আপন জাতিগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা মেনে নেয়া যেমন কষ্টকর ছিল, তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাহায্য-সমর্থনের প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিতেও তিনি রাজি ছিলেন না, সম্মত ছিলেন না তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে। তিনি ভাতিজাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, ভাতিজা আমার! তোমার জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা আমার কাছে এসেছিল এবং এ ধরনের কথা বলেছে। এখন আমার দিকেও একটু খেয়াল দাও আর নিজের জানেরও মায়া কর। আমার ওপর এত বড় বোঝা চাপিয়ে দিও না যা আমি বহন করতে পারব না।

যদি ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদও দেয়া হয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে ধারণা করলেন, সম্ভবত চাচা আবূ তালিবও এবার তাঁর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ও সংশয়াকুল। এরপর তিনি আর তাঁর বেশি সাহায্য-সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারবেন না। তিনি বললেন, "চাচা! আল্লহর কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদও তুলে দেয় আর তারা যদি চায়, আমি এই কাজ ছেড়ে দিই তবুও আমি ততক্ষণ এ থেকে বিরত হব না যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করেন অথবা এ পথে আমি ধ্বংস হয়ে যাই।"

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২৬৫-৬৬ পৃ.

এ কথা বলতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি কেঁদে ফেলেন। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং বেরিয়ে যেতেই আবূ তালিব তাঁকে ডাকেন এবং বলেন, "ভাতিজা! আমার কাছে এস। তিনি কাছে যেতেই বললেন, যাও! তোমার মনে যা চায় বল এবং যেভাবে চাও প্রচার চালিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।"[১]

কুরায়শগণ কর্তৃক মুসলিম নিপীড়ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে আল্লাহর দিকে পূর্ণ শক্তিতে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। কুরায়শরা যখন তাঁর চাচা আবূ তালিবের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল তখন তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তাদের গোত্রের সেই সব লোকের ওপর যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁদেরকে সাহায্য-সমর্থন করবার মত কেউ ছিল না।

প্রতিটি গোত্রই তাদের গোত্রেরই সেই সব লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যাঁরা ইসলাম কবুল করেছেন। এই সব লোককে বন্দিত্ববরণ, মারপিট, ক্ষুধা-পিসাসা, মক্কার ভীষণ গরম ও চোখ ঝলসানো রৌদ্রের তীব্র দহনের কষ্ট সইতে হয়।

হযরত বেলাল হাবশী (রা)-কে ইসলাম কবুলের কারণে তাঁর মনিব উমায়্যা ঠিক দুপুরের তপ্ত রৌদ্রে বাইরে নিয়ে আসত, এরপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে দিত। তারপর বলত: না, আল্লাহর কসম! না, তোমাকে এই অবস্থায় রাখা হবে যতক্ষণ না তোমার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায় অথবা তুমি মুহাম্মদের ধর্ম অস্বীকার কর এবং লাত ও উযযার পূজা পুনরায় শুরু কর। কিন্তু তিনি এই কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্তেও আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের ঘোষণা করা থেকে বিরত হতেন না এবং বলতেন, "আহাদ! আহাদ"-তিনি এক, একজন!

এ রকম অবস্থায় একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত বেলাল (রা)-কে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁর মনিব উমায়্যাকে তাঁর অধিক চেয়ে মজবুত, মোটাসোটা ও কৃষ্ণকায় একজন গোলামের বিনিময়ে তাঁকে (বেলালকে) মুক্ত করে দেন।[২]

বনী মাখযুম আম্মার ইবনে ইয়াসির, তাঁর পিতা ও মাতার ইসলাম কবুলের অপরাধে বাইরে নিয়ে আসত এবং তাঁদেরকে মক্কার ভীষণ গরম ও তপ্ত রৌদ্রে ফেলে বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিত। যদি কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিক দিয়ে যেতেন এবং তাঁদেরকে এ অবস্থায় দেখতে পেতেন তখন বলতেন, "ওহে ইয়াসরিব পরিবার! একটু সবুর কর! তোমাদের মনযিল তো জান্নাতে!" তাঁর মা হযরত

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২৬৫-৬৬ পৃ.।

২. সীরাত ইবনে হিশাম, ৩১৭-১৮ পৃ.।

সুমায়্যা (রা)-কে মুশরিকরা সেই সময় শহীদও করে দেয়। কেননা তিনি ইসলাম ছাড়া আর সব কিছুকেই অস্বীকার করেছিলেন।[১]

মুস'আব ইবন 'উমায়র (রা) ছিলেন মক্কার উত্তম পোশাকের অধিকারী একজন যুবক। আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের ভেতর তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার অতি আদরের দুলাল। তাঁর মা ছিলেন একজন ধনবতী মহিলা। মা তাঁকে সর্বদা ভাল ভাল ও দামী কাপড়-চোপড় পরাতেন। সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহারেও মক্কায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। খুবই দামী হাদরামী জুতা ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা বলতে গিয়ে বলতেন, মক্কায় মুসআব ইবন উমায়র-এর চেয়ে সুন্দর আকৃতি-প্রকৃতি, উত্তম বসন-ভূষণ ও সবচেয়ে বিলাস ব্যসনে লালিত-পালিত আর কাউকে আমি দেখিনি। মুসআব ইবন ইমায়র (রা) যখন জানতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "দারুল আরকাম"-এ ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন তখন তিনিও সেখানে গিয়ে পৌঁছেন, ইসলাম কবুল করেন এবং তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য দেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি তাঁর মা ও স্বজাতির ভয়ে একথা প্রকাশে বিরত থাকেন এবং গোপনে গোপনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করে থাকেন।

'উছমান ইবনে তালহা একবার তাঁকে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখে ফেলেন এবং এ কথা তাঁর মা ও গোত্রের লোকদেরকে জানিয়ে দেন। তারা তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং বন্দী করে রাখে। আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত পর্যন্ত তিনি বন্দী অবস্থায় থাকেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আবিসিনিয়াগামী প্রথম কাফেলার সঙ্গে হিজরত করেন। এরপর তিনি মুসলমানদের সঙ্গে এমন শান-শওকতের সঙ্গে ফিরে আসেন যে, তাঁর অবস্থা আমূল বদলে গিয়েছিল এবং কোমলতা ও প্রাচুর্যের বিপরীতটাই ঘটে গিয়েছিল। তাঁর মা তাঁর এই পরিবর্তন দেখে তাঁকে অভিশাপ দেয়া ও গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকে।[২]

কিছু সংখ্যক মুসলমান মুশরিকদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এরা ছিল মুশরিক কুরায়শদের প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী সর্দার। তারা আশ্রিত মুসলমানদের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করত। 'উছমান ইবন মাজউন (রা) ওয়ালীদ ইবন মুগীরার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁর মর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। তিনি এ অবস্থা মেনে নিতে অসম্মত হন এবং তাঁর সাহায্য-সমর্থন ও যিম্মাদারী তাকে ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা, আমি গায়রুল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করব না। এ নিয়ে তাঁর ও অন্য এক মুশরিকের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এতে উক্ত মুশরিক রেগে গিয়ে তাঁর চোখে এমন জোরে ঘুষি মারে যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারাবার উপক্রম হয়। ওয়ালীদ

---

১. ঐ, ৩১৯-২০ পৃ.।

২. তাবাকাত ইবন সা'দ, ৩খ., ৮২ পৃ., ইস্তীআব, ১খ., ২৮৮ পৃ.।

ইবন মুগীরা কাছে থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। সে বলল, আল্লাহর কসম! ভাতিজা আমার, তোমার চোখ এই ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্ত ছিল, নিরাপদ ছিল। তুমি এক মজবুত আশ্রয়ে ছিলে (খামাকা তুমি এক বিপদ ডেকে এনেছ)। হযরত 'উছমান ইবন মাজউন (রা) জওয়াব দেন, আল্লাহর কসম! আমার ভাল চোখটিও ইচ্ছে করছে তার সাথেও একই ঘটনা ঘটুক! ওহে আবদু'স-শামস! আমি তো তাঁর গৃহে তাঁর আশ্রয়ে রয়েছি যিনি তোমার চেয়ে বেশি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী।[১]

হযরত 'উছমান ইবন 'আফফান (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল-আস ইবন উমায়্যা তাঁকে খুব শক্ত করে বাঁধে। এরপর বলল, তুমি কি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ? আল্লাহর কসম! তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁধনমুক্ত করব না যতক্ষণ না তুমি তোমার এই ধর্ম পরিত্যাগ করবে। হযরত 'উসমান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কোনদিন ও কখনও এই ধর্ম পরিত্যাগ করব না। হাকাম যখন ধর্মের ওপর তাঁর দৃঢ়তা ও অটুট বিশ্বাস দেখতে পেল তখন সে তাঁকে ছেড়ে দিল।[২]

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বলেন, একদিন কুরায়শ গোত্রের লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তারা আগুন জ্বালাল এবং আমাকে টেনে-হিঁচড়ে সেখানে নিয়ে ফেলল। এরপর একজন এসে আমার বুকের ওপর তার পা এভাবে তুলে চেপে ধরল যে, আমার পিঠ মাটির সঙ্গে লেগে গেল। এরপর তিনি পিঠ আলগা করে দেখালেন, দেখতে পেলাম গোটা পিঠটাতেই ধবল কুষ্ঠের মত দাগ পড়ে গেছে।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কুরায়শদের শত্রুতার নানা পদ্ধতি

ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এসব টগবগে যুবা ও তরুণকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার কুরায়শদের সকল প্রয়াস যখন ব্যর্থ হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভেতরও কোনরূপ নমনীয়তা সৃষ্টি করতে পারল না তখন বিষয়টি ইসলামের শত্রুদের নিকট খুবই অসহনীয় হয়ে উঠল। তারা কিছু মূর্খ ও মাস্তান কিসিমের লোককে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। এরা তাঁকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেষ্টা করল এবং নানা রকমের কষ্ট ও যন্ত্রণা দিতে শুরু করল। তাঁর প্রতি যাদুকর, কবি, গণক, মাথা খারাপ ইত্যাদি নানা ধরনের বদনাম চাপাল। তাঁকে কষ্ট দেবার নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে লাগল এবং সব রকমের অস্ত্রই তাঁর ওপর প্রয়োগ করল।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., ৩৭০-৭১ পৃ.।
২. তাবাকাত, ৩খ., ৩৭ পৃ.।
৩. ঐ, ১১৭ পৃ.।

একদিন মক্কার কুরায়শ নেতৃবর্গ হিজর-এ সমবেত ছিল। এমন সময় হঠাৎই রাসূলুল্লাহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাওয়াফরত অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ-কে লক্ষ্য করে কিছু কটূক্তি করল, বিদ্রূপ করল। তিনবার যখন তিনি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন তিনবারই তারা তাঁকে নিয়ে হাসি-মস্করা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। শেষে তিনি থামলেন এবং বললেন, "কুরায়শ-এর লোকেরা! তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ! কসম সেই সত্তার যাঁর কব্জায় আমার জীবন! আমি তোমাদের জন্য ধ্বংস বয়ে এনেছি। তাঁর এই কথায় সবাই এভাবে নিশ্চুপ হয়ে যায় যে, মনে হচ্ছিল কারও ধড়েই বুঝি প্রাণ নেই! এরপর তিনি তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ও আত্মীয়তার কথা বলা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। গতকালের লোকেরাই সেখানে ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সেখানে তশরীফ নিলেন। তারা সকলে এক সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে ঘিরে ধরল। এদের একজন তাঁর চাদর ধরে এমন জোরে হেঁচকা টান দিল যে, তা রাসূলুল্লাহ-এর গলায় পেঁচিয়ে তাঁর শ্বাস বন্ধ করবার উপক্রম হলো। এ দৃশ্য দেখতেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ও লোকটির মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّىَ اللّٰهُ তোমরা একজন লোককে "আমার রব আল্লাহ" বলার অপরাধে জানে-প্রাণে মেরে ফেলতে চাও? এতে তারা রাসূলুল্লাহ-কে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু আবূ বকর (রা)-এর দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং তাঁকে প্রহার করতে থাকল।

অবশেষে তারা হযরত আবূ বকর (রা)-এর দাড়ি ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায় এবং তিনি এই অবস্থায় বাড়ি গিয়ে পৌঁছেন যখন তাঁর মুখ-মাথা ফুলে গিয়েছিল।

একদিন রাসূলুল্লাহ বের হলেন। সারা দিনটিই তাঁকে কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এমন একজনকেও পাওয়া যায়নি যে, তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি কিংবা কোন রকমের কষ্ট দেয়নি। যখন তিনি ঘরে ফিরলেন কষ্টের তীব্রতায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, এ সময় সূরা মুদাচ্ছিরের প্রথম দিককার কয়েকটি আয়াত নাযিল হয় এবং তাঁকে يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করা হয়।[১]

---

১. বিস্তারিত দ্র. সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., ২৮৯-৯১; ইমাম বুখারীও এই ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন
باب مالقى رسول الله صـ واصحابه من المشركين بمكة

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে কুরায়শ কাফিরদের ব্যবহার

একদিন হযরত আবূ বকর (রা) একটি জনসমাবেশে তাবলীগে দীনের তথা ইসলাম প্রচারের নিয়তে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। কুরায়শরা রাগে বেদিশা হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড প্রহারে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলল। উতবা ইবন রবী'আ এক জোড়া পুরনো ছেঁড়া জুতো দিয়ে তাঁর চেহারায় এমনভাবে মারতে লাগল যে, সেই আঘাতে চেহারা ফুলে এমন হয়েছিল যে, তাঁকে আর চিনবার উপায় ছিল না।

বনূ তামীম হযরত আবূ বকর (রা)-কে মৃতপ্রায় অবস্থায় সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। দুপুরের পর তিনি হুঁশ ফিরে পান। হুঁশ ফিরে পাবার পর প্রথম শব্দ যা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল তা ছিল এই, "আমাকে আগে বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তিনি ভাল আছেন তো?" এতে তারা হযরত আবূ বকর (রা)-কে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলেছিল, দেখ, নিজে মরতে বসেছে সেদিকে খেয়াল নেই, অথচ যাঁর জন্য মরতে বসেছে তাঁর দিকে টান ষোল আনা এখনও বর্তমান। সেই মুহূর্তে উম্মু জামীল যিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর নিকটবর্তী হন। তিনি তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করেন। তিনি তখন বলেন, আপনার আম্মা কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শুনে ফেলবেন। এতে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, তাঁর সামনে বললে কোন ক্ষতি নেই।

উম্মু জামীল বললেন, তিনি বহাল তবিয়তেই ও সহীহ-সালামতেই আছেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর দরবারে মানত মেনেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে বরকতময় খেদমতে হাজির হতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন কিছু খাব না, পানও করব না। কিন্তু তাঁরা দু'জন থেমে গেলেন। এরপর লোকজনের আনাগোনা বন্ধ হলো এবং চারদিক যখন নীরব হলো তখন তাঁরা উভয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-কে ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নিয়ে আসেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ব্যথিত হন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর মায়ের জন্য দু'আ করেন এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করলে তিনি সেই মুহূর্তেই মুসলমান হয়ে যান।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি করতে কুরায়শদের অপপ্রয়াস

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে খুবই পেরেশান ছিল। তাদের বুঝতে পারছিল না, তাঁর সম্বন্ধে এমন কি বলা যায় যদ্দরুন লোকে তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে এবং তাঁর নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাকে। তারা মনেপ্রাণে চাইত, যে সমস্ত কাফেলা দূর ও কাছাকাছি এলাকা থেকে আসত, তাঁর পয়গাম শুনত

---

১. সীরাত ইবন কাছীর, ১খ., ৪৩৯-৪১ পৃ.।

তাদেরকে কোনক্রমে দূরে সরিয়ে দেয়া ও কাছে ঘেঁষতে না দেয়া। তারা সকলে মিলে ওয়ালীদ ইবন মুগীরার নিকট গেল (যে তাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ছিল আর হজ্জ মৌসুমও ছিল আসন্ন) এবং তার পরামর্শ চাইল। সে বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! হজ্জ মৌসুম এসেই গেল প্রায়! এই মৌসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হজ্জ প্রতিনিধি দল আসবে। তাদের সকলের কানে এ কথা পৌঁছে গেছে। এজন্য এই লোকটি সম্পর্কে সবাই মিলে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যাতে তোমরা পরস্পর মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না হও। তোমরা সবাই একই কথা বল। অনেকক্ষণ ধরে তারা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করল এবং বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হলো। কিন্তু ওয়ালীদ কোন কথাতেই তৃপ্ত হলো না। সে সব প্রস্তাবকেই অসম্পূর্ণ ও ভুল ঠাওরাল। এবার কুরায়শরা এ ব্যাপারে তার নিজের মতামত কি তা জানতে চাইল। সে উত্তর দিল, আমার ধারণায় সবচে' মনে ধরার মত কথা হবে, তোমরা সবাই মিলে যাদুকর বল। বল, মুহাম্মদ যাদু দেখাতে এসেছে। সে তাঁর যাদু দ্বারা বাপ-বেটা, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের লোক ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়।

এই খবর নিয়ে তারা সেখান থেকে ফিরল। হজ্জ মৌসুম আসতেই ও কাফেলার আগমন শুরু হতেই এরা সকলে মক্কার বিভিন্ন আসা-যাওয়ার পথে ও সাধারণ সড়ক পথের ওপর দিয়ে বসে পড়ল। সেখান দিয়ে যারাই এ পথ দিয়ে যেত তারা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যেতে বাধা দিত এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে কথা বারবার বলত।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট প্রদানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিয়ে ও চরম নিষ্ঠুরতা দেখাল। বিভিন্ন পন্থায় তারা তাঁকে কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট দিল। এ ক্ষেত্রে তারা না আত্মীয়তার তোয়াক্কা করল, আর না পরওয়া করল মানবতার।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল-হারামে সিজদারত ছিলেন। তাঁর কাছাকাছি কুরায়শরা বসে ছিল। তাদের ভেতর থেকে উকবা ইবন আবী মু'ঈত উঠে গিয়ে কোন এক জায়গা থেকে একটা মরা উটের নাড়ীভুঁড়ি এনে তাঁর পিঠের ওপর চাপিয়ে দিল। নাড়ীভুঁড়ির ভারে তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলতে পারছিলেন না। এমন সময় খবর পেয়ে কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) সেখানে ছুটে এলেন এবং সে সব সরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভারমুক্ত করলেন এবং উক্ত পাষণ্ডকে বদ দু'আ দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ঐসব পাষণ্ডের জন্য বদ দু'আ করলেন।[২]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., ২৭০ সংক্ষেপে।

২. বুখারী ذكر ما لقى النبى صـ واصابه من المشركين بمكة

হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

একদিন আবূ জেহেল সাফা পর্বতের পাদদেশে রাসূলুল্লাহ-এর পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। সে রাসূলুল্লাহ-কে একা দেখতে পেয়ে বেশ গালমন্দ দিল এবং নিপীড়ন করল। তিনি এর কোন উত্তর দিলেন না দেখে সে চলে গেল অল্পক্ষণ পরই হযরত হামযা তীর-ধনুকসজ্জিত অবস্থায় শিকার থেকে ফিরে এলেন। তিনি কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও উদ্যমী যুবক হিসাবে বিবেচিত হতেন তাঁকে আবদুল্লাহ ইবন জাদ'আনের বাঁদী এই ঘটনা বিবৃত করে। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেই মুহূর্তেই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন, আবূ জেহেল তার লোকজনের মাঝে বসে আছে। তিনি তার কাছে গেলেন এবং একেবারে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ধনুক দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন এবং ভীষণ রকম আহত করলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার এত বড় সাহস যে, তুমি তাঁকে গাল-মন্দ কর এবং কটু বাক্য বল, অথচ আমি তাঁরই দীনের ওপর আছি এবং সে যা বলে তা আমি বলি। আবূ জেহেল চুপ করে থাকল। আর হযরত হামযা (রা) ইসলাম কবুল করলেন। তাঁর বীরত্বে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার কারণে কুরায়শরা ভীষণ এক চপেটাঘাত পেল।[১]

উতবা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারস্পরিক কথা

কুরায়শরা যখন দেখতে পেল, রাসূলুল্লাহ-এর সমর্থক সহযোগী ও ঈমানদারদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়তে যাচ্ছে, তখন ইতবা রবী'আ এই প্রস্তাব পেশ করল, রাসূলুল্লাহ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতার কোন একটা পন্থা খুঁজে বের করা যাক। সে কুরায়শদের নিকট অনুমতি চাইল, রাসূলুল্লাহ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু প্রস্তাব তাঁর সামনে রাখতে চায়। সম্ভবত সে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে স্বীয় দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে বিরত থাকবে। কুরায়শরা তাকে অনুমতি দিল এবং তাকে এ ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করল।

উতবা রাসূলুল্লাহ-এর নিকট গেল এবং তাঁর সামনে গিয়ে বসল তারপর বলল, ভাতিজা! তুমি আমাদের ভেতর যে মর্যাদা ও পদের অধিকারী তা তুমি জান। তুমি এক ঝগড়া ও গণ্ডগোলের বিষয় তোমার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এনে ছড়িয়ে দিয়েছ। তুমি তাদের ঐক্য ও সংহতিকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছ। তাদেরকে বেওকুফ ও নাদান ঠাওরেছ। তাদের উপাস্য দেবদেবীগুলোকে ও তাদের ধর্মের ওপর দোষ চাপিয়েছ। তাদের পূর্বপুরুষ ও পিতৃ-পিতামহদের তরীকাকে অস্বীকার করেছ। এখন আমি কয়েকটি কথা তোমার সামনে রাখছি। সম্ভবত এগুলোর মধ্যে কোন একটি তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., ২৯১-৯২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবুল-ওয়ালীদ! তোমার যা বলার অসংকোচে বল। আমি শুনছি।

সে বলল, ভাতিজা আমার! যে তরীকা ও যেই দীন তুমি নিয়ে এসেছ, এর পেছনে যদি তোমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে থাকে ধন-সম্পদ অর্জন তাহলে আমরা সেই ধন-সম্পদ তোমার জন্য এতটাই জমা করব যে, তুমি হবে আমাদের ভেতর সবচে' ধনবান। যদি সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা হিসাবে মেনে নেব এবং তোমার মর্জির বাইরে কোন ফয়সালা আমরা করব না। যদি বাদশাহী চাও, চাও রাজক্ষমতা, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানাব, আর যদি কোন প্রেতাত্মা, জিন ইত্যাদির আছরজনিত কারণে এসব হয়ে থাকে আর এর প্রতিরোধক যদি তোমার কাছে না থাকে তাহলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারি এবং এজন্য যত টাকা দরকার আমরা দেদার খরচ করতে পারি যাতে তুমি তার হাত থেকে পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করতে পার।

উতবার যখন সব কিছু বলা হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যা কিছু বলার ছিল তা কি বলেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এবার আমার কথা শোন।

এরপর তিনি সূরা ফুসসিলাত-এর কিছু আয়াত সিজদার আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। উতবার কানে কালামে পাকের আয়াত পৌঁছুতেই সে নীরবে তা শুনতে লাগল। তার দুই হাত ছিল পেছনের দিকে ঠেস দেয়া আর তার কান দুটো ছিল ঐশী বাণী শ্রবণে একান্তভাবে মগ্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছুতেই সিজদা করলেন। এরপর বললেন, আবুল-ওয়ালীদ! তোমার যা কিছু শোনার ছিল শুনেছ। এখন যা মনে করার কর।

উতবা যখন তার সাথীদের নিকট ফিরে গেল তখন লোকেরা তার চেহারা দেখে বলতে লাগল, আমরা কসম খেয়ে বলছি, আবুল-ওয়ালীদ যেই চেহারা নিয়ে গিয়েছিল এই চেহারা তার থেকে ভিন্ন। সে বসতেই লোকেরা তাকে জেঁকে ধরে জিজ্ঞেস করল, আবুল-ওয়ালীদ! খবর কি? কী সংবাদ নিয়ে এসেছ? উতবা বলল, খবর হলো, আমি তাঁর মুখে এমন এক কালাম শুনেছি যা এর আগে আমি আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম করে বলছি, হে কুরায়শগণ! এ কালাম কাব্য নয়, যাদু নয়, গণবিদ্যা নয় আর নয় জোতির্বিদ্যা। আমার কথা শোন এবং ঐ লোকটাকে তাঁর অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। একথা বলতেই তারা উতবাকে গালমন্দ দেয়া শুরু করল। তারা আরও বলল, মুহাম্মদের যাদু, আল্লাহর কসম, দেখছি তোমাকেও গ্রাস করেছে!

উতবা বলল, আমার কথা আমি তোমাদেরকে বললাম। এখন তোমাদের ইচ্ছা, যা খুশি করতে পার।[১]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১খ., ২৯৩-৯৪, পৃ.।

আবিসিনিয়া অভিমুখে মুসলমানদের হিজরত

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখতে পেলেন, তাঁর সাহাবাগণ তথা সঙ্গী-সাথীদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তিনি তাঁদের হেফাজত ও প্রতিরোধ করতে পারছেন না তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, যদি তোমরা চাও তবে আবিসিনিয়ার দিকে বেরিয়ে গেলে ভাল হবে। সেখানকার যিনি বাদশা তাঁর জন্য কেউ কারোর ওপর জুলুম করে না। দেশটা খুব ভাল। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের জন্য মুক্তির ও উপযুক্ত অন্য কোন ব্যবস্থা করছেন এটাই তোমাদের জন্য ভাল হবে।

এই সময় মুসলমানদের একটি দল আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করল। ইসলামের এটাই ছিল প্রথম হিজরত। এই দলে ছিলেন দশজন মুসলিম। দলের আমির নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত 'উসমান ইবন মাজ'উর (রা)। এরপর জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা) হিজরত করেন। এরপর একে একে অনেক মুসলমানই সেখানে গিয়ে পৌছেন। এঁদের ভেতর কেউ ছিলেন একাকী এবং কেউ কেউ পরিবার-পরিজনসহ হিজরত করেছিলেন। এসব লোক যাঁরা আবিসিনিয়ার পানে হিজরত করেছিলেন তাঁদের মোট সংখ্যা ৮৩ জন বলে কথিত।[১]

আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরতের পেছনে কুরায়শদের অত্যাচার-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, বরং বিদেশ-বিভুঁইয়ে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, সেই সঙ্গে নবী করীম ﷺ-এর দুশ্চিন্তার লাঘবও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

মুহাজিরদের তালিকা ভাল করে একটু খতিয়ে দেখলেই এর পরিধির বিশালতা ও বৈচিত্র্যের পরিমাপ করা যায় এবং জানা যায়, এই তালিকায় সমাজের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের প্রতিনিধি ছিলেন। এ দলে আমীর যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় ফকীরকেও, বৃদ্ধ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন যুবকও। পুরুষ যেমন, তেমনি নারীও এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন। আর এঁদের অধিকাংশেরই সম্পর্ক ছিল মক্কার বনেদী ও প্রাচীন খান্দানগুলোর সঙ্গে। এ থেকে ইসলামের দাওয়াতের বিরাট প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও এর শক্তির বিশালতা জানা যায়।

কুরায়শদের পশ্চাদ্ধাবন

কুরায়শরা যখন দেখতে পেল, মুসলমানরা যেখানে পৌঁছে গেছে এবং আরাম ও প্রশান্তির সঙ্গে রয়েছে তখন তারা আবদুল্লাহ ইবন আবী রবী'আ ও 'আমর ইবনুল-আস ইবন ওয়াইলকে সেখানে পাঠায় এবং তাদের সঙ্গে সম্রাট নাজাশীর যুদ্ধবাজ সর্দার ও সিপাহসালারদের জন্য এমন বহু উপহার-উপঢৌকনও পাঠায় যেগুলোকে মক্কার বিশেষ সওগাত মনে করা হতো। এরা দু'জন সম্রাট নাজাশীর

১. ঐ, ১ম খ., ৩২০-২১, পৃ.।

রে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সম্রাটের সিপাহসালার ও সর্দারদেরকে নানা উপহার পেশ করে তাদের অনুকূলে টেনে নেয়। সম্রাটের দরবারে এ কুরায়শ প্রতিনিধি এভাবে তাদের আলোচনা শুরু করে :

"মহানুভব সম্রাটের রাজ্যে আমাদের দেশের কিছু বেওকুফ ও তরুণ এসে নিয়েছে। এরা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, অথচ তারা আপনার ধর্মও করেনি, বরং তারা এক নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে, যে ধর্ম না আমরা চিনি না আপনারা চেনেন। আমাদেরকে আপনার কাছে তাদের সম্প্রদায়ের কিছু ও দায়িত্বশীল লোক (যারা তাদেরই বাপ-চাচা ও নিকটাত্মীয়) পাঠিয়েছেন আপনি তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কেননা এদের রে তারাই বেশি ভাল জানে এবং তারাই এদের আপনজন।"

সম্রাটের চারপাশে যেসব সর্দার ছিল তারা সকলেই এক বাক্যে বলে উঠল, মহানুভব সম্রাট! এঁরা দু'জন ঠিকই বলছেন। আপনি তাদেরকে ওঁদের দু'জনের হাতে তুলে দিন।

নাজাশী তাদের এ রকম কথায় খুবই রেগে গেলেন এবং তাদের কথা মেনে নিলেন না। যারা তাঁর মহানুভবতার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে এসেছে তাদেরকে বন্ধুহীন ও স্বজনহীন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া তিনি পছন্দ করেননি। এ ব্যাপারে শপথও করেন এবং মুসলমানদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের সেই ধর্ম কী যার জন্য তোমরা তোমাদের ও জাতি পরিত্যাগ করেছ এবং তোমরা না আমার ধর্ম গ্রহণ করেছ, আর না কোন পরিচিত ধর্ম কবুল করেছ?

জাফর ইবন আবী তালিব (রা)-এর ভাষণ: জাহিলিয়াতের উন্মোচন ও ইসলামের পরিচিতি পেশ

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতৃব্য পুত্র জাফর ইবন আবূ তালিব (রা) দাঁড়ান নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন,

"হে রাজন! আমরা ছিলাম এক জাহিল কওম। আমরা মূর্তি পূজা করতাম। জীব ভক্ষণ করতাম। সর্বপ্রকার নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও পাপে আমরা ছিলাম। আমাদের মধ্যে যারা সবল ও শক্তিশালী তারা দুর্বল ও কমজোর লোকদের খেতাম। আমরা এ রকম অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় আল্লাহ তায়ালা দের মধ্যে থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠালেন যাঁর খান্দান বংশ মর্যাদা কৌলিন্য শ্রেষ্ঠ, যাঁর সত্যবাদিতা, আমানতদারী, সচ্চরিত্র ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আগে থেকেই জানতাম। তিনি আমাদেরকে দাওয়াত দিলেন এক আল্লাহর ঈমান আনতে এবং কেবল তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করতে। তিনি আহ্বান লেন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা যেসব মূর্তি ও পাথরের পূজা করতেন

সেগুলোকে একেবারে ছেড়ে দিতে এবং সে সবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, আমানত আদায় করতে, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে,প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করতে, নাজায়েয ও হারাম কথাবার্তা ও না-হক খুন-খারাবী ত্যাগ করে চলতে নির্দেশ দেন। নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজ, মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণা, য়াতীমের মাল ভক্ষণ, সতী-সাধ্বী ও পবিত্রা রমণীদের চরিত্রে অপবাদ আরোপ করা থেকে তিনি নিষেধ করেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক না করি। তিনি আমাদেরকে সালাত, সাওম ও যাকাতের নির্দেশ দেন। (এ সময় তিনি ইসলামের অন্যান্য আরকানের বর্ণনাও দেন।)

আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনেছি, তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং যেসব তরীকা ও শিক্ষামালা তিনি আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন আমরা তার আনুগত্য করি, করি অনুসরণ। আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সঙ্গে অপর কাউকে শরীক করি না। তিনি যা হারাম করেছেন আমরা তা হারাম মেনেছি এবং তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল হিসাবে মেনে নিয়েছি। এতে আমাদের জাতিগোষ্ঠী আমাদের সঙ্গে দুশমনিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। তারা আমাদেরকে নানা রকমের কষ্ট দেয় এবং আমাদেরকে তাঁর প্রচারিত দীন থেকে বিচ্যুত করবার জন্য বিভিন্ন রূপ পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করে। তারা আরও চেষ্টা চালায় যেন আমরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিই, পুনরায় মূর্তি পূজা শুরু করি এবং যেই সব গোনাহ ও পাপ কাজকে প্রথমে বৈধ মনে করতাম পুনরায় তা বৈধ ও হালাল মনে করি।

যখন তারা আমাদের সঙ্গে জোর-যবরদস্তি করা শুরু করল, আমাদের ওপর জুলুম করল, আমাদের বেঁচে থাকাকে অসম্ভব করে তুলল, আমাদের ধর্মের পথে পর্বতসম বাধা হয়ে দাঁড়াল তখন আমরা আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছায় আপনার রাজ্যে আসি এবং এজন্য আপনাকেই আমরা নির্বাচিত করি। আপনার প্রতিবেশী ও আশ্রয়ের ইচ্ছা পোষণ করি। হে রাজন! আমরা এখানে এই আশায় এসেছি, এখানে আমাদের ওপর কোন জুলুম হবে না।

নাজাশী এই গোটা বক্তৃতা নীরব ও গম্ভীর হয়ে শুনলেন এবং বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার কিছু কি তোমাদের কাছে আছে? হযরত জা'ফর (রা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! আছে। নাজাশী বললেন, আমাকে তা পাঠ করে শোনাও।

হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারয়মের প্রথম দিকের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। তেলাওয়াত শুনে নাজ্জাশী কেঁদে ফেললেন এবং চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যায়। সম্রাটের দরবারের পাদরীরা পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন, এমন কি তাঁদের ধর্মীয় পুস্তক পর্যন্ত চোখের পানিতে ভিজে যায়।

হযরত জা'ফর (রা)-এর হেকমত ও অলংকারময় বক্তব্য

আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশীর সামনে হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা)-এর বক্তৃতা ও ইসলামের দাওয়াত, তার হেকমত, স্থান-কালের রে'আয়েত ও মানুষের মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে জানার এক চিত্তাকর্ষক নমুনা। এ থেকে শাব্দিক অলংকারের চেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক অলংকার প্রকাশ পায় যাকে ঐশী পথ-নির্দেশনা (রব্বানী হেদায়াত) ও গায়বী মদদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই বক্তৃতা থেকে জা'ফর (রা)-এর শান্ত প্রকৃতি ও দূরদর্শিতারও পরিচয় পাওয়া যায় যে ক্ষেত্রে বনূ হাশিম কুরায়শদের ওপর ও কুরায়শ গোত্র সমগ্র আরবের ওপর পুরোগামী ছিল। হযরত জা'ফর (রা) তাঁর বক্তৃতাকে আরব জাহিলিয়াতের অবস্থা পেশ করা এবং একথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, মানুষকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন এবং দীনে হক-এর দাওয়াত ও সর্বোত্তম চরিত্রের তালীম দিয়েছেন। যে সব লোক তাঁর ওপর ঈমান এনেছে তাদের জীবনে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

এটা অবস্থার এমন বিশ্লেষণ ও চিত্র অংকন যা একটি আত্মজীবনীর মর্যাদা রাখে এবং বর্ণনাকারীর সত্যতার ক্ষেত্রে সন্দেহ বা সংশয়ের আদৌ অবকাশ নেই। বিজ্ঞতাসুলভ দাওয়াত ও বর্ণনা প্রকৃত সত্যের এমন একটি পন্থা বা পদ্ধতি যা বক্তার জন্য না বিপদ সৃষ্টিকারী আর না সংশয় সৃষ্টিকারী, না বিরোধী ও আপত্তি উত্থাপককে আহত করে এবং না শ্রোতাকে বিরোধিতা করার জন্য উৎসাহিত করার সুযোগ দেয়! এটি এমন একটি ব্যাপার যা ঘটনা ও একটি সমাজের সত্যিকার কহিনী যার মধ্যে একজন নবীর দাওয়াত ও তালীম গ্রহণকারীকে মানবতার নিম্নতর অবস্থা থেকে উঠিয়ে উচ্চতম সোপানে পৌঁছে দিয়েছে। যার ইচ্ছা সে এটাকে পরীক্ষা করে দেখুক এবং এই বৈপ্লবিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখুক।[১]

কুরায়শ প্রতিনিধি দলের ব্যর্থতা

নাজাশী (বক্তৃতা শুনে) বললেন, নিঃসন্দেহে এটি যা কিছু হযরত 'ঈসা (আ) নিয়ে এসেছিলেন একই আলোক-রশ্মি থেকে । অতঃপর তিনি কুরায়শ দুই দূতের দিকে চোখ ফেরালেন এবং বললেন, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনো এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না।

এবার 'আমর ইবনুল-আস তার তূনীরের শেষ তীরটি নিক্ষেপ করল। তীরটি ছিল বিষমাখা। সে বলল, সম্রাট! এরা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে এমন সব কথা বলে যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাও মুশকিল।

---

১. লেখক পরিচিতি بم روائع من ادب الدعوة فى القران والسيرة , পৃ. ১২২-২৩।

মুসলমানদের লক্ষ্য করে সম্রাট নাজাশী জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত মসীহ (আ) সম্পর্কে কী বলে থাক?

হযরত জাফর ইবন আবী তালিব (রা) উত্তরে জানালেন, আমরা তাঁর সম্পর্কে সেই সব কথাই বলি যা আমাদের নবী ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আর তা হলো, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তিনি তাঁর রূহ ও তাঁর বাক্য (কালেমা) যা তিনি কুমারী ও পবিত্রা মারয়ামের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন। এ কথা শুনে তিনি তাঁর হাত দিয়ে মাটি থেকে একটি খড় তুলে বললেন, আল্লাহর কসম! যা কিছু তোমরা বললে হযরত ঈসা (আ)-এর থেকে এই খড়ের তুল্যও বেশি নন।

এরপর সম্রাট মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদায় দিলেন, তাদেরকে নিরাপত্তা ও অভয় দান করলেন। কুরায়শ দূত দু'জন অত্যন্ত লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে সেখান থেকে বহিষ্কৃত হলো আর মুসলমানরা অত্যন্ত উত্তম আবাসে সম্মানজনক স্থান লাভ করল।[১]

মুসলমানদের কৃতজ্ঞতাবোধের প্রেরণা

সেই যুগেই নাজাশীর জনৈক দুশমন তাঁর রাজ্যে হামলা চালায়। মুহাজির মুসলমান সম্বন্ধে সম্রাট নাজাশীর প্রশংসনীয় ভূমিকা এবং তাঁর সদয় ব্যবহারের উত্তরে মুসলমানগণ সম্রাটকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন যা ছিল ইসলামের নৈতিক শিক্ষামালা মাফিক ও মুসলমানদের চরিত্রের উপযোগী।

আবিসিনিয়ায় দীনের দাওয়াত ও ইসলামের পরিচিতি পেশ

আবিসিনিয়া অভিমুখে মুসলমানদের হিজরত নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত জাফর ইবন আবী তালিব (রা) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে হিজরী ৭ম বর্ষ পর্যন্ত এখানে থাকেন এবং খায়বার যুদ্ধের সময় তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হন। এভাবে তাঁরা প্রায় পনের বছর আবিসিনিয়ায় থাকেন। এ এক দীর্ঘ সময় যা থেকে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রা) ইসলামের দাওয়াতের ধারাবাহিকতায় অবশ্যই ফায়দা লাভ করে থাকবেন। যেহেতু দেশটি অপরাপর খৃস্টান দেশের মুকাবিলায় উদারতা, সহিষ্ণুতা ও নিপীড়িত মজলুমদেরকে আশ্রয় দানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল এবং শাসক তাঁর ন্যায়বিচার ও মানবতাবোধের জন্য পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ঐ যুগ ঘটনার বিস্তৃত ও লিখিত বিবরণ ধরে রাখার যুগ ছিল না। এর সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে যদিও আমাদের নিকট ঐতিহাসিক ও পুঁথিগত দলীল-দস্তাবেয নেই, কিন্তু অনুমান করা চলে, তারা এই দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অবস্থান থেকে (যার পেছনে

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৩৩৪, ৩৮ পৃ. সংক্ষিপ্ত।

জন্য কোন পার্থিব ফায়দা লাভ লক্ষ্য ছিল না) দীনের দাওয়াত ও ইসলামের পরিচিতি পেশের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করে থাকবেন।

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর ইবনুল-খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য-সমর্থনের অদৃশ্য মদদে সরবরাহ করেন। ওমর কুরায়শ গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ভীতিকর ও প্রভাবমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী বীর পুরুষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তিনি মুসলমান হন। এজন্য তিনি দু'আও করতেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হলো, তাঁর বোন খাত্তাব কন্যা ফাতিমা (রা) ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং তারপর তাঁর স্বামী সাঈদ ইবন যায়দ (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের দু'জনের কেউই হযরত ওমরের ভীতিকর ব্যক্তিত্বের কারণে, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর কঠোর আচরণের দরুন এখন পর্যন্ত তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি। খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) ফাতিমাকে কুরআন শরীফ পড়াতেন।

হযরত ওমর (তখনও তিনি মুসলমান হননি) একবার তলোয়ার ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের সন্ধানে বের হলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন, এই সময় তিনি ও তাঁর সাহবীগণ সাফা পাহাড়ের নিকটে কোন বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। পথিমধ্যে তিনি নঈম ইবন আবদুল্লাহর দেখা পান যিনি তাঁরই গোত্র বনী আদীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওমর! কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, (আল্লাহর পানাহ চাই) মুহাম্মদ ﷺ-এর ফয়সালা করতে চলেছি যিনি ধর্মচ্যুত হয়ে গেছেন, কুরায়শদের ঐক্য ও সংহতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছেন, তাদেরকে জাহেল ও বেওকুফ বানিয়েছেন, তাদের ধর্মে দোষারোপ করেছেন, তাদের উপাস্য দেবদেবীগুলোকে গালি দিয়েছেন। আজ তাঁর কিস্‌সা খতম করতে চাই।

নঈম বললেন, ওমর! জানি না তুমি কোন্ ধোঁকায় পড়েছ! আগে নিজের ঘরের খোঁজ নাও। প্রথমে নিজের ঘর ঠিক কর।

হযরত ওমর বললেন, আমার ঘরের খবর! কেন, আমার ঘরে কি হয়েছে?

তিনি উত্তর দিলেন, তোমার ভগ্নিপতি, চাচাতো ভাই সাঈদ ইবন যায়দ ও তোমার বোন ফাতেমা দু'জনই মুসলমান হয়েছে এবং মুহাম্মদের ধর্ম কবুল করেছে, তার খবর রাখ! আগে তাদের খোঁজ নাও (তারপর অন্যের খরব নিতে যেও)।

ওমর তখন বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ির পথ ধরলেন। সে সময় তাঁদের নিকট হযতর খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বসে ছিলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল কুরআনুল কারীমের সূরা ত্ব-হা-এর লিখিত একটি অংশ। তিনি তাঁদের উভয়কে এটি পড়াচ্ছিলেন। ওমরের পায়ের আওয়াজ পেতেই হযরত খাব্বাব (রা) ঘরের ভেতরের একটি কামরায় গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন। হযরত ফাতেমা জলদি লিখিত সূরার অংশটুকু ঊরুর নীচে লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু ওমর খাব্বাব ইবন আরাত (রা)-এর তেলাওয়াতের শব্দ আগেই শুনে ফেলেছিলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করতেই জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে ঢুকতেই কী সব যেন শুনতে পেলাম! ঘরে তোমরা কি করছিলে? তাঁরা উভয়ে বললেন, তুমি কিছু শুনতে পেয়েছ বুঝি! ওমর বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি আর এও শুনেছি, তোমরা দু'জনেই মুহাম্মদের ধর্ম কবুল করেছ। এই বলে তিনি ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মারতে শুরু করলেন। হযরত ফাতেমা (রা) স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও ভাইয়ের হাতে মার খেলেন এবং আহত হলেন।

এবার তাঁরা উভয়ে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বললেন, ওমর! তুমি যা শুনেছ এবং যা জেনেছ তা সত্য। হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়েছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। এখন তোমার যা করার করতে পার।

বোনের রক্তাক্ত শরীরের দিকে তাকাতেই ওমরের উত্তেজনায় ভাটা পড়ল এবং আপন কৃতকর্মের দরুন লজ্জিত হলেন। তিনি থামলেন, তারপর বললেন, কিছুক্ষণ আগে তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দাও, আমি দেখতে চাই মুহাম্মদ তোমাদেরকে কী শেখান। ওমর লেখাপড়া জানতেন। তাঁর মুখে একথা শুনতেই বোন ফাতেমা বললেন, ওমর? আমাদের ভয় হচ্ছে তুমি এর সঙ্গে কোন বেয়াদবী না করে বস! তিনি বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না, নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তিনি কসম খেয়ে তাঁদের আশংকা দূর করলেন এবং তাঁদেরকে আশ্বস্ত করলেন। তাঁর এ ধরনের কথাবার্তায় বোন ফাতেমা আশা করলেন, সম্ভবত ওমর ইসলাম কবুল করবেন। তিনি নম্র ভাষায় বললেন, ভাইজান! শির্ক-এ লিপ্ত থাকার দরুন আপনি নাপাক ও অপবিত্র। এই সহীফা কেবল পাক-পবিত্র মানুষই স্পর্শ করতে পারে।

ওমর উঠলেন, গিয়ে গোসল করলেন। তখন বোন ফাতেমা কুরআনের অংশটুকু ভাইয়ের হাতে তুলে দিলেন। সূরা ত্ব-হা পড়া শুরু করে কিছু দূর অগ্রসর হতেই ওমর বলে ওঠেন, কী পবিত্র ও সম্মানিত কালাম!

হযরত খাব্বাব (রা) একথা শুনতেই গোপন কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ওমরকে লক্ষ্য করে বললেন, ওমর! আল্লাহর কসম, আমার আশা ছিল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর দাওয়াত দ্বারা আপনাকে অবশ্যই ধন্য ও অনুগ্রহ লাভ করাবেন। কেননা গতকালই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই দু'আ করতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আবূল-হাকাম ইবন হিশাম (আবূ জাহল) কিংবা ওমর ইবনুল-

...বের মাধ্যমে ইসলামকে সাহায্য কর। হে ওমর! এখন তো তোমার কিছুটা আল্লাহর ভয় লজ্জা-শরমের খেয়াল করা উচিত।

তখন ওমর বললেন, খাব্বাব! আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে নিয়ে চল। আমি ইসলাম কবুল করতে চাই। হযরত খাব্বাব (রা) বললেন, তিনি এখন সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি একটি ঘরে আছেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক সাথী আছেন। হযরত ওমর (রা) তলোয়ার কোষবদ্ধ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে সাফা রওয়ানা হলেন। তিনি ঘরে গিয়ে টোকা দিলেন। দরজায় টোকা পড়তেই একজন সাহাবী দাঁড়ালেন এবং দরজা পথে উঁকি দিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চাইলেন। দেখতে পেলেন, ওমর তলোয়ারসহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান! তিনি ঘাবড়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাত্তাব পুত্র ওমর তলোয়ার হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে! বীর কেশরী হযরত হামযা (রা) বললেন, তাকে আসতে দাও। যদি সে নেক নিয়তে এসে থাকে তবে তো ভাল, অন্যথা আমরা তার তলোয়ার দিয়েই তাকে খতম করব। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে অনুমতি দাও। এরপর সাহাবী গিয়ে হযরত ওমরকে ভেতরে আসবার অনুমতি দিলেন।

হযরত ওমর (রা) আসতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পরিধেয় কাপড় সজোরে টেনে ধরে বললেন, খাত্তাব পুত্র! কোন্ উদ্দেশে তুমি এখানে এসেছ? আল্লাহর কসম! আমি দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর আগে কোন কঠিন বিপদ ও মুসীবতের সম্মুখীন তোমাকে হতে হবে।

হযরত ওমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনার এবং আল্লাহ তায়ালার যে হেদায়াত ও তালীম তাঁর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তা কবুল করার জন্য হাজির হয়েছি।

হযরত ওমর (রা) বলেন, একথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ তকবীর ধ্বনি দিলেন। তকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হতেই সেই ঘরে যত সাহাবা-ই কিরাম উপস্থিত ছিলেন সকলেই বুঝলেন, ওমর মুসলমান হয়ে গেছেন![1]

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধের সৃষ্টি হয়। হযরত হামযা (রা) আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি জানতেন, কুরায়শ কাফিরদের ওপর এর কতটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং মক্কার জীবনে এর কী প্রভাব অনুভূত হবে, আর তাদের এই ধারণা কোন খোশ-কল্পনার ওপর ভিত্তি করে ছিল না। কেননা মুশরিকদের নিকট আর কোন লোকের ইসলাম গ্রহণ এতটা কষ্টকর ও অসহনীয় ছিল না এবং আর কোন ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি যতটা দেয়া হয়েছিল হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাকে।

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ৩৪২-৪৬।

হযরত ওমর (রা) তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ্যে ও খোলাখুলি ঘোষ দেন। কুরায়শদের ভেতর এ খবর তাৎক্ষণিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত ওমর (রা)-ও এজন্য প্রয়োজনে লড়াই করে মরবার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যান এবং তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুকাবিলার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত বিরোধী ও শত্রুপক্ষ ব্যর্থমনোরথ ও হিম্মতহারা হয়ে থেমে যায়।[১]

কুরায়শদের পক্ষ থেকে বনী হাশিমকে বয়কট ও অবরোধ

আরব গোত্রগুলোর মাঝে ইসলাম দ্রুত বেগে বিস্তার লাভ করতে থাকে এতে কুরায়শরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এমন একটি লিখিত অঙ্গীকার বা চুক্তিনামা সম্পাদিত হোক যার মাধ্যমে বনী হাশিম ও বনী আবদুল-মুত্তালিবকে এ বিষয়ে বাধ্য করা হবে, তাদের সঙ্গে কোন প্রকার বিয়ে-শাদী হবে না, কোন রকমের ক্রয়-বিক্রয় ও করা যাবে না। সভার পর এই সব দফাওয়ারী সিদ্ধান্তসমূহ লিখে অতঃপর এ সব অঙ্গীকারের ওপর সকলের দস্তখত গ্রহণ করে সর্বসম্মতিক্রমে তা কাবা শরীফের ভেতরে টাঙিয়ে দেয়া হয়।

শে'ব-এ আবী তালিব বা আবূ তালিবের গিরি সংকটে

কুরায়শরা এই চুক্তিনামা সম্পাদন করতেই বনূ হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিব তাদের সর্দার আবূ তালিবের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হলো, তারা আবূ তালিব গিরি সংকট বা উপত্যকায় গিয়ে উঠল এবং সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। এ ঘটনা নবূওয়াতের ৭ম বর্ষের। বনূ হাশিমের আবূ লাহাব ইবন আবদিল-মুত্তালিব এতে শরীক ছিল না। সে ছিল কুরায়শদের সমর্থক। বনূ হাশিম অনেক কাল এতে বন্দী জীবন যাপন করে। অবশেষে অবরোধ দীর্ঘ হতে থাকে এবং এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, অবরুদ্ধ লোকজনকে বাবুল বৃক্ষের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। শিশুরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে চীৎকার দিয়ে কাঁদত, এমন কি তাদের কান্নার আওয়াজ বহু দূর থেকেও শোনা যেত। কুরায়শরা ব্যবসায়ীদেরকেও তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। ফলে ঐসব ব্যবসায়ী খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মূল্য এতটা বাড়িয়ে দেয় যাতে বনূ হাশিমের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এভাবে কেটে যায় তিন তিনটি বছর। এ সময় গোপন পথে কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাদের নিকট পৌঁছে যেত। কুরায়শদের যেসব লোক তাদের সঙ্গে লেনদেন ও আত্মীয়তা ছিল তারা কিছুটা গোপনে তাদের সাহায্য করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ অবস্থায়ও তাঁর গোত্রের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের এই গুরু

১. ঐ, ১ম খ., ৩৪৯ পৃ.।

দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন দিনে-রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে সম্ভাব্য সকল সময়। আর বনূ হাশিম পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় সকল প্রকারের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করত।

চুক্তিনামা ভঙ্গ ও বয়কটের অবসান

ইতোমধ্যে কুরায়শদের কিছু বিবেকবান ও উন্নত মনোবলের লোকের মনে, যাদের ভেতর হিশাম ইবন আমর ইবন রবী'আ ছিলেন সবার পুরোভাগে, এ অত্যাচার-নিপীড়নমূলক চুক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং একে তারা মানবতাবিরোধী কাজ বলে মন্তব্য করে। হিশামের ছিল উত্তম আচার-আচরণ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী লোক এবং গোত্রের সকলেই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তিনি কুরায়শদের সেই সব লোকের সঙ্গে, যাদের ভেতর কোমল আচরণ, উন্নত মনোবল ও উদারতা ছিল, যোগাযোগ করেন, তাদের শরাফত ও মানবতাবোধকে জাগিয়ে দেন এবং তাদেরকে এই নিপীড়নমূলক অঙ্গীকার অকেজো করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। পাঁচ ব্যক্তিকে পাওয়া গেল যারা এই চুক্তি মানতে অস্বীকার করতে একমত হলো। পরদিন কুরায়শদের একটি বৈঠকে যুহায়র ইবন আবী উমায়্যা, যাঁর মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব কন্যা 'আতেকা, এসে হাজির হন এবং বলতে থাকেন,

"ওহে মক্কাবাসি! এ তোমাদের কেমন বিচার যে, আমরা সকলে মজাসে খাব, পান করব আর আমাদের আত্মীয় বনূ হাশিম এক দানা খাবার ও এক বিন্দু পানির জন্য হাপিত্যেশ করবে এবং তাদের প্রাণ হুমকির সম্মুখীন হবে, তাদের সঙ্গে কেনাবেচাও করা চলবে না, বন্ধ থাকবে। আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে বসে থাকব না যতক্ষণ না এ জুলুমসর্বস্ব চুক্তিনামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে পারছি।"

এ সময় আবূ জাহ্ল বাধা দিতে চাইল। কিন্তু তার চাল কাজে আসল না। মুত'ইম ইবন 'আদী এই চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলার উদ্দেশে কাবার দিকে অগ্রসর হতেই দেখতে পেলেন চুক্তিনামাটির অধিকাংশই কীটদষ্ট, কেবল بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ শব্দটি অক্ষত ও পাঠযোগ্য রয়েছে। [রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবকে এ বিষয়ে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন।]

যা-ই হোক, চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং সেই সাথে এর লিখিত বক্তব্যেরও আর কোন গুরুত্ব রইল না।[১]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ৩৫০-৫১ পৃ.।

আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাত

নবূওয়াতের দশম বর্ষে একই সালে আবূ তালিব ও হযরত খাদিজা (রা) উভয়েরই ইনতিকাল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এ দু'জনের উত্তম সহবত ও আচরণ, বিশ্বস্থতা ও সাহায্য-সমর্থনের যে সম্পর্ক ছিল তা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল। অবশ্য আবূ তালিব ইসলাম কবুল করেননি। এই শোকাবহ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পর পর কয়েকটি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

কুরআন মজীদের বিপ্লবাত্মক চিকিৎসা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির ওপর এর প্রভাব

তুফায়েল ইবন আমর আদ-দাওসী ছিলেন আরবের একজন নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি। একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি একবার মক্কায় এলে কুরায়শরা অভ্যাস মাফিক তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হতে বাধা দিতে চাইল এবং তাঁকে তাঁর কাছে যাওয়া ও তাঁর কথা শোনাতে ভীত ও শংকিত করল এবং বলল, আমাদের ভয় হয়, না জানি এর ফলে আমাদের এখানে যা ঘটেছে তোমার ও তোমার জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গেও সেই একই ব্যাপারে ঘটে! অতএব, তাঁর সঙ্গে তোমার কথা না বলা ও তাঁর কথা না শোনাই ভাল।

তুফায়েল বলেন, আল্লাহর কসম! তারা এমনভাবে আমার পেছনে লাগল যে, আমি সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেললাম, আমি তাঁর কথা শুনবও না, আর তাঁর সঙ্গে কথাও বলব না, বরং আরও একটু এগিয়ে আমি এতদূর করলাম যে, আমি কানে তুলা ভরে নিলাম এবং (তাওয়াফের নিয়াতে) হারাম শরীফের দিকে গেলাম। হঠাৎ আমি চোখ তুলে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার কাছে নামায পড়ছেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে দাঁড়ালাম এবং আল্লাহ্ তাঁর কালাম-ই পাকের কিছুটা আমাকে যবরদস্তি করে শুনিয়েই ছাড়লেন। তিনি বলেন, আমি খুব ভাল কথা শুনলাম। আমি মনে মনেই বললাম, আমার মা আমাকে কাঁদাক! আল্লাহর কসম! আমি কথাশিল্পী আর আমি কথা চিনিও। কথার ভাল-মন্দ আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। কাজেই এ কালাম শোনার পথে কোন্ জিনিস বাধা হতে পারে? যদি তা প্রকৃতই ভাল কথা হয় তাহলে আমি তা কবুল করব আর খারাপ হলে ছেড়ে দেব।

এরপর তুফায়েল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করলেন এবং এই ঘটনা আগাগোড়া বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন এবং তাঁর সামনে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করলেন। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং ইসলামের দা'ঈ ও মুবাল্লিগ হিসাবে আপন কওম ও পরিবার-পরিজনের মাঝে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করলেন এবং বলে দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মুসলমান হচ্ছে তিনি তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবেন না। এ কথায়

তারা সকলেই ইসলামে দাখিল হলো। তিনি তাঁর গোত্র দাওসকেও ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাঁর মাধ্যমে উক্ত গোত্রে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।[১]

হযরত আবূ বকর (রা) শুরুতে নিজের ঘরেই নামায পড়তেন। কিন্তু তাঁর মন এতে সন্তুষ্ট হলো না। তিনি ঘরের আঙ্গিনায় নামাযের একটি জায়গা বানিয়ে নেন এবং সেখানে নামায আদায় ও কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকেন। যখন তিনি তেলাওয়াত করতেন তখন কাফির মুশরিকদের মহিলা ও শিশুরা তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত এবং তাঁকে দেখতে ও তাঁর কুরআন মজীদ তেলাওয়াত শুনতে থাকত আর বিস্ময় বোধ করত! হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন খুবই কোমল অন্তঃকরণের। তেলাওয়াতের মুহূর্তে তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরত। এ দৃশ্য কাফির সর্দারদেরকে ভীত ও শংকিত করে তোলে। তারা ইবনুদ-দাগিনাকে, যে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল, ডেকে পাঠায়। যখন সে তাদের সামনে গেল তখন তারা তাকে বলল, তুমি আবূ বকরকে ঠাঁই দিয়েছিলে। আমরা এই শর্তে তা মেনে নিয়েছিলাম সে তার ঘরের ভেতরের থেকে আল্লাহর ইবাদত করবে। কিন্তু এক্ষণে সে তার নামায ও কেরাত পাঠ সব কিছুই প্রকাশ্যে করতে শুরু করেছে। আমাদের ভয় হয়, সে আমাদের ছেলেমেয়ে ও মহিলাদেরকে প্রভাবিত ও যাদুগ্রস্ত না করে ফেলে!

এখন সে যদি তার ঘরের ভেতর আল্লাহর ইবাদত করতে রাজী থাকে তাহলে ঠিক আছে। যদি তা না করে তাহলে তাকে বল, সে তার আশ্রয় ও হেফাজত ফিরিয়ে নিক! আমরা চাই না, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর। আর আমরা এও চাই না, আবূ বকরকে প্রকাশ্যে ইবাদত ও তেলাওয়াতের অনুমতি দেয়া হোক!

ইবনু'দ-দাগিনা যখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে কুরায়শ নেতাদের এই খবির কথা জানালেন তখন জওয়াবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের আশ্রয় ও আমানত ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আল্লাহর যামানত ও হেফাজতেই রাজী আছি।[২]

তায়েফ সফর[৩] ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি

আবূ তালিবের ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শদের পক্ষ থেকে এমন নানা ধরনের কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হন। আবূ তালিব যতদিন

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৩৮২-৮৪ পৃ. সংক্ষেপে।

২. বুখারী শরীফ, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীছ باب هجرة النبي ﷺ واصحابه

৩. অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হলো, তায়েফের এই সফর নবূওয়াতের দশম বর্ষে শাওয়ালের শেষ তারিখে হয়। খাতামুন্নাবিয়্যীন, শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরাকৃত, ১ম খ., ৫৮৮।

বেঁচেছিলেন কুরায়শদের সাহসে কুলায়নি। একবার তাঁর মাথার ওপর মাটি নিক্ষেপ করা হয়। তাঁকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার ধারা যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল এবং কাফির ও মুশরিকদের ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা, অপমান ও অসম্মান দেখানোর ফিরিস্তি যখন বাড়তে থাকল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ গমনের ইচ্ছা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি তায়েফের ছাকীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি তাদের সাহায্য চাইবেন। তায়েফবাসীদের কাছে তিনি ভাল কিছু আশা করেছিলেন এবং এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। তাঁর এই প্রত্যাশার পেছনে কারণ ছিল আর তা এই, দুধ পানকালীন তিনি বনী সাদ কবিলায় বাস করেছিলেন। এই কাবিলার বসতি ছিল তায়েফেরই কাছে।

তায়েফের গুরুত্ব

তায়েফ শহর নিজস্ব গুরুত্ব, আবাদীর বিস্তৃতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের দিক দিয়ে মক্কার পর দ্বিতীয় শহর। কুরআন মজীদে কুরায়শদের যবানীতে এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

"আর এরা বলে, এই কুরআন কেন নাজিল হলো না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফ) কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর?" [যুখরুফ : ৩১ আয়াত]

এই শহর ছিল বিখ্যাত প্রতিমা "লাত"-এর পূজা-অর্চনারও কেন্দ্র যেখানে লোকে নিয়মিত তীর্থ দর্শনের জন্য আসত। আর এ ব্যাপারে তায়েফ ছিল মক্কার সমকক্ষ এবং ছিল একই আসনে। মক্কা ছিল কুরায়শদের সর্ববৃহৎ প্রতিমা "হুবল"-এর পূজা-অর্চনার কেন্দ্র। আমীর-উমারা ও সম্পদের অধিকারী লোকেরা গ্রীষ্মকাল এখানেই কাটাত। মুসলিম আমলে ও এরপরও তার এই গুরুত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। উমায়্যা কবি ওমর ইবন রবী'আ বলেন,

تشتو بمكة نعمة . ومصيفها بالطائف .

"বিলাসপ্রিয় ও প্রাচুর্যের অধিকারী লোকেরা শীতকাল মক্কায় কাটায় আর গ্রীষ্মকাল কাটায় তায়েফে।"

তায়েফের লোকেরা স্থাবর সম্পত্তি ও জায়গা-যমীনের মালিক ছিল। তাদের ছিল বড় বড় বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার। এই সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাদের ভেতর অহংকার সৃষ্টি করে দিয়েছিল আর তারা ওপরই ছিল কুরআন কারীমের এই আয়াতের প্রয়োগস্থল,

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا. اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ
بِهٖ كٰفِرُوْنَ. وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

"যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরও বলত, আমরা ধনেজনে সমৃদ্ধিশালী, সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না।" [সূরা সাবা : ৩৪-৩৫]

তায়েফবাসীদের আচরণ ও মহানবী ﷺ-এর দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তায়েফ গমন করেন তখন তিনি প্রথমে ছাকীফ নেতা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যান এবং তাদের কাছে 'দীনে হক'-এর দাওয়াত দেন। কিন্তু তিনি এর খুবই খারাপ ও কড়া জওয়াব পান। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল এবং শহরের উচ্ছৃঙ্খল ও বখাটে যুবক ও ক্রীতদাসদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। এরা তাঁকে গালি দিত, হৈ চৈ করত এবং তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারত। এরূপ কষ্টকর ও অসহায় অবস্থায় তিনি আশ্রয় নেবার উদ্দেশে খেজুর বাগানে তশরীফ নেন। তায়েফে তাঁকে যতটা কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া হয়েছিল মক্কার কষ্টের তুলনায় তা ছিল অনেক বেশি। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গমন পথের দু'পাশে লোক দাঁড় করিয়ে দিল। তিনি চলার জন্য পা তুলতেই দু'দিক থেকে পাথর ছোঁড়া হতো। শেষ পর্যন্ত তাঁর পা রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। সে সময় তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তরনিংড়ানো দু'আ বেরিয়ে আসে এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের দুর্বলতা, নিঃসম্বলতা ও মানুষের চোখে নিকৃষ্টতার ফরিয়াদ জানান এবং আল্লাহর সাহায্য-সহায়তার জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় প্রার্থনা জানান। তিনি বলেন,

اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي ، وهواني على الناس، يا ارحم الرحمين، انت رب المستضعفين، الى من تكلني، الى بعيد يتجهمني، ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب على فلا ابالي، غير ان عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمت وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان ينزل بي غضبك او يحل على سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله.

"আল্লাহ! তোমার কাছেই আমি ফরিয়াদ জানাই আমার দুর্বলতার, আমার নিঃসম্বলতার এবং মানুষের কাছে আমার নিকৃষ্টতার। তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বাধিক রহম করনেওয়ালা। অসহায় ও দুর্বলদের প্রভু তো তুমিই আর আমার প্রতিপালক রবও তুমিই। তুমি কার হতে সোপর্দ করছ আমাকে? অনাত্মীয় রুক্ষ চেহারাওয়ালাদের কাছে অথবা এমন দুশমনদের কাছে ঠেলে দিচ্ছ আমাকে যারা আমার কাজে-কর্মে আমার ওপর কাবু পেয়ে যেতে পারে তার কাছে? তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক তবে এরও কোন পরওয়া করি না আমি। তবে তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও 'আফিয়াতই আমার জন্য অধিক প্রশস্ত। ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার সত্তার নূর তথা আলোক-রশ্মির আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা দিয়ে সমগ্র আঁধার আলোময় হয়ে যায় এবং দীন ও দুনিয়ার সকল কাজ সহীহ-শুদ্ধ হয়ে যায়। তোমার ক্রোধ আমার ওপর আপতিত হোক অথবা তোমার অসন্তুষ্টিই আমার ওপর আপতিত হোক, সব অবস্থায়ই তোমার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টিই আমার কাম্য। নেক কাজ করার কিংবা অন্যায় ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি আমি তোমার কাছেই পেয়ে থাকি।"

এ সময় আল্লাহতায়ালা পাহাড়সমূহের ফেরেশতাকে তাঁর নিকট পাঠান এবং তিনি তাঁর কাছে তায়েফ যে দু'টো পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত সে দু'টোকে একত্রে মিলিয়ে দিয়ে তায়েফবাসীদেরকে পিষে মেরে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি আশা করি, তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না।[১]

যখন উতবা ইবন রবী'আ ও শায়বা ইবন রবী'আর মন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই অবস্থা দেখে কিছুটা কোমল হলো এবং তাদের মানবতার শিরায় কিছুটা কাঁপন সৃষ্টি হলো তখন তারা উভয়ে আদ্দাস নামক তাদের এক খৃস্টান ক্রীতদাসকে ডেকে পাঠাল। তারা তাকে বলল, লও, এই সব আঙুরের খোসা একটি তশতরীতে করে ঐ লোকটির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে খেতে বল। আদ্দাস নির্দেশ মাফিক হুকুম তামিল করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ও তাঁর মহানুভব চরিত্র দেখে মুসলমান হয়ে গেল।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে এলেন। তাঁর সম্প্রদায় তখনও তাঁর বিরোধিতায়, শত্রুতায়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যন্ত্রণা ছিল তেমনি জোর তৎপর।

---

১. যাদুল-মা'আদ, ১ম খ., ৩০২ পৃ.।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ.., ৪১৯-২২ ও সীরাত ইবন কাছীর, ২য় খ., ১৪৯-৫৩ ও যাদ'ল মআদ. ১ম খ., ৩০১ পৃ.।

মিরাজের ঘটনা

এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ ঘটে। তাঁকে রাতারাতি গায়বী শক্তিযোগে মসজিদে হারামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে মসজিদে আকসায় পৌঁছানো হয়। এরপর এর আশেপাশের এলাকা, সপ্ত আসমান ভ্রমণ, আল্লাহর নিদর্শনাবলী দর্শন এবং আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের সঙ্গে সাক্ষাতের সেই সব ঘটনা ঘটেছে যে সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ইরশাদ,

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.

"তার চোখ না অন্যদিকে ঝুঁকেছে আর না সীমা অতিক্রম করেছে। সে তার প্রতিপালকের কুদরতের কত বিরাট বিরাট নিদর্শনই না প্রত্যক্ষ করেছে!" [১]

[সূরা আন-নজ্‌ম! ১৭-১৮ আয়াত]

এ ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর সম্মানে যিয়াফত ও অভ্যর্থনা। তাঁর চিত্ত বিনোদন ও তায়েফে প্রাপ্ত সেই সব আঘাতের উপশম ও সেই সমস্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, অপদস্থ হওয়া ও অবিশ্বস্ততার ব্যথা দূর হওয়ার জন্যই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি সেখানে কাটিয়েছিলেন।

সকাল হতেই তিনি সকলকে এই ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। এতে কুরায়শরা খুবই বিস্ময় প্রকাশ করে, একে অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার হিসাবে মন্তব্য, তাঁকে মিথ্যাবাদী ঠাওরায় এবং বিদ্রূপ করে। হযরত আবূ বকর (রা) মিরাজের ঘটনার কথা শুনতেই বলে ওঠেন, যদি তিনি এ ধরনের কথা বলে থাকেন তবে তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। তোমরা এতে অবাক হচ্ছ কেন? আল্লাহর কসম! তিনি যখন আমাদেরকে এই খবর বলেন, তাঁর নিকট দিবারাত্রের যে কোন ভাগে আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ওয়াহ্‌য়ি এসে থাকে তখন আমি তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। এটা তো তার চাইতেও কঠিন ও অসম্ভব ব্যাপার যে বিষয় নিয়ে তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ! [২]

মি'রাজের উচ্চ ও সূক্ষ্ম মর্ম

মি'রাজের ঘটনায় শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শন দেখানো হয় এবং আসমান ও যমীনের রাজত্ব পর্দাহীন ও আবরণমুক্ত অবস্থায় তাঁর সামনে ধরা দেয়। নবূওয়াতের এই অদৃশ্য

---

১. দেখুন সূরা ইসরা ও সূরা নাজম এবং হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ। সংশ্লিষ্ট ঘটনার হাকীকত, এর রহস্য ও হুকুম জানবার জন্য হাকীমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর "হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ", ২য় খ., পাঠ করুন।

২. الا سراء الى المسجد الا قصى ثم الى سدرة المنتهى

ও আসমানী সফরে এছাড়াও বহু উচ্চ ও সূক্ষ্ম মর্ম লুক্কায়িত রয়েছে এবং এর ভেতর বহু সুদূরপ্রসারী ইশারা-ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা ইসরা ও সূরা নাজ্‌ম, যা মি'রাজের সিলসিলায় নাযিল হয়, এটা ঘোষণা দেয়. রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় কিবলা অর্থাৎ মসজিদুল-হারাম ও মসজিদুল-আকসার নবী. উভয় দিক অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের ইমাম, তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়া-ই কিরাম-এর ওয়ারিছ এবং পরবর্তীতে আগত সমগ্র মানব জাতির রাহবার ও রাহনুমা (পথ প্রদর্শক)। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মি'রাজ সফরে মক্কা বায়তুল-মাকদিসের ও মসজিদুল-হারাম মসজিদে আকসার কাছাকাছি হয়ে গেছে। তাঁর ইমামতিতে তামাম আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) সালাত আদায় করেন আর এটি ছিল তাঁর ব্যাপক ও অসাধারণ পয়গাম ও দাওয়াত তাঁর চিরন্তন নেতৃত্ব এবং প্রতিটি মানবশ্রেণীর জন্য তাঁর শিক্ষামালার সম্পূর্ণতা ও যোগ্যতার প্রমাণ।

এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিত্বের সঠিক ও নির্ভেজাল পরিচয়, এর নির্ভুল নির্দেশনা, তাঁর ইমামত ও নেতৃত্বের বর্ণনা, এই উম্মার (যাদের মাঝে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন) আসল মকাম ও প্রকৃত অবস্থানগত মর্যাদা নির্ধারণ, এই পয়গাম ও দাওয়াতের ও নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের পর্দা খুলে দেয় যা এই উম্মতকে এই বিশাল বিস্তৃত দুনিয়া ও বিশ্বসমাজে আনজাম দিতে হবে।

মি'রাজের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে একটি সীমিত, স্থানীয় ও সাময়িক প্রকৃতির এবং নবুওয়াতের চিরন্তন ও বিশ্বজয়ী ব্যক্তিত্বের মাঝে একটি বিভক্তি রেখা ও বৈশিষ্ট্যমূলক মাইল ফলক হিসাবে মর্যাদা রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কোন জাতীয় অথবা স্থানীয় লিডার, কোন একটি দেশ বা রাষ্ট্রের পথ প্রদর্শক নেতা, বিশেষ কোন বংশ বা গোত্রের মুক্তিদাতা এবং কোন নতুন শান-শওকত ও আজমতের প্রতিষ্ঠাতা হতেন, তাহলে তাঁর এই আসমানী মি'রাজের প্রয়োজন ছিল না, এজন্য তাঁর আসমান-যমীনের বিস্তৃত রাজত্বে ভ্রমণ ও ভালো করে দেখারও দরকার ছিল না। এরও প্রয়োজন ছিল না, তাঁর মাধ্যমে আসমান ও যমীনের এই নতুন সম্পর্ক কায়েম হবে। সে সময় এই ভূখণ্ড, এই পরিবেশ, এই সমাজ তাঁর জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতো। এটা বাদ দিয়ে তাঁর আর কোন ভূখণ্ডের দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না সমুন্নত ও সুউচ্চ আসমান ও সিদরাতুল-মুন্তাহা পর্যন্ত পৌছার অথবা মসজিদে আকসায় তশরীফ নেবার যা তাঁর নিজের শহর থেকে বহু দূরে এবং শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল।

মিরাজের ঘটনা এই ঘোষণা দেয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সব জাতীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে কোনই সম্পর্কে রাখেন না যাদের যোগ্যতা ও চেষ্টা সাধনা তাদের দেশ অথবা তাদের জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাদের থেকে কেবল তাদেরই বংশ-গোত্র ও তাদেরই জাতিগোষ্ঠী উপকৃত হয়

দের সঙ্গে তারা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেই পরিবেশ শক্তিই তাদের প্রভাব থেকে যায় যেই পরিবেশের মাঝে তাদের জন্ম। তিনি যেই দল ও জামা'আতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা ছিল আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলদের জামা'আত যাঁরা আসমানের পয়গাম জমিনবাসীদেরকে, স্রষ্টার পয়গাম সৃষ্টিকে পৌঁছে দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের দ্বারা গোটা মানব সমাজ (কাল, ইতিহাস, রঙ, বংশ, দেশ ও জাতি অভিন্নভাবে) ধন্য ও গৌরবমণ্ডিত হয়ে থাকে এবং তাদের ভাগ্য গড়ে।

সালাত ফরয হলো

এ সময় আল্লাহতায়ালা তাঁর ও তাঁর উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন এবং আল্লাহর বরাবর তিনি ওয়াক্‌ত সংখ্যা হ্রাস করবার জন্য আবদার জানাতে থাকেন। শেষে আল্লাহ রাহমানু'র-রামীম এই সালাতকে দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত-এ সীমিত করে দেন এবং এও ঘোষণা করে দেয়া হয়, যে ঈমান ও ইহতিসাবের সঙ্গে এই সালাতসমূহ আদয় করবে তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের বিনিময় ও সওয়াব প্রদান করা হবে।[১]

আরব গোত্রগুলোর প্রতি ইসলামের দাওয়াত

এখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে আরম্ভ করলেন এবং তাদের নিকট ইসলামের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "হে অমুক গোত্র! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের হুকুম দেন এবং এও হুকুম দেন, তোমরা তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করবে না। আর যেসব সত্তাকে তোমরা তাঁর সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছ এবং যাদেরকে পূজা-অর্চনা কর সে সবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ কর। তোমরা তাঁর ওপর ঈমান আন এবং এর সত্যতা স্বীকার কর আর আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হেফাজত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আল্লাহ্‌র দেয়া জিনিসগুলো যেগুলো দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাঠিয়েছেন সেগুলো ভাল করে খোলাখুলিভাবে আমি বর্ণনা করি।"

তিনি কথা শেষ করতেই (তাঁকে অনুসরণরত) আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে পড়ত এবং বলত, হে অমুক গোত্র! সে তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে, তোমরা লাত ও উয্যার বন্দেগী ও বিশ্বস্ততার শেকল নিজেদের গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল এবং নিজেদের সাহায্যকারী জিনদের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করে সেই বিদ'আত ও গোমরাহী এখতিয়ার করা যা সে নিয়ে এসেছে। অতএব, তোমরা তাঁর কথা মানবে না, তাঁর কথা শুনবে না।

---

১. সহীহ বুখারীর কিতাবু'স-সালাত, كيف فرضت الصلاة অধ্যায়।

ইসলামের রাস্তা

এই পথ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের দিকে যেত, কাঁটা ভরা ও সব ধরনের বিপদাপদ ও শংকাপূর্ণ ছিল, যে পথে নিজের জীবনের ওপর বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া চলা ও মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিল না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর মক্কা পর্যন্ত পৌঁছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র খেদমতে হাযির হওয়া ও ইসলাম কবুলের যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এতে তার ওপর আলোকপাত করে। তিনি বলেন,

"যখন আবূ যর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি সেই উপত্যকায় যাও এবং সেই লোকটি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা কর যিনি দাবি করছেন, তাঁর কাছে আসমান থেকে ওয়াহী আসে। তাঁর কথাবার্তা শুনবে, এরপর আমাকে এসে বলবে। তাঁর ভাই রওয়ানা হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। এরপর ফিরে গিয়ে সে আবূ যর গিফারী (রা)-কে বলল, আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি পছন্দণীয় চরিত্রের লোক ও ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর আমি তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা শুনতে পেয়েছি যাকে কবিতা বলা যায় না। আবূ যা'র (রা) বললেন, আমি যা জানতে চাচ্ছিলাম এ দ্বারা তা মিলল না।

এরপর তিনি নিজেই সফরের জন্য তৈরি হলেন এবং পানির মশক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং হারাম শরীফে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্ধান নিতে শুরু করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনতেন না, অথচ কাউকে জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করেননি। এই খোঁজেই রাত হলো। সে সময় হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁকে দেখতে পান এবং দেখা মাত্রই তিনি বুঝতে পারেন, লোকটি কোন নবাগত মুসাফির। তিনি তাঁর পিছু নিলেন। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। যখন ভোর হলো তখন তিনি (আবূ যর) তাঁর মশক ও খাদ্য-খাবার নিয়ে আবার সেই মসজিদে গেলেন। এ দিনটিও এভাবেই কেটে গেল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ - ও তাঁকে দেখেন। আর এ অবস্থায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি তাঁর শোবার জায়গায় চলে গেলেন।

এই সময় হযরত আলী (রা) তাঁর নিকট দিয়ে যান এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, এখন পর্যন্ত কি এই মুসাফিরের মনযিলে মকসুদ জানার সময় হয়নি? তৃতীয় দিন হযরত আলী (রা) এভাবেই তাঁর কাছে গেলেন, তাঁকে ওঠালেন এবং বললেন, তুমি কি আমাকে বলবে, কোন্ জিনিস তোমাকে এখান পর্যন্ত টেনে এনেছে? তিনি বললেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে ওয়াদা কর, তুমি আমাকে পথ

দেখাবে তাহলে আমি তোমাকে বলতে পারি। হযরত আলী (রা) ওয়াদা করলে তিনি তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হলেন। হযরত আলী (রা) সঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তাঁর কথা শুনলেন এবং সেখানেই মুসলমান হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার কওমের নিকট ফিরে যাও এবং এই দাওয়াত তথাকার লোকদেরকে পৌঁছে দাও যাতে আমার কথা ভালভাবে প্রকাশ পায়।

হযরত আবূ যার (রা) বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি তাদের নিকট গিয়ে চিৎকার করে এই দাওয়াত দেব। অতঃপর বের হয়ে মসজিদে হারামে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله এই কথা শুনতেই লোকেরা তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং এত মারপিট করে যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ইতোমধ্যে হযরত আব্বাস (রা) এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন এবং লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি জান, লোকটি গিফার গোত্রের? তোমাদের ব্যবসায়ী বণিকদের যে রাস্তা সিরিয়ার দিকে গেছে তা এই গোত্রের পাশ দিয়েই গেছে। এরপর তিনি তাঁকে বাঁচিয়ে দেন। দ্বিতীয় দিনও তিনি এই ঘটনা আবারও বললেন। আর লোকেও উত্তেজিত হয়ে তাঁকে খুব মারধর করে। হযরত আব্বাস (রা) এসে সেদিনও তাঁকে সাহায্য করেন।[১]

আনসারদের ইসলাম কবুলের সূচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ মৌসুমে ইসলামের প্রচার অভিযানে রওয়ানা হন। এমনি এক অভিযানে 'আকাবা'[২] উপত্যকার কাছে আনসারদের খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন, তাদের সামনে ইসলাম পেশ করেন এবং কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে শোনান। এ সব লোক মদীনায় ইয়াহূদীদের বাসগৃহে বসবাস করত এবং তাদের কাছে থেকে শুনত, খুব কাছাকাছি সময়ে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, আল্লাহর কসম! এঁকে সেই নবী বলেই মনে হচ্ছে যাঁর সংবাদ ইয়াহূদীরা তোমাদের বলত। দেখো, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ যেন তোমাদের আগে না যেতে পারে! তারা তক্ষুণি তাঁর সত্যতা মেনে নিল এবং তাঁর নিকট আরয করল, আমরা আমাদের কওমকে ছেড়ে এসেছি। আমাদের সেই কওমের ভেতর যতটা অন্যায়, ফাসাদ ও বিভেদ এতটা আর কোন কওমে নেই। সম্ভবত আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন। আমরা

---

১. বুখারী শরীফ, হযরত আবূ যারের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়।

২. আকাবা অর্থ ঘাঁটি। এটি মিনা পর্বতের মক্কার দিকে অবস্থিত। একটি পার্বত্য অংশে কিছুটা আড়ালে এর অবস্থান জামরাতুল-কুবরার কাছেই। সম্ভবত এজন্যই জামরাতুল-কুবরাকে জামরাতুল আকাবাও বলা হয়। আকাবার স্মৃতি হিসাবে পরে সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল।

ওখানে গিয়ে তাদেরকে এ ব্যাপারে জানাব এবং তাদেরকে দাওয়াত দেব। আপনিও তাদের সামনে সেই সব জিনিস পেশ করুন যা আমরা কবুল করেছি। যদি আল্লাহতায়ালা তাদেরকে আপনার পেছনে ঐক্যবদ্ধ করে দেন তাহলে আপনার চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী আর কেউ হবে না।[১]

তারা ঈমান আনার পর স্বদেশে ফিরল। মদীনায় পৌঁছে তারা তাদের অন্য ভাইয়ের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আলোচনা করল এবং তাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিল। এই দাওয়াতে তাদের কওম ও জাতিগোষ্ঠীর ভেতর ইসলামের ব্যাপক প্রচার ঘটে। আনসারদের এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা না হয়েছে।[২]

আকাবার প্রথম বায়'আত

পরের বছর। হজ্জ মৌসুমে আনসারদের বারজন লোক আকাবা উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলো এবং তাঁর পবিত্র হাতের ওপর চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা থেকে বিরত থাকা এবং ভাল কাজে অনুসরণ ও তৌহিদের ওপর বায়'আত নিল। যখন তারা ফিরে যেতে চাইল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-কে পাঠান এবং তাঁকে বলে দেন, তিনি যেন তাদেরকে কুরআন শেখান, ইসলামের তা'লীম দেন এবং তাদেরকে দীনী তথা ধর্মীয় মসলা-মাসাইলও জানিয়ে দেন। তাঁকে মদীনায় 'মুকরী' বা কুরআন পাঠ দানকারী বলা হতো। তিনি আস'আদ ইবন যুরারাহর এখানে মেহমান হয়েছিলেন এবং সেখানে ইমামতির দায়িত্বও তিনি পালন করতেন।[৩]

আনসারদের ইসলাম গ্রহণের আসল কারণ

আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তাই করলেন অর্থাৎ এই রকম নাযুক মুহূর্তে তিনি তাঁর রাসূল ও দীনের সাহায্যে-সমর্থনের জন্য আওস ও খাজরায়ন[৪] গোত্র দু'টিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরা উভয়েই ছিল ইয়াছরিবের দু'টি বড় গোত্র ও গুরুত্বপূর্ণ আরব কবিলা। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সুবর্ণ সুযোগ দান করলেন যে, তারা এই নে'মতের, যার থেকে বড় আর কোন নে'মত নেই, কদর করুক! ইসলামের অভ্যর্থনা ও কবূলিয়তের ক্ষেত্রে তাদের সমসাময়িকদের ও হেজাযবাসীদের ডিঙিয়ে যাক। এই মুহূর্তে এই দীনকে নিজেদের বুকের ভেতর স্থান দিক, এর

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ২২৮-২৯ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ৪৩৪ পৃ. সংক্ষেপে।

৪. আওস ও খাযরাজ আযদ-এর দু'টি গোত্র যা কাহতানের শাখার সঙ্গে জড়িত। তাদের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ছা'লাবা ইবন আমর য়ামনের মারিব পানি প্লাবনে ধ্বংসের পর ১২০ খৃ. পূ. হেমায় স্থানান্তরিত হন। এরপর মদীনাকে স্থায়ী আবাসে পরিণত করেন।

যেন নিজেদের বুক পেতে দেয়! কিন্তু আরবের সকল গোত্র, বিশেষ করে শরা এ থেকে একেবারেই মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল।

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"আর আল্লাহ যাকে চান সিরাতুল-মুস্তাকীম দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন।"

বিভিন্ন কারণ, যা ছিল মূলত আল্লাহ তায়ালার হেকমত ও ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল এবং যাঁর উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, আওস ও খাযরাজকে এই মহাসৌভাগ্যের জন্য তৈরি করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে কুরায়শদের ভেতর কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল। আওস ও খাযরাজের এই গোত্র মক্কার কুরায়শদের বিপরীতে নরম মেজাজ ও নরম দিলওয়ালা ছিল আর চরমপন্থী, জোর-যবরদস্তি, অহংকার ও সত্য স্বীকার না করার মত নীচতা ও খারাপ মনোভাব থেকে ছিল মুক্ত ও পবিত্র। এ সম্পর্ক সেই সব বংশীয় ও গোত্রীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্যেই ছিল। এর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ য়ামানের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইঙ্গিত করে বলেছিলেন,

اتاكم اهل اليمين ارق افئدة والين قلوبا.

"তোমাদের কাছে য়ামানের লোকেরা এসেছে যারা খুবই কোমল অন্তঃকরণবিশিষ্ট নরম দিলের মানুষ।" এই উভয় গোত্রের (আওস ও খাযরাজ) মূলত য়ামানের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন যুগে তাঁদের বাপ-দাদা সেখান থেকে এখানে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন:

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করে না আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।" [সূরা হাশর : ৯ আয়াত]

তাদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে এও একটি কারণ ছিল যে, পরস্পরে গৃহযুদ্ধ ও বিরতিহীন লড়াই-ঝগড়া তাদেরকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। বু'আছ যুদ্ধের পর বেশি দিন হয়নি, এর তিক্ত স্মৃতি তখনও তাদের মন-মানসে জেগে ছিল। আর এখন তাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি, আপস ও সমঝোতা ও যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার একটা ইচ্ছাও পয়দা হয়ে গিয়েছিল। তাদের এই মনোভাব সেই অবস্থার কথাই ব্যক্ত করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ইঙ্গিত দেয়, "আমরা আমাদের কওমকে পেছনে রেখে এসেছি। কোন কওমের ভেতর এতটা অন্যায়-অনাসৃষ্টি, ফেতনা-ফাসাদ ও শত্রুতা নেই যতটা আছে তাদের ভেতর। সম্ভবত আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাদেরকে একত্র করবেন। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন তাহলে আপনার থেকে বেশি সম্মানের অধিকারী আর কেউ হবে না।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বু'আছ যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি গায়বী মদদ এবং মদীনায় হিজরত ও নুসরতের একটি সূচনা ছিল।

দ্বিতীয় কারণ, কুরায়শ ও বাকী সমস্ত আরবদের সম্পর্ক নবূওয়াত ও আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের সঙ্গে দীর্ঘকাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং কালের দীর্ঘ দূরত্বের কারণে তারা এর অর্থ ও মর্ম সম্বন্ধে একেবারেই জানত না। তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে তারা বাড়াবাড়ির সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা সেই সব ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী (য়াহূদী ও খৃস্টান) থেকেও বহু দূরে সরে গিয়েছিল যারা আম্বিয়া-ই কিরামের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করত এবং আসমানী সহীফার (তা বিকৃতই হোক না কেন) ছিল ধারক ও বাহক। আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে সেই ঐতিহাসিক সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ.

"যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি যার ফলে ওরা গাফিল।" [সূরা ইয়াসিন : ৬ আয়াত]

এর বিপরীতে আওস ও খাযরাজ নবুওয়াত ও আম্বিয়া-ই কিরাম নিয়ে ইয়াহূদীদেরকে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে ও তাওরাত পাঠ করতে বরাবর দেখতে ও শুনতে পেত, বরং ইয়াহূদীরা অধিকাংশ সময় তাদেরকে বলত, শেষ যুগে একজন নবী আসবেন। আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে এভাবে হত্যা করব, যেভাবে 'আদ ও ইরাম জাতিগোষ্ঠীকে হত্যা করা হয়েছে।[১] এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১ খ., ২১৭ পৃ.।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا . فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ . فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

"তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট থেকে তার সমর্থক কিতাব আসল ও পূর্বে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত। তারা যা জানত তা যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা তা গ্রহণ করল সুতরাং কাফিরদের ওপর আল্লাহর লানত।" [সূরা বাকারা : ৮৯ আয়াত]

আওস, খাযরাজ ও মদীনার আদিম অধিবাসীরা, যারা আকীদা তথা বিশ্বাসের থেকে মুশরিক ও মূর্তিপূজক ছিল, ধর্মীয় সত্যতা, পরিভাষা (যেমন ওয়াত ও রিসালাত, ওয়াহ্য়ি ও ইলহাম, হাশর-নশর ও আখিরাত) ও সুন্নাতে তথা ঐশী জীবনধারা সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ ও অপরিচিত ছিল না যতোটা মক্কার কুরায়শ ও তাদের প্রতিবেশী গোত্রগুলো। এর কারণ হলো, আওস ও খাযরাজ দীর্ঘকাল থেকে ইয়াহূদীদের সঙ্গে ওঠা-বসা ও বসবাসের কারণে ঐসব তথা দীনী সত্যতা ও পরিভাষাসমূহ, আম্বিয়াই কিরাম-এর নাম ও বিক্ষিপ্ত , বিভিন্ন যুগে আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের আবির্ভাব ও হেদায়াত তথা পথ নির্দেশনার আসমানী নিজাম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়ে গিয়েছিল। তারা ত ইয়াহূদীদের সঙ্গে ওঠাবসা করত যারা ছিল আহলে কিতাব। তাদের যুদ্ধ ও সমঝোতা, অঙ্গীকার ও চুক্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিরও সম্পর্ক । এজন্য যখন আওস ও খাযরাজের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী মদীনার সে সব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দাওয়াতের কথা জানতে পারল এবং তারা হজ্জ নের জন্য মক্কায় এলো এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত লেন, এ সময় এমন মনে হলো যে, হঠাৎই তাদের চোখ থেকে পর্দা উঠে গেল তারা যেন প্রথম থেকেই এর জন্য তৈরী ছিল!

ইয়াছরিবের বৈশিষ্ট্য ও একে দারুল-হিজরত হিসাবে নির্বাচনের পেছনে প্রচ্ছন্ন রহস্য

মদীনাকে দারুল হিজরত ও ইসলামের দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচনের ন মদীনাবাসীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এছাড়া সেই সব রহস্যের ছিল যেসব রহস্য আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানে না। একটি হেকমত এও মদীনার সামরিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর একটি সুদৃঢ় দুর্গ বে অবস্থানের দিক থেকে গুরুত্ব ছিল।

আরব উপদ্বীপের কাছাকাছি আর কোন শহর এ ব্যাপারে তার সমকক্ষ ছিল না। হাররাতুল-ওয়াবরা[১] পশ্চিম দিক দিয়ে মদীনাকে হেফাজত করত আর হাররা ওয়াকিম পূর্বদিক থেকে একে ঘিরে রেখেছিল। মদীনার উত্তর দিকটা ছিল একমাত্র পথ যা আক্রমণকারী যে কোন বাহিনীর জন্য ছিল একেবারে খোলা [এটাই সেই এলাকা যেখানে ৫ম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দক (পরিখা) খননের নির্দেশ দিয়েছিলেন] মদীনার অপরদিক খেজুরের ঘন বাগান অথবা ক্ষেত দিয়ে ছিল। যদি কোন আক্রমণকারী ফৌজকে একে অতিক্রম করতে হতো, তবে তার রাস্তায় এমন সঙ্কীর্ণ পথ ও অলিগলি পড়ত যে কাতারবন্দী ও ফৌজী শৃঙ্খলার সাথে পার হওয়া সহজসাধ্য ছিল না এবং মা'মুলী ফৌজী চৌকীও এ অভিযানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ছিল যথেষ্ট।

ইবন ইসহাক বলেন, মদীনার একদিকের অংশ বা রাস্তা ছিল খোলা, বাকি সকল দিক বসতি ও খেজুর বাগানের কারণে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কোন দুশমন এর ভেতর দিয়ে এগুতে পারত না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মদীনাকে মনোনীত করতে গিয়ে সম্ভবত আল্লাহর সেই হেকমত ও মুসলিহাত (উপযোগিতা)-এর দিকে হিজরতের পূর্বেই ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন এবং এও বলেছিলেন, আমাকে তোমাদের দারুল-হিজরত দেখানো হয়েছে। এটি খেজুরের বাগিচা ভরা এলাকা ও لابتين তথা পোড়া ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কংকরপূর্ণ দু'টি এলাকার মাঝখানে অবস্থিত। এরপর যাদের হিজরত করার ছিল তারা মদীনায় হিজরত করেছে।[২]

মদীনার এই দু'টি গোত্র, যারা আওস ও খাযরাজ নামে বিখ্যাত ছিল- জাতীয় মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান, অশ্বারোহণ ও পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ছিল। তারা কারো সামনে কখনো মাথা নত করেনি। কোন বড় গোত্র কিংবা হুকুমতকে তারা কখনো ট্যাক্স ও জরিমানা দেয় নি। এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য আওস সর্দার হযরত সাদ ইবন মুআয (রা)-এর সেই বক্তব্যের মাঝে পাওয়া যাবে যা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খন্দক যুদ্ধের সময় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমরা ও এরা শির্ক ও মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিলাম। না আমরা

---

১. হার্রা বা লাভা কালো রোদে পোড়া এবং আড় ও তেরছা পাথুরে এলাকাকে বলা হয় অথবা সেই অংশকে বলে যা আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহ কোন জায়গায় জমা হওয়ার দরুন হয়ে থাকে। এই এলাকায় উট ও ঘোড়ার চলাচল অথবা কোন বাহিনীর পার হওয়া তো দূরের কথা, কোন একজনের পক্ষে পায়ে হেঁটে চলাও কষ্টকর। আল্লামা মাজুদ্দীন ফীরোযাবাদ (মৃ. ৮২৩ হি.) তাঁর المغانم المطابة معالم طابة নামক গ্রন্থে حرف الحاء-এর অধীনে বহু হার্রার উল্লেখ করেছেন যা বিভিন্ন দিক দিয়ে মদীনাকে ঘিরে রেখেছে। কতক স্থানে খুব কাছে, কোথাও কিছুটা দূর। এ তাকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, কমপক্ষে সেনাবাহিনী চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে। দ্র. উল্লিখিত গ্রন্থ, ১০৮-১৪ পৃ.।

২. সহীহ বুখারী باب هجرة النبى ﷺ

আল্লাহর ইবাদত করতাম আর না আমরা তাঁকে চিনতাম! সে সময়ও তাদের (ইয়াহূদীদের) এ সাহস ছিল না, তারা মেহমানদারী কিংবা মূল্য প্রদান ছাড়া মদীনার একটি খেজুরও খাবে!"[১]

ইবন খালদূন বলেন, "এই দু'টি গোত্র বা জাতিগোষ্ঠীর ইয়াহূদীদের ওপর প্রাধান্য ছিল এবং সম্মান-সম্ভ্রম ও শান-শওকতের ক্ষেত্রে নাম করেছিল। তাদের নিকটে মুদার গোত্রের বসতি ছিল; তারাও ছিল তাদেরই মিল্লাতের মধ্যেই।"[২] বিখ্যাত আরব গ্রন্থকার ইবন 'আবদ রাব্বিহী তদীয় ইকদুল-ফারীদ, গ্রন্থে লিখেছেন :

আনসার গোত্র ছিল আয্‌দ কবিলার শাখা। এদের আওস ও খাযরাজ বলা হয়। হারিছা ইবন আমর ইবন আমের-এর দুই পুত্র থেকে এ বংশধারা চলতে থাকে। এসব লোক অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং তাদের ছিল উন্নত মনোবল। তারা কখনো কোন সম্রাট কিংবা হুকুমকে রাজস্ব প্রদান করেনি।"[৩]

এ ছাড়া বনী আদী ইবন নাজ্জার বনী হাশিমের ছিল মাতৃকুল। হাশিম তাদের বংশের এক মেয়ে সালমা বিনতে আমেরকে বিয়ে করেছিলেন। হাশিমের এক ছেলে আবদুল-মুত্তালিবের এই ঘরে জন্ম নেয়। হাশিম তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট রেখে আসেন। যখন তিনি বড় হন এবং সাবালকত্বে পৌছার সময় তাঁকে তাঁর চাচা মক্কায় নিয়ে আসেন। আরবের সমাজ জীবনে আত্মীয়-কুটুম্বের বিরাট গুরুত্ব ছিল এবং একে উপেক্ষা করা যেত না। হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) ছিলেন এই বংশেরই একজন। মদীনায় পৌছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে অবস্থান করেছিলেন।

আওস ও খাযরাজ ছিল কাহতান বংশধর। মুহাজির ও যেসব লোক মক্কা ও এর চারপাশে তাদের আগেই ইসলাম কবুল করেছিল তারা ছিল আদনান বংশের। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং আনসাররা তাঁর সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে এল তখন এর মাধ্যমে বনী আদনান ও কাহতান উভয়েই ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হলো এবং দুই দেহ এক আত্মায় লীন হয়ে গেল। জাহিলিয়াত যুগে এদের মাঝে বিরাট দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা ছিল। ইসলামের বরকতে শয়তান তাদের কাতারে ঢোকার ও কুমন্ত্রণা দেবার রাস্তাই পায়নি। ফলে জাহিলী যুগের ন্যায়-অন্যায় সকল ক্ষেত্রেই গোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব ও আদনান বংশের কিংবা কাহতান বংশের দাবির ব্যাপারে অযথা এ পক্ষের সমর্থন ও অহংকার প্রকাশের সুযোগটুকুও হারাতে বসে।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ২২৩ পৃ.।
২. তারীখে ইবন খালদুন, ২য় খ., ২৮৯ পৃ.।
৩. আল-ইকদুল-ফারীদ, ৩য় খ., ৩৩৪ পৃ.।

এ সমস্ত কারণের জন্য ইয়াছরিব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবা-ই কিরামে হিজরতের জন্য সবচেয়ে উপযোগী স্থান ছিল। ইসলামের দাওয়াতের আবাসস্থ ও কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য এই শহর পূর্ণ হকদার ছিল, এমন কি সে এর হকদার ছিল, ইসলাম পূর্ণ শক্তি ও দৃঢ়তা লাভ করুক, তার ভেতর ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা ও শক্তি পয়দা হোক এবং সে আরব উপদ্বীপকে জয় করতে পারুক এবং এরপর সেই সময়কার গোটা সভ্য জগতে আপন হেদায়াতের পতাকা ওড়াতে সক্ষম হোক!

মদীনায় ইসলামের বিস্তার

এখন আনসার (অর্থাৎ আওস ও খাযরাজ)-দের ঘরে ঘরে ইসলামের প্রচার শুরু হলো। প্রথমে আওসের শাখা বনী আল-আশহালের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের কওমের সর্দার সাদ ইবন মুআয ও উসায়দ ইবন হুদায়র ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে বিরাট ভূমিকা ছিল প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারীদের ঈমানী হিকমত, স্নেহ-ভালবাসা ও মেহেরবানীপূর্ণ আচরণ এবং মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াত ও তাবলীগের। এরপর বনী আব্দ আল-আশহাল ও ইসলাম কবুল করে। শেষ পর্যন্ত আনসারদের এমন কোন ঘর বাকী রইল না যার কোন না কোন পুরুষ ও মহিলাম মুসলমান না হয়েছে।[১]

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত

পরের বছর মুসআব ইবন উময়র (রা) মক্কায় ফিরে আসেন এবং আনসারদের কিছু মুসলমান মুশরিকদের একটি দলের সাথে, যারা হজ্জ আদায়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল, মক্কায় পৌছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে 'আকাবার বায়আতের ওয়াদা করে। তাঁরা হজ্জ পালনের পর রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হতেই আকাবা উপত্যকার নিকটে একটি ঘাঁটিতে একত্র হন। এঁদের সাকুল্য সংখ্যা ছিল ৭৩ জন যাঁদের ভেতর দু'জন মহিলাও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তশরীফ নেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল-মুত্তালিবও ছিলেন। তখনও তিনি মুসলমান হননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের কুরআন মজীদ পাঠ করে শোনান, তাঁদেরকে আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান এবং ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ কথার ওপর বায়'আত নিচ্ছি, তোমরা আমাকে হেফাজতের ব্যাপারে ততটুকুই খেয়াল রাখবে এবং যত্নবান হবে যতটুকু তোমরা আপন পরিবার-পরিজনদের

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৪৩৬-৩৮ সংক্ষেপে।

ক্ষেত্রে করে থাক। এর ওপর তাঁরা বায়'আত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তিনি তাঁদেরকে বন্ধুহীন ও সহায়হীন অবস্থায় ত্যাগ করবেন না এবং স্বীয় জাতিগোষ্ঠীর নিকটও ফিরে যাবেন না। তিনি ওয়াদা করেন এবং বলেন, আমি তোমাদেরই একজন এবং তোমরাও আমারই লোক। যার সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করবে, তার সঙ্গে আমিও যুদ্ধ করব। যার সঙ্গে তোমরা সন্ধি করবে, সমঝোতা করবে, আমিও তার সঙ্গে সমঝোতা ও সন্ধি করব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের ভেতর থেকে বারজন যিম্মাদার ও সর্দার নির্বাচিত করেন, ন'জন খাযরাজ আর তিনজন আওস গোত্রের।[২]

মদীনায় হিজরতের অনুমতি

আনসারদের এই গোত্র যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করল এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের সব ধরনের সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিল তখন থেকে মুসলমান তাঁদের আশ্রয়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সব মুসলমানের, যাঁরা তাঁর সঙ্গে মক্কায় ছিলেন, মদীনার পানে হিজরতের ও আনসারদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা তোমাদের জন্য কিছু ভাই ও ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করেছেন যেখানে তোমরা নিরাপদে থাকতে পার। এ কথা শুনে লোকে দলে দলে হিজরত করতে লাগল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় থেকেই হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন।

মক্কা থেকে মুসলমানদের হিজরত কোন তুচ্ছ ব্যাপার ছিল না যে, কুরায়শরা ঠাণ্ডা মাথায় ও নির্বিকার চিত্তে তা মেনে নিয়েছে। তারা বসতির এই অন্য স্থানে গমন, তাদের চলাচল ও গতিবিধির পথে নানা বাধা দাঁড় করায় এবং মুহাজিরদেরকে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা ও কষ্ট-তকলীফের মধ্যে ফেলতে শুরু করে। কিন্তু মুহাজিররাও তাঁদের এই রায় পাল্টাতে ও পিছিয়ে আসতে তৈরী ছিলেন না। তাঁরা কোন মূল্যেই মক্কায় থাকা পছন্দ করতেন না। কাউকে নিজের বউ-বিবি ও বাচ্চা মক্কায় রেখে একাকী চলে যেতে হয় যেমনটি আবূ সালামা (রা)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কেউ তাঁর সারা জীবনের কামাই ও পুঁজিপাট্টা থেকে হাত গুটিয়ে নেন যেমনটি সুহায়ব (রা) করেছিলেন।

উম্মু সালামা (রা) স্বয়ং বর্ণনা করেন, যখন আবূ সালামা (রা) মদীনায় হিজরতের পাকাপোক্ত এরাদা করলেন, তখন সফরের জন্য নিজের উট তৈরি করলেন, আমাকে তার পিঠে চড়িয়ে দিলেন এবং আমার ছেলে সালামা ইবন আবী সালামাকে আমার কোলে দিলেন। এরপর উটের রশি হাতে নিলেন এবং

২. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৪৪১-৪৪ পৃ.।

রওয়ানা হলেন। যখন বনী আল-মগীরার কিছু লোকের নজর তাঁর ওপর পড়ল তখন তারা তাঁর নিকট ছুটে এল এবং বলতে লাগল, তোমার পর্যন্ত তো ঠিক আছে, নিজের জান বাঁচিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু তোমার স্ত্রীকে আমরা তোমার সাথে কিভাবে ছাড়তে পারি? তিনি বলেন, এই কথা বলে তারা উটের রশি তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল এবং আমাকে সাথে করে নিয়ে গেল।

এটা দেখে বনূ আবদুল-আসাদ, যারা আবূ সালামার সমর্থক ছিল, ভীষণ উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হলো। তারা বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা তাকে আমাদের ভাই থেকে কেড়ে রেখেছ। কিন্তু এখন আমরা আমাদের সন্তানকে তার কাছে কিছুতেই থাকতে দেব না। এরপর আমার বাচ্চাকে নিয়ে তাদের ভেতর টানাটানি শুরু হয়ে গেল। উভয়েই বাচ্চা টানাটানি করতে গিয়ে বাচ্চার হাতই উপড়ে ফেলার উপক্রম করে! শেষে বনী আবদুল-আসাদ তাকে ছিনিয়ে নিল এবং নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যায়। বনূ আল-মুগীরা আমাকে তাদের কাছে নিয়ে নেয়। আমার স্বামী মদীনা রওয়ানা হয়ে পড়েছিলেন। এভাবে আমার সন্তান, স্বামী ও আমি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমি প্রতিদিন সকালে বাইরে বেরিয়ে আসতাম, আবতাহ নামক স্থানে বসে পড়তাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতে থাকতাম। আর এভাবেই কেটে যায় এক বছর।

একদিন বনী আল-মুগীরার আমার এক চাচার ছেলে আমাকে এভাবে দেখতে পেয়ে আমার প্রতি মেহেরবান হয়। সে বনী আল-মুগীরাকে গিলে বলল, তোমরা এই অসহায়া মহিলাকে কেন আটকে রেখেছ? কেন তোমরা তাকে ছেড়ে দিচ্ছ না? তোমরা তাকে তার স্বামী-পুত্র থেকে মাহরূম করেছ। এতে তারা বলতে লাগল, যদি তোমার মন চায় তবে তুমি তোমার স্বামীর কাছে চলে যেতে পার।

সে সময় বনী আবদুল-আসাদ আমার সন্তানকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়। আমি আমার উট তৈরি করলাম, আমার বাচ্চা কোলে নিলাম এবং স্বামীর সন্ধানে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। এ সময় আমার সাথে আল্লাহর কোন বান্দা ছিল না। আমি যখন "তানঈম" পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন সেখানে বনী আবদুদ-দার-এর উছমান ইবন তালহার সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে। তিনি আমাকে দেখেই বলে ওঠেন, আবূ উমায়্যার মেয়ে! কোথায় চলেছ তুমি? আমি বললাম, মদীনায় আমার স্বামীর কাছে যাবার ইচ্ছা রয়েছে। তিনি আবার বললেন, তোমার সাথে আর কেউ (কোন পুরুষ) আছে? আমি জওয়াব দিলাম, আমার সাথে আল্লাহ ভিন্ন আর এ বাচ্চা ছাড়া আর কেউ নেই। বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার পক্ষে সেখানে পৌঁছা সহজ হবে না। এই বলে তিনি উটের রশি নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং আমাকে নিয়ে সামনে রওয়ানা হলেন।

আল্লাহর কসম! যাঁদেরকে আমি এ পর্যন্ত দেখেছি তাঁদের মধ্যে কাউকেই আমি তাঁর চেয়ে বেশি শরীফ ও দয়ালু কাউকেই দেখিনি। যখনই কোন মনযিল আসত এবং থামবার দরকার হতো তিনি উট বসিয়ে নিজে দূরে সরে যেতেন। আমি উটের পিঠ থেকে নেমে এলে তিনি উটের কাছে গিয়ে সামানপত্র নামাতেন। এরপর উটটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে নিজে কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়তেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ও রওয়ানা হওয়ার সময় হলে তিনি উঠে পড়তেন, উট তৈরি করতেন, সামানপত্র উটের পিঠে বোঝাই করতেন। এরপর সেখান থেকে কিছুটা দূরে সরে যেতেন এবং আমাকে উটের পিঠে উঠে বসতে বলতেন। আমি ভালভাবে বসলে তিনি এসে উটের রশি ধরতেন এবং এভাবে পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতেন। এভাবেই তিনি আমাকে মদীনায় পৌঁছে দেন। তিনি যখন বনী আমর ইবন আওফের গ্রাম "কুবা" দেখতে পেলেন তখন আমাকে বললেন, তোমার স্বামী এই গ্রামে আছেন (আবূ সালামা এখানেই ছিলেন)। এখন তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে ওখানে চলে যাও। এই বলে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন এবং মক্কায় রওয়ানা হলেন।

তিনি বলতেন, ইসলামের কোন পরিবারকেই সেই তকলীফ বইতে হয়নি যে তকলিফ বয়েছে আবূ সালামা (রা)-এর পরিবারবর্গ এবং আমি উছমান ইবন তালহা (রা)-এর চেয়ে বেশি শরীফ ও অদম্য মনোবলের কাউকেই পাইনি।[১]

সুহায়ব রূমী (রা) যখন হিজরত করতে ইচ্ছা করলেন তখন কুরায়শ কাফিরগণ তাঁকে বলল, তুমি একজন অবহেলিত ও দরিদ্র অসহায় হিসাবে আমাদের কাছে এসেছিলে। আমাদের এখানে থেকে তুমি এত বড় ধনী ও সম্পদশালী হয়েছ এবং এত বিরাট মর্যাদার অধিকারী হয়েছ। আর এখন চাচ্ছ, তুমি তোমার সমস্ত সাজ-সজ্জা, আসবাবপত্র ও জানমাল নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! এ হতে পারে না। সুহায়ব (রা) তাদেরকে বললেন, যদি আমি এ সব কিছুই তোমাদেরকে দিয়ে দিই তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ। সুহায়ব (রা) বললেন, তবে এই নাও, আমার যা কিছু তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন: ربح صهيب - ربح صهيب সুহায়ব লাভবান হয়েছে, সুহায়ব লাভবান হয়েছে![২]

---

১. উছমান ইবন তালহা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম কবুল করেন এবং হিজরত করেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সা) কা'বাগৃহের চাবি তাঁকে সোপর্দ করেন (ইবন কাছীর, ২য় খ., ২১৫-১৭ ও আল-ইসাবা)।

২. ইবন কাছীর, ইবন হিশামের বরাতে।

এ সময় আর যাঁরা মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত ওমর, তালহা, হামযা, যায়দ ইবনে হারিছা, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যুবায়র ইবনুল-আওয়াম, আবূ হুযায়ফা, উছমান ইবন আফফান (রা) ছাড়াও আরও বহু সাহাবায়ে কিরাম। এরপর হিজরতের সিলসিলা শুরু হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মক্কায় দু'জন লোক (হযরত আবূ বকর ও হযরত আলী) ছাড়া কেবল তাঁরাই ছিলেন যাঁরা কোন সঙ্গত ওযরের কারণে যেতে পারেননি অথবা যাঁরা কোন পরীক্ষা ও সঙ্কটে পড়েছিলেন।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কুরায়শদের ষড়যন্ত্র ও তার ব্যর্থতা

কুরায়শরা যখন দেখতে পেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় এমন পরিমাণ মদদগার ও সহায় সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, সেখানে আর তাদের ওপর কোন জোর-যবরদস্তি চলবে না, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় হিজরত থেকে খুবই বিপদ ও ভয়ের আশঙ্কা করল। তারা ভাবল, যদি তিনি মদীনায় চলে যান তাহলে আর তাঁকে পায় কে? কোনভাবেই আর তাঁকে বাগে আনা যাবে না। অতএব, যা করবার তা এখনই করতে হবে, নইলে আর কখনো নয়। এই ভেবে তারা সকলে দারুন-নদওয়া (যা আসলে কুসায়্যি ইবন কিলাবের ঘর ছিল এবং কুরায়শরা তাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে এখানেই সিদ্ধান্ত নিত এবং নিষ্পত্তি করত) সমবেত হলো এবং সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল। এ সময় কুরায়শদের বড় বড় সর্দার সবাই হাজির ছিল।

শেষে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হয়, প্রতি গোত্র থেকে একজন সাহসী, উদ্যমী ও উত্তম বংশের যুবক বাছাই করা হোক! তারা সকলে মিলে একযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর হামলা করবে। তাতে এই হত্যার দায় সকল গোত্রের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাবে। কারও একার ওপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। তাহলে বনী আবদে মানাফ সকল কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ঝুঁকি নেবে না। এরপর লোকেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং "সার্বিক পাপ" সংঘটনের এই সিদ্ধান্ত এভাবেই গৃহীত হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল-কে শত্রুদের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং জানিয়ে দেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে তাঁর বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দেন এবং এও বলেন, তাঁর জীবনের ওপর কোনরূপ বিপদের কোন আশংকা নেই।

এদিকে ষড়যন্ত্রকারীরা সকলে মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় সশস্ত্র অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। তারা আক্রমণের জন্য ছিল পুরোপুরি প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং অল্প কিছু মাটি হাতে তুলে নিলেন। এ সময়ই

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ খ., ৪৭০-৭৯।

আল্লাহ তাআলা তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন। অতঃপর তিনি তাদের মাথার ওপর মাটি ছিটাতে ছিটাতে এবং সূরা ইয়াসীনের আয়াত فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ পর্যন্ত তেলাওয়াতরত অবস্থায় পরিষ্কার তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, কেউ জানতেও পারল না।

এরই মাঝে এক আগন্তুক এসে তাদেরকে বলল, তোমরা কিসের ও কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ? তারা বলল, মুহাম্মদের অপেক্ষায় আছি। আগন্তুক বলল, ব্যর্থ অপদার্থের দল! সে তো চলে গেছে এবং যেখানে যাবার তার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে। তারা সকলেই ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখল, একজন লোক বিছানায় শুয়ে আছে। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল, বিছানায় শায়িত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ না হয়েই যায় না! ভোর হলে দেখা গেল হযরত আলী (রা) বিছানা ছেড়ে উঠছেন। এ দৃশ্যে তারা খুবই লজ্জিত হলো ও সকলে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেল।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরত

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার এবং হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবূ বকর (রা) বললেন: الصحبة يارسول الله ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গী ও সহচর হবার প্রত্যাশী। তিনি বললেন, الصحبة। হ্যাঁ, তুমিই এ সফরে আমার সাথী হবে। হযরত আবূ বকর (রা) এ কথা শুনে আনন্দে কেঁদে ফেলেন! এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে দু'টো উটে ওঠার জন্য পেশ করেন যা তিনি এই সফরের উদ্দেশে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন উরায়কিতকে তিনি পথ প্রদর্শক হিসাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করেন।

আশ্চর্য বৈপরীত্য

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এত পরিমাণ শত্রুতা ও তাঁর বিরোধিতায় এতখানি ঐক্যবদ্ধ হাওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বস্ততা, সততা, উদারতা, আমানতদারী ও অদম্য মনোবলের ওপর ছিল পূর্ণ আস্থাশীল। সমগ্র মক্কায় যদি কারো কোন জিনিস বিনষ্ট হবার কিংবা ছিনতাই হবার আশঙ্কা দেখা দিত তবে সে উক্ত বস্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গচ্ছিত রেখে দিত। এভাবে তাঁর নিকট বিভিন্ন ধরনের আমানত রক্ষিত ছিল। তিনি হযরত আলী (রা)-কে এসবের

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৪৮০-৮৪ পৃ.।

যিম্মাদার বানিয়ে যান যাতে তিনি মক্কায় থেকে এসব আমানত তার প্রকৃত মালিকদেরকে ফেরত দিতে পারেন। যতক্ষণ না তিনি তা পালন করতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্তই কেবল তিনি মক্কায় অবস্থান করবেন। আল্লাহ তায়ালা সত্যই ইরশাদ করেছেন :

قَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

"আমি জানি, ওদের (কাফিরদের) কথা তোমাকে কষ্ট দেয়, আর তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে থাকে।" [সূরা আন'আম ঃ ৩৩ আয়াত]

হিজরত থেকে একটি শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই হিজরত থেকে সর্বপ্রথম যে কথা প্রমাণিত হয় তা, দাওয়াত ও ধর্ম বিশ্বাসের খাতিরে যে কোন প্রিয় ও ভালবাসার, যে কোন পরিচিত ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু এবং এমন প্রতিটি বস্তুকে যাকে ভালবাসা, যাকে প্রাধান্য প্রদান এবং যাকে যে কোন মূল্যে আঁকড়ে ধরার প্রেরণা মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকৃতির অন্তর্গত, বে-দেরেগ কুরবানী করা যায়, কিন্তু কথিত প্রথম দু'টি বস্তুকে কোন জিনিসের বিনিময়েই বর্জন করা যেতে পারে না।

মক্কা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মস্থান ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর কেন্দ্র ও স্বদেশ হওয়া ছাড়াও হৃদয়ে চুম্বকের মতই তার প্রতি আকর্ষণ ছিল। আর তা এজন্যও যে, এই শহরেই বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘর অবস্থিত যার প্রতি ভালবাসা তাঁদের আত্মা ও রক্তের কণিকায় মিশে ছিল। কিন্তু এগুলোর কোনটিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে দেশত্যাগ ও পরিবার-পরিজনকে বিদায় জানানো থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কিন্তু যমীন এই আকীদা-বিশ্বাস ও দাওয়াতের জন্য একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং মক্কাবাসীরা এ দু'টো বস্তু থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মানবীয় সম্বন্ধ ও ভালবাসা এবং ঈমানী শক্তি ও আগ্রহ-উদ্দীপনার এই মিলিত প্রেরণা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর এই বাক্য থেকে স্পষ্ট ফুটে ওঠে যা তিনি হিজরত কালে মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

ما اطيبك من بلد واحبك الى ولولا ان قومى اخرجونى منك ما سكنت غيرك.

"(প্রিয় মক্কা!) কত সুন্দর শহর তুমি আর আমার কত প্রিয় ও ভালবাসার তুমি! যদি আমার কওম আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত তাহলে তোমাকে ছাড়া অন্য কোথাও আবাস গড়তাম না, বসবাস করতাম না।"[১]

এটি ছিল আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দেশ পালন:

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنَ.

"বান্দা আমার! যারা ঈমান এনেছ (তারা জেনে রাখ), আমার যমীন খুব প্রশস্ত; অতএব, একমাত্র আমারই ইবাদত কর।" [সূরা আনকাবূত ঃ ৪৬ আয়াত]

ছওর গিরিগুহার দিকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা) মক্কা থেকে গোপনে চুপিসারে রওয়ানা হন। আবূ বকর (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে বলে রেখেছিলেন, সে যেন খবর রাখে, লোকে তাঁদেরকে নিয়ে কী ধরনের কানাকানি করছে। নিজের গোলাম আমের ইবন ফুহায়রার প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল সে যেন সারা দিন তার বকরী চরায় এবং সন্ধ্যাবেলায় তাঁদেরকে দুধ পৌছে দেয়। আসমা বিনতে আবী বকর (রা) তাঁদের খাবার পৌছে দিতেন।

প্রেমের অপূর্ব ঝলক

প্রেম বা ভালবাসা মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এমন একটি ইলহামী বা ঐশী প্রেরণা হিসাবে স্থায়ী ও চিরন্তন হয়ে আছে যা নাযুক থেকে নাযুকের কথা বা বিষয়ের দিকে নিজেই পথ-দেখায় আর রাস্তা বুঝিয়ে দেয়। এই عشق است وهزار بد گمانی ওয়ালা ব্যাপারটা তার প্রেমাস্পদ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও গাফিল হয় না এবং কল্পনা থেকে ধারণা করে বস্তুর বিপদের আঁচ করে। এই সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা)-এরও অবস্থা ছিল অনেকটা এ ধরনেরই। বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গুহার দিকে রওয়ানা হলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা) চলার সময় কখনও তাঁকে আগে রেখে পেছনে চলতেন, আবার কখনো বা পেছনে রেখে নিজে সামনে চলতেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, আবূ বকর! কী ব্যাপার, কখনো তুমি আমার পেছনে পেছনে চল, আবার কখনো বা আগে? আবূ বকর (রা) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমি দুশমনের পেছনে হওয়ার কথা মনে করি তখন আমি আপনার পেছনে চলি, অতঃপর সামনে থেকে যখন শত্রুর হঠাৎ আক্রমণের আশঙ্কা হয় তখন আমি আপনার সামনে যাই।[২]

---

১. ইবন আব্বাস (রা) থেকে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত মরফূ' হাদীছ (باب فضل مكة)।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাছীরকৃত, ৩য় খ., ১৮০; বায়হাকী বর্ণিত ওমর (রা) কর্তৃক।

উভয়ে যখন গুহা মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একটু থামুন। আমি গুহার ভেতর-বাইরে ভালভাবে দেখে নিই আর ধূলি-ময়লা কিছু থাকলে ভেতরটা পরিষ্কার করে নিই এরপর তিনি গুহার ভেতরে ঢোকেন এবং তা সাফ-সুতরা করে যেসব গর্ত ও ফাঁক-ফোকর ছিল সেগুলো বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সে সময় তাঁর মনে পড়ল, ভেতরের একটি গর্ত এখনও বন্ধ করা বাকি যেটি তিনি ঠিকমত দেখতে পাননি। তিনি পুনরায় আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি সেটি আরেকবার দেখে নিই। তিনি পুনরায় গুহায় ঢুকলেন। যখন তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভেতরে ঢোকার অনুরোধ জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে তশরীফ নেন।[১]

আসমানী সাহায্য ও গায়বী মদদ

উভয়ে যখন গুহায় প্রবেশ করলেন তখন আল্লাহ তায়ালা মাকড়সা পাঠালেন। সে গুহা ও গুহার মুখে যা গাছ ছিল তার মাঝে জাল বুনল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আড়াল করে দিল। এরই সাথে আল্লাহ তায়ালা দু'টো কবুতর পাঠিয়ে দিলেন। এরা বাক-বাকুম ডেকে অবশেষে গুহার মুখে এসে বসে গেল।[২]

আল্লাহরই হাতে আসমান ও যমীনের বাহিনী।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নাযুক মুহূর্ত

এদিকে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পেছনে ছুটল। এ ছিল মানবতার সুদীর্ঘ সফরের সবচেয়ে নাযুক ও চরম সন্ধিক্ষণ অথবা এ ছিল এমন এক দুর্ভাগ যার কোন শেষ ছিল না কিংবা এমন এক সৌভাগ্যের সূচনা যার কোন সীমা ছিল না। মানবতা অস্থির চিত্তে শ্বাসরুদ্ধ করে এবং নিশ্চল ও নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে সেই সব গুপ্তচর ও অনুসরণকারীকে অবাক চোখে দেখছিল যারা সেই মুহূর্তে গুহার মুখে দাঁড়িয়েছিল এবং এতটুকু বাকি ছিল যে, তাদের মধ্যে কেউ নীচের দিকে তাকাবে আর দেখে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাদের ও তাদের পদক্ষেপের মাঝে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং তারা প্রতারিত হলো। তারা দেখল গুহার মুখে মাকড়সার জাল। ফলে তাদের ধারণায়ও আসেনি যে, ভেতরে কেউ থাকতে পারে!

---

১. প্রাগুক্ত।

২. ইবন কাছীর ২য় খ., ২৪০-২৪১ ইবন আসাকির বর্ণিত।

এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا.

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا = চিন্তিত হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে

সেই মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৃষ্টি ওপরে উঠতেই মুশরিকদের পায়ের আভাস পেলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আর এক কদমও যদি এগোয় তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াব দিলেন, مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا "সেই দু'জনের সম্বন্ধে তোমরা কি ধারণা যাঁদের তৃতীয় জন আল্লাহ?"[১] এ সূত্রেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন,

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا.

"দু'জনের একজন যখন তারা দু'জনের গুহার ভেতর ছিলেন যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন, ঘাবড়িও না, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই; আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা তওবাহ ঃ ৪০ আয়াত]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পশ্চাদ্ধাবনে সুরাকার যাত্রা

কুরায়শরা চারদিকে ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে কোন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গ্রেফতার করে আনতে পারবে তাকে এক শত উটনী পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-সহ গুহায় তিন রাত্রি কাটানোর পর বেরিয়ে সামনের দিকে এগোলেন। আমের ইবন কুহায়রা ও আবদুল্লাহ ইবন উরায়কিত, যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ দেখানোর জন্য সাথে নিয়েছিলেন, সমুদ্র তীরের দিকে তাঁদেরকে নিয়ে চললেন।

সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শামকে পুরস্কার লোভ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে ছোটার জন্যে উস্কানি দেয় এবং শত উটনীর জন্যে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ শুরু করে। কিন্তু হঠাৎ তার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। কিন্তু এরপরও সে হার মানতে রাজি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ের চিহ্ন ধরে সামনে এগুতে থাকে। দ্বিতীয়বার তার ঘোড়া হোঁচট খেলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। অতঃপর পুনরায় সে তাতে সওয়ার হয়ে পেছনে ছোট শুরু করে, এমন কি সে যাত্রীদলকে সামনে এগোত দেখতে পায়। আর ঠিক সেই সময়েই তার ঘোড়া কঠিনভাবে হোঁচট খায় এবং তার সামনের দু'টো পা মাটির

---

১. সহীহ বুখারী আয়াতের তাফসীর অধ্যায়।

মধ্যে ধ্বসে যায় আর সুরাকা মাটিতে ছিটকে পড়ে। এরই সাথে সেখান থেকে ঘূর্ণি আকারে ধোঁয়া উঠতে থাকে।

এ দেখে সুরাকা পরিষ্কার বুঝতে পারল, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহায় ও মদদগার এবং সব জায়গায় তিনিই জয়যুক্ত হবেন। অতএব সে জোরে ডাক দিল এবং বলল, আমি সুরাকা ইবন জু'শাম। আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। আমা দ্বারা আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, ওকে জিজ্ঞেস করুন সে আমাদের কাছে কী চায়? সুরাকা বলল, আপনি মেহেরবানী করে আমাকে কিছু লিখিত দিন যা আমার ও আপনার মাঝে চিহ্ন ও স্মৃতি হিসাবে রক্ষিত থাকবে। আমের ইবন ফুহায়রা হাড় কিংবা ঝিল্লির ওপর কিছু লিখে তাকে দেন।[১]

একটি কল্পনাতীত ও বুদ্ধির অগম্য ভবিষ্যদ্বাণী

ঠিক এমনি এক অবস্থায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই দেশ ত্যাগে মজবুর, যখন তাঁর পক্ষে মক্কায় থাকা অসম্ভব, চারদিক থেকে শত্রু দিয়ে ঘেরাও, সতর্ক ও শ্যেন দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি তখন দৃষ্টিসীমার বাইরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত যেদিন তাঁরই গোলাম পারস্য সম্রাট কিসরার শাহী মুকুট ও রোম সম্রাট কাইজারের সিংহাসন তাদের দুই পা দিয়ে দলিত-মথিত করবে এবং দুনিয়ার সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের মালিক হবে। তিনি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝেও সেই জ্বলজ্বলে আলোকিত ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং সুরাকাকে লক্ষ্য করে বলেন, সুরাকা! সে সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন পারস্য সম্রাটের কঙ্কন তুমি তোমার হাতে পরবে?

নিশ্চিতই আল্লাহ তাঁর নবীর সঙ্গে সাহায্য-সমর্থন, প্রকাশ্য ও নিশ্চিত বিজয় এবং তাঁর দীনের প্রাধান্য, উত্থান ও পরিপূর্ণ বিজয়ের ওয়াদা করেছিলেন।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য-সুন্দর দীনসহ পাঠিয়েছেন যাতে সেই দীনকে (দুনিয়ার) সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, যদিও তা মুশরিকদের নিকট অপ্রীতিকর হয়।" [সূরা তওবা : ৩৩ আয়াত]

১. সীরাত ইবন হিশাম, ৪৮৯-৯০; এ ছাড়া বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের باب هجرة النبى الى المدينة শব্দের কিছুটা পার্থক্য।

হস্ব দৃষ্টি স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা এই সত্যকে অস্বীকার করেছে, অগ্রাহ্য করেছে, কুরায়শরা একে অসম্ভব বিষয় ভেবেছে, কিন্তু নবুওয়াতের দৃষ্টি দূরের জিনিসকে কাছে দেখছিল।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

"আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।"

এটি হরফে হরফে সত্যে পরিণত হয়েছে। যখন হযরত ওমর (রা)-এর সামনে পারস্য সম্রাট কিসরার কঙ্কন, তার কোমরবন্ধনী, মেখলা ও শাহী মুকুট এনে হাজির করা হয় তখন তিনি সুরাকাকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে এসব পরিধান করান। আর এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী হরফে হরফে পূর্ণতা পায়।[১] সুরাকা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাহা খরচ ও জরুরী সামানও পেশ করেছিল, কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি, কেবল এতটুকু বলেছিলেন : اخف عنا "আমাদের খবর গোপন রাখবে, কাউকে বলবে না।"

বরকতময় ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা) তাঁদের সফরকালে উম্মু মা'বাদ আল-খুযাইয়ার পাশ দিয়ে যান। তার ছিল একটি বকরী। দানাপানি ও ঘাসের ঘাটতির দরুন বকরীর দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পালানের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন, আল্লাহর নাম নিলেন এবং দু'আ করলেন। ঠিক সে মুহূর্তেই পালান দুধে পরিপূর্ণ হলো। অতঃপর দুধ দোহন করা হলে তিনি উম্মু মা'বাদ ও নিজের সাথীদেরকে তা পান করতে দিলেন। সবাই পেট ভরে ও তৃপ্তি সাথে দুধ পান করলেন। এরপর মহানবী ﷺ নিজেও পান করলেন। অতঃপর আবার দুধ দোহন করা হলে পাত্র ভর্তি হয়ে গেল। আবূ মা'বাদ ঘরে ফিরে পাত্র ভর্তি দুধ দেখে ব্যাপার কি জানতে চাইল। উম্মু মা'বাদ বলল, আল্লাহর কসম! একজন বরকতময় লোক আমাদের এখান দিয়ে গেছেন! তিনি এ ধরনের কথাও বলেছেন, এই বলে সে রাসূল ﷺ-এর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করল। এ কথা শুনে আবূ মা'বাদ বলল, আল্লাহর কসম! মনে হচ্ছে ইনি সেই লোক কুরায়শরা যাঁর সন্ধান করে ফিরছে।[২]

রাহবার তাঁদের দু'জনকে সাথে করে সফর অব্যাহত রাখল। অতঃপর এক সময় তাঁরা মদীনার কাছে কুবা পল্লীতে পৌঁছলেন। এটি ছিল ১২রবিউল আওয়াল সোমবারের ঘটনা। আর এই তারিখ থেকেই হিজরী তথা ইসলামী বর্ষপঞ্জী শুরু করা হয়।

---

১. আল-ইস্তীআব, ২য় খ., ৫৯৭।

২. যাদু'ল-মাআদ, ২য় খ., ৩০৯ পৃ.।

নবী যুগে ইয়াছরিব (মদীনা) : এক নজরে

মক্কা ও মদীনার সামাজিক পার্থক্য

ইয়াছরিব শহরের সঠিক পরিমাপ করবার জন্য যে শহরকে আল্লাহতা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দারুল হিজরত, ইসলামের বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কেন্দ্র ইসলাম আসার পর পয়লা ইসলামী সমাজের দোলনা বানান, আমাদেরকে তার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রাচীন গোত্রগুলোর পরস্পরের সম্পর্ক, সেখানকার ইয়াহূদীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব এবং এই উর্বর শহরের জীবনের মান বুঝতে হবে যেখানে কয়েকটি ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ পাশাপাশি ছিল, যেখানে মক্কা মুকররামায় এক রঙ, এক পদ্ধতি ও একই ধর্ম ছিল। এই প্রসঙ্গে এখানে পাঠকদের সামনে কিছুটা বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে যাতে নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাবকালীন ইয়াছরিব শহরের ধরন, প্রকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে কতকটা আন্দাজ করা যাবে।

ইয়াহূদী

বর্তমানে এই ঐতিহাসিক সত্য এমন গুরত্ব পেয়েছে যে, ইয়াহূদীদের অধিকাংশই আরব উপদ্বীপে সাধারণভাবে, বিশেষভাবে ইয়াছরিব শহরে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আগমন করে। প্রখ্যাত ইয়াহূদী পণ্ডিত ড. ইসরাঈল ওয়েলফিনসন লেখেন,

"৭০ খৃস্টাব্দে ইয়াহূদী ও রোমকদের যুদ্ধের ফলে যখন ফিলিস্তীন ও বায়তুল মাকদিস ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইয়াহূদীরা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তখন ইয়াহূদীদের বহু দল আরব দেশগুলোর দিকে মুখ ফেরায়। একই বক্তব্য ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাসেরও যিনি নিজেও এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইয়াহূদী ইউনিটগুলোর নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। আরবী উৎসসমূহেও এর সমর্থন মেলে।[১]

মদীনায় ইয়াহূদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করত (যাদের বয়স্ক পুরুষদের সংখ্যা দু'হাজারের কিছুটা ওপরে) : কায়নুকা, নাদীর ও কুরায়জা। অনুমিত হয়,

---

১. تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام ওয়েলফিনসন (আবূ যুওয়াইব) কায়রো ১৯২৭।

কায়নুকা গোত্রের লড়াকু পুরুষের সংখ্যা ছিল সাত শ'। নয'দীর গোত্রের লোক সংখ্যাও ছিল অনুরূপ। অপরপক্ষে কুরায়জা গোত্রের প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা ছিল সাত শ' ও নয় শ'র মাঝামাঝি।[১]

এই তিনটি গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ত এবং এদের পরস্পরের মধ্যে কখনও যুদ্ধও বেঁধে যেত। ড. ওয়েলফিনসেন বলেন,

"বনী কায়নুকা ও অবশিষ্ট ইয়াহূদীদের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছিল। এর কারণ বনী কায়নুকা ও বনী খাযরাজের সঙ্গে বুআছ যুদ্ধে শরীক ছিল। আর বনী নাদীর ও বনী কুরায়জা অত্যন্ত নির্মমভাবে বনী কায়নুকার রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের মেরুদণ্ড অত্যন্ত কঠিন হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, অথচ তারা বন্দী সমস্ত ইয়াহূদীদের মুক্তিপণ (ফিদয়া)-ও আদায় করে দিয়েছিল। তারপর বুআছ যুদ্ধের পর থেকে ইয়াহূদী গোত্রগুলোর মধ্যে ঝগড়া চলে আসছিল। কায়নুকা গোত্র ও আনসারদের মধ্যে যুদ্ধ হলে আনসারদের মুকাবিলায় কোন ইয়াহূদীই তাদের সহযোগিতা দেয়নি।[২]

কুরআন মজীদও য়াহূদীদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ.

---

১. এই অনুমান সীরাত ইবন হিশামের সেসব পরিসংখ্যান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যা যুদ্ধ ও ঘটনাবলীর আলোচনায় এসেছে :
যেমন বনী নাদীরের নির্বাসন, বনী কুরায়জার হত্যা প্রভৃতি। বনী কায়নুকা, বন নাদীর ও কুরায়জা ছিল বিরাট গোত্র, যার অধীনে আরও অনেক শাখা গোত্রও ছিল। যেমন বনী হাদল বনী কুরায়জার অনুগত ছিল যাঁদের ভেতর কেউ কেউ বড় সাহাবীও হয়েছিলেন এবং বনী যানবা ছিল বনী কুরায়জার শাখা। কিছু কিছু ইয়াহূদী দলের নাম সেই চুক্তিতেও এসেছে যা রসূলুল্লাহ (সা) ও ইয়াহূদীদের মধ্যে হয়েছিল। যেমন বনী আওফ, বনী আন-নাজ্জার, বনী সাইদাহ, বনী ছালাবা, বনী জুফনা, আল হারিছ প্রভৃতি এই চুক্তিতে সেসব দলের আলোচনার পর এসেছে, ان بطانة يهود كانفسهم ইয়াহূদীদের বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য লোকের ব্যাপারে তাদেরই মত। এজন্য সামহূদী وفاء الوفاء প্রণেতা বলেন, য়াহূদীরা কুড়িটি গোত্রের বেশি ছিল। - وفاء الوفاء ১১৬ পৃ.

২. اليهود فى بلاد العرب , ১২৯ পৃ.।

"যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করবে না, অতঃপর তোমরা এটা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। তোমরাই তারা যারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করছে এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন করে পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও, অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।" [সূরা বাকারা : ৮৪-৮৫ আয়াত]

ইয়াহূদীরা মদীনার বিভিন্ন বস্তি ও মহল্লায় থাকত। এটা তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বনূ কায়নুকাকে যখন বনী নাদীর ও বনূ কুরায়জা মদীনার পাশের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয় তখন তারা শহরের ভেতর একটি বিশেষ মহল্লায় বসবাস করতে থাকে। বনূ নাদীর মদীনা থেকে দু'তিন মাইল দূরে বুতহান উপত্যকার চড়াইয়ে থাকত যা ছিল খেজুর ও ক্ষেত-খামারে পূর্ণ। বনূ কুরায়জা মদীনার দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে মাহযূর এলাকায় বসবাস করত।[১]

মদীনায় ইয়াহূদীদের নির্দিষ্ট বস্তি ছিল সেখানে তৈরি হয়েছিল বহু দুর্গ ও সুদৃঢ় ইমারত। সেগুলোতে তারা স্থায়ীভাবে থাকত। তাদের ইয়াহূদী হুকুমত স্থাপনের মওকা মেলেনি, বরং তারা গোত্রীয় সর্দারদের সমর্থন-সহায়তায় ও হেফাজতে নিশ্চিন্তে বসবাস করত এবং এই সমর্থন-সহায়তার বদলে তারা বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করত যদ্দরুন তারা বেদুঈনদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকত। এই বিপদের কারণেই ইয়াহূদীরা অঙ্গীকার বা চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য ছিল। প্রত্যেক ইয়াহূদী আরব সর্দার ও আরব রঈসের কাউকে না কাউকে নিজেদের মিত্র বানিয়ে রাখত।[২]

ধর্মীয় বিষয়াদি

ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে একটি চিরন্তন ধর্মের ও আসমানী শরীয়ত তথা ঐশী বিধানের ধারক-বাহক মনে করত। তারা তাদের মাদরাসাগুলোতে (যেগুলোকে মিদরাস বলত) তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে, শরঈ হুকুম-আহকাম, ইতিহাস ও তাদের নবী-রসূলদের জীবনী পাঠ করত এবং পাঠ দান করত। এভাবেই তারা নির্দিষ্ট ইবাদতগাহগুলোতে তাদের ইবাদত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করত। তারা সেসব জায়গায় তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে পরামর্শ ও মত বিনিময়ের জন্য একত্র হতো। ইয়াহূদীরা তাদের নির্দিষ্ট ধর্মীয় আইন-কানুনের ওপর আমল করত যেগুলোর ভেতর থেকে কিছু কিছু তারা নিজেদের কিতাবগুলো থেকে গ্রহণ করেছিল আর কিছু তাদের গণক ও আলিমগণ নিজেদের পক্ষ থেকে রচনা

---

১. بنو اسرائل فى القران والسنه - للد كتور محمد سيد الطنطاوى ৭৭ পৃ.।

২. تاريخ العرب قبل الاسلام ৭ম খ., ২৩ পৃ. থেকে সংক্ষেপিত, ড. জাওয়াদ আলী (বাদগাদ)

করে নিয়েছিল। ঠিক তেমনি তাদের ঈদ উৎসব তারা পৃথকভাবে পালন করত। বিশেষ কিছু দিন যেমন আশূরার দিনে তারা রোযা রাখত।[১]

ইয়াহূদীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা

মনে হয় মদীনার ইয়াহূদীদের তাদের আসল দীন ও কিতাবের শিক্ষামালার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল এবং কালক্রমে তারাও তাদের প্রতিবেশী আরবদের মতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাওহীদের কিছু প্রভাব, খানাপিনা ও হালাল-হারামের বাছ-বিচার তখনও থেকে গিয়েছিল। কিন্তু যখন ইসলাম নির্ভেজাল তাওহীদের অকাট্য আকীদা-বিশ্বাস সাথে নিয়ে এল যা কুরআনে রয়েছে, তখন তাদের এই ছিটেফোঁটা বৈশিষ্ট্যটুকুও লোপ পেল। তারা নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌছে গিয়েছিল। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিকৃষ্টতম কাজ, যাদুটোনা প্রভৃতি, বিরোধী ও প্রতিপক্ষের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য খাদ্যে বিষ মেশানো, বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ, দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি, ধোঁকা দিয়ে অর্থপূর্ণ কথা বলে আহত নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দান করা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঐসব হীন মানসিকতা ও পরাজিত সমাজের পরিচিত চিহ্ন ছিল। তারা পুরুষোচিত গুণ ও নৈতিক সাহস থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যাদুবিদ্যা ও গণনাশাস্ত্রে ইয়াহূদীদের দক্ষতা ইতিহাসস্বীকৃত। তাদের আলিম ও মনীষীরা এ কথা গর্বভরে বলেও থাকে। কুরআন মজীদেরও নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে:

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ .

"তারা (ইয়াহূদীরা) এর (যাদুবিদ্যার) আনুগত্য করেছে যদ্দারা শয়তান সুলায়মানের সাম্রাজ্যে ও শাসনামলে কাজ নিত।" [সূরা বাকারা : ১০২ আয়াত]

ইয়াহূদীদের এই পেশা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত ছিল। প্রখ্যাত ইয়াহূদী প্রাচ্যবিদ মারগোলিয়ূথ (Margoliuth), যার ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব সর্বজনবিদিত, বলেন, "মদীনার ইয়াহূদীরা যাদুবিদ্যায় বড় অভিজ্ঞ ছিল। তারা প্রকাশ্য যুদ্ধ ও পুরুষোচিত শৌর্যবীর্যের মুকাবিলায় যাদুর কসরত দেখানোকে প্রাধান্য দিত।"[২]

খয়বর যুদ্ধের প্রসঙ্গে বকরীর গোশতে বিষ মেশানোর ঘটনা আসবে যা নবী করীম ﷺ-কে পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা থেকে রক্ষা পান। কিন্তু বশর ইবন বারা ইবন মারূর (রা.) এই খাবার গ্রহণ করায় মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

---

১. بنو اسرائيل فى القران والسنة, ৮০-৮১ পৃ.।

২. Margoliuth, Muhammad and the Rise of Islam, P. 189.

৩. সহীহ বুখারী باب الشاة سمت للنبى ﷺ بخيبر

পরিচিত বাক্যকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ব্যবহার এবং এর থেকে কদর্য অর্থ গ্রহণের উল্লেখ কুরআন শরীফে এভাবে এসেছে:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা (নবীকে) راعنا, বল না, বরং বল انظرنا (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন); আর জেনে রেখ, কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" [সূরা বাকারা : ১৫৪ আয়াত]

আবূ নঈম তাঁর দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহূদীরা খুবই আস্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে راعنا, বলত যা ছিল তাদের ভাষায় একটি খারাপ গালি। তারা এ কথা বলে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করত। এই কারণে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাযিল করেন এবং এর দরজা বন্ধ ও মুসলমানদের পরের অনুকরণ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ইয়াহূদীদের এখানে এই বাক্যের অর্থ হলো : اسمع لاسمعت শোন! আল্লাহ যেন তোমাকে শোনার নসীব না করেন। এও বলা হয়েছে (না'উযুবিল্লাহ = আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই) তারা অর্থাৎ ইয়াহূদীরা রাসূল ﷺ -কে ر ع ن দ্বারা ডেকেছে যা رعونا, থেকে আর এর অর্থ হলো মূর্খতা ও বোকামি। আলিফ দীর্ঘ আওয়াজের জন্য।[১]

ইমাম বুখারী হযরত আয়েশা (রা) থেকে ওরওয়া (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা মহানবী ﷺ -কে সালাম করার সময় سام عليك অর্থাৎ 'তোমার ওপর মৃত্যু বা দুর্ভাগ্য আপতিত হোক' বলত।[২]

হাদীসে এসেছে لكل داء دواء الا السام 'সব রোগের ঔষধ আছে মরণ ব্যাধি ছাড়া।' এ সম্বন্ধে এই আয়াত নাযিল হয়:

وَاِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ.

"আর লোকে যখন তোমার কাছে আসে তোমাকে তখন এমন ভাষায় সালাম দেয় যে ভাষায় আল্লাহ তোমাকে সালাম দেননি।"

এভাবেই তারা এমন সব নৈতিক অবনতি ও চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার হয়েছিল যা কোন সভ্য, ভদ্র ও শারঈ শিক্ষামালার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের নিকট আশা করা যায় না। এই প্রবণতা সম্বন্ধে জানা যায় সেই আরব মহিলার ঘটনা

---

১. আল্লামা আলূসী বাগদাদীকৃত, রূহুল মাআনী, ১ম খ., ২৪৮-৪৯।
২. জামি সহীহ, কিতাবুদ্দাওয়াত।

থেকেও যে মহিলা বনী কায়নুকার বাজারে একজন কারিগরের নিকট কোন কাজে গিয়েছিলেন। ইয়াহূদী তখন তার মুখের নেকাব খুলে ফেলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু মহিলা অস্বীকার করায় কারিগর তার নেকাব পেছনে (কিছুর সাথে) বেঁধে দেয়। মহিলাটি উঠে দাঁড়াতেই তাঁর নেকাব খসে পড়ে এবং তিনি বেআব্রু হয়ে যান। এই দৃশ্যে ইয়াহূদীরা হেসে ফেলে। ফলে অপমানিতা মহিলাটি জোরে চিৎকার করে ওঠেন। চিৎকার শুনে একজন মুসলিম ছুটে আসেন এবং তলোয়ারের এক আঘাতেই দুর্বৃত্ত কারিগরকে খতম করেন। অতঃপর ইয়াহূদীরা সকলে উক্ত মুসলমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে শহীদ করে দেয়।[১]

দেখে মনে হয়, এই জাতীয় ঘটনা এটাই প্রথম ছিল না এবং আরব বাজারগুলোতে এরূপ ঘটা ছিল কঠিন।

অর্থনীতি

অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের অধিকাংশ আর্থিক বিষয় বন্ধক ও সুদী ভিত্তিতে চলত এবং মদীনার মত কৃষি এলাকার কারণে তাদের সামনে সুবর্ণ সুযোগও ছিল। কেননা কৃষকদের কৃষিকর্মের জন্য বেশির ভাগ সময় ধারকর্জের প্রয়োজন দেখা দিত।[২]

বন্ধক ব্যবস্থা কেবল সম্পদ ও গহনাগাটির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নিরুপায় অবস্থায় মহিলা ও শিশুকেও বন্ধক রাখা হতো। কা'ব ইবনে আশরাফ-এর হত্যা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন :

قال له محمد بن مسلمة قد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين فقال نعم ار هنو نى قالوا اى شئ تريد . قال ارهنو نى نساءكم قالوا كيف نرهن نسائنا وانت اجمل العرب قال فارهنونى ابناءكم قالوا كيف نر هنك ابنائنا فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين قال هذا عار علينا ولكن نرهنك اللامة.

"মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) কা'বকে বললেন, আমরা চাই, তুমি এক ওয়াসাক কিংবা দুই ওয়াসাক খাদ্যশস্য আমাদেরকে কর্জ হিসাবে দাও। সে বলল, দিতে পারি, তবে এই শর্তে, তুমি আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা) বললেন, তুমি কি বন্ধক নিতে চাও? কা'ব বলল, তুমি তোমার মহিলাদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমরা আমাদের

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২খ., ৪৮ পৃ.।

২. بنو اسرائيل فى القران والسنة পৃ. ৮০-৮১;

মহিলাদেরকে তোমার কাছে কি করে বন্ধক রাখি যেখানে তুমি সমগ্র আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রী ও কান্তিময় পুরুষ? সে বলল, তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক হিসাবে রাখ। এতে তিনি বললেন, আমরা আমাদের ছেলেদেরকে তোমার কাছে কি করে বন্ধক রাখি? ভবিষ্যতে তাদেরকে কেউ গালমন্দ করবে এবং খোঁটা দেবে, তাদেরকে এক বা দুই ওয়াসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। আর এটা আমাদের জন্য হবে চরম লজ্জা ও গ্লানির বিষয়। অবশ্য আমরা তোমার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক হিসাবে রাখতে পারি।"[১]

এ ধরনের বন্ধকের অশুভ পরিণাম হলো, এতে বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়, বিশেষত সেই সময় যখন আরবের লোকের তাদের মহিলাদের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী এবং এ ব্যাপারে তাদের খ্যাতিও রয়েছে। মদীনার অর্থনীতির ওপর ইয়াহূদীদের এই প্রাধান্যের ফলে তাদের সামাজিক চাপ খুবই বেড়ে যায় এবং তারা বাজারগুলোতে খেয়াল-খুশির রাজত্ব চালাতে থাকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও মুনাফাশিকারী মানসিকতার কারণে তারা কৃত্রিম অভাব ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে চোরাকারবারী ও মজুদদারীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। এজন্য মদীনার অধিকাংশ লোক তাদের এই পরিকল্পিত ধান্ধাবাজি ও সীমাতিরিক্ত সুদখোরী ও মুনাফাখোরী মানসিকতার এমন সব লজ্জাকর কার্যকলাপের কারণে তাদের ঘৃণা করতে শুরু করেছিল যা থেকে একজন আরব দূরে অবস্থান করে।[২]

তাদের স্বভাবগত রাজনীতি, লোভ-লালসা ও ক্রমান্বয়ে জুড়ে বসেছিল Deiacy of Leary তার Arabia before Muhammad নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

আসল বেদুঈন বাসিন্দা[৩] ও নতুন বসতি স্থাপনকারী ইয়াহূদীদের সম্পর্ক ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীতে খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেননা ঐসব ইয়াহূদী তাদের কৃষি এলাকা বেদুঈনদের চারণক্ষেত্র পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছিল।[৪]

আওস ও খাযরাজ (মদীনার আরব বাসিন্দা) ও ইয়াহূদীদের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভের ওপর ভিত্তিশীল। ইয়াহূদীরা এই দুই গোত্রকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত করাতে সম্ভাব্য লাভের আশায় প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করত। আওস ও খাযরাজের কয়েকটি যুদ্ধে তারা এ ধরনের খরচ করেছিল। এর ফলে এ দু'টো গোত্রই ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। তাদের সামনে কেবল একটাই লক্ষ্য

---

১. ইমাম বুখারী একে কিতাবুল মাগাযী باب قتل كعب بن الاشرف -এ উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশাম কিছুটা পার্থক্যসহ এই ঘটনা السيرة النبوية -এর ২য় খণ্ডের ১৫ পৃ. উদ্ধৃত করেছেন।

২. بنو اسرئيل فى القران والسنة , ৭৯ পৃ.,।

৩. এ দ্বারা আরব গোত্রসমূহকে বোঝান হয়েছে। যেমন আওস, খাযরাজ ও অন্যান্য আরব যারা মদীনার আশেপাশে তাদের প্রতিবেশী ছিল।

৪. Arabia before Muhammad (London 1927), P. 114.

রাখত যাতে মদীনার ওপর তাদের আর্থিক আধিপত্য বজায় থাকে। আগত নবীর প্রসঙ্গে ইয়াহূদীদের কথাবার্তাও আঁওস ও খাযরাজকে ইসলাম প্রেরণা দিয়েছিল এবং উৎসাহিত করেছিল।[১]

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আরব ভূখণ্ডে বসবাসরত ইয়াহূদীদের ভাষা স্বাভাবিকভাবে আরবীই ছিল, কিন্তু তা নির্ভেজাল ছিল না। এতে স্বল্প পরিমাণে হিব্রু ভাষার মিশ্রণ ঘটে গিয়েছিল। কেননা তারা হিব্রুর ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করেনি। তারা তাদের ইবাদত-বন্দেগী ও শিক্ষামূলক বিষয়ে এর ব্যবহার করত।[২]

ইয়াহূদীদের ধর্মীয় ও দাওয়াতী দিক সম্বন্ধে ড. ইসরাঈল ওয়েলফিনসন বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই, ইয়াহূদীদের নিকট আরবে তাদের ধর্মীয় ক্ষমতা বিস্তৃত করবার উপায়-উপকরণ ছিল। যদি তারা চাইত তবে অর্জিত ক্ষমতা দ্বারা আরও অনেক বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু ইয়াহূদীদের ইতিহাস যারা জানে না তারা বলেন, ইয়াহূদীরা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীকে কখনো তাদের ধর্ম গ্রহণে প্রেরণা ও উৎসাহ দেয়নি এবং কতকগুলো কারণে ধর্মের প্রচার ইয়াহূদীদের জন্য নিষিদ্ধ থেকেছে।[৩]

ইয়াহূদীরা (নিজেদের জাতীয় মেযাজ মাফিক) তাদের সমাজকে নবতর অবস্থা ও যুগোপযোগী ঢেলে সাজানো, নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা ও প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগানো এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের সংস্কৃতি, মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপযুক্ত স্থান লাভে ব্যর্থ হয়। এই দুঃখজনক পরিণতি এমন প্রতিটি সমাজকেই বরণ করে নিতে হয়েছে যারা নিজেদের অতীত, নাম-ধাম ও বংশের অহংকারে মত্ত, যারা কল্পনার জগতে বসবাস করে এবং শূন্যগর্ভ নেতৃত্বের আশ্রয় নেয়।

ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে এবং এক পয়গামবাহক, আহলে কিতাব ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াই কিরাম-এর উম্মত ও বংশধর হওয়ার দিক দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। আরবের নিম্ন পর্যায়ের মূর্তি পূজা ও নীচু স্তরের জাহিলিয়াত দেখে শুনেও তাদের মধ্যে কোন প্রকার অস্থিরতা জন্ম নেয় নি এবং তারা (নিদেনপক্ষে) সেই তৌহিদী আকীদা-বিশ্বাসের দাওয়াতও দেয় নি যে আকীদা-বিশ্বাসের (তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ও জাতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও) ধারক-বাহক হিসাবে দাবি করে আসছিল। এর বুনিয়াদী কারণ ছিল, তারা নিজেদের ধর্মের দিকে কোন ইসরাঈলীবহির্ভূত

---

১. بنو اسرئيل فى القران والسنة, ৭৩-১০১।

২. مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول, আহমদ ইবরাহীম শরীফকৃত, ২০৩ পৃ.।

৩. ইসরাঈল ওয়েলফিন্সনকৃত. اليهود فى بلاد العرب, পৃ. ৭২।

লোককে দাওয়াত দেয়ার সমর্থকই ছিল না। ইয়াহুদী ধর্মকে তারা পারিবারিক ও বংশগত ধর্ম ও সম্মান মনে করবার বিশ্বাস ছিল তাদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের চি (যেমন ইসরাঈল ওয়েলফিনসন ও প্রাক্তন আমেরিকান ইয়াহূদী ও বর্তমানের মুসলিম মনীষা মরিয়ম জামিলা বলেন)। এরই সাথে তাদের আরামপ্রিয়তা ও সীমাতিরিক্ত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতাও তাদের জন্য ছিল এক বাধা।

কিন্তু এটি এক নিশ্চিত বিষয়, আওস, খাযরাজ ও অন্যান্য আরব গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী বহু লোক ইয়াহূদী ধর্মকে নিজেদের মর্জি মাফিক কিংবা আত্মীয়তাসূত্রে অথবা ইয়াহূদী পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে গ্রহণ করে নিয়েছিল। আরবের ইয়াহূদীদের মধ্যে সবই পাওয়া যেত। এটাও জানা যে, বিশি ইয়াহূদী বণিক ও বিখ্যাত কবি কা'ব ইবনুল-আশরাফ (যে নাদীর গোত্রীয় হিসাবে পরিচিত ও বিখ্যাত ছিল) তাঈ গোত্রের একজন সদস্য ছিল। তার পিতা নাদীর গোত্রে বিয়ে করেছিল। অতঃপর কা'ব একজন উৎসাহী ইয়াহূদী হিসাবে আবির্ভূত হয়। ইবন হিশাম বলেন,

"তার পৈতৃক সম্পর্ক ছিল তাঈ গোত্রের সঙ্গে, এরপর বনী নাবহান গোত্রের সঙ্গে। তার মা ছিল নাদীর গোত্রের মেয়ে।"[১]

আরবদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল, যাদের ছেলে হয়ে মারা যেত, বাঁচত না, তারা মানত করত, যদি ছেলে বেঁচে যায় তবে তাকে ইয়াহূদীদের হাতে তুলে দেবে; তারা তাকে নিজেদের মধ্যে শামিল করে নেবে। অতএব, বহু আরব এভাবেই ইয়াহূদী হয়ে গিয়েছিল। সুনানে আবূ দাঊদ-এ নিম্নোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায় :

عن ابن عباس رضـ قال كانت المراة تكون مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش لها ولدان تهوده فلما اجليت بنو النضير كان فيهم من ابناء الانصار فقالوا لا ندع ابنائنا فانزل الله تعالى لا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ط

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই মহিলার বাচ্চা বাঁচত না সে মানত করত, যদি এই বাচ্চা বেঁচে যায় তবে তাকে ইয়াহূদী বানাবে। অতএব, নাদীর গোত্র যখন মদীনা থেকে নির্বাসিত হলো তখন তাদের নিকট আনসারদের ছেলে-সন্তানও ছিল। এজন্য তারা বলতে থাকে, আমরা আমাদের ছেলেদের ছেড়ে যাব না। এ নিয়ে এ আয়াত নাযিল হয় :

---

১. ইবন হিশাম, ১খ., ৫১৪।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

"ধর্মে কোন জোর-জুলুম নেই। সত্য থেকে মিথ্যা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।"[১]

আওস ও খাযরাজ

আওস ও খাযরাজ (মদীনার আরব বাসিন্দা)-এর বংশধারা য়ামানের আযদ গোত্রের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয় যেখান থেকে ইয়াছরিবের দিকে হিজরতের স্রোত থেমে থেমে বইতে থাকে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। এগুলোর মধ্যে য়ামনের অনিশ্চিত অবস্থা, আবিসিনিয়া আক্রমণ, মা'রিব বাঁধের ধ্বংসের পর কৃষি জমিতে সেচ উপযোগী পানির অভাব প্রভৃতি রয়েছে। এভাবেই আওস ও খাযরাজ মদীনায় ইয়াহূদীদের পর আসে।[২] আওসের শাখা-গোত্রসমূহ মদীনার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বসতি স্থাপন করে যাকে আয়ালী এলাকা বলা হয়। খাযরাজের শাখা-গোত্রসমূহ মধ্য ও উত্তর এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এটি মদীনার নিম্ন বা ঢালু ভাগ। এরপর পশ্চিমে হাররাতুল-ওয়াবরা পর্যন্ত আর কিছু নেই।[৩]

খাযরাজ ছিল চারটি গোত্রের সমষ্টি : (১) মালিক, (২) আদী, (৩) মাযিন ও (৪) দীনার। নাজ্জার গোত্রের সঙ্গে এ সবেরই সম্পর্ক ছিল যাকে تيم اللات বলা হতো। বনূ নাজ্জারের গোত্রসমূহ মদীনার সেই মধ্যভাগে বসতি স্থাপন করে যেখানে এখন মসজিদে নববী ﷺ অবস্থিত। আওস মদীনার উর্বর কৃষি এলাকায় বসতি স্থাপন করে এবং ইয়াহূদীদের গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ও দলসমূহ প্রতিবেশীতে পরিণত হয়। খাযরাজ যেখানে অবস্থান নেয় তা খুব শস্য-শ্যামল এলাকা ছিল না। তাদের বনী কায়নুকা নামক একটি বড় ইয়াহূদী গোত্র প্রতিবেশী ছিল।[৪]

এখন আওস ও খাযরজের প্রকৃত জনসংখ্যা জানা খুবই কষ্টকর। কিন্তু অবস্থা ও ঘটনাসমূহের ওপর যাদের চোখ পড়বে তাদের সামরিক শক্তির আন্দাজ সেই সমস্ত যুদ্ধ থেকে করতে পারবে যেসব যুদ্ধে তারা হিজরতের পর অংশ গ্রহণ করেছিল। এরপর মক্কা বিজয়ের পর তাদের যুদ্ধ-উপযোগী জনসংখ্যা ছিল চার হাজার।[৫]

---

১. আবূ দাউদ, কিতাবুল-জিহাদ।

২. বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্যাডিভ-এর মত হলো আওস ও খাযরাজ ৩০০ খৃস্টাব্দে ইয়াছরিবকে তাদের বাসভূমিতে পরিণত করে, ৪৯২ খৃ. ইয়াছরিব-এর ওপর তাদের প্রাধান্য বজায় থাকে। দ্র. তারীখুল-আরব আল-আম।

৩. মক্কা ও ওয়াল-মদীনা, ৩১১ পৃ.।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. আল্লামা তকীউদ্দীন আহমদ ইবনে আলী আল-মাকরিযার امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال والحفدة والمتاع

মদীনায় হিজরতের সময় আরবদের প্রাধান্য ও ক্ষমতা অটুট ছিল। ইয়াহূদীরা তাদের এসব প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত ছিল না। তাদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছিল অনৈক্য ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। কিছু গোত্র আওসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল আর কিছু ছিল খাযরাজের সঙ্গে। যুদ্ধের সময় তারা তাদের স্বধর্মীয়দের মুকাবিলায় আরবদের তুলনায় কঠোর স্বভাবের প্রমাণিত হয়েছিল। কায়নুকা, বনূ নাদীর ও বনূ কুরায়জার শত্রুতার ফলেই বনী কায়নুকা নিজেদের কৃষি কর্ম ও ক্ষেত-খামার ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।[১]

এভাবেই আওস ও খাযরাজের মধ্যে বহু যুদ্ধ ঘটে যার মধ্যে প্রথম যুদ্ধ ছিল সুমায়র যুদ্ধ আর শেষ যুদ্ধ ছিল বু'আছ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে ঘটেছিল।[২] ইয়াহূদীরা আওস ও খাযরাজকে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে চক্রান্ত করত এবং অনৈক্য ও হানাহানির আগুন জ্বেলে দিত যাতে আরব তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। আরবরাও এ কথা অনুভব করত। এজন্য তারা ইয়াহূদীদেরকে ثعالب তথা খেঁক শিয়াল বা ধূর্ত বলেই ভাবত।

এই প্রসঙ্গে ইবন হিশাম ইবন ইসহাকের বর্ণনায় যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা থেকে এ বিষয়ের ওপর বেশ আলোকপাত ঘটে। ঘটনার বর্ণনায় বলা হয়েছে, একবার শা'ছ ইবন কায়স নামক এক বয়োবৃদ্ধ ইয়াহূদী এক স্থানে আওস ও খাযরাজকে ইসলাম কবুলের পর এক মজলিসে বসে স্নেহ-ভালবাসার আলাপ করতে দেখতে পায়। এ দৃশ্যে সে খুব কষ্ট পায়। অবশেষে সইতে না পেরে সে এক ইয়াহূদী যুবককে, আনসারদের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল, ডেকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল সে যেন তাদের মজলিসে যোগ দেয় এবং কোন এক উপলক্ষে বু'আছ যুদ্ধসহ ইতোপূর্বেকার যুদ্ধগুলোর প্রসঙ্গ টেনে ওঠায় এবং যুদ্ধকালে পঠিত কবিতা আবৃত্তি করে যাতে উভয় গোত্রের পুরনো ক্ষত, যা শুকিয়ে গিয়েছিল, পুনরায় দগদগে হয়ে ওঠে এবং জাহিলী যুগের অন্ধ গোত্রপ্রীতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে এত দিনের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

এ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়নি। উভয় গোত্রের মধ্যে, যারা এককালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার মনোভাব নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুহূর্তের মধ্যে রক্তে জাহিলিয়াতের আগুন ধরে যায়। খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করার উপক্রম হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন তাঁর অমূল্য উপদেশ দিয়ে তাদের ঈমানের স্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তোলেন এবং তাদের দীনী জযবা তথা ধর্মীয় প্রেরণা জাগিয়ে দেন। তারা তখনই বুঝতে

---

১. মক্কা ওয়াল মদীনা, ৩২২ পৃ.।

২. ফতহুল-বারী, ৭ম খ., বু'আছ যুদ্ধের বিবরণ জানতে ইবনুল আছীরের কামিল দ্র.।

...কম হয়, তারা এক গভীর চক্রান্তের শিকার হয়ে গিয়েছিল! তাদের চোখ দিয়ে অনুশোচনা ও অনুতাপের অশ্রু ঝরতে থাকে। আওস ও খাযরাজ পরস্পরকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। মনে হচ্ছিল তাদের মধ্যে যেন কিছুই হয়নি![১]

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা

নবী করীম ﷺ-এর হিজরতের কালে ইয়াছরিব বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল যেখায় ইয়াহূদী ও আরব গোত্রগুলো বসবাস করত এবং প্রতিটি গোত্র কোন না কোন গোত্রের অংশে ছিল। এসব এলাকা ছিল দু'প্রকার : এক প্রকার কৃষি জমি, ঘরবাড়ী ও এসবে বসবাসকারী আর দ্বিতীয় প্রকার ছিল আতাম (اطام) বা আতেম[২] (গড় বা দুর্গঘেরা মহল্লা)। ইয়াহূদীদের এসব গড়ের (اطام) সংখ্যা ছিল ৫৯টি।[৩] ড. ওয়েলফিন্সন এসব 'আতাম-এর (গড়ের) উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন,

"ইয়াছরিবে 'আতাম' (গড়)-এর বিরাট গুরুত্ব ছিল যেখানে শত্রুর আক্রমণে মুহূর্তে গোত্রের লোকেরা আশ্রয় নিত, বিশেষত মহিলা, শিশু, পঙ্গু ও অসহায় লোকেরা। সে সময় এতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেত। যখন মহল্লার পুরুষেরা লড়বার জন্য চলে যেত, এসব গড় গুদাম হিসাবেও ব্যবহৃত হতো এবং এতে খাদ্যশস্য ও ফলমূল জমা করে রাখা হতো। কেননা এগুলো খোলা জায়গায় রাখলে শত্রু দ্বারা লুণ্ঠিত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার আশংকা থাকত। এছাড়া এতে মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্র রাখা হতো। নিয়ম ছিল, দ্রব্যসামগ্রী ও রসদ-সম্ভারে পরিপূর্ণ কাফেলা গড়ের কাছাকাছিই অবতরণ করবে। আর এসব গড়ের দরজা মুখে বাজারও বসত। ধারণা করা হয়, এসব গড়ে ইবাদতখানা ও ইয়াহূদীদের ধর্মীয় শিক্ষায়তনও থাকত, যেসব উত্তম ও প্রচুর সামান সেখানে থাকত তা থেকে এটাই বোঝা যায়। সেখানে ধর্মীয় কিতাবও থাকত। সেখানে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের জন্যে ইয়াহূদী নেতারা সমবেত হতো। কোন বিশেষ ব্যাপারকে পাকাপোক্ত করতে কিংবা প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি সম্পাদনের সময় তারা পবিত্র গ্রন্থের কসম খেত।[৪]

লেখক 'আতেম (اطم)-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরও বলেন,

"হিব্রু ভাষায় এর অর্থ বন্ধ ও রুদ্ধ করে দেয়া। প্রাচীরের সঙ্গে যখন এই শব্দ বলা হবে তখন এর অর্থ হবে সেই খিড়কি যা বাইরে থেকে বন্ধ, কিন্তু ভেতর থেকে খোলা যায়। এর ব্যবহার পাঁচিল কিংবা দৃঢ় নিরাপত্তামূলক প্রাচীরের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। এভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, ইয়াহূদীরা 'আতেম'কে ছোট্ট দুর্গ

---

১. দ্র. ইবন হিশাম, ১ম খ., ৫৫৫-৫৬।
২. তারীখুল-য়াহূদ ফী বিলাদিল-আরব থেকে উদ্ধৃত, ড. ওয়েলফিনসনকৃত, ১১৬ পৃ.।
৩. সামহূদীকৃত ওয়াফাউল-ওফা, ১ম খ., ১১৬ পৃ.।
৪. তারিখুল ইয়াহূদ ফী বিলাদিল-আরব, ১১৬-১৭।

অর্থে ব্যবহার করত। এতে বাইরে থেকে ভেতরে আলো প্রবেশের জন্য ছিদ্র থাকত যা বাইরে থেকে বন্ধ এবং ভেতর থেকে খোলা যেত।"[১]

ইয়াছরিব ছিল এসব মহল্লা ও কেল্লাবন্দের নাম যা প্রকৃতপক্ষে কাছাকাছি বস্তিগুলোর একটি সাকল্য ছিল যা পরবর্তীকালে শহরে পরিণত হয়েছিল। কুরআন কারীমও এদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছে :

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى.

"আল্লাহ বস্তিবাসীদের থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু প্রদান করেছেন।"

[সূরা হাশর :৭ আয়াত]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ.

"ওরা তোমাদের সাথে একাট্টা হয়ে লড়াই করে না, কিন্তু লড়াই করে কেল্লাবন্দ বস্তিতে কিংবা প্রাচীরের পেছন থেকে।" [সূরা হাশর : ১৪ আয়াত]

মদীনা তায়্যিবায় হাররাতের বিরাট গুরুত্ব ছিল। হাররা-ই লাভা বলা হয় সেই পোড়া কালো পাথরের এলাকাকে যা আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা একে অপরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে এবং যা একেবারেই অসংলগ্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও আড়াআড়ি তেরছাভাবে মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত। এর ওপর খালি পায়ে হাঁটা যেমন মুশকিল, তেমনি এর ওপর দিয়ে উট ও ঘোড়ার পক্ষেও চলা কঠিন। মদীনার দু'টো হাররাহ বিখ্যাত। একটি পশ্চিম দিকে যাকে 'হাররাতুল-ওয়াবরা' (حرة الوبرة) বলা হয়। অপরটি পূর্বদিকে যা 'হাররাহ ওয়াকিম' নামে মশহুর। আল্লামা মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী তাঁর গ্রন্থ المطابة فى معام طابة-য় কতিপয় হাররাহর কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো মদীনার আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।[২]

এই দু'টি হাররাহ (হাররা-ওয়াবরা ও হাররাহ ওয়াকিম) মদীনাকে একটি দুর্গঘেরা শহর বানিয়ে দিয়েছে যার ওপর কেবল উত্তর দিক থেকে সেনাভিযান হতে পারত (এবং এটাই সেই দিক যে দিকটিতে আহযাব যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা খনন করত নিরাপদ ও সুরক্ষিত করা হয়েছিল)। দক্ষিণ দিকে ঘন খেজুর বাগান, বাগ-বাগিচা ও ঘন বসতির দরুন মিলিত ঘরবাড়ীগুলো একটি অপরটির সঙ্গে এমনভাবে ঘেরাও করা যে, এদিক থেকেও বাইরে থেকে আক্রমণ করা কঠিন।

১. প্রাগুক্ত, ১১৭ পৃ.।

২. বিস্তারিত দ্র. বর্তমান পুস্তকের 'য়াছরিবের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অধ্যায়।

...তের জন্য মদীনাকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে মদীনার এই সুদৃঢ় প্রাকৃতিক রক্ষা ব্যূহ ...রিক বৈশিষ্ট্যেরও ভূমিকা ছিল।

হাররাহ ওয়াকিম ছিল মদীনার পূর্বদিকে। এটি ছিল হাররাতুল-ওয়াবরা থেকে ... জনবসতিপূর্ণ। নবী করীম ﷺ যখন ইয়াছরিবে হিজরত করেন তখন হাররাহ ...কিমে ইয়াহূদীদের উল্লেখ্য গোত্রসমূহ, যেমন বনূ নাদীর, বনূ কুরায়জা প্রভৃতি ...বাস করত। তাদের সাথে আওস গোত্রের গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহ বনূ আবদিল ...হাল, বনূ জাফর, বনূ হারিছা, বনূ মুআবিয়া সেখানেই থাকত। ওয়াকিম বনী ...-আশহালেরই এলাকায় ছিল যার নামে হাররাহ ওয়কিমের নাম খোদাই করা ...।[১]

...য় অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান

মদীনার আরব জনসাধারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কুরায়শদের মেনে চলত আর ...বাসী কুরায়শদেরকে কা'বার মুতাওয়াল্লী, ধর্মীয় নেতা এবং আকীদা ও আমলের ...য় অনুসরণ ও অনুকরণ করত। তারা আরব ভূখণ্ডে বিস্তৃত মূর্তিগুলোরই পূজা ... যেগুলোকে কুরায়শ ও হেজাযের লোকেরা পূজা করত। কতক গোত্রের কিছু ... এলাকাভিত্তিক মূর্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এভাবে 'মানাত' নামক মূর্তি মদীনার ...কদের সবচেয়ে প্রিয় ও পুরাতন মূর্তি ছিল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্র একে ... চাইতে পবিত্র মনে করত। একে আল্লাহর শরীক জ্ঞান করত। এই মূর্তিটি ...য়দ পাহাড়ের সম্মুখে সমুদ্র তীরের দিকে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে 'মুশাল্লাল' ... স্থানে ছিল। 'লাত' তায়েফবাসীদের প্রিয় মূর্তি ছিল। উয্যা ছিল মক্কার ...তীয় মূর্তি। এজন্য এসব শহরের লোকদের তাদের স্ব স্ব মূর্তির সঙ্গে বিশেষ ...বেগের সম্পর্ক রাখত। মদীনার লোকদের ভেতর কেউ কাঠের কিংবা অন্য ... জিনিসের মূর্তি নিজেদের ঘরে রাখলে তাকে 'মানাত' নামেই ডাকত, যেমন ... সালমার একজন সর্দার 'আমর ইবনু'ল-জামূহ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বানিয়ে ...খছিল।[২]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) উরওয়ার বরাতে হযরত আইশা (রা) থেকে إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ — আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ...সারগণ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'মানাত' নামের ওপর তালবিয়া (দ্র.) পড়ত এবং ...ল্লাল-এর কাছে তার পূজা করত। তার নামে হজ্জ শুরুকারী সাফা ও মারওয়ার ... (দ্র.) সহীহ-শুদ্ধ মনে করত না।[৩] লোকে যখন এ বিষয়ে জানতে গিয়ে ...ল্লাহ ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহিলী যুগে সাফা-মারওয়ার

---

১. الوحى منزل ডা. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কালকৃত;, ৫৭৭ পৃ.।

২. ...গুল আরাব ফী মারিফাতি আহওয়ালিল আরাব, আল্লামা মাহমূদ শুকরী আল-আলূসীকৃত।

৩. ... বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে আরও কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে।

তাওয়াফকে দোষের ভাবতাম। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন الصفا والمروة। অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আমরা মদীনার আর কোন মূর্তি সম্পর্কে জানি না, তা লাত, মানাত কিংবা উয্যা ও হোবলের মত বিখ্যাত হয়েছে এবং লোকে তার পূজা-অর্চনা করত এবং তার জন্য মদীনার বাইরে থেকে আসত। মনে হয় মক্কার মত মদীনায় মূর্তি এত বেশী ছিল না এজন্য যে, মক্কার প্রতিটি ঘরেই একটি বিশেষ মূর্তি থাকত। মক্কায় লোকে মূর্তি ফেরি করে বিক্রি করত। মোটকথা, মক্কা মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মর্যাদার দাবিদার ছিল, সে ছিল নেতৃত্বের আসনে সমাসীন আর মদীনা ছিল এর ছায়ার মত।

মদীনার লোকেরা বছরের দু'দিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসবের পর্ব হিসাবে পালন করত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় তশরীফ নেন তখন মদীনার লোকদের তিনি বললেন,

قدابدلكم تعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر والاضحى

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই দু'দিনের থেকে উত্তম দিন দান করেছেন: ঈদু'ল-ফিতর ও ঈদু'ল-আযহা।[২] কোন কোন হাদীছ ব্যাখ্যাতা জাহিলী যুগের উক্ত দু'দিন সম্পর্কে বলেছেন, সে দু'দিনের একটি হলো নওরোয বা নববর্ষ এবং ২য় দিন মিহিরজান দিবস। সম্ভবত তারা এই দুই উৎসব ইরানের লোকদের থেকে নিয়েছিল।[৩]

আওস ও খাযরাজ গোত্রের বংশীয় খানদানের স্বীকৃতি কুরায়শরাও দিত। তারা ছিল আরব আরিবার বনূ কাহতানের একটি শাখা। কুরায়শ তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রও ছিল। কুরায়শ সর্দার হাশিম ইবন আবদ মানাফ বনী আন-নাজ্জারে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল সালামা বিনতে আমর ইবন যায়দ-এর সঙ্গে যিনি বনী আদী ইবন আন-নাজ্জারের কন্যা আর বনী আদী ছিল খাযরাজ গোত্রেরই একটি শাখা। এর পরেও কুরায়শরা নিজেদেরকে মদীনার আরব গোত্রগুলোর তুলনায় নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ ভাবত। বদর যুদ্ধের দিন উতবা ইবন রবীআ, শায়বা ইবন রবীআ ও ওয়ালীদ ইবন উতবা যখন মুসলমানদেরকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জন্য আহ্বান করল তখন সে ডাকে সাড়া দিতে আনসারদের কিছু যুবক বের হলো। তখন তারা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা? তারা জওয়াবে বলল, আমরা আনসার। এতে তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে চাই না। এরপর তাদের একজন চিৎকার দিয়ে ডেকে বলল, মুহাম্মদ! আমাদের মুকাবিলায় আমাদের সমগোত্রীয় ও সমকক্ষ কাউকে

---

১. সূরা বাকারা, ১৫৮ আয়াত।

২. বুখারী ও মুসলিম।

৩. বুলুগুল-আরব।

...। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উবায়দা ইবনুল হারিছ! তুমি এগিয়ে যাও। ...! তুমি আগাও। আলী! তুমি দাঁড়াও। এসব মুসলমান তাদের সম্মুখীন হলে ও ...দের নাম বললে কুরায়শরা বলল, হ্যাঁ, এসব শরীফ লোক, আমাদের ...।[১]

এর কারণ কি? এর কারণ, কুরায়শরা কৃষিকাজকে (যাতে মদীনার লোকেরা ...দের এলাকাগত অবস্থার কারণে) কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখত। এর প্রকাশ ...বূ জাহলের সেই সব কথা থেকেও পাওয়া যায় যাকে আফরার দুই আনসারী ... হত্যা করেছিল। মৃত্যুর সময় সে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে ...ছিল, لوغير اكار قتلنى হায়! যদি এক কৃষক ছাড়া অন্য কেউ আমাকে হত্যা ...ত![২]

...নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মদীনা ছিল তার ভূমির ধরন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে একটি কৃষি এলাকা। এজন্য ... বাসিন্দাদেরকে কৃষি ও বাগ-বাগিচার ওপরই নির্ভর করতে হতো। তাদের ...ন উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ছিল খেজুর ও আঙ্গুর। কেননা তাদের সেখানে অনেক ...ন ছিল[৩] যেগুলোর অনেক কয়টিই বেড়া ঘেরা আর অনেক কয়টি ছিল ...বিহীন। ক্ষেতের ফসল ও খেজুর গাছ দুই কাণ্ডওয়ালা ও এক কাণ্ডওয়ালা ...তো।[৪]

শস্যক্ষেতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য ও শাক-সবজি উৎপন্ন হতো। দুর্ভিক্ষ ও ... বছরে লোকের বেশির ভাগ খাদ্যের প্রয়োজন খেজুর পূরণ করত এবং ...য়োজনের মুহূর্তে মুদ্রা তথা টাকা-পয়সার ন্যায় এসবের কেনাবেচার ক্ষেত্রে ...হায্য নেয়া হতো। এভাবে খেজুর বাগান মদীনাবাসীদের জীবনে বিরাট কল্যাণ ও

১. ইবন হিশাম, ১ম খ., ৬২৫ পৃ.।

২. আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনী, "মাজমাউল-বিহার" নামক গ্রন্থে এর অর্থ কৃষিজীবী ও কৃষক লিখেছেন। তিনি বলেন, কৃষিকাজ আরবদের নিকট ছিল নিম্নমানের পেশা। আবূ জাহলের একথা বলার অর্থ ছিল এই, 'আফরার ছেলে কৃষক। এজন্য যদি অন্য কেউ তাকে কতল করত তাহলে এতটা লজ্জা ও অপমানের ব্যাপার হতো না। ১ম খ., ৬৮ পৃ.।

৩. বীরহা সম্পর্কে হযরত আবূ তালহা (রা)-এর হাদীছ দেখুন যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। হাদীছসমূহ থেকে জানা যায়, মদীনায় এমন ঘন বাগানশ্রেণীও ছিল যে, গুরিয়্যার মত ক্ষুদ্র পাখি এসব বাগানে ঢুকলে বের হতে পারত না। আবূ তালহা (রা)-এর কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর বাগানে সালাত আদায় করেছিলেন। এমন সময় একটি গুরিয়্যা বাগান থেকে বের হওয়ার আশায় একবার এদিক, একবার সেদিক উড়ে যাচ্ছিল। তিনি সালাতের কথা ভুলে গিয়ে পাখির এই প্রাণান্তকর চেষ্টার দৃশ্য দেখতে থাকেন। এই কাহিনীর শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে, এই গাফিলতি ও অবহেলার দরুন তিনি এই বাগানটিকে দান করে দেন (দ্র. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক)।

৪. দ্র. সূরাতুল-আনআম, ১৪১ আয়াত ও সূরাতুর-রাদ, ৪ আয়াত।

বরকতের পুঁজি ছিল। এ দিয়ে তাদের যেমন খাদ্য লাভ ঘটত, তেমনি শিল্পসামগ্রী নির্মাণ, জ্বালানি ও পশু পালের খাবার হিসাবেও তা কাজে লাগত।[১]

মদীনার খেজুর ছিল বহু রকমের যার সব কয়টির নাম মনে রাখাও মুশকিল। মদীনার লোকদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে খেজুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত মানের করার বহু পন্থা জানা ছিল যেগুলোর ভেতর নারী-পুরুষের পার্থক্য এবং সেগুলের কলমের ব্যবহারও ছিল যাকে 'তাবীর' বা 'কলম' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করত।[৩]

বাগান কিংবা কৃষিকাজ করার অর্থ এই নয়, মদীনায় কোন প্রকার বাণিজ্যিক তৎপরতা ছিল না। অবশ্য এ কথা ঠিক, মদীনার বাণিজ্যিক তৎপরতা মক্কার মত উষ্ণ ও জোরদার ছিল না। কেননা পানিবিহীন ঊষর-ধূসর শুষ্ক মরু বিয়াবান মক্কা উপত্যকার লোকদের নির্ভরতা স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক সফরের ওপর ছিল।

মদীনার কিছু কিছু শিল্প ইয়াহূদীদের সঙ্গেই চলত। এটা ছিল নির্দিষ্ট। এগুলো তারা সম্ভবত য়ামান থেকে নিয়ে এসেছিল। বনী কায়নুকার লোকেরা সাধারণভাবে স্বর্ণকার ও অস্ত্রনির্মাতা ছিল আর ইয়াহূদীরা ছিল মদীনার সবচেয়ে ধনিক ও বিত্তবান সম্প্রদায়। তাদের বাড়িঘর সব সময় ধন-সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে ভর্তি থাকত।[৪]

মদীনার জমিন আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা এলাকায় (হাররাত) বিদ্যমান থাকায় খুব উর্বর প্রমাণিত হয় যার উপত্যকাগুলোতে বন্যার পানিও খুব প্রবাহিত হতো এবং জমির সাথে সাথে ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচাগুলোকে প্লাবিত ও শস্য-শ্যামল করে তুলত। এগুলোর ভেতর সবচেয়ে বিখ্যাত উপত্যকা ছিল 'আকীক উপত্যকা। আবার 'আকীক উপত্যকা ছিল মদীনার খেলাধুলার জায়গা। এতে প্রচুর পানি থাকত আর এখানে বাগানে কুয়া খননের সাধারণ প্রচলন ছিল।[৫]

বাগানের চারপাশ প্রাচীর ঘেরা থাকত। এ ধরনের প্রাচীর ঘেরা বাগানকে মদীনার লোকেরা 'হা'ইত' حائط বলত। ঠিক তেমনি মদীনার অনেক কুয়া প্রচুর পানি ও মিষ্টতার জন্য মশহুর ছিল। এসব কুয়ার সঙ্গে ছোট ছোট খাল বা নালা

---

১. বুখারীর কিতাবুল-ইলম باب طرح الامام المسالة على الناس ليختبرما عندهم من العلم এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাত-হুল-বারী কিংবা উমদাতুল-কারী।

২. খেজুর সম্পর্কে আরবী ভাষায় যে বিস্তৃত শব্দভাণ্ডার পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায়, আরবদের জীবনে সাধারণভাবে ও মদীনাবাসীদের জীবন বিশেষভাবে খেজুরের গুরুত্ব ও ভূমিকা কতখানি ছিল! উদাহরণ হিসাবে ইবন কুতায়বার আদাবুল-কাতিব, ছা-আলিবীর ফিকহুল-লুগাত" ও ইবন সাইয়েদার "আল-মুখাস্যাস" দ্র.। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি খেজুরের ওপর বইও লিখেছেন।

৩. তাবীরের অর্থ স্ত্রী খেজুরের খোসা চিরে পুরুষ খেজুরের রেণু ভেতরে ফেলা (মুসলিম-এর ভাষ্য)।

৪. اليهود فى بلاد العرب , ১২৮ পৃ.।

৫. সহীহ বুখারীর (كتاب المغازى)-তে কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর পরীক্ষার ঘটনা দ্র.। এতে বলা হয়েছে, "আমার ওপর যখন লোকের চাপ ও উপেক্ষা বৃদ্ধি পেল তখন আমি আবূ কাতাদার বাগানের প্রাচীরের ওপর চড়লাম। আবূ কাতাদা (রা) ছিলেন আমার চাচাতো ভাই।" (শেষ পর্যন্ত)

...বস্থা ছিল যে সবের মারফত মদীনাবাসী তাদের বাগানগুলোতে পানি সরবরাহ করত।[১]

খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রথম স্থান ছিল যবের এবং এরপরে ছিল গমের। ...-সবজি ও তরি-তরকারি ছিল প্রচুর। কৃষি কাজ ছিল কয়েক ধরনের: মুযাবানা, মুহাকালা, মুখাবারা, মু'আওয়াম।[২] ঐগুলোর মধ্যে কোন কোন কৃষি ব্যবস্থাকে ইসলাম বহাল রাখে আর কোন কোনটিকে নিষিদ্ধ করে, আবার কোন কোনটির সংস্কার সাধন করে।

মক্কা ও মদীনার যেসব মুদ্রার প্রচলন ছিল তা ছিল একই ধরনের। আমরা মক্কা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মক্কাবাসীদের তুলনায় মদীনার ...দেরকে মাপ-জোখের বেশি মুখোমুখি হতে হতো। কেননা সেখানকার বাসিন্দাদের পুঁজিই ছিল খাদ্যশস্য ও ফলমূল। মদীনায় ব্যবহৃত পরিমাপক বস্তু ছিল ..., সা', ফারাক, 'ইরক ও ওয়াসাক[৩] আর ওজনের জন্য ছিল দিরহাম, শিকাক, ...ক, কীরাত, নাওয়াত, রাতল, কিনতার ও আওকিয়া।[৪]

ভূমির উর্বরতা সত্ত্বেও খাদ্যের দিক দিয়ে মদীনা স্বনির্ভর ছিল না। এজন্য সেখানকার বাসিন্দারা বাইরে থেকেও খাদ্যশস্য আমদানি করত। ময়দা, আটা, ঘি মধু সিরিয়া থেকে আমদানি হতো। তিরমিযী শরীফে হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা) বর্ণিত হাদীছ থেকে জানা যায়, মদীনার লোকের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর ও ...। আর কেউ যখন সচ্ছল হতো তখন কোন সওদাগর (ضافط)[৫] সিরিয়া থেকে ... নিয়ে আসত তখন তারা নিজেদের জন্য এসব ময়দা ক্রয় করত। কিন্তু

---

১. হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-র সেই হাদীছ পড়ুন যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং সেই হাদীছে একটি বাগান প্লাবিত করার কথা বলা হয়েছে। এতে 'শিরাজ' বা পানির নালা ও 'মাসাস্থাত' বা ফওড়ার সাহায্যে পানি সরবরাহের উল্লেখ রয়েছে।

২. ...াহ গ্রন্থসমূহে "কৃষি ও ক্ষেত-খামার" শীর্ষক অধ্যায়সমূহ দেখুন। মুযাবানা বলা হয় গাছে থাকা অবস্থায় খেজুর নগদ খেজুরের মূল্যে বিক্রয় করাকে আর মুহাকালা বলা হয় খোসাযুক্ত খাদ্যশস্য নগদ খাদ্যশস্যের অর্থাৎ যবের বদলে যব এবং গমের বদলে গম মেপে নেয়াকে। মুখাবারা ও মুযারাআ ...টা একই ধরনের। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি বর্গা নেয়াকে মুখাবারা বা মুযারা'আ বলে। কিন্তু মুযারাআর ক্ষেত্রে বীজ মালিকের আর মুখাবারার ক্ষেত্রে বীজ ...কের দিতে হয়। অভিধানবিদদের একদল উভয়কেই এক বলেছেন। এ ধরনের বর্গা চাষের ...ক্তার নিয়ে উলামায়ে কিরামের মতভেদ বিখ্যাত (নববীকৃত মুসলিম শরীফের ভাষ্য)। কয়েক বছরের ফসল একেবারে বিক্রি করা, যেমন গাছের ফল দু'তিন বছরের একেবারের আগাম বিক্রি করাকে মু'আওয়ামা বলে।

৩. বিস্তারিত জানতে চাইলে হাদীছ গ্রন্থসমূহ দেখুন আর ওজন সম্পর্কে জানতে চাইলে দেখুন ১/৪১ التراتيب الادار...।

৫. ...ض সম্পর্কে আল্লামা তাহির পাটনী বলেন, ضافط ও ضفاط তাদেরকে বলা হতো যারা মাল-সামান ...রেও সরবরাহ করত। সাধারণত নাবাতী সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে নিয়োজিত ছিল যারা মদীনায় ...া, তেল প্রভৃতি সরবরাহ করত (মাজমাউল-বিহার, ৩খ., ১০, হয়দরাবাদ সা.)।

পরিবার-পরিজন খেজুর ও যবই খেত।[১] এই কাহিনী মদীনার খাদ্য ব্যবস্থাও জীবন মানের পার্থক্যের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে যা হিজরতের পর হঠাৎ করে সামনে এসে দেখা দেয়নি।

ইয়াহূদীরা, যাদের স্বভাব-প্রকৃতি ও ইতিহাস সর্বত্রই একই রূপ, মদীনায়ও তারা আরবদের তুলনায় অধিক বিত্তবান ও সম্পদশালী ছিল। আরবরা তাদের বেদুঈন প্রকৃতি ও জাতীয় মেযাজের কারণে ভবিষ্যত সম্পর্কে বেশি ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না, এর জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার চিন্তা করত না। সেই সঙ্গে তারা ছিল অত্যন্ত মেহমান নওয়ায তথা অতিথিবৎসল ও দানশীল। এজন্য তারা প্রায়শই ইয়াহূদীদের নিকট হাত পাততে ও ধার-কর্জ করতে বাধ্য হতো আর এসব ধার-কর্জ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদী ও বন্ধকী ধরনের হতো।

মদীনার লোকদের নিকট উট, গাভী ও বকরীও ছিল। জমিতে পানি সেচ দেবার জন্য তারা উট ব্যবহার করত। আর এ ধরনের উটকে الابل النواضح বলা হতো তাদের চারণক্ষেত্রও ছিল। এসব চারণক্ষেত্রের ভেতর সবচেয়ে মশহূর চারণক্ষেত্র ছিল غابه ও زاغابة। এখান থেকে লোকে জ্বালানি সংগ্রহ করত এবং পশুপালও চরাত।[২] ঘোড়া তারা যুদ্ধে ব্যবহার করত যদিও তা মক্কার তুলনায় কম পাওয়া যেত। বনূ সুলায়ম ঘোড়ার জন্য খ্যাত ছিল। তারা ঘোড়া বাইরে থেকে আমদানি করত।

মদীনায় কয়েকটি বাজারও ছিল। এসব বাজারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য ছিল বনী কায়নুকার বাজার। এই বাজার ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনা, শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও বস্ত্রবাজার হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত। সেই সময় মদীনার সুতী ও রেশমী কাপড়, রঙীন গালিচা ও নকশাকৃত পর্দা[৩] সাধারণভাবে পাওয়া যেত। আতর বিক্রেতারা বিভিন্ন রকমের আতর ও মেশক বিক্রি করত। তেমনি আম্বর ও পারা[৪] ব্যবসায়ীও পাওয়া যেত। ক্রয়-বিক্রয়ের বহুবিধ পন্থার মধ্যে ইসলাম কোন কোনটি বহাল রাখে এবং কোন কোনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যেমন নাজাশ ও ইহতিকার (গুদামজাত করে সঙ্কট সৃষ্টি করে অধিক মূল্যে বিক্রয়), تلقى الركبان (পশুর স্তনে দুধ জমা করে খরিদ্দারকে অধিক দুধের কথা বলে প্রতারণা করে বিক্রয়). بيع

১. দ্র. আয়াত ১০৭ সূরা নিসা-এর তিরমিযী শরীফে বর্ণিত ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما। তাফসীর।

২. য়াকূত হামবীর "মু'জামু'ল-বুলদান" ও সামহূদীর "ওয়াফাউ'ল-ওয়াফা" দেখুন।

৩. বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস দেখুন। এতে কুরাম-এর উল্লেখ রয়েছে। কুরাম সম্পর্কে আল্লামা পাটনী বলেন, তা সূক্ষ্ম পর্দা কিংবা কয়েক রঙের পশমী চাদর অথবা সেই পর্দা যা বাসর রাতে দরকার হয়। বলা হয়, তা সজ্জিত ও নকশাকৃত হয়ে থাকে (মাজমা বিহারি'ল-আনওয়ার, ৪র্থ খ., ২৫৮)।

৪. التراتيب الادارية ১ম খ., [illegible]

الحاضر البادى، بيع النسية (بيع المصراة) بيع المزابنه، بيع المجازفه مخاطر আওস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক (ইয়াহূদীদের দেখাদেখি) নিজেরা সূদী কারবার শুরু করেছিল। কিন্তু ইয়াহূদীদের তুলনায় এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

মদীনার সাংস্কৃতিক জীবনে সেখানকার বাসিন্দাদের মেযাজ ও রুচির কারণে বেশ উন্নতি দেখা যাচ্ছিল। ফলে সেখানে দ্বিতল গৃহ নির্মাণ শুরু হয়েছিল।

কিছু কিছু ঘরের সঙ্গে পাইন বৃক্ষের বাগানও ছিল। তারা মিষ্টি পানি পানে অভ্যস্ত ছিল। আর এই মিষ্টি সুপেয় পানি তাদেরকে অনেক সময় দূর থেকে আনতে হতো। বসার জন্য চেয়ারও ব্যবহার করত।[1] সীসা ও পাথরের পেয়ালা ও আবহূর এবং নানা ধরনের চেরাগও ব্যবহৃত হতো।[2] ঘর ও ক্ষেত-খামারের কাজে ছোট টকুরি (ঝুড়ি) ও থলি ব্যবহার করা হতো। বিত্তবান ও ধনাঢ্য লোক, বিশেষত ইয়াহূদীদের বাড়িতে বেশ অসবাবপত্র পাওয়া যেত। নানা প্রকার গহনাপাতি ব্যবহৃত হতো, যেমন কংকন, বাজুবন্দ, পায়ের মল, খাড়ু, কানবালা, আংটি বা অঙ্গুরী, স্বর্ণ বা য়ামানী দানার হার প্রভৃতি।[3]

মহিলাদের মধ্যে কাপড় বোনা ও সুতা কাটার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং সেলাই, রঞ্জন করা, পাথর কাটা প্রভৃতি শিল্পের সঙ্গে হিজরতের পূর্ব থেকেই মদীনার লোকেরা পরিচিত ছিল।

ইয়াছরিবের জটিল ও উন্নত সমাজ

এভাবে এ কথা খুব সমাজেই বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ ﷺ ও মুহাজিরগণ মক্কা থেকে ইয়াছরিব নামক কোন গ্রামের দিকে সফর করেননি, বরং তাঁরা এক শহর থেকে আরেক শহরে দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং অন্যত্র গিয়েছিলেন। যদিও দ্বিতীয় শহরটি প্রথম শহরের তুলনায় জীবনের বহু প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নতর ছিল এবং তুলনামূলকভাবে মক্কা থেকে কিছুটা ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু সেখানকার অর্থাৎ ইয়াছরিবের জীবন জটিলতার দিক দিয়ে মক্কার তুলনায় এগিয়ে ছিল এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আগত সমস্যা ছিল বিভিন্ন ধরনের। কেননা সেখানে কয়েকটি ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বর্তমান ছিল যে সবের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং মদীনাকে এক আকীদা-বিশ্বাস ও একই ধর্মের রঙে রঞ্জিত করার কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই করতে পারতেন। তাঁকে আল্লাহ পাক

---

১. হাদীছ গ্রন্থ ও ফিকহের বিক্রয় অধ্যায় ও মাজমা 'বিহারিল-আনওয়ার, দ্র. যেখানে এসব শব্দের ব্যাখ্যা এবং এর হালাল-হারাম সম্পর্কিত বিধান পাওয়া যাবে।

২. দেখুন হিজরত সম্পর্কে হাদীস ও হযরত আবূ আয়্যুব আনসারীর গৃহে রসূল (সা)-এর অবস্থানের ঘটনা।

৩. হযরত আয়েশা (রা)-এর চরিত্রে অপবাদ (افك)-এর ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস দ্র. যা বুখারী কিতাবু'ল-মাগাযী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। এতে جزع শব্দ রয়েছে যা সাদা-কালো দানাকে বলা হয়।

প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, মানবতার বিক্ষি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্র করা এবং পরস্পর বিবদমান শক্তিকে হেদায়াত ও মানবতার পুনর্গঠনের কাজে একে অন্যের মদদগারে পরিণত করবার অস্বাভাবিক যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং তাঁকে এক চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব দান করেছিলেন আল্লাহ তাআলা কত যথার্থই না বলেছেন :

هُوَالَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ـ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ـ اِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"যিনি তোমাকে তাঁর সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা সাহায্য করেছেন, তিনি ওদের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আনফাল : ৬৩ আয়াত

মদীনায়

মদীনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল

আনসাররা আগেই জেনেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এটা তাঁদের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, প্রত্যহ ফজর বাদ তাঁরা শহরের শেষ প্রান্তে চলে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসার জন্য অপেক্ষা করতেন এবং রৌদ্রতাপ প্রখর ও তীব্র না হওয়া, সয়্যের বাইরে না চলে যাওয়া ও ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সে স্থান ত্যাগ করতেন না। এরপর তাঁরা যে যার ঘরে ফিরতেন। এ সময় ছিল গ্রীষ্ম মৌসুম। ফলে রৌদ্র তাপের তীব্রতা ছিল প্রচণ্ড।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময় মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হন সে সময় আনসারগণ প্রতিদিনের স্বাভাবিক অপেক্ষার পর যার যার ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। সবার আগে একজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদীনার পানে আসতে দেখে। ইয়াহূদী প্রতিদিন আনসারদেরকে এভাবে অপেক্ষা করতে দেখত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেয়েই সে সজোরে ডাক দেয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসার সংবাদ জানিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসার সংবাদ পেতেই যে যার বাড়ি-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা দেখতে পান নবী ﷺ একটি খেজুর গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন, সাথে হযরত আবূ বকর (রা)। হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। আনসারদের অধিকাংশই ইতোপূর্বে আর কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেননি। ফলে আগ্রহ ভরে তাঁরা উভয়কে ঘিরে ধরেন এবং কখনও বা রাসূল মনে করে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সালাম করছিলেন। ভিড় বাড়ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) বুঝলেন, লোকেরা বুঝতে পারছে না উভয়ের মধ্যে কে মাখদূম আর কে খাদেম। এই ভুল দূর করবার জন্যে একটি চাদর নবী ﷺ-এর মাথার ওপর ছায়ার মত তিনি মেলে ধরলেন। ফলে ভুল দূর হয়।[১]

প্রায় পাঁচ শত আনসারদের একটি বিরাট জামা'আত এই মুবারক কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানায়। অবশেষে তাঁরা অত্যন্ত সম্ভ্রম ও সৌজন্যের সাথে নবী ﷺ-এর নিকট নিবেদন পেশ করেন, হুযূর! তশরীফ নিয়ে চলুন। আপনি এখন সব দিক দিয়ে নিরাপদ। আপনি যা-ই বলবেন তা শোনা হবে এবং মান্য করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সফরসঙ্গীসহ কাফেলার সামনে থেকে রওয়ানা হলেন। এদিকে

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ৪৯২, পৃ.।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানাতে গোটা মদীনা যেন ভেঙে পড়ল! সবাই তাঁকে খোশ আমদেদ জানাতে উদ্‌গ্রীব। মহিলারা দালান-কোঠার ছাদে উঠে নবাগত কাফেলাকে দেখছিল এবং একে অপরকে বলছিল, এঁদের মধ্যে মহানবী ﷺ কে? হযরত আনাস (রা) বলেন, এরপর আমরা আর কখনো এই দৃশ্য দেখতে পাইনি।

মানুষ পথে-ঘাটে, লোক চলাচলের রাস্তায়, ঘরের ছাদে, খিড়কি পথে, দরজায়, এক কথায় সবখানেই জমায়েত। আবাল-বৃদ্ধবনিতা, মনিব-ভৃত্য সকলের মুখেই এক কথা ও এক আওয়াজ।

الله اكبر جاء رسول الله! الله اكبر جاء محمد! الله اكبر جاء محمد! الله اكبر جاء رسول الله.

আল্লাহু আকবার, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন! আল্লাহু আকবর। মুহাম্মদ এসেছেন। আল্লাহু আকবার! আল্লাহর রাসূল আগমন করেছেন![২]

বারাআ ইবন আযিব (রা) তখন খুব ছোট ছিলেন, অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি মদীনাবাসীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসাতে যত খুশী হতে দেখেছি অন্য কিছুতে তত খুশী হতে দেখিনি। দাস-দাসীরাও আনন্দের আবেগে এই বলে চিৎকার করে ফিরছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন, আল্লাহর রাসূল এসেছেন![৩]

মুসলমানেরা তাঁর শুভ আগমনে খুশী ও আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দেয়। মনে হচ্ছিল তাঁদের জীবনে এর চেয়ে বড় আনন্দ যেন আর কখনও আসেনি! মনে হচ্ছিল মদীনা যেন মুচকি হাসছে আর গর্বে ও আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছে! মদীনার কচি শিশুরা হেলেদুলে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করছিল[৪] :

طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا * ما داع لله داع

ايها المبعوث فينا * جئت بالامر المطاع

তরজমা :

১. ছানিয়্যাতুল বিদা পাহাড়ের দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় ঘটেছে।

২. যতদিন আল্লাহর নাম নেবার মত একজনও থাকবে আমাদের ওপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে।

---

১. ইমাম আহমদ উদ্ধৃত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীছ (ইবন কাছীর, ২য় খ., ২৬৯)।

২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম, ইসরাঈল (রা) সূত্রে আবূ বকর (রা)-এর হাদীছ (হাদীছে হিজরত)।

৩. সহীহ বুখারী . باب مقدم النبى ﷺ واصحابه الى المدينة

৪. ইবন কাছীর, ২য় খ., ২৬৯ বায়হাকী, হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে।

৩. আমাদের মধ্যে প্রেরিত ওহে সজ্জন! আপনি বাধ্যতামূলক আনুগত্যের নির্দেশ নিয়ে এসেছেন।[১]

হযরত আনাস ইবন মালিক আনসারী (রা) যে সময় খুবই অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় তশরীফ নেন সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি এর চাইতে সুন্দর ও আলোকোজ্জ্বল দিন আর দেখিনি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে (মদীনায়) তশরীফ আনেন।[২]

কুবা মসজিদ ও মদীনার প্রথম জুমুআ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবায় চার দিন থাকেন এবং এখানে একটি মসজিদের বুনিয়াদ রাখেন। জুমুআর দিন তিনি সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে বনী সালেম ইবন আওফ মহল্লায় গিয়ে উপস্থিত হন। সালাতের সময় হলে তিনি এখানেই মহল্লার মসজিদে জুমুআ আদায় করেন। এটিই ছিল জুমুআর প্রথম সালাত যা তিনি মদীনায় আদায় করেন।[৩]

---

১. হাফেজ ইবন কায়্যিম তার যাদু'ল-মা'আদ গ্রন্থে এক্ষেত্রে একটি জ্ঞান ও তত্ত্বগত আলোচনা শুরু করিয়েছেন। তিনি বলেন, আলোচ্য কবিতায় যে ছানিয়্যাতুল-বিদার উল্লেখ দেখা যায় তা মক্কা থেকে মদীনায় আসার পথে (যা দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী) পড়ে না। কেননা ছানিয়্যাতুল-বিদা সিরিয়াগামী কিংবা সিরিয়া থেকে আসার পথে অবস্থিত। তাঁর গবেষণা ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাবুক থেকে সম্মান ও বিজয়ী বেশে ফেরেন তখন এই কবিতা পাঠ করা হয়েছিল। খোদ সহীহ বুখারীতে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময়ের বর্ণনায় ছানিয়াতু'ল-বিদার উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু সীরাত লেখকগণ, সাধারণভাবে যাঁদের মধ্যে প্রাচীন সীরাতকারগণও রয়েছেন, এই কবিতাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কা থেকে মদীনায় আসার সময় পঠিত ও গীত বলে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান লেখক সেসব সুধী মনীষীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, যাঁরা মদীনার অলি-গলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বলেন, মক্কা থেকে আগমনকারী কোন লোকও এ পথ ধরতে পারেন এবং হিজরত যে অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল তাতে এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তিনি সাধারণের ব্যবহৃত রাস্তায় না গিয়ে ছানিয়্যাতুল-বিদা হয়ে মদীনামুখী হয়েছিলেন। সেই সাথে এও মনে রাখতে হবে, মদীনায় ছানিয়্যাতুল-বিদা নামে কেবল একটি জায়গাই ছিল না, মক্কার পথেও এমন একটি টিলা ছিল যার নিচে আকীক নামক উপত্যকা ছিল এবং তা চারদিকে ছিল আগ্নেয়শিলা । এটা সে যুগে মদীনার লোকদের একটি পর্যটনকেন্দ্র ছিল। গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার লোকেরা এখানে মিলিত হতো। এও সম্ভব যে, এই কবিতায় উক্ত স্থানের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মদীনাবাসী মক্কায় যাওয়ার সময় লোকদেরকে বিদায় দিতে এ পর্যন্ত আসতেন (آثار المدينة المنورة ১৬০ পৃ., ৩য় সংস্করণ)।

স্বয়ং এই কবিতাতেও এর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এই কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ গীত সে সময় গাওয়া হয়েছিল যখন তিনি প্রথম মদীনায় পা দিয়েছিলেন। কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, বিশেষ করে কবিতার শেষ পংক্তিটি বলে দিচ্ছে, এটি তখনই আবৃত্তি করা হয়েছিল যখন মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রথম দেখার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিল। যদি তাবুক যুদ্ধের সময়ও এটি পঠিত হয়ে থাকে যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনায় দেখা যায়, তবে তা অসম্ভব নয়। এ ধরনের কবিতার পুনঃপাঠ বিরল নয়।

২. দারিমী।

৩. ইবন হিশাম, ৪৯৪ পৃ.।

আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহে

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শহরের পথ ধরে এসেছিলেন তখন পথিমধ্যে লোকের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হুযূর ﷺ -এর কাছে দরখাস্ত পেশ করতে থাকে হযরত ﷺ যেন তাদের ঘরে বাস করেন! তিনি তাদের ঘরে সম্মান, মর্যাদা ও সাজ-সামান ও সংখ্যাসহ অবস্থান করুন। কখনও বা তারা অতি আগ্রহভরে উটের রশি ধরেও টানছিল। তিনি তখন বলেছিলেন, ওকে যেতে দাও! ও তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। এমনটি কয়েকবারই হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বনী নাজ্জারের মহল্লা দিয়ে অতিক্রম যাচ্ছিলেন তখন মহল্লার ছোট শিশু ও কিশোরীরা নীচের কবিতা আবৃত্তি করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়:

نحن جوار من بني النجار * ياحبذا محمد من جار.

"আমরা নাজ্জার গোত্রের মেয়ে, কী সৌভাগ্য আমাদের, মুহাম্মদ আমাদের প্রতিবেশী!"[১]

(এভাবে চলতে চলতে) তিনি যখন বনী মালিক ইবন আন-নাজ্জারের ঘর পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন উটনী এক স্থানে, যেখানে আজ মসজিদে নববীর দরজা অবস্থিত, আপনাআপনি বসে পড়ল। সে সময় সেখানে খেজুরের একটি বাগান ছিল। জায়গাটি ছিল বনী নাজ্জারের দু'টি য়াতীম বালকের। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাতৃকুলের দিক দিয়ে আত্মীয়তার সূত্রও ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উটনী পিঠ থেকে নেমে আসেন। আবূ আয়্যূব আনসারী (রা.) [খালিদ ইবন যায়দ আন-নাজ্জারী আল-খাযরাজী] তক্ষুণি তাঁর সামানপত্র নামিয়ে বাসায় যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানেই থাকেন। আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) হুযূর আকরাম ﷺ -এর মেহমানদারী, সেবা-যত্ন ও ভক্তি-সম্মান প্রদর্শনে কোন ত্রুটিই রাখেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর দ্বিতল গৃহের নীচতলায় থাকেন। কিন্তু এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবমাননা হবে, এজন্য তিনি তাঁর নিজের ব্যবহৃত দ্বিতল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করেন। তিনি নীচে নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এ ব্যাপারে আর্জি পেশ করেন এবং ওপর তলায় অবস্থান নিতে অনুরোধ জানান। জাওয়াবে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আবূ আয়্যূব! আমি আমার ও আমার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের পক্ষে নীচের তলায় থাকাটাই অধিকতর সুবিধাজনক হবে বলে মনে করি।

---

১. বায়হাকী, আনাস ইবন মালিক (রা)-এর বর্ণনা, ইবন কাছীর ২য়., ২৭৪।

আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। কিন্তু আজ স্বয়ং তাঁরই গরীবালয়ে হুযূর আকরাম ﷺ থাকার জন্যে তাঁর খুশীর অন্ত ছিল না। এই বিরল ও দুর্লভ সম্মান ও সৌভাগ্যের (আল্লাহ তাআলা যা তাঁকে দান করেছিলেন)[১] কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাঁর ভাষা ছিল অক্ষম। প্রেম ও ভালবাসাই খেদমতের আদব শেখায় (অর্থাৎ প্রেমাস্পদের খেদমত কিভাবে করতে হবে তার জন্য কোন রীতিনীতি শেখার দরকার হয় না, প্রেমাবেগই এর জন্য যথেষ্ট)। আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের খাবার তৈরি করে পাঠাতাম। খাবার শেষে ভোজ্য উচ্ছিষ্ট কিছু ফিরে আসলে আমি ও আমার স্ত্রী উম্মু আয়্যূব তা রাসূল যেখানটায় মুখ লাগিয়ে খেয়েছেন সেখান থেকে খেয়ে নিতাম এবং বরকত হাসিল করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীচ তলায় থাকতেন আর আমরা থাকতাম ওপর তলায়। একবার পানি রাখার মশকটা ভেঙে যায়। ফলে আমি আর উম্মু আয়্যূব আমাদের পরিধেয় একমাত্র চাদর দিয়ে গড়িয়ে পড়া পানি শুষে নিলাম যাতে তা কোনভাবে গলিয়ে নীচে অবস্থানরত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কষ্টের কারণ না হয়।

মসজিদে নববী ও গৃহ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ য়াতীম বালকদ্বয়কে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছ থেকে জায়গাটি মসজিদ নির্মাণের জন্য খরিদ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে এটি হাদিয়া হিসাবে পেশ করছি। কিন্তু তিনি এভাবে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, বরং কোন না কোনভাবে মূল্য দিয়ে জমিটুকু গ্রহণ করেন এবং সেখানে মসজিদ তৈরি করেন।[২]

মসজিদ নির্মাণে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ইট বহন করতেন আর সাহাবীরা তাঁকে অনুসরণ করতেন। এ সময় তিনি আবৃত্তি করতেন :

اللهم ان الاجر اجرالاخرة * فارحم الا نصار والمهاجرة.

"হে আল্লাহ! আখেরাতের পুরস্কারই তো প্রকৃত পুরস্কার, অতএব, আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি দয়া করুন।"[৩]

মুসলমানরা সে সময় খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। তাঁরা উৎসাহ ভরে কবিতা পাঠ করতেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

---

১. ইবন ইসহাক, আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) বর্ণিত, ইবন কাছীর, ২খ., ২৭৭ পৃ.।

২. সহীহ বুখারী, مقدم النبى ﷺ واصحابه الى المدينة শীর্ষক অধ্যায়।

৩. ইবন কাছীর, ২খ., ২৫১ পৃ.।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর ঘরে সাত মাস থাকে[১] মসজিদ ও বাসগৃহ তৈরি হয়ে গেলে তিনি সেখানে চলে যান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় আসার পর মুহাজিররা আসতেই থাকে। শে পর্যন্ত মক্কায় কেবল দু'ধরনের লোকই অবশিষ্ট থেকে যায়, (১) যার ফেতনা-ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন অথবা (২) শত্রু হাতে বন্দী ছিলেন যে থেকে মুক্তির কোন রাস্তা ছিল না। অপরদিকে আনসারদের এমন কোন ঘর ছিল ন যেখানে লোক ইসলাম কবুল না করেছে।[২]

মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একে অন্যের শোকে-দুঃখে বিষাদ-বেদনায় সমবেদনা ও সাহায্য-সহানুভূতি দেখানোর মদ্যে পরস্পপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সূচনা করেন। আনসার ও মুহাজিরগণ একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য এমন প্রতিযোগিতায় নামে যে, অবশেষে তা লটারী গিয়ে পৌঁছতে হতো। তাঁরা মুহাজিরদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি, ঘরের তৈজসপত্র টাকা-পয়সা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, এমন কি যাবতীয় বিষয়-আশয় তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছেন যাতে সেগুলো তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারেন এবং মুহাজিরদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতেন।

একজন আনসারী তাঁর মুহাজির ভাইকে বলেছেন, দেখ! এই আমার ধন-সম্পদ, এর অর্ধেক তোমার, যেটা খুশি গ্রহণ কর। আমার দু'জন স্ত্রী। এদের মধ্যে তোমার পছন্দ বল, আমি তাকে তালাক দিই এবং তোমার সঙ্গে বিয়ে দিই মুহাজির উত্তর দিলেন, আল্লাহতাআলা তোমার ঘরে-বাইরে ও বিষয়ে-আশয়ে বরকত দান করুন (ওসব তোমারই থাকুক)! দয়া করে তুমি আমাকে বাজারের রাস্তাটা বাতলে দাও (ওখানেই আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করব)।

আনসারদের কাজ ছিল মুহাজিরদের পক্ষে আপন স্বার্থ কুরবানী এবং তাদের মুহাজির ভাইদের স্বার্থকে প্রথম বিবেচনায় আনা। আর মুহাজিরদের কাজ ছিল এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও আত্মমর্যাদাবোধ উন্নত রাখা।[৩]

---

১. ইবন কাছীর, ২য় খ., ২৭৯ পৃ. এটি ইবন সাদ-এর মতে ওয়াকিদীর বর্ণনা; ফাতহুল-বারী রচয়িতা ইবন হাজার এ মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার বছর রবিউল আওয়াল থেকে সফর মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন, সেখানে মসজিদ তৈরি করেন এবং বসবাসের জন্য ঘর তৈরি করেন। এভাবে তিনি হযরত আবূ আয়্যুব (রা)-এর এখানে দশ মাসের বেশি অবস্থান করেন।

২. ইবন হিশাম, ১ম খ., ৪৯৯-৫০০।

৩. সহীহ বুখারী كيف اخى ﷺ بين اصحابه ও اخاء النبى ﷺ بين المهاجرين والانصار অধ্যায়ে আবদুর রহমান ইবন আওফ ও সাদ ইবনু'র-রবী (রা)-এর ঘটনা দ্র.।

ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও এর গুরুত্ব

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন আপন প্রকৃতির দিক দিয়ে ছিল একক ও অনন্য, ইসলামী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদ, দাওয়াতের অধিকারী (দাঈ) একটি উম্মাহর প্রতিষ্ঠার সূচনা যা এক নতুন পৃথিবী বিনির্মাণের জন্য মুখরিত হচ্ছিল এবং যা সঠিক, বিশুদ্ধ ও নির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস এবং দুনিয়াকে দুর্ভাগ্য ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে মুক্তি দানকারী নেক মকসুদ, ঈমান ও অর্থপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপর সম্পর্কের জন্যে ঘটেছিল। এভাবেই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এই সীমিত ভ্রাতৃত্ব মানবতার জগতে নতুন জিন্দেগীর সূচনা বলে প্রমাণিত হয়। এজন্যই আল্লাহতা'আলা একটি ছোট্ট শহরের এক ছোট্ট জামাআতকে সম্বোধন করতে গিয়ে বলেন :

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

"যদি তোমরা তা না কর তাহলে পৃথিবীতে এক মহাফেতনা ও বিরাট বিপর্যয় দেখা দেবে।" [সূরা আনফাল : ৭৩ আয়াত]

মহানবী ﷺ-এর মদীনার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ইয়াহূদীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সময় মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে মদীনার বিভিন্ন জাতি-গোত্র-সম্প্রদায় ও ইয়াহূদীদের নিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এতে সকলকে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। অমুসলিমের যার যার ধর্ম পালন ও আপন সহায়-সম্পত্তি রক্ষার অধিকার স্বীকার করা হয়, তাদের যাবতীয় মৌলিক অধিকার এবং যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্যের রূপ ও সীমারেখা চিহ্নিত করা হয়।[১]

আযানের হুকুম

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনার বুকে পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলেন এবং ইসলাম সুদৃঢ় রূপ লাভ করল তখন সালাতের জন্য মুসলমানদেরকে ডাকার

---

১. দেখুন ইবন হিশাম, ৫০১ পৃ. এই রাজনৈতিক দলীলের গুরুত্ব বোঝার (যাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সুসংঘবদ্ধ লিখিত সংবিধান বলা যেতে পারে যা আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান) এবং এই গভীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক বিষয়সমূহ রাসূল (সা)-এর প্রজ্ঞা ও ঐশী দিক-নির্দেশনা ও অবস্থার সুষম পর্যালোচনার জন্য দেখুন ড. হামীদুল্লাহ, সাবেক অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক আইন, উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দারাবাদ-এর নিবন্ধ, যার আরবী তরজমা বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক مجموعه مباحث علميه দাইরাতুল-মাআরিফ আল-উছমানিয়া, হায়দারাবাদ থেকে ১৩৫৫ হি.-তে প্রকাশিত হয়েছিল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকা, মওলানা মুশাহিদ লিখিত ও বর্তমান অনুবাদকের অনূদিত 'ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার' নামক পুস্তক ও ড. হামীদুল্লাহ লিখিত বিভিন্ন বইয়ে এর বিস্তারিত বিবরণ দেখা যেতে পারে। – অনুবাদক)।

সেই সব পন্থা যা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ভেতর প্রচলিত ছিল সেগুলো, যেমন ঘন্টা বাজানো, শিংগায় ফুঁ দেয়া, আগুনের মশাল জ্বালানো প্রভৃতি অপছন্দ করলেন। তখন পর্যন্ত মুসলমানরা কোন রকম পূর্ব ঘোষণা ও ডাকাডাকি ছাড়াই সালাতের ওয়াক্তে আপনাআপনিই হাজির হয়ে যেতেন। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ পাক আযান দ্বারা মুসলমানদেরকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেন এবং স্বপ্নের মাধ্যমে কোন কোন সাহাবীকে এর বাস্তব রূপ ও দৃশ্যও দেখানো হয়। অতঃপর তিনি এই আযানকেই নির্ধারিত করেন এবং শারঈভাবেই এর প্রচলন ঘটানো হয়। অতঃপর আযান দানের এই মহান খেদমত হযরত বেলাল ইবন রাবাহ হাবশী (রা)-কে সোপর্দ করা হয়। তিনি 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুওয়াযযিন' এই উপাধিতে ভূষিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত মুওয়াযযিন আসবেন তাঁদের ইমাম হওয়ার অনন্য গৌরব লাভ করেন।

মদীনায় নিফাক ও মুনাফিকদের আবির্ভাব

মক্কায় নিফাক অর্থাৎ মুনাফিকী ছিল না[১] আর তা এজন্য যে, সেখানে ইসলাম ছিল পরাজিত ও অসহায়। তার ভেতর অবস্থার পরিবর্তনের কোন শক্তি ছিল না। সে কাউকে সুবিধা প্রদান কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখত না, বরং মক্কায় ইসলাম কবুল করার অর্থই ছিল সব রকমের বিপদ-আপদ ও ক্ষয়ক্ষতি বরণ, দুশমনি কেনা, জেনেশুনে শত্রুকে উত্তেজিত করে তোলা ও তাকে আরও উস্কে দেয়া। এরূপ দুঃসাহস একমাত্র সেই ব্যক্তিই করতে পারত যে কথায় সত্যবাদী ও সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তির অধিকারী, যার ঈমান মজবুত এবং যে নিজেকে, নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে ঠেলে করতে প্রস্তুত হতো। মক্কায় উভয় শক্তির মধ্যে ভারসাম্য ছিল না। কাফির মুশরিকরা ছিল প্রবল শক্তির অধিকারী এবং বিজয়ী আর মুসলমানরা ছিল মজলুম ও দুর্বল। কুরআন মজীদ এই অবস্থার একটি চিত্র আপন ওজস্বী ভঙ্গীতে পেশ করেছে এভাবে :

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ.

"আর স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে অল্প আর দুর্বল ছিলে দেশে, আর ছিলে ভীত-সন্ত্রস্ত, না জানি তোমাদেরকে লোকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়!"

[সূরা আনফাল : ২৬ আয়াত]

---

১. অধিকাংশ মুফাসসির ও ঐতিহাসিকের এটাই অভিমত। কুরআন মজীদের যেসব সূরায় নিফাক ও মুনাফিকদের উল্লেখ করা হয়েছে তার সবই মদীনায় নাযিল হয়েছে। সূরা বারাআতে বলা হয়েছে : আর কিছু কিছু তোমার আশেপাশের মুনাফিক ও কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফিকীতে অনড় [সূরা তওবাহ, ১০১ আয়াত]।

ইসলাম যখন মদীনায় চলে এলো আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবা-ই কিরাম (রা) শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা লাভ করলেন, ইসলাম চারদিকে বিস্তার লাভ করতে লাগল, ইসলামী সমাজ তার সমস্ত শর্ত ও প্রয়োজনীয় উপাদানসহ রূপ লাভ করল তখন অবস্থার মধ্যে এক ধরনের বিশেষ আলামত দেখা দিল এবং নিফাক তথা মুনাফিকী মাথা গজাল। এটি ছিল এক ধরনের স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যা থেকে পালাবার কোন পথ ছিল না, সম্ভবও ছিল না এজন্য যে, নিফাক সব সময় সেখানেই জন্ম নেয় এবং হাত-পা মেলে যেখানে দু'টো পরস্পরবিরোধী দাওয়াত ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব বিরাজ করে। এ অবস্থায় এ দু'য়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত পক্ষ এই দুই দাওয়াত ও নেতৃত্বের মাঝখানে দুলতে থাকে থাকে। তারা দ্বিধাগ্রস্ত ও চিন্তাযুক্ত থাকে, কোন্ দাওয়াতকে তারা কবুল করবে এবং কোন্‌টিকে তারা ত্যাগ করবে। কখনও তারা একটি দাওয়াত কবুল করে নেয় এবং সেই শিবিরে গিয়ে নাম লেখায়, তার সঙ্গেও বিশ্বস্ততার সম্পর্কও কায়েম করে। কিন্তু তাদের পার্থিব স্বার্থ ও প্রতিপক্ষ দাওয়াতের বিস্তার, তার বিজয়, প্রাধান্য ও উত্থান তাকে তার যথার্থ অবস্থান গ্রহণ এবং প্রথম দাওয়াতের পতাকাতলে আসার ঘোষণা দেয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং তারা তাদের প্রাচীন পরিবেশের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না। কুরআন মজীদ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্থিরচিত্ততার এই অবস্থার খুবই নাজুক ও জীবন্ত চিত্র অংকন করেছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

"মানুষের মধে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে আর যদি সে পরীক্ষায় পড়ে তবে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। ইহকাল ও পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত আর এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।" [সূরা হজ্জ : ১১ আয়াত]

এদের গুণপনা অপর এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۗءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۗءِ ۔

"মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায়, না এদিকে আর না ওদিকে।" [সূরা নিসা : ১৪৩]

আওস ও খাযরাজ গোত্রের এবং ইয়াহূদীদের সঙ্গে যুক্ত এসব মুনাফিকের নেতৃত্বে ছিল আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূল। বু'আছ যুদ্ধের পর সকলে একমত হয়ে তাকে তাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। ইসলাম যখন এখানে

আসে তখন তার রাজমুকুট পরার আনজাম চলছিল। যখন সে দেখতে পেল, লোক বিপুল সংখ্যায় ও দ্রুত ইসলাম কবুল করছে তখন বিষয়টি কাঁটার মত তার দিলে খচখচ করে বিঁধতে থাকল। সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। ইবনে হিশামের বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মুহূর্তে মদীনায় তশরীফ নেন সে সময় আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূল ছিল মদীনাবাসীর সর্দার। আওস ও খাযরাজ গোত্র ইসলাম আসার পূর্বে তাকে ছাড়া আর কারো নেতৃত্ব ব্যাপারে একমত হতে পারছিল না। তার সম্প্রদায় রাজমুকুট হিসেবে শিরে ধারণের জন্য (كوريون) একটি মুকুটও বানিয়ে রেখেছিল যা সে তাদের সম্রাট হিসাবে পারবে। এ রকম একটি অবস্থায় আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এখানে পাঠালেন। এরপর তার জাতি ও সম্প্রদায় তাকে ফেলে যখন মুসলমান হয়ে গেল তখন তার দিলে কঠিন হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো। সে অনুভব করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার সর্দারী ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করলেন। কিন্তু যখন সে এও দেখতে পেল, তার জাতিগোষ্ঠী কোন অবস্থাতেই ইসলাম ত্যাগ করতে রাজী নয় তখন সেও নেহায়েত অনিচ্ছা সত্ত্বেই ইসলামে প্রবেশ করল বটে, কিন্তু মুনাফিকী, অন্তর্জ্বালা ও হিংসা-বিদ্বেষকে আগাগোড়াই অন্তরে মাঝে লুকিয়ে রাখল।[১]

এ ধরনের সব লোকই ইসলামের প্রতি শত্রুতায় নেমে পড়ল যাদের অন্তরে কোন ক্ষোভ ছিল এবং যারা ছিল নেতৃত্বের লোভী। সে এই নবতর ধর্মকে অপয় ভাবতে লাগল যে ধর্ম তার মতলবকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল, তার সকল আশা-ভরসাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিল, যা মদীনার রঙ পাল্টে দিয়ে মুহাজির ও আনসারদেরকে একদেহ একপ্রাণ উম্মাহ তৈরি করল, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করত এবং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে নিজেদের পিতা-পুত্র ও স্ত্রীর ভালবাসার ওপরও স্থান দিত। এই দৃশ্যে ঐসব মুনাফিকের অন্তর রাগে-দুঃখে ও হিংসা-বিদ্বেষে ভরে গেল এবং তারা মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে নানা রকম ফন্দি-ফিকির ও চক্রান্ত করতে লাগল। এভাবেই মদীনায় ইসলামী তথা মুসলিম সমাজের ভেতরেই একটি বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে যায় যাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা মুসলিম সমাজের পক্ষে জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এই দলটি 'কোমরের ছুরি' হিসাবে থেকে যায় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য শত্রুর চেয়েও অধিক বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়।

এটাই কারণ, কুরআন মজীদে অধিক সংখ্যায় তাদের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের কৃতকর্মের মুখোশ খুলে দেয়। ইসলামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বিভিন্ন ধরনের। এজন্য সীরাত গ্রন্থসমূহে নিশ্চিতভাবেই তাদের উল্লেখ এসেছে এবং বর্তমান গ্রন্থেও তা থাকবে ইনশাআল্লাহ!

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৫৮৪-৮৫ পৃ.।

ইয়াহূদীদের শত্রুতার সূচনা

প্রথম দিকে কিছুটা নিরপেক্ষ ও নিশ্চুপ থাকার পর প্রথমবার মতো ইয়াহূদীদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে শুরু হয়। তাদের অবস্থান প্রথমে মুসলমান ও মুশরিকদের এবং মক্কাবাসী ও মদীনাবাসীদের মধ্যে নিরপেক্ষ ছিল, বরং সে সময় বরং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের টান তুলনামূলকভাবে বেশিই ছিল। এর কারণ ছিল, নবুওয়াত, রিসালাত ও আখেরাত দিবসের ওপর (ঈমানের বেলায় কিছু কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও) এবং আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও তৌহিদী আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা ছিল মুসলমানদের খুবই কাছাকাছি, যদিও এই আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা ছিল মুসলমানদের পাশে দীর্ঘকাল। মূর্তি পূজার পরিবেশে এই দীর্ঘকাল কাটানোর ফলে খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং এতে চরম বাড়াবাড়ি ও কোন কোন নবীর পবিত্রতার ধারণাও শামিল হয়ে গিয়েছিল যার কিছুটা পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে বলা হয়েছে।[১]

সমস্ত কারণ এটাই বলত, তারা ইসলামের সহযোগী ও সহযোদ্ধা হতে না পারলেও কমপক্ষে এ ব্যাপারে তারা অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকবে এজন্য যে, ইসলাম তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে সমর্থন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী ইসরাঈলের সকল নবী ওপর ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিতে থাকেন। কুরআন মজীদ মুমিনদের ভাষায় বলে,

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

"সকলেই আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর ও তাঁর রাসূলদের ওপর ঈমান রাখে (এবং তারা বলে), আমরা তার রাসূলদের মাঝে কোনরূপ ফরক করি না।" [সূরা বাকারা : ২৮৫ আয়াত]

যদি এমনটি হতো, তাহলে আজ কেবল ইসলামের ইতিহাসই নয়, বরং দুনিয়ার ইতিহাসের গতিধারাই বদলে যেত এবং ইসলামের দাওয়াতকে সেসব সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতো না। ইসলাম ও ইয়াহূদীদের দ্বন্দ্ব এবং সেসব প্রথম দিককার মুসলমান (যারা নিজেদের লালন-পালনের অবস্থায় ছিলেন) ও ইয়াহূদী (যারা শক্তিশালী, প্রভাবশালী, ধনবান ও শিক্ষিত ছিল)-দের ভেতর দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এর পেছনে দু'টো মৌলিক কারণ ছিল। প্রথম ছিল ইয়াহূদীদের ভেতরকার হিংসা-বিদ্বেষ, সংকীর্ণ মানসিকতা, স্থবির ও

---

[১] দেখুন 'জাহিলিয়াত যুগ'।

পরশ্রীকাতর স্বভাব এবং অপরটি হলো তাদের বাতিল তথা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, নীচু প্রকৃতির আখলাক-চরিত্র ও মন্দ অভ্যাস যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন মজীদে নানা জায়গায় সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সেই দীর্ঘ ইতিহাসের পর্দা তুলে দেয়া হয়েছে সেটা ছিল আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর সঙ্গে লড়াই-সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া, তাঁদের পেশকৃত দাওয়াত ও পয়গামের মুকাবিলা করা, তাঁদের হত্যা করার অমার্জনীয় স্পর্ধা, শত্রুতা ও বিদ্রোহের আচরণ, সত্যের পথে বাধা প্রদান, আল্লাহতাআলার ওপর অপবাদ আরোপ, সম্পদ প্রীতি, নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদী কায়কারবারের প্রতি আকর্ষণ, অবৈধভাবে লোকের সম্পদ ভক্ষণ, হারাম মালের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহবোধ, তাওরাতে নিজেদের ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক রদবদল, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন, জীবনের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভালবাসা এবং এ ধরনের আরও বহু কিছু তাদের জাতীয় ও বংশগত বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ।

যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলে কোন রাজনৈতিক নেতা হতেন তাহলে এই জটিল ও সঙ্গীন অবস্থা (যা সেই সময় মদীনায় কায়েম ছিল) বুঝে শুনে তারই আলোকে কল্যাণ উপযোগী পদক্ষেপ নিতেন। তিনি যদি ইয়াহূদীদের সঙ্গে তেয়াজ-তদবির ও খোশামুদীর ব্যাপারে কিছু নাও করতেন, তাহলে কমপক্ষে তাদেরকে উত্তেজিত করা ও তাদের শত্রুতা কিনে নেয়া থেকে অবশ্যই সতর্ক হতেন। কিন্তু তিনি (রাসূলুল্লাহ) রিসালাত ও নবুওয়াতের তাবলীগ, দীনে হক তথা সত্য-সুন্দর জীবন ব্যবস্থার স্পষ্ট ও খোলাখুলি ঘোষণা, হক ও বাতিল পৃথক করা, ফাসাদ ও গোমরাহীর মুকাবিলা ও উৎখাত করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং তাঁকে এ ব্যাপারে যিম্মাদার ও দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল, তিনি দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠী, ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়কে, যাদের মধ্যে ইয়াহূদী ও খৃস্টানও আছে, ইসলামের প্রকাশ্য ও খোলাখুলি দাওয়াত জানাবেন। এজন্য তাঁকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কুরবানী দিয়ে দিতে হোক এবং যত রকমের কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটের সম্মুখীনই হতে হোক! এটি নবুওয়াতের সেই মেযাজ ও রীতি-পদ্ধতি যার ওপর সমগ্র আম্বিয়াই কিরাম (আ) সব সময়ই আমল করেছেন। এই মেযাজ ও রীতি-পদ্ধতিই রাজনীতি ও নবুওয়াতের রাস্তাসমূহকে পৃথক করে দেয় এবং আম্বিয়া-ই কিরাম ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে।

ইয়াহূদীদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের জীবন ও তাদের সীরাত তথা জীবন-চরিত ও কর্মকাণ্ডের ওপর এতে আঘাত লাগে। ফলে তা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতা ও শত্রুতায় টেনে নামায়। এটা তাদের এত দিনের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ বদলে দেয় এবং গোপন ও প্রকাশ্য– উভয় দিক দিয়েই ইসলামের বিরোধিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে নেমে পড়ে। ইয়াহূদী মনীষী

ইসরাঈল ওয়েলফিনসন এই বিবাদ ও শত্রুতার কারণ কী তার ওপর কিছুটা সাহস সহকারে ও স্পষ্ট ভাষায় আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন :

"যদি রাসূলের শিক্ষামালা কেবল মূর্তি পূজার বিরোধিতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত এবং ইয়াহূদীদের থেকে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত মেনে নেবার দাবি না করা হতো তাহলে আর ইয়াহূদী ও মুসলমানদের ভেতর কোন ঝগড়া দেখা দিত না। ইয়াহূদীরা সেক্ষেত্রে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষামালাকে দেখত, তাঁকে সমর্থন করত এবং জানমাল দিয়ে তাঁকে সাহায্য করত, এমন কি তিনি (রাসূল) ঐ সব মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতেন (আরব উপদ্বীপে যার রাজত্ব চলছিল) এবং পৌত্তলিক আকীদা-বিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটাতেন যা গোটা আরবে ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু এর জন্য শর্ত ছিল এই, তিনি তাদের ব্যাপারে ও তাদের ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ মাথা ঘামাবেন না এবং তাদেরকে এই নতুন নবুওয়াত ও রিসালাত কবুল করতে বাধ্যও করবেন না এজন্য যে, ইয়াহূদী মন-মানস এমন কোন জিনিসের সামনে নরম হতে রাজী হয় না যা তাকে তার ধর্ম থেকে সরিয়ে দিতে চায়। তারা বনী ইসরাঈল ছাড়া আর কোন বংশের নবীকে মেনে নিতে রাজী হতে পারে না।"[১]

ইয়াহূদীদেরকে এ বিষয়টিও উত্তেজিত করে তোলে, তাদের কোন কোন আলেম, যেমন 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম যাঁকে তারা খুবই সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত, ইসলাম কবুল করেন। ইয়াহূদীরা ধারণাও করতে পারেনি, তাঁর মত একজন মানুষ মুসলমান হয়ে যাবেন! এটি তাদের বুকের হিংসা ও মনের দহন জ্বালাকে আরও বেশি উস্কে দেয়, বাড়িয়ে দেয়।[২]

ইয়াহূদীরা কেবল ইসলামের বিরোধিতা, এর থেকে দূরে সরে যাওয়া ও নির্জনে থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আরো সামনে এগিয়ে গিয়ে তারা মুশরিক ও মূর্তি পূজকদেরকে সেই সব মুসলমানের ওপর প্রকাশ্য গুরুত্ব দিতে থাকে যারা তৌহিদী আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের শরীক ও সমর্থক ছিল। এটাই আশা করা গিয়েছিল আর যুক্তি-বুদ্ধির দাবিও ছিল এই, যখন কুরায়শদের ধর্ম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দীনের তুলনা করা হবে এবং এ দু'য়ের মধ্যে প্রাধান্য প্রদান ও বাছাইয়ের প্রশ্ন আসবে তখন তারা মুসলমানদের সাথে তাদের মতের অমিল সত্ত্বেও শির্ক ও মূর্তি পূজার ওপর ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দেবে।

---

১. تاريخ اليهود فى بلاد العرب. ১২৩ পৃ.।

২. ইয়াহূদীদের যেসব লোক মুসলমান হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ৩৯ জনের মত হবে। তাঁদের নাম ও জীবনকাহিনী 'তাবাকাতই সাহাবা' যেমন "আল-ইসাবা", "আল-ইস্তী'আব", "উসদু'ল-গাবা" প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জলীলুল কদর আলিম ও শ্রেষ্ঠতম সাহাবীদের অন্তর্গত ছিলেন (এই সংখ্যা দারুল-মুসান্নিফীন, আজমগড় প্রকাশিত মুজীবুল্লাহ নদভী اهل كتاب صحابه وتابعين থেকে উদ্ধৃত)।

অতঃপর খসরু পারভেয য়ামানের শাসনকর্তা বাযানকে হুকুম দেন যেন পত্র প্রেরককে গ্রেফতার করে তার কাছে হাজির করা হয়। তিনি বাবাওয়ায়হকে রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করেন। বাবাওয়ায়হ গিয়ে জানায়, সম্রাট খসরু গভর্নর বাযানকে নির্দেশ দিয়েছেন কাউকে পাঠিয়ে আপনাকে সেখানে হাজির করতে। তিনি আমাকে এজন্যই পাঠিয়েছেন যাতে আপনি আমার সাথে সেখানে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে জানান, আল্লাহ পাক খসরু পারভেযের ওপর তার পুত্র শায়রূয়াকে চাপিয়ে দিয়েছেন যে তাকে হত্যা করেছে।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেই খবর দিয়েছিলেন তা হরফে হরফে সত্য প্রমাণিত হয়। খসরুর সিংহাসনে তারই পুত্র কুবায, যার উপাধি ছিল শায়রূয়া, বসেন হন। খসরু পারভেয তারই ইঙ্গিতে ৬২৮ খৃস্টাব্দে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর আসলে সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডই ভেঙে যায় এবং শাসক বংশের হাতে সাম্রাজ্য একটি খেলনায় পরিণত হয়। শয়রূয়া ছয় মাসের বেশি রাজত্ব করতে পারেননি। চার বছরের ভেতর পর পর দশজন সম্রাট সিংহাসনে বসেন। সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। অবশেষে সবাই মিলে ইয়াযগির্দকে সিংহাসনে বসায় এবং তারই শিরে রাজমুকুট পরায়। ইনি ছিলেন সাসানী বংশের শেষ শাসক। তাকেই মুসলিম ফৌজের মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে ফৌজ অবশেষে সাসানী সাম্রাজ্যের ভাগ্যের ওপর সীলমোহর মেরে দেয় এবং যে সাম্রাজ্যের বিজয় ডংকা সুদীর্ঘ চার শত বছর ধরে দুনিয়ার বুকে বেজেছিল তা চিরতরে বন্ধ হয়। ৬৩৭ খৃস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। আর এভাবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী আট বছরের মধ্যে সত্যে পরিণত হয়[২] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশ اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده অর্থাৎ "যখন পারস্য সম্রাটের পতন হবে, তারপর আর কেউ সম্রাট পদে বরিত হবে না" ফলে যায়।[৩]

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে পারস্যের উত্তরাধিকারী ও শাসক বানিয়ে দেন, পারস্যবাসীদেরকে ইসলামের হেদায়াত দান করেন, ইরানে 'ইল্‌ম ও দীনের বড় বড় ইমাম ও ইসলামের অসাধারণ সব ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একথা সঠিক হিসাবে ধরা দেয়, لوكان العلم بالثريا لتناوله اناس من ابناء فارس অর্থাৎ ইল্‌ম যদি ছুরায়্যা নক্ষত্রেও থাকে তবুও কিছু ইরানবাসী তা অর্জন করেই ছাড়বে।[৪]

---

১. তারিখ তাবারী, ৩খ., ৯০-৯১ পৃ.।

২. সাসানী আমলে ইরান, ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ের "সাসানী সাম্রাজ্যের শেষ যুগ" শীর্ষকের সংক্ষিপ্তসার।

৩. এ সেই বর্ণনার শব্দমসষ্টি যা ইমাম মুসলিম ইবন উয়ায়না থেকে, এছাড়া ইমাম শাফঈ তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৫১৩ পৃ.।

৪. মুসনাদ ইমাম আহমদ, দ্বিতীয় খ., ৩৯৯ পৃ.।

হেরাক্লিয়াস ও আবূ সুফিয়ানের কথোপকথন

হেরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সঠিত তথ্য লাভ ও যথার্থ সত্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন এবং এমন কোন লোকের খোঁজ করেন যে তাঁর (রাসূল সা.) সম্পর্কে নির্ভুল বিবরণ দিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আবূ সুফিয়ান সে সময় গাযায় উপস্থিত ছিলেন এবং বাণিজ্যব্যপদেশে সেখানে এসেছিলেন। তাঁকে শাহী দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। সম্রাটের প্রশ্ন ছিল এমন একজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকের প্রশ্নের ন্যায় যিনি ধর্মের ইতিহাস, আম্বিয়া-ই কিরামের বৈশিষ্ট্য ও জীবন-চরিত, তাঁদের জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যবহার, আচার-আচরণ ও আল্লাহর সুন্নাহ সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানা। আবূ সুফিয়ান ও প্রাচীন আরবদের ন্যায় এই লজ্জায়, লোকে তাঁকে যেন ভুল বক্তব্য ও তথ্য বিকৃতকারী না বলে কৃত প্রশ্নের একেবারে ঠিকঠাক উত্তর দেন।

নিম্নের আলোচ্য কথোপকথন উদ্ধৃত করা হলো :

হেরাক্লিয়াস : তাঁর বংশ কিরূপ?

আবূ সুফিয়ান : তাঁকে আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত মনে করা হয়।

হেরাক্লিয়াস : তিনি যা বলেন তা কি তাঁর আগে কেউ কখনো বলেছিলেন?

আবূ সুফিয়ান : না (বলেন নি)।

হেরাক্লিয়াস : এই বংশে কোন বাদশাহ অতিক্রান্ত হয়েছেন?

আবূ সুফিয়ান : না (হননি)।

হেরাক্লিয়াস : প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকে তাঁর অনুসরণ করছে, না কি দুর্বল লোকেরা?

আবূ সুফিয়ান : দুর্বল লোকেরা।

হেরাক্লিয়াস : তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে?

আবূ সুফিয়ান : বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হেরাক্লিয়াস : কেউ কি তাঁর ধর্মে একবার প্রবেশের পর অপসন্দ হওয়ার কারণে উক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করেছে?

আবূ সুফিয়ান : না (পরিত্যাগ করেনি)।

হেরাক্লিয়াস : এই দাবি করবার পূর্বে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখেছ?

আবূ সুফিয়ান : না (বলতে দেখিনি)।

হেরাক্লিয়াস : কখনও কি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তোমরা দেখেছ?

আবূ সুফিয়ান : এখন পর্যন্ত তো করেননি। কিন্তু এখন একটি নতুন সন্ধিচুক্তি হয়েছে। দেখা যাক, তিনি এর ওপর কায়েম থাকেন কি না।

কিন্তু ইসলামের দুশমনি তাদেরকে এর অনুমতি দেয়নি। একবার ইয়াহূদী আলেমরা যখন কুরায়শ সর্দারদের সঙ্গে দেখা করতে মক্কায় যায় তখন কুরায়শ সর্দারগণ তাদেরকে বলেছিল, আপনারা প্রথমে আহলে কিতাব আর আমাদের ও মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে যে মতভেদ ও বিভেদ চলছে তাও আপনাদের জানা। এ ব্যাপারে আপনারা কি বলেন, আমাদের ধর্মই উত্তম না ওদের? তারা জওয়াব দেয়, আপনাদের (অর্থাৎ কুরায়শদের) ধর্ম ওদের ধর্ম থেকে উত্তম এবং আপনারাই বেশি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

এই ইয়াহূদী মনীষী (ড. ইসরাঈল ওয়েলফিনসন) এই ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন,

"কিন্তু একটি কথা, যে ব্যাপারে ঐসব লোককে আসলেই তিসস্কার করা যেতে পারে এবং যে ব্যাপারে এমন প্রত্যেক লোক কষ্ট পাবে যারা এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী চাই তারা ইয়াহূদীদের ভেতরকার কেউ হোক অথবা মুসলমানদের ভেতরকার কেউ, আর সেই কথোপথন যা ইয়াহূদী ও কুরায়শ মূর্তি পূজকদের মধ্যে হয়েছিল সেই কথোকথনে ঐ সব ইয়াহূদী কুরায়শের ধর্মকে ইসলামের পয়গম্বরের ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল।

তিনি আরও লেখেন :

"সামরিক প্রয়োজন জাতির জন্য চালবাজি, মিথ্যা কথন ও শত্রুর ওপর বিজয় লাভের জন্য ফেরেববাজি তথা প্রতারণার নানা কলা-কৌশলকে বৈধ বলেছে। কিন্তু *সব কিছু সত্ত্বেও ইয়াহূদীদের এই মারাত্মক ভুলে জড়িয়ে পড়া কিছুতেই সঙ্গত* হয়নি। কুরায়শের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সামনে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ উচিত হয়নি, মূর্তি পূজা ইসলামের একত্ববাদ (আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত যার অপর নাম তৌহিদ) থেকে শ্রেয়, চাই এর দরুন তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না-ই বা হাসিল হলো! যেই বনী ইসরাঈল দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মূর্তি পূজারী জাতিসমূহের মুকাবিলায় নিজেদের প্রাচীন বাপ-দাদার নামের ওপর তৌহিদী পতাকা উড্ডীন রেখেছে এবং যারা ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই 'আকীদা-বিশ্বাসের খাতিরে সংখ্যাতীত বিপদ-আপদ ও কষ্ট-মুসীবত বরদাশত করেছে এবং হত্যা ও রক্তের সাগর পাড়ি দিয়েছে, তাদের আজ এটা কর্তব্য ছিল মুশরিকদেরকে ব্যর্থ ও বিফল করে দেবার জন্য নিজেদের জীবনের সব সম্পদ ও মূল্যবান থেকে মূল্যবান বস্তুও কুরবানী দেয়া।"

কুরআন মাজীদের নীচের আয়াত এর দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছে :

---

১. ইবন হিশাম, ২য় খ., পৃ. ২১৪।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا.

"তুমি কি সেসব লোককে দেখনি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল, যারা মূর্তি ও শয়তানের ওপর বিশ্বাস রাখে আর কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এরা মু'মিনদের তুলনায় সোজা সঠিক পথে আছে ?" [সূরা নিসা : ১৫১ আয়াত]

কেবলা পরিবর্তন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তামাম মুসলমান এ যাবত বায়তু'ল-মুকাদ্দাস-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করছিলো। মদীনায় আগমনের পর এক বছর চার মাস কাল সেদিকেই মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক কামনা ছিল, কা'বাকে মুসলমানদের কেবলা বানিয়ে দেয়া হোক! আরব মুসলমানগণও (যাদের লালন-পালন কা'বার প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধের ওপর হয়েছিল আর এই ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তাদের রক্তে-মাংসে ও অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল) অন্তর দিয়ে কামনা করত, যদি কা'বা তাঁদের কেবলা হতো! তাঁরা কোন জায়গাকেই কা'বা এবং সায়্যিদুনা ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলার সমকক্ষ মনে করত না।

বায়তুল-মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা এবং তাকে নিজেদের কেবলা হিসাবে মেনে নেয়া তাঁদের জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু কোনরূপ বাচ্য ছাড়াই তাঁরা এই নির্দেশকে মেনে নেয়, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا "আমরা শুনলাম, মেনে নিলাম এবং اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا "আমরা এর ওপর ঈমান আনলাম যা কিছু আমাদের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই" ছাড়া তাদের মুখ দিয়ে আর কিছু বের হয়নি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য, অনুসরণ ও আল্লাহর সামনে মস্তক নত করে দেয়া ছাড়া আর কিছু জানত না, চাই তা তাঁদের ইচ্ছা, অভ্যাস ও প্রকৃতি-প্রকৃতির অনুকূল কিংবা প্রতিকূলই হোক না কেন! আল্লাহ যখন তাঁদের দিলের পরীক্ষা নিয়ে নিলেন এবং তাঁরা তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ও আনুগত্যের পূর্ণ প্রমাণ দিয়ে দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তামাম মুসলমানদের মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। কুরআন মজীদে বলা হলো,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ

...ـنَهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ط

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাহ করেছি যাতে তো... সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষাদাতা হন তোম... জন্যে। আর আপনি যে কেবলার ওপর ছিলেন তাকে আমি এজন্যই কে... বানিয়েছিলাম যাতে এ কথা জানা যায়, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে ... টান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয় যাদে... আল্লাহ্ হেদায়াত দান তথা পথ প্রদর্শন করেছেন।" [সূরা বাকারা : ১৪৩ আয়াত]

মুসলমানগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে নিজেদের মু... তখনই কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং সেটাই কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানে... কেবলা নির্ধারিত হয়ে যায়। মুসলমান দুনিয়ার যে কোন অংশেই হোক না কে... নিজেদের মুখ ঐ দিকে ঘুরিয়ে সালাত আদায় করার জন্য আদিষ্ট।[১]

মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে কুরায়শদের সংঘর্ষ

মদীনায় যখন ইসলাম মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কুরায়শ... দেখতে পেল, ইসলামের বিস্তৃতি, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দিনকে দিন বৃ... পাচ্ছে, আর এই অবস্থা যদি আরও কিছু দিন চলে, তাহলে তাদের আর তখন ক... মত কিছুই থাকবে না, সব কিছুই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, তখন তারা এ... বিরোধিতায় ও দুশমনিতে কোমর বেঁধে লেগে গেল এবং চারদিকে ত... ইসলামের বিরুদ্ধে শোরগোল শুরু করল। কিন্তু মুসলমানদেরকে আল্লাহর প... থেকে সবর এখতিয়ার ও ক্ষমার হুকুম এবং ...ـفُّوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ "আর তোমরা তোমাদের হাত সংযত রাখ এবং সালাত কায়েম কর"-এর তা... দেয়া হচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এই যে জীবন, এই স্বাদ-আহ্লাদ ও আরাম-আ... তাদের চোখে যেন নিষ্প্রভ ও মূল্যহীন হয়ে যায় এবং (আল্লাহর) আনুগত্য ... নফসের বিরোধিতা, আত্মোৎসর্গ ও কুরবানির মত কঠিন কাজ যেন তাদের জ... সহজ হয়ে যায়!

কিতাল (যুদ্ধ)-এর অনুমতি প্রদান

মুসলমানদের শক্তি যখন আরও কিছুটা বাড়ল এবং তাদের বাযু আরেকটু শ... হলো তখন তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু এ কেবল অনুমতিই ছি...

---

১. সিহাহ সিত্তা ও কুরআন মজীদে এসব আয়াতের তাফসীর দেখুন যেখানে কেবলা পরিবর্তনের ক... হয়েছে।

একে তাদের ওপর ফরয করা হয়নি।[1] বলা হলো :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ.

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে। কেননা তারা অত্যাচারিত। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।"
[সূরা হজ্জ : ৩৯ আয়াত]

আবদুল্লাহ ইবন জাহশ-এর সারিয়্য ও আবওয়া যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ছোট ছোট অভিযান (সারিয়্যা) ও হঠাৎ আক্রমণ পরিচালনা সূচনা করেন। এর ধরন অধিকাংশ সময় নিয়মিত যুদ্ধে গড়াত না। একে আমরা বড় জোর পরস্পরের জন্য শক্তি পরীক্ষা, সংঘর্ষ ও হঠাৎ আক্রমণ হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। তার উদ্দেশ্য ছিল কাফির মুশরিকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা এবং ইসলামের শান-শওকত ও কর্মতৎপরতার প্রকাশ আর এসব ছোটখাট লড়াই-সংঘর্ষ ও হঠাৎ আক্রমণ থেকে এর পুরো ফায়দা পাওয়া যায়।

এই সুযোগে আমরা বিশেষভাবে আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা)-এর সারিয়্যার কথা উল্লেখ করব। এই সারিয়্যা সম্পর্কে একটি আয়াতও নাযিল হয়েছিল। তাছাড়া এ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ হাকীকতের ওপরও আলোকপাত ঘটবে, কুরআন মজীদ মুসলমানদের কোন অন্যায়, বিচ্যুতি ও ভুলকে সমর্থন করে না, বরং সে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও দল সম্বন্ধে কোন ফয়সালা দেবার ও রায় কায়েম করবার ক্ষেত্রে ইনসাফের তুলাদণ্ডে প্রতিটি কাজ ওজন করে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে পেশ করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে আবদুল্লাহ ইবন জাহশ আল-আসাদী (রা)-কে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন এবং সাথে মুহাজিরদের আটজনকে পাঠান। তিনি তাঁকে একটি লিখিত পত্র দেন এবং নির্দেশ দেন, এই পত্র এখন খুলবে না। দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর পত্র খুলবে এবং পাঠ করবে। এরপর পত্রে লিখিত নির্দেশ পালন করবে, কিন্তু সাথীদের কাউকে সেই নির্দেশ পালনে বাধ্য করবে না।

'আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) দু'দিনের পথ অতিক্রম করে পত্র খুললেন এবং দেখতে পেলেন, এতে লেখা রয়েছে, যখন তোমরা এই পত্র দেখবে তখন সামনে এগিয়ে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে নাখলিস্তান (দ্রাক্ষাকুঞ্জ) গিয়ে অবতরণ

---

১. বিস্তারিত যাদু'ল মাআদ দ্র.।

করবে। সেখান থেকে কুরায়শদের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে এবং আমাদেরকে তাদের খবরাখবর পাঠাতে থাকবে। 'আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) পত্র পাঠ করে বললেন, سمعاً وطاعة আমার মনিবের হুকুম আমার চোখের মণিতুল্য। এরপর তিনি নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সামনে এগিয়ে গিয়ে আমরা যেন নাখলিস্তানে অবতরণ করি। সেখান থেকে কুরায়শদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখি এবং সেসব খবর তাঁকে জানাই। তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে আমি কেন কাউকে বাধ্য না করি! এখন তোমাদের মধ্যে যার শাহাদতের প্রতি সুতীব্র আগ্রহ ও বাসনা রয়েছে সে আমাদের সঙ্গে আসবে, আর যে তা চাও না সে ফিরে যাও। অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আমাকে যে কোন মূল্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুকুম তামিল করতেই হবে। এরপর তিনি সামনে রওয়ানা হলেন। তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীই তাঁর সাথে থেকেছেন, পেছনে থাকতে একজনও রাজি হননি।

সামনে এগিয়ে গিয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা নাখলিস্তানে অবস্থান নিলেন। ইতোমধ্যে একটি কুরায়শ কাফেলা সেখান দিয়ে অতিক্রম করে। এই কাফেলায় আরম ইবনুল-হাদরামীও ছিল। কুরায়শ এই কাফেলা দেখে ভয় পেয়ে যায়। তাদের ছাউনিও কাছাকাছিই ছিল। ইতোমধ্যে 'উক্কাশা ইবন মিহসান, যার মাথা ছিল ন্যাড়া, মাথা তুলে চাইল। কুরায়শরা তাকে দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো এবং বলল, ওদের ভয় পাবার কিছু নেই। এরা তো উমরা করতে যাচ্ছে![১] এ ঘটনা ছিল দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসের শেষ তারিখে।[২] এরপর মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল এবং সিদ্ধান্ত হলো, যদি তোমরা এসব কাফিরকে এই রাত্রে ছেড়ে দাও তাহলে এরা মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে এবং তোমাদেরকে সেখানে যেতে বিরত রাখবে। আর যদি তোমরা ওদের সঙ্গে লড়াইয়ে রত হতে চাও তাহলে সম্মানিত ও পবিত্র মাসে যুদ্ধ করতে হয়। এতে সকলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে যায় এবং তাদের এ ধরনের পদক্ষেপে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হয়। অতঃপর তারা নিজেদেরকে উৎসাহিত করে তোলে এবং সবাই একমত হয়, এদের যতজনকে সম্ভব হত্যা করা হবে এবং তাদের মাল-সামান হস্তগত করা হবে।

---

১. আরবরা রজব মাসে উমরা করাকে প্রাধান্য দিত।

২. রজব সম্মানিত চারটি মাসের প্রথম মাস। সম্মানিত এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল এবং জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রথম দিকে আরবরা এ নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলত। বাকি তিন মাস হলো যি'ল-কা'দা, যিল-হাজ্জাহ ও মুহাররাম। জমহুর উলামার মতে এই আয়াত সূরা বারা'আতের নীচের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم তাছাড়া وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة হযরত সাঈদ ইবনুল-মুসায়্যিব (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুসলমানরা কি পবিত্র মাসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে? জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ, পারে। ইসলামী বিজয় অভিযানে ও যুদ্ধ-জিহাদে এরই ওপর আমল করা হতো। ইতিহাসে এটা পাওয়া যায় না, প্রতি বছর এক মাস রজব কিংবা বাকি তিন মাস যুদ্ধ বন্ধ থাকত এবং মুসলিম ফৌজ ছাউনিতে ফিরে আসত।

পর তাঁদের মধ্যে থেকে প্রথমে ওয়াকেদ ইবন আবদুল্লাহ আত-তামীমী (রা) তীর নিক্ষেপ করেন এবং 'আমর ইবনুল-হাদরামীকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দেন। দুজনকে বন্দী করা হয়। 'আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) ও সঙ্গী-সাথীরা কাফেলা ও দুজন বন্দীসহ ফিরে এলেন।

মদীনায় তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হাযির হতেই তিনি তাঁদেরকে বলেন, আমি তোমাদের সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করতে তো বলিনি। এরপর তিনি তাঁদের আনীত কোন জিনিস গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন যা তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমাত) হিসাবে এনেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁদেরকে একথা বললেন, তখন তো তাঁদের হাত-পা ফুলতে শুরু করল এবং তাঁদের আশঙ্কা হলো, এখন তাঁদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। অপরদিকে মুসলমানরাও তাঁদের খুব ভাল-মন্দ বলল এবং বকাবকি করল। কুরায়শরা বলল, নাও! মুহাম্মদ তো সম্মানিত ও নিষিদ্ধ মাসেও যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত জায়েয করে দিল! এ সময় আল্লাহ নিচের আয়াত নাযিল করলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করাও কুফরী করা, মসজিদুল-হারামের পথে বাধা দেয়া ও সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ফেতনা হত্যা অপেক্ষাও বড় পাপ।" [সূরা বাকারা : ২১৭ আয়াত]

আল্লামা ইবনুল-কায়্যিম 'যাদুল-মাআদ" গ্রন্থে লেখেন :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপন দোস্ত ও দুশমনের মধ্যেও আদল ও ইনসাফ করেছেন এবং আপন মকবুল ও পছন্দনীয় বান্দাদের এই সম্মানিত মাসে গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে সমর্থন করেননি, বরং একে এক গুরুতর বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে এও প্রকাশ করে দিলেন, তাদের দুশমন মুশরিকরা সম্মানিত মাসে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য, বিশেষ করে এ অবস্থায় যে, তাঁর মকবুল বান্দারা এ ক্ষেত্রে ভিন্নতর ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। বলা যায়, তাদের এ ব্যাপারে এক ধরনের বিচ্যুতি

হয়েছিল যা আল্লাহ তাআলা তৌহিদী আকীদা, আনুগত্য ও ইবাদত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হিজরত ও আল্লাহর জন্য কুরবানীর বদৌলতে ক্ষমা করেছিলেন।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-আবওয়া' যুদ্ধে[২] যাকে বুওয়াত-ও বলা হয়, স্বয়ং শরীক হয়েছেন। এটা ছিল তাঁর প্রথম যুদ্ধ। এটি যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়নি। তারপর তিনি ফিরে আসেন। এরপর কয়েকটি ছোটখাট ও বড় ধরনের যুদ্ধ হয়।

সিয়াম ফরয হলো

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস যখন মুসলমানদের অন্তরে খুব দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল তখন সালাতের জন্য তাঁদের ইচ্ছা পুরোপুরি সৃষ্টি হলো। আর তা বৃদ্ধি পেতে পেতে ইশক বা ভালবাসার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল এবং তাঁদের মধ্যে শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও আল্লাহর নির্দেশ পালন করার এমন এক মন ও মেযাজ সৃষ্টি হয়ে গেল যে, মনে হচ্ছিল তারা যেন ঐ সব হুকুম-আহকামের অপেক্ষায় থাকেন তখন আল্লাহ তায়ালা সিয়ামের হুকুম নাযিল করলেন,

এটি হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষের ঘটনা। এ সময় এই আয়াত নাযিল হলো :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম (রোযা) ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" [সূরা বাকারা : ১৮৩ আয়াত]

দ্বিতীয় এই আয়াত নাযিল হয় :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْنَ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

"রমযান মাসই হলো সেই মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য হেদায়াত ও সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পাবে সে এই মাসের সিয়াম পালন করবে।"[৩] [সূরা বাকারা : ১৮৫ আয়াত]

---

১. যাদুল-মআদ, ১ম খ., ৩৪১ পৃ.।

২. বিস্তারিত সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৫৯।

৩. সিয়ামের গূঢ় তত্ত্ব, হুকুম, এর শরঈ গুরুত্ব বিস্তারিত জানার জন্য 'আরকানে আরবা'আ পড়ুন।

বদর যুদ্ধ : ২য় হিজরী

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব

হিজরতের দ্বিতীয় বছর রমযান মাসে বদরের সেই চূড়ান্ত ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুদ্ধ হয় যে যুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্য ও দাওয়াতে হকের ভবিষ্যতের ফয়সালা হয় যার ওপর গোটা মানব জাতির ভাগ্য নির্ভর করছিল।

এরপর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা যত বিজয় ও সাফল্য অর্জন করেছে, তাদের আজতক যতগুলো সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে, তার সবই এ প্রকাশ্য ও অবধারিত বিজয়েরই নিকট ঋণী যা বদর প্রান্তরে সেই মুষ্টিমেয় দল লাভ করেছিল। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা এই যুদ্ধকে 'য়াওমুল-ফুরকান' বা ফয়সালার দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ.

"যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর ওপর এবং সে বিষয়ের ওপর যা আমি তোমাদের বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে যে দিন সম্মুখীন হয়ে যায় সেনাদল।" [সূরা আনফাল : ৪১ আয়াত]

এই যুদ্ধের পেছনের কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, আবূ সুফিয়ান সিরিয়া থেকে কুরায়শদের এক বিরাট তেজারতী কাফেলা নিয়ে মক্কা যাচ্ছে। কাফেলায় প্রচুর মালমাত্তা ও দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে। এ ছিল এমন এক সময় যখন মুসলমান ও মক্কার মুশরিকদের সাথে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলছিল এবং কুরায়শরা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মুকাবিলা, সত্যের পথে বাধা ও মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন রকমের অসুবিধা সৃষ্টি করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। তারা এজন্য তাদের সকল ধন-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ, সমরোপকরণ ও জরুরী আসবাবপত্র ওয়াকফ করে রেখেছিল এবং তাদের সামরিক বাহিনী মদীনার সীমান্তে ও চারণক্ষেত্রগুলো পর্যন্ত পৌছে যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন, আবূ সুফিয়ান, ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমন, এত বড় এক বিরাট কাফেলাসহ আসছে তখন তিনি লোকদেরকে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এর জন্য তিনি খুব বেশি ব্যবস্থা ও চিন্তা-ভাবনা করেননি এজন্য যে, আর যা-ই হোক, এটি একটি বাণিজ্যিক কাফেলা বৈ তো নয়, কোন সামরিক অভিযানে বের হওয়া সেনাদল তো নয়!

ওদিকে আবূ সুফিয়ান সংবাদ পেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কাফেলার মুকাবিলার জন্য মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছেন তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তার দূত মক্কায় পাঠায় এবং কুরায়শদের কাছে এই মর্মে ফরিয়াদ জানায়, তারা যেন তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে এবং মুসলমানদেরকে সামনে এগিয়ে আসার পথে বাধা দেয়। আবূ সুফিয়ানের এই ফরিয়াদ মক্কায় পৌঁছতেই কুরায়শরা পুরোপুরি সমর প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে এবং খুব দ্রুত এক বিপুল বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। কুরায়শ নেতৃদের মধ্যে এমন কোন নেতা ছিল না যে এতে শরীক ছিল না। তারা পাশের সকল গোত্রকেই এতে শরীক করে। কুরায়শদের বিভিন্ন শাখার লোক এতে শামিল ছিল। এমন কেউ ছিল না যে এতে শরীক না হয়েছে। এই বাহিনী বিরাট জাঁকজমক, অহঙ্কার, ক্রোধ ও প্রতিশোধমূলক আবেগ-উত্তেজনাসহ রওয়ানা হয়।

আনসারদের প্রস্তাব এবং তাঁদের আনুগত্য ও প্রাণোৎসর্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানতে পারলেন, কুররায়শদের এক বিরাট বাহিনী রওয়ানা হয়েছে তখন তিনি সাথী সাহাবীদেরকে নিয়ে পরামর্শ করলেন। সে সময় তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আনসারদের দিকে এজন্য যে, তিনি আনসারদের থেকে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা মদীনায় তাঁকে পূর্ণ হেফাজত ও সাহায্য করবেন। মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি এটা জানতে চান, এই মুহূর্তে আনসাররা কী চিন্তা করছে? সবার আগে মুহাজিররা নিজেদের কথা বললেন এবং খুব ভালভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজেদের সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাস দিলেন। তিনি আবার পরামর্শ চাইলেন মুহাজিরগণ আবারও তাঁকে সমর্থন দান করেন। এরপর তিনি যখন তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন তখন আসনারগণ বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিজ্ঞাসার লক্ষ্য আনসারদের দিকে।

অতঃপর হযরত সা'দ ইবনু মু'আয (রা) তাৎক্ষণিক জওয়াব দান করেন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত আপনার কথার লক্ষ্যবস্তু আমরা এবং আপনি আমাদের কথা শুনতে চাচ্ছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! খুব সম্ভব আপনার এই ধারণা হচ্ছে, আনসাররা তাদের স্বদেশে ও নিজেদের ভূখণ্ডে আপনাকে সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আমি আনসারদের পক্ষ থেকে বিনীত নিবেদন পেশ করছি এবং তাদের পক্ষ থেকে বলছি, আপনি যেখানে খুশি চলুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক স্থাপন করুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন, আমাদের ধন-সম্পদ যত খুশি গ্রহণ করুন এবং যত খুশি আমাদেরকে দান করুন আর তা এজন্য যে, আপনি যা-ই কিছু গ্রহণ করবেন তা আপনি যা বর্জন করবেন তার তুলনায় আমাদের নিকট অনেক বেশি প্রিয় হবে। আপনি যা হুকুম করবেন আমরা তা নত মস্তকে মেনে নেব। আল্লাহর কসম! আপনি যদি চলা শুরু করেন, এমন কি 'বারকু

গামদান'[1] পর্যন্তও পৌঁছে যান তবু আমরা আপনার সঙ্গে চলতে থাকব। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আপনি যদি এই সমুদ্রেও প্রবেশ করেন সে ক্ষেত্রে আমরাও আপনার সঙ্গে সমুদ্রেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।

হযরত মিকদাদ (রা) বলেন, আমরা আপনাকে তেমন কথা বলব না যে কথা মূসা (আ)-এর কওম তাঁকে বলেছিল,

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ.

"যাও, তুমি ও তোমার রব উভয়ে মিলে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।"[2] আমরা তো আপনার ডাইনে লড়ব, বামে লড়ব, আপনার সামনে লড়ব এবং আপনার পেছনেও লড়ব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারক এ কথা শুনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাহাবাদের মুখ থেকে উচ্চারিত এসব কথায় তিনি খুবই খুশি হন। এরপর তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বলেন, سيروا وابشروا চল এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।"[3]

জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি বালকদের আগ্রহ

মুজাহিদগণ বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলে 'উমায়র ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) নামক এক বালক, যাঁর বয়স তখন ষোল বছর, মুজাহিদদের সঙ্গে রওয়ানা হন। তাঁর ভয় ছিল, না জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অল্প বয়স্ক ভেবে ফেরত দেন! এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে ধরা পড়া থেকে বাঁচতে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁকে লুকিয়ে বেড়াবার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি তাঁর ভয়ের কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন, আমি এই জিহাদে শরীক হতে চাই। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমাকেও শাহাদাত দান করবেন। তাঁর আশঙ্কাই অবশেষে সত্য হয়ে দেখা দিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধারণায়, সে এখনও যুদ্ধের বয়সে পৌঁছেনি, তাঁকে ফেরত পাঠাতে চান। এতে তিনি কাঁদতে থাকেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিভূত হন এবং তাঁকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি এই যুদ্ধেই শাহাদাত লাভ করেন এবং আপন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেন।[4]

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৩৭২ পৃ., সীরাত ইবন হিশামে বারকু গামাদানের বদলে "বারকুল-গিমাদ" বলা হয়েছে। এটি য়ামানের একটি জায়গার নাম। এটি ভাষ্যমতে এটি হিজর (ছামুদ গোত্রের বস্তি)-এর একটি দূরদরাজ এলাকা। সুহায়লী (ইবন হিশামের ভাষ্যকার) বলেন, আমি তাফসীরের কিছু কিছু কিতাবে দেখেছি, এটি আবিসিনিয়ার একটি শহর। যা-ই হোক, এটি এমন এক শহর যা মদীনা তায়্যিবাহ থেকে অনেক দূরে এবং দূরবর্তী এলাকা হিসাবে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। যেমন আমরা বলে থাকি, কালাপানির দ্বীপান্তর, কোহকাফ শহর ইত্যাদি।

২. সূরা মাইদা, ২৪ আয়াত।

৩. যাদুল-মা'আদ, ১ম খ., ৩৪২-৪৩ পৃ., সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৬১৪ পৃ., বুখারী ও মুসলিম।

৪. উসদুল গাবা, ৪র্থ খ., ১৪৮ পৃ.।

মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে সামরিক শক্তির পার্থক্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত বেগে যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ৩১৩ জন মুসলমান। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা থেকেই অনুমান করা যাবে, মুসলিম মুজাহিদদের নিকট কেবল দু'টি ঘোড়া ও সত্তরটি উট ছিল। এক একটি উটের পিঠে দু'জন তিনজন করে পালক্রমে বসেছিলেন।[১] এ ক্ষেত্রে কি সেনাপতি আর সাধারণ সৈনিক, অফিসার কিংবা অধীনস্থ সেপাইয়ের কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। এমন ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হযরত আবূ বকর, ওমর (রা) ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম সকলেই শরীক ছিলেন।

জিহাদের সাধারণ পতাকা (لواء) মুসআব ইবন উমায়র (রা)-কে, মুহাজিরদের পতাকা (راية) হযরত আলী (রা) ও আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-কে প্রদান করা হয়।

আবূ সুফিয়ান যখন জানতে পেল, মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেছে তখন তিনি নিচের সমুদ্র তীরের দিকে চলে যায় এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে যে, এখন আর তার কোনরূপ ভয়-ভীতির আশঙ্কা নেই আর কাফেলাও নিরাপদ, কুরায়শদেরকে এই পয়গাম পাঠায়, তোমরা এখন ফিরে যাও। যে কাফেলার নিরাপত্তা বিধানের জন্য তোমরা এসেছিলে সে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। এটা শুনে মক্কী বাহিনীর লোকজন ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু আবূ জাহল ফিরে যেতে অস্বীকার করল এবং অন্যদেরকেও ফিরতে বাধা দিল। সে যুদ্ধ করা ছাড়া ফিরে যেতে কিছুতেই রাজী ছিল না।[২] কুরায়শ ফৌজের সংখ্যা ছিল এক হাজারের ওপর আর এর মধ্যে নির্বাচিত সমস্ত বড় সর্দার, যুদ্ধবাজ যুবক, সমীহ করার মত ঘোড়সওয়ার ও অভিজ্ঞ সিপাহী শামিল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে বলেন, মক্কা তার সমস্ত কলিজার টুকরোগুলোকে আজ তোমাদের সামনে নিক্ষেপ করেছে।

পরামর্শের গুরুত্ব

কুরায়শ বাহিনীর বদর প্রান্তরে পৌঁছে উপত্যকার একদিকে ছাউনি ফেলল আর মুসলমানরা শিবির স্থাপন করল অপরদিকে। এরই মাঝে হযরত হুবাব ইবনুল-মুনযির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মনযিল, আমরা যে শিবির স্থাপন করেছি তা কি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে যার মধ্যে কোন প্রকার রদবদল আমাদের জন্য অনুমোদিত নয়, নাকি এ সিদ্ধান্ত সামরিক কর্ম-কৌশল, তদবীর ও কুশলী ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, এতো কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপার আর

---

১. যাদুলমাআদ, ১ম খ., ৩৪২ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ৩৪৩ পৃ. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৬১৮-১৯ পৃ.।

ক্ষেত্রে শত্রুর চোখে ধুলো দেবার সকল ব্যবস্থাই করা যেতে পারে। তিনি বললেন, তাহলে হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিনীত নিবেদন পেশ করব, এখানে শিবির স্থাপন সেই দিক থেকে উপযোগী নয়। তিনি অন্য এক জায়গা চিহ্নিত করলেন যা যুদ্ধের জন্য অধিকতর উপযোগী ও অনুকূল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা বলেছ। এরপর তিনি তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে সেদিকে চললেন এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। জায়গাটা ছিল পানির কাছাকাছি।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রাত পর্যন্ত সবার আগে পানির কাছে পৌঁছে গেলেন এবং এর হাওজ তৈরি করলেন। তিনি কাফিরদেরকেও পানি পানের অনুমতি দিলেন।[২]

এই রাতে আল্লাহ বৃষ্টির ব্যবস্থাও করে দিলেন যা কাফির মুশরিকদের জন্য দুর্ভোগ ও দুরবস্থা ডেকে আনল। ফলে তাদের এগুনোটা থেমে গেল। মুসলমানদের জন্য এই বৃষ্টি রহমতের বারিধারা হিসাবে প্রমাণিত হলো। বৃষ্টি প্রান্তরের বালুকণাগুলোকে আরও বেশি শক্ত ও দৃঢ় করে দিল এবং তাদের মনমানস শান্ত ও ভয়শূন্যতা দিয়ে পুরো করলেন। আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامُ.

"আর তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন যাতে তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমরাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা আর যাতে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের পা গুলো।" [সূরা আনফাল : ১১ আয়াত]

সিপাহসালার হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ

এ সময় তিনি অস্বাভাবিক ও অতুলনীয় নেতাসুলভ যোগ্যতা (তাঁর চিরন্তন ও বিশ্বজয়ী রিসালাতের সঙ্গে যা সমঞ্জস, এ সবের বুনিয়াদ এবং ইলহাম ও হেদায়াতের উৎস) পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য ও প্রভার সঙ্গে দীপ্ত ছিল। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কাতারবন্দী ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, বিপদ ও হঠাৎ হামলা রোধের কৌশল, শত্রুর সামরিক শক্তি, তাদের সৈন্যসংখ্যা, ছাউনি ও বিভিন্ন প্লাটুনের অবস্থানের সঠিক পরিমাপ,

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৬২০।

২. প্রাগুক্ত, ৬২২, সংক্ষেপে।

এগুলো ছিল সেই সব জিনিস যেগুলো থেকে তাঁর অস্বাভাবিক সামরিক মেধার পরিচয় মেলে। এর প্রয়োজনীয় বিস্তৃত বিবরণ সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।[১]

সমর প্রস্তুতি

মহানবী ﷺ-এর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের সামনে একটি টিলার ওপর ছাউনি ফেলা হয়। এরপর তিনি ময়দানে যান এবং জায়গায় জায়গায় হাত দিয়ে ইশারায় বলতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ, এখানে অমুক মারা যাবে, এখানে অমুকের পতন হবে, এই স্থানে অমুক নিহত হবে। একটি জায়গায়ও এর বিপরীত ঘটেনি এবং তিনি যা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়, এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি। যে জায়গা তিনি চিহ্নিত করেছিলেন তার আদৌ হেরফের হয়নি।

উভয় বাহিনী সামনাসামনি হতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ! এই কুরায়শ-এর লোকেরা আজ পুরো অহঙ্কার নিয়ে ও গর্বভরে এসেছে। এরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে।

রাতটা ছিল জুমু'আর এবং রমযানের ১৭ তারিখ। ভোর হতেই কুরায়শ বাহিনী সকল প্রকার সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ময়দানে এসে হাযির হয় এবং পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

দরবারে ইলাহীতে কান্নাকাটি, দু'আ ও মুনাজাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতার ঠিক করেন। এরপর ঠিক 'আরীশে ফিরে আসা সাথে আবূ বকর (রা)-ও ছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি, দু'আ ও মুনাজাত পেশের ব্যাপারে কোনরূপ কার্পণ্য করেননি। তিনি বেশ ভালই জানতেন, আজ যদি মুসলমানদের ভাগ্যে ফয়সালা সংখ্যা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে হয় তাহলে এর ফল কি দাঁড়াবে। এ সেই ফল যা কোন শক্তিশালী, শক্তিধর ও বিরাট জামা'আতের মুকাবিলায় কমজোর ও স্বল্প সংখ্যার অধিকারী দলের ক্ষেত্রে সব সময় ঘটে থাকে। তিনি যখন নিক্তির উভয় পাল্লার দিকে দৃষ্টি ফেললেন তখন পরিষ্কার দেখতে পেলেন, কাফির-মুশরিকদের পাল্লা ভারী। উভয়ের মাঝে কোন তুলনাই চলে না। তিনি মুসলমানদের পাল্লার ওপর সেই প্রস্তর খণ্ডটি স্থাপন করলেন যার ফলে মুসলমানদের পাল্লা হঠাৎই ভারী হয়ে গেল। তিনি মহান শাহানশাহ রাজাধিরাজের দরবারে আপন ফরিয়াদ পেশ করলেন এবং তাঁর সাহায্য-সমর্থনের প্রার্থী হলেন যাঁর ফয়সালা ও নির্দেশ কেউ উপেক্ষা করতে পারে না, পারে না টলিয়ে দিতে। তিনি এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর (যে বাহিনী সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম থেকে ছিল বঞ্চিত) অনুকূলে আল্লাহ তা'আলার সুপারিশ করলেন। তিনি বললেন,

১. বদর যুদ্ধে তিনি যে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ ও যে কুশলী সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ জে. আকবর খানের 'হাদীছে দেফা' (মহানবীর প্রতিরক্ষা কৌশল নামে প্রকাশিত) এবং ইরাকী জেনারেল মাহমুদ শীছ খাত্তাব-এর الرسول القائد নামে গ্রন্থে দেখুন।

اللهم ان تهلك هذه العصابة لاتعبد بعدها فى الارض.

"হে আল্লাহ! যদি তুমি এই ক্ষুদ্র জামা'আতটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত করবার কেউ থাকবে না।" তিনি আত্মবিস্মৃত প্রায় ও বেকারার অবস্থায় আল্লাহতায়ালার দরবারে দু'আ করছিলেন আর বলছিলেন :

اللهم انجزنى ما وعدتنى اللهم نصرك.

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ কর! আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য চাই; তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন।

তিনি তাঁর দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করছিলেন, এমন কি তাঁর পবিত্র কাঁধ থেকে চাদর গড়িয়ে পড়ে। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এবং আশ্বস্ত করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এত বেশী ক্রন্দন ও বেকারার অবস্থা দেখতে ও সইতে পারতেন না।[১]

উম্মতের সঠিক পরিচয় এবং তার আসল অবস্থান ও পয়গাম নির্ধারণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সব কয়েকটি, পবিত্র আত্মার জন্য এই নাযুক ও সঙ্কটময় মুহূর্তে যেই সংক্ষিপ্ত শব্দসহকারে দু'আ করেছেন তার ভেতর তাঁর চিত্তহারী মিষ্ট বচন ও আস্থা, অশান্তি ও অস্থিরতা, আত্মিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি এবং নম্রতা ও বিনয়ের সমস্ত দিক একই সঙ্গে মুক্ত ও বিকশিত ছিল। এটাই এই উম্মতের সঠিক ও সর্বোত্তম পরিচয়, পৃথিবীর জাতিগোষ্ঠীসমূহের মাঝে তার আসল অবস্থান, তার মর্যাদা ও পয়গাম, দুনিয়ায় তার মূল্যায়ন, তার উপকারিতা ও প্রয়োজনের পূর্ণ বিশ্লেষণ, নির্দিষ্ট করে তা চিহ্নিত করা–এসব কথার ঘোষণা ছিল, এই উম্মত যে সীমান্ত ও যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে আদিষ্ট ছিল তা ছিল আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান ও ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত ও পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে।

এই ফাতহুম-মুবীন বা নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট বিজয় (যা সকল প্রকার অনুমান-অনুমান ও অভিজ্ঞতাকে ভুল প্রমাণিত করে) তাঁর সেই সব বাণীর ওপর চিরদিনের জন্য সমর্থনে মোহর মেরে দেয় এবং এর বাস্তব ও কার্যকর প্রমাণ দেয়, তাঁর এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক ছিল। আর এই উম্মাহর সঠিক, সত্য ও উজ্জ্বল চিত্র এটাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাবাহিনীর সামনে তশরীফ নিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও শাহাদাত লাভের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। ইতোমধ্যে উৎবা ইবন রবী'আ, ভ্রাতা শায়বা ও পুত্র ওয়ালীদ সামনে এগিয়ে এলো এবং কাতারের

১. দেখুন যাদু'ল মা'আদ।

মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তারা প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করল। এর জওয়াবে আনসারদের মধ্যে থেকে তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে গেল। তাঁদের দেখে তারা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা? তাঁরা জানালেন, আমরা আনসার। বলল, তোমরা শরীফ মানুষ বটে, তবে আমাদের সমপর্যায়ের নও। আমাদের মুকাবিলায় আমাদের ভাই-ভাতিজা (কুরায়শ)-দের মধ্য থেকে কাউকে পাঠাও। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উবায়দা ইবনুল-হারিছ, হামযা ও আলী (রা)! ওদের মুকাবিলায় তোমরা তিনজন অগ্রসর হও। এঁদেরকে দেখে তারা আশ্বস্ত হলো এবং বলল : হ্যাঁ, এবার আমাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মিলেছে। এরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বটে!

প্রথমে এঁদের মধ্য থেকে প্রবীণতম হযরত উবায়দা ইবনু'ল-হারিছ (রা.) চীৎকার করে উৎবাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। হযরত হামযা (রা) শায়বাকে ও হযরত আলী (রা) ওয়ালীদ ইবন উৎবাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। অতঃপর হযরত হামযা ও আলী (রা) আপন আপন প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহূর্তের মধ্যেই ধরাশায়ী ও নিহত করেন। হযরত উবায়দা (রা) ও উৎবার মধ্যে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। কিন্তু চূড়ান্ত ফয়সালা ঘটতে বিলম্ব হচ্ছিল বলে হযরত হামযা ও হযরত আলী (রা) স্ব স্ব তলোয়ার হস্তে উৎবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে হত্যা করেন। অতঃপর আহত হযরত উবাদা (রা)-কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে আনেন। আঘাত মারাত্মক ছিল বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১]

যুদ্ধের সূচনা

এর পরপরই উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ সময় মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এগিয়ে যাও সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান-যমীন বরাবর।

প্রথম শহীদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যবান মুবারকে এ কথা উচ্চারিত হতেই হযরত উমায়র ইবনুল-হুমাম আনসারী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই জান্নাত কি আসমান ও যমীন বরাবর? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এতে উমায়র (রা) বলে উঠলেন, বাহ! বাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, এ তুমি কী বলছ? উমায়র (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! না, অন্য কিছু নয়। আমি এই ধারণার বশে বলছি যাতে এই জান্নাত আমার ভাগ্যে জুটে যায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এই জান্নাত লাভ করবে। এরপর উমায়র (রা) তাঁর তূণীর থেকে কিছু খেজুর বের করলেন এবং খেতে লাগলেন। এরপর হঠাৎ করেই বলে উঠলেন, যদি আমি এই

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৬২৫ পৃ.।

...গুলো শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলে অনেক বেশি দেরী হয়ে যাবে। ...বেঁচে থাকার মত ধৈর্য আমার নেই। এই বলে বাকী খেজুরগুলো তিনি ...ফেলে দিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে ...লেন। বদর যুদ্ধে তিনিই ছিলেন প্রথম শহীদ।[১]

অপরদিকে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ কাতারবন্দী অবস্থায় সীসা ঢালা প্রাচীরের মতই ...র বাহিনীর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন। ধৈর্য ও দৃঢ়তার তাঁরা প্রতিমূর্তি, দিল ...দের আল্লাহর স্মরণে মশগুল, আর যবান তাঁরই যিকর ও তসবীহ পাঠে সিক্ত। ...ল্লাহ ﷺ পুরোপুরিভাবে যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ছিলেন শত্রুর সবচেয়ে ...কাছি এবং তাঁর চেয়ে বেশি বীর বাহাদুর সে সময় আর কাউকে চোখে পড়ত ... আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের জন্য ফেরেস্তা প্রেরণ করেন এবং তাঁরা ...রিকদেরকে তছনছ করে ছাড়েন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.

"আর স্মরণ কর, যখন তোমার প্রভু প্রতিপালক নির্দেশ দান করেন ...রেশতাদেরকে, আমি সাথে আছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের ...চলিত রাখ; আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেব। সুতরাং তদের ...নের ওপর আঘাত হান এবং আঘাত হান তাদের সর্বাঙ্গে।"

[সূরা আনফাল : ১২ আয়াত]

...দের প্রতি ও শাহাদাত লাভের ব্যাপারে দুই ভাইয়ের প্রতিযোগিতা

আজ প্রতিযোগিতা চলছিল শাহাদাতের মাধ্যমে অনন্ত সৌভাগ্য লাভের আশায় ... এ প্রতিযোগিতা চলছিল রক্ত সম্বন্ধীয় ভাইও হৃদয়ের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ ...দের মধ্যে। হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধে আমি ...মার বাহিনীর মধ্যে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ চোখ তুলতেই ...তে পেলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক তরুণ। এ দু'জন তরুণকে ... আমি খুব আশ্বস্ত হতে পারলাম না।[৩] আমি চিন্তা করছিলাম। এমন সময়ে ... দু'জনের একজন তার সাথীর অগোচরে আমার কানের কাছে এসে চুপিসারে

...দুল মা'আদ, ১ম খ., ৩৪৫; সীরাত ইবন কাছির, ২য় খ., ৪২১।

...প্রাগুক্ত, ২য় খ., ৪২৫।

...যদি সংকট মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয় তাহলে এ দু'জন তরুণ আমার কোন্ সাহায্যে আসবে?

বলল, চাচা! আমাকে একটু আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, তা তোমার কি দরকার? সে বলল, আমি আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাকে যেখানেই দেখতে পাই অমনি তার কম্ম সাবাড় করব, অন্যথায় নিজের জীবন বিলিয়ে দেব। অপরজনও তেমনি চুপিসারে একই কথা আমার কানে কানে বলল। হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) বলেন, আমি আবূ জাহলের দিকে কেবলই ইশারা করেছি অমনি তরুণ দু'জন বাজ পাখীর মতই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সেখানেই তাকে লাশে পরিণত করল। তরুণ দু'জন ছিল 'আফরার কলিজার টুকরো নয়নের পুত্তলি।[১]

আবূ জাহলের পতন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আবূ জাহল ছিল এই উম্মতের ফেরাউন।[২]

প্রকাশ্য ও নিশ্চিত বিজয়

এই যুদ্ধ মুসলমানদের প্রকাশ্য ও নিশ্চিত বিজয় এবং কাফির-মুশরিকদের লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয়ের ভেতর দিয়ে শেষ হলে রাসূলূল্লাহ ﷺ বলেন :

الحمد لله الذى صدق وعده ونصر وهزم الاحزاب وحد -

"আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দল ও গোষ্ঠীকে পরাভূত করেছেন।"

কুরআন মজীদের নিচের আয়াত ওপরের অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় তোমরা ছিলে অসহায়। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।" [সূরা আল-ইমরান : ১২৩ আয়াত]

যুদ্ধের শেষে নিহত কাফিরদের লাশগুলো বদর প্রান্তরের গভীর কুয়াগুলোতে নিক্ষেপের জন্য রাসূল ﷺ নির্দেশ দেন। নিক্ষেপ করার পর তিনি সেখানে গেলেন এবং কুয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিহতদের লক্ষ্য করে বলেন, ওহে কুয়ার অধিবাসীরা! তোমাদের প্রভু প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তা কি সত্য পেয়েছ? আমার প্রভু আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আমি সম্পূর্ণই সত্য পেয়েছি।

১. বুখারী ও মুসলিম; কথাগুলো সহীহ বুখারীর (কিতাবুল-মাগাযী, বদর যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়)।

২. সীরাত ইবন কাছীর, ২য় খ., ৪৪৪ পৃ.।

এই যুদ্ধে কাফিরদের সত্তরজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়।[১]

মুসলমান পক্ষে মুহাজিরদের ছয় ও আনসারদের আটজন শাহাতদ বরণ করেন।[২]

বদর যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে এলেন। এই সাফল্য ও বিজয় লাভের ফলে মদীনা ও তার আশেপাশের এলাকায় তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিপুল সংখ্যক মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে।

এর আগে যুদ্ধের বিজয়বার্তা ঘোষণার জন্য তিনি দু'জন বিশেষ দূত মদীনায় প্রেরণ করেন। এঁদের একজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)। তিনি যুদ্ধের সুখবর শোনাতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে আনসার সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের নিরাপত্তা এবং কাফিরদের হত্যা ও গ্রেফতারী তোমাদের জন্য বরকতময় হোক! কুরায়শদের যেসব নেতা ও বীর পুরুষ এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন, তাঁদের একেকজনের নাম তিনি ঘোষণা করতে থাকেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে এই ঘটনা শোনাতে থাকেন। শিশুরা এসব কাহিনী তাদের সাথে সুর করে ও আগ্রহ ভরে শোনাত, কবিতা পাঠ করত এবং গান গাইত। কিছু কিছু লোক এ সব সংবাদের সত্যতায় বিশ্বাসী ছিল আর কিছু লোক ছিল সন্দিহান ও দ্বিধান্বিত। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর বন্দীদেরকে নিয়ে আসা হয়। এসব কয়েদীর তত্ত্বাবধানে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোলাম শুকরান।[৩] তিনি যখন রাওহা নামক স্থানে পৌছলেন তখন মুসলমানরা ফিরে আসেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, তাঁকে ও সঙ্গী মুসলমানদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় ও গৌরবান্বিত করেছিলেন, মুবারকবাদ পেশ করেন।

ওদিকে মক্কার মুশরিকদের ঘরে ঘরে শোকের মাতম উঠল এবং নিহতদের জন্য কান্নার রোল পড়ে গেল।[৪] ইসলামের শত্রুদের অন্তরে মুসলমাদের ভীতিকর প্রভাব পড়ল। আবূ সুফিয়ান মানত করল, যতদিন না রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে প্রতিশোধ নেবে ততদিন সে গোসল তো দূরের কথা, মাথায় এক ফোঁটা পানিও ঢালবে না। মক্কার দুর্বল ও অসহায় মুসলমানগণ

---

১. বুখারী, বারাআ ইবন আযিব (রা) বর্ণিত।

২. সীরাত ইবন কাছির, ২য় খ., ৪৬৩ পৃ.।

৩. সীরাত ইবন কাছীর, ২য় খ., ৪৭০-৭৩।

৪. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খ., ৬৪৭-৪৮।

কাফিরদের পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং তাঁরা নিজেদের ভেতর শক্তি ও সম্মানবোধ অনুভব করেন।

ঈমানী সম্পর্ক রক্ত সম্পর্কের উর্ধ্বে

এই যুদ্ধে আবূ 'উযায়র ইবন 'উমায়র ইবন হাশিমকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। সে ছিল হযরত মুস'আব ইবন 'উমায়র (রা)-এর সহোদর ভ্রাতা। মুস'আব ইবন 'উমায়র (রা) ছিলেন এই যুদ্ধে মুসলমানদের পতাকাবাহী। আর তাঁর ভাই ছিল কুরায়শ বাহিনীর পতাকাবাহী।

ঘটনা হলো, একবার হযরত মুস'আব ইবন 'উমায়র (রা) যখন তাঁর ভাইয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি দেখতে পান, একজন আনসারী তাঁর ভাইয়ের হাত বাঁধছে। হযরত মুস'আব (রা) আনসারীকে বললেন, বেশ ভালভাবে কষে বাঁধ। এর মা বিরাট ধনী মহিলা। এর মুক্তিপণ বাবদ বেশ ভাল অংকের টাকা পাবার আশা রয়েছে। এ কথা শুনে আবূ 'উযায়র মুস'আবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ভাই! তুমি ভাই হয়ে তাকে এই পরামর্শ দিচ্ছ? হযরত মুস'আব ইবন 'উমায়র (রা) বললেন, তুমি আমার ভাই নও! আমর ভাই তো সেই যে তোমাকে কষে বাঁধছে।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, استوصوا بهم خيرا। "ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।" আবূ উযায়র বর্ণনা করেন, তারা যখন আমাকে বন্দী করে নিয়ে এল তখন জনৈক আনসারীর ঘরে আমার জায়গা মিলল। তারা আমাকে দুই বেলা রুটি খেতে দিত আর নিজেরা খেজুর খেয়ে থাকত। এ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপদেশ ও নির্দেশেরই ফল। কেউ কোথাও থেকে এক টুকরো রুটি পেলেও তা আমাকে এনে দিত। আমার লজ্জা লাগত তা গ্রহণ করতে, তাই আমি তা ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তারা আমাকে জোর করে দিত এবং নিজেরা তা হাত দিয়েও ধরত না।[২]

এসব যুদ্ধবন্দীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা 'আব্বাস ইবন আবদি'ল-মুত্তালিবও ছিলেন, ছিলেন চাচার ছেলে 'আকীল ইবন আবী তালিবও। তাঁর কন্যা হযরত যয়নব (রা)-এর স্বামী আবূ'ল-আস ইবনুর-রবীও ছিলেন। এঁদের সঙ্গে কোনরূপ বিশেষ ব্যবহার করা হয়নি। সাধারণ যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল এঁদের সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করা হয়।

---

১. সীরাত ইবন কাছীর, ২য় খ. ৪৭৫ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩২ পৃ.।

বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাবার বিনিময়ে বন্দী মুক্তি

বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষমা করেন এবং তাদের মুক্তিপণ গ্রহণ করেন। যে যে রকম ধনী ও বিত্তবান ছিল তার মুক্তিপণও ছিল সেই অনুপাতে। যার দেবার মত কিছুই ছিল না তাকে বিনা পণেই মুক্তি দেয়া হয়। মোটের ওপর কুরায়শরা তাদের বহু বন্দীকেই মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্ত করে।

এমন কিছু সংখ্যক বন্দীও ছিল যাদের মুক্তিপণ দেবার মত কিছু ছিল না। তাদের ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তারা আনসারদের শিশুদেরকে লেখাপড়া শেখাবে।[১] একজন বন্দী দশজন মুসলিমকে লেখাপড়া শেখাবে ঠিক করে দেয়া হয়।[২] হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) এভাবেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। এই নির্দেশে জ্ঞান অর্জনকে যতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং লেখাপড়া শেখাকে যতটা উৎসাহিত করা হয়েছে তা বোঝবার জন্য বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন করবে না।

অপরাপর যুদ্ধ ও ছোটখাটো অভিযান

আগেই বলা হয়েছে, আবূ সুফিয়ান কসম খেয়েছিল, যতদিন না মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না ততদিন মাথায় এক ফোঁটা পানিও ঢালবে না। সে তার কসম পুরো করবার নিয়তে কুরায়শদের দু'শ' অশ্বারোহীসহ আক্রমণের উদ্দেশে বের হয়। বনী নাদীর নেতা সাল্লাম ইবন মাশকামের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতে সে কেবল অনুমতিই দিল না, বরং ডেকে যথাযথ মেহমানদারীও করল এবং মদীনার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁকে জানানও। আবূ সুফিয়ান কিছু লোককে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশে পাঠায় যারা দু'জন আনসারকে শহীদ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামসহ তাদের পিছু ধরার জন্য বের হন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান তার দলবলসহ মুসলমানদের পৌঁছাবার পূর্বেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পেছনে রেখে যায় বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্য যার বেশির ভাগই ছিল ছাতু। এজন্য এই গাযওয়াকে "গাযওয়াতুস সাবীক" বা ছাতুর যুদ্ধও বলে।[৩]

বনী কায়নুকার সঙ্গে ব্যবহার

বনী কায়নুকা ছিল প্রথম ইয়াহূদী গোত্র যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে, মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অবরোধ করেন। পনর রাত এ অবস্থায় কাটে। অবশেষে তারা মাথা নত করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়। বনী কায়নুকার মিত্র আবদুল্লাহ ইবন উবাই (মুনাফিক সর্দার) তাঁর খেদমতে তাদের মধ্যে সুপারিশ

---

১. মুসনাদ আহমাদ, ১ম খ., ২৪৭ পৃ.।

২. তাবাকাত ইবন সা'দ, ২য় খ., ১৪ পৃ.।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৪-৪৫, আরবী ভাষায় ছাতুকে ছাবীক (سويق) বলে।

পেশ করে। তিনি তাদের কথা বিবেচনা করে অবরোধ তুলে নেন।[১] কায়নুকার ছিল সাত শত যুদ্ধবাজ সৈনিক এবং পেশায় এদের অধিকাংশই ছিল স্বর্ণকার ও দোকানদার।[২]

নবী করীম ﷺ ঐ সবই ইয়াহূদীকে এই শর্তে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেন, তারা মদীনা থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। ফলে তাদের বেশির ভাগ লোক পরম নির্ভয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং তাদের অস্থাবর সম্পত্তিও সাথে নিয়ে যায়। বনী কায়নুকা তাদের বিদ্রোহ ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তারা নিরাপদে ইয়াছরিব থেকে চলে যায়।[৩]

কা'ব ইবনুল-আশরাফ ছিল একজন বিরাট ইয়াহূদী সর্দার। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আগাগোড়া কষ্ট দিত এবং অভিজাত মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে গায়কী কবিতা বলত। বদর যুদ্ধের পর সে মক্কায় গিয়ে কাফিরদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করে। এ অবস্থায় সে মদীনায় পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আসার খবর পেয়ে বলেন, কা'ব ইবনুল-আশরাফ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুব কষ্ট দিয়েছে। তার কি কেউ কোন ব্যবস্থা করতে পারে? আনসারদের কিছু লোক এই খেদমত আঞ্জাম দেবার জন্য তক্ষুণি দাঁড়িয়ে গেল এবং তার কম্ম সাবাড় করল।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, ৪৭-৪৯।

২. যাদুল মা'আদ, ১ম খ., ৩৪৮ পৃ.।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৮ পৃ., মন্টগোমারী ওয়াট তাঁর Muhammad Prophet and statesman নামক গ্রন্থে বলেন, "বনী কায়নুকার বহিষ্কার ছিল এমন একটি কাজ যা হযরত (সা)-এর কেন্দ্রকে মজবুত করে। এই বহিষ্কারের পেছনে কায়নুকার ইয়াহূদী ও কতক মুসলিম বণিকদের মধ্যে ঝগড়া কাজ করেছে বলা হয়। এটি মদিনার এক বাজারে ঘটে। মন্টগোমারী ওয়াট এ ব্যাপারেও একমত নন, এই বহিষ্কারের কারণ বনী কায়নুকায় একজন মুসলিম মহিলার ওপর ইয়হূদীদের সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ি ছিল যা সীরাত গ্রন্থসমূহে লিখিত। তিনি লেখেন, মুহাম্মদ (সা) ইয়াহূদীদের বহিষ্কারের পদক্ষেপের কারণ এর চেয়ে গভীর যা সেই সাময়িক ঘটনার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। প্রকৃত কারণ ছিল "ইয়াহূদীদের মুসলিম সমাজ জীবনে মিশে না যাওয়া"।
তিনি আরও লেখেন, মুহাম্মদ (সা) ইয়াহূদী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার কুরায়শদের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও জেনে থাকবেন যা মুসলমানদের ও ইয়াহূদীদের মধ্যে পরস্পরের চুক্তির প্রাণসত্তার পরিপন্থী মনে করা হয়েছে। উস্তাদ মুহাম্মদ আহমদ বাশমীলের বনী কায়নুকা যুদ্ধ দেখুন।

৪. যাদু'ল-মাআদ, ২য় খ., ৩৪৮, সংক্ষেপে।

ওহুদ যুদ্ধ

(শাওয়াল ৩ হি.)

জাহেলী মর্যাদাবোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা

বদর যুদ্ধে কুরায়শদের বড় বড় সর্দার মারা যায় এবং অবশিষ্ট ফৌজ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মক্কার দিকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া মক্কাবাসীদের মন-মানসে তীব্র হয়ে দেখা দেয়। এ পরাজয় তাদের জন্য এক মহাদুর্ঘটনার চেয়ে কম ছিল না। সেসব লোক যাদের বাপ-বেটা ও ভাই মারা গিয়েছিল তারা সকলে আবূ সুফিয়ানের নিকট গিয়ে তার সঙ্গে ও কুরায়শ কাফেলায় যেসব লোকের অংশ ছিল সেসব লোকের সঙ্গেও এ ব্যাপারে পরামর্শ করে এবং তাদের টাকা-পয়সায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে একটি নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। কবিরা নিয়ম মাফিক তাদের আত্মসম্মানে ঘা দিতে শুরু করে এবং তাদের জাহিলী অহংবোধ উস্কে দেয়।

হিজরতের তৃতীয় বর্ষে শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি কুরায়শদের এই বাহিনী পুরো সাজ-সরঞ্জামসহ রওয়ানা হয়। কুরায়শ যুবকদের সঙ্গে অপরাপর গোত্রের লোকেরাও ছিল যারা কুরায়শদেরকে তাদের নেতা হিসাবে মানত। তাদের সঙ্গে মহিলারাও ছিল যাদেরকে এই বাহিনীর সঙ্গে এই উদ্দেশেই পাঠানো হয়েছিল যাতে পুরুষেরা তাদের কারণে পালানোর পথ বেছে না নিতে পারে।[১] কুরায়শ নেতৃবর্গের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা ছিল। মোটের ওপর কুরায়শ বাহিনী রওয়ানা হয় এবং মদীনার সামনে গিয়ে ছাউনি ফেলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিমত ছিল এই, মুসলমানরা মদীনাতেই থাকবে এবং ওদের সঙ্গে কোনরূপ লড়াই-সংঘর্ষে যাবে না। যদি তারা হামলা করেই বসে তাহলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহর ছেড়ে ও মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মুকাবিলায় যেতে পছন্দ করছিলেন না। 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর অভিমতও ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ। কিন্তু কতক মুসলমান যাঁরা বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি এবং যাঁদের আফসোস থেকে গিয়েছিল তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বাইরে বেরিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করুন যাতে তারা এটা বুঝতে না পারে, আমরা কাপুরুষতা ও দুর্বলতার কারণে বাইরে বের হচ্ছি না। এসব লোক যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এ ধরনের কথাবার্তা বলেছিলেন তখন

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬০-৬২।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে তশরীফ নেন এবং লৌহবর্ম পরে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এ সময় ঐ সব লোক যারা মদীনার বাইরে গিয়ে মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছিল এরা লজ্জিত হয়। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে আপনার মর্জির বিরুদ্ধে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি যা আমদের করা উচিত নয়। যদি আপনি চান তবে তশরীফ রাখুন এবং এখানে থেকেই মুকাবিলা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, এটা নবীর শানের পরিপন্থী, যুদ্ধসাজে সজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধের আগে অস্ত্র রেখে দেয়।[১] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার সাথীসহ মুকাবিলার উদ্দেশে বের হলেন। মদীনা থেকে কিছু দূর এগুবার পর আবদুল্লাহ ইবন উবাই এক-তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে ফিরে যায়। সে বলল, আমার কথা তিনি অগ্রাহ্য করলেন এবং যুবকদের কথা মেনে নিলেন।[২]

ওহুদ প্রান্তর

রাসূলুল্লাহ ﷺ এগিয়ে গিয়ে ওহুদ পর্বতের পাদদেশে (যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে তিন কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত) ছাউনি ফেলেন। তিনি ওহুদ পর্বত পেছনে রাখেন এবং সেনাবাহিনীও সেই হিসাবে মোতায়েন করেন।[৩] এরপর তিনি বলেন যতক্ষণ না আমি হুকুম দিই কেউ যুদ্ধের সূচনা করবে না। এরপর তিনি নিয়ম মাফিক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গী-সাথী ছিল ৭০০ জন আব্দুল্লাহ ইবন জুবায়ের (রা)-কে তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এদের সংখ্যা ছিল ৫০ জন। তিনি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দিলেন, তারা তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে অশ্বারোহী বাহিনীকে রুখবে এবং এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে যেন তারা আমাদের পেছনে এসে হামলা না করতে পারে, চাই যুদ্ধ পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলেই থাকুক বা প্রতিকূলে।[৪] তিনি তাদেরকে এও নির্দেশ দেন তারা কোন অবস্থাতেই যেন তাদের স্থান ত্যাগ না করে এবং এই স্থান থেকে কোনমতেই যেন না সরে, যদি শত্রু মুসলিম বাহিনীকে ছোঁ মেরে তুলেও নিয়ে যায় তবুও।[৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সময় দু'টো লৌহবর্ম পরেছিলেন এবং মুসআব ইবন উমায়র (রা)-কে মুসলিম বাহিনীর পতাকা প্রদান করেন।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৩।

২. প্রাগুক্ত, ৬৪ পৃ.।

৩. যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক অবস্থান ও সামরিক কৌশল অনুধাবনের জন্য ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহর গ্রন্থ "নবী যুগের যুদ্ধক্ষেত্র" পাঠ করুন।

৪. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৬ পৃ.।

৫. যাদুল মাআদ, ১ম খ., ৩৪ পৃ.।

সমবয়সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় বালককে বয়সের অল্প হওয়ার কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত পাঠান। হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা) ও রাফে ইবন খাদীজ (রা) তাঁদের মধ্যে ছিলেন। এ দু'জনের বয়স পনের বছরের বেশি ছিল না। রাফে'র পিতা রাফে'র পক্ষে সুপারিশ করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলে রাফে' খুব ভাল তীরন্দায। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুপারিশ কবুল করে তাঁকে (রাফে'কে) যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেন। এরপর সামুরা ইবন জুনদুব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনিও রাফে'র সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি তাঁকেও ফেরত পাঠান। সামুরা (রা) আরয করেন, হুযুর! আপনি রাফে'কে অনুমতি দিয়েছেন আর আমাকে ফেরত পাঠাচ্ছেন, অথচ মল্লযুদ্ধে আমি রাফে'কে হারিয়ে দিতে পারি। মল্লযুদ্ধ হলো। সামুরা রাফে'কে হারিয়ে দিলেন আর এভাবেই তিনিও ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি পেলেন।[১]

যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষ একে অপরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হিন্দ বিন্‌ত উতবা মহিলাদের মধ্যে ছিল। মহিলারা দফ বাজিয়ে পুরুষদেরকে যুদ্ধে উৎসাহ দিচ্ছিল। অবশেষে যুদ্ধ প্রচণ্ডতম রূপ ধারণ করে। হযরত আবূ দুজানা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঢুকে পড়লেন। কেউ তাঁর সামনে পড়লে আর রক্ষা ছিল না, তলোয়ারের আঘাতে দু'টুকরো হয়ে যেত।[২] এটি তৃতীয় হিজরীর ৭ শওয়াল তারিখের ঘটনা।

হযরত হামযা ও মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর শাহাদাত

হযরত হামযা (রা) এই যুদ্ধে বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের চরম কৌশল দেখান এবং কুরায়শদের বড় বড় নেতৃস্থানীয় বীর পুরুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেন। তাঁর সামনে দাঁড়াবার কারও শক্তি ছিল না। কিন্তু জুবায়ের ইবন মুতইম-এর গোলাম ওয়াহশী সুযোগের সন্ধানে ছিল। বর্শা নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুপোকাত ও ধরাশায়ী করতে সে বিশেষ পারদর্শী ছিল। জুবায়র তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে যদি হামযাকে হত্যা করতে পারে তবে তাকে এর পুরস্কার হিসাবে মুক্তি দেয়া হবে। তার পিতৃব্য তুআয়মা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। ফলে পিতৃব্যের শোক তার অন্তরে ছিল জাগরূক। অপর দিকে হিন্দ তাকে (ওয়াহশীকে) হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করতে উস্কানি দিচ্ছিল। সে তাঁর শাহাদাত দ্বারা তার অতৃপ্ত কলিজাকে তৃপ্ত ও শীতল করতে চাচ্ছিল। ওয়াহশী তার বর্শা তাক করে পূর্ণ

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৬ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।

শক্তিতে হযরত হামযা (রা)-এর প্রতি নিক্ষেপ করে। ফলে তা তাঁর নাভিমূলে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়। হযরত হামযা (রা) মাটিতে পড়ে যান এবং শাহাদাত বরণ করেন।[১] মুস'আব ইবন 'উমায়র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে বুক পেতে দিয়ে লড়তে থাকেন এবং স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন। মুসলমানরা এই যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ জানবাযীর হক আদায় করেন এবং সত্যের পথের প্রতিটি পরীক্ষায় সফল হন।[২]

মুসলমানদের বিজয়

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। কাফির মুশরিকরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং তাদের মহিলারা, যারা পুরুষদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে এসেছিল, তারা পলায়ন করে। তাদেরকে তাদের পরনের কাপড় গুটিয়ে পালাতে দেখা যাচ্ছিল।[৩]

পাশা উল্টাল, যুদ্ধের গতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গেল

কাফির মুশরিকরা পরাজিত হয়ে যখন পালাচ্ছিল এবং তাদের মহিলারাও যখন তাদের অনুসরণ করছিল তখন ঘাঁটি প্রহরারত তীরন্দাযগণ এ দৃশ্য দেখে নিজেদের স্থান ত্যাগ করে এবং বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়। বিজয় লাভের ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। তারা ময়দানে পৌঁছেই 'মালে গনীমত! মালে গনীমত!' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ! যুদ্ধলব্ধ সম্পদ!) বলে ধ্বনি দিতে শুরু করে। এ সময় তাঁদের সেনানায়ক (আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)) তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু উৎসাহ ও আবেগে তারা কারো কথা শোনেনি। এখন আর মুশরিকদের পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয় এই বিশ্বাসে এই ফ্রন্ট তারা খালি করে দেয় এবং মুসলমানদের পশ্চাতে অবস্থানরত কুরাইশ অশ্বারোহী বাহিনীর রাস্তা খুলে যায়।[৪] মুশরিকদের পতাকা যারা বহন করছিল তারা মারা গিয়েছিল। ভূলুণ্ঠিত পতাকার কাছে আসার কেউ সাহস পাচ্ছিল না। ঠিক এমন মুহূর্তে কাফির মুশরিকরা পেছনে এসে ধ্বনি তুলল, মুহাম্মদ মারা গেছেন! এ কথা শুনে মুসলিম বাহিনী হঠাৎ পেছনে ফিরল। ফলে কাফিরদের পক্ষে আবার হামলার সুযোগ মিলে গেল এবং এই সংকটময় মুহূর্ত থেকে তারা পুরোপুরি ফায়দা ওঠাল। মুহূর্তগুলো ছিল মুসলমানদের জন্য কঠিন পরীক্ষার। ইতোমধ্যে দুশমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন কামিআ ও

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৭০-৭২; পুরো ঘটনা স্বয়ং ওয়াহশীর ভাষায় বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ওহুদ যুদ্ধ, হামযা হত্যা প্রসঙ্গ।

২. প্রাগুক্ত, ৭৩।

৩. ঐ, ৭৭।

৪. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৩৫০ পৃ.।

উতবা ইবন আবী ওয়াক্কাস নামক দুই দুর্বত্ত ছিল এক্ষেত্রে সবার আগে। এ সময় একটি পাথর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে আঘাত করে এবং তিনি এ আঘাতের ফলে ডান দিকে একটি গর্তে পড়ে যান, সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়, মাথায় আঘাত লাগে এবং ঠোঁট রক্তাক্ত হয়ে যায়। চেহারা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, সেই কওম কি করে সাফল্য লাভ করতে পারে যে তার নবীর চেহারাকে রক্তসিক্ত করতে পারে যিনি তাদেরকে তাদের প্রভুর দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন?[১]

মুসলমানদের জানা ছিল না তিনি এখন কোথায়? হযরত আলী (রা) তাঁকে ঠেস দেন এবং হযরত তালহা ইবন উবায়দিল্লাহ (রা) তাঁকে টেনে তোলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। মালিক ইবন সিনান (রা) সেই মুবারক রক্ত যা তাঁর নূরানী চেহারাকে সিক্ত করেছিল ভালবাসার আবেগ পান করেন।[২]

আসলে এটি পলায়ন ছিল না, বরং এ ছিল সামরিক কলা-কৌশলের একটি অঙ্গ যা প্রতিটি সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনের মুহূর্তে গ্রহণ করতে হয়। এরপর পরিস্থিতি সামলে নিয়ে পুনরায় চড়াও হয়। মুসলমানদেরকে এ সময় পরীক্ষার যেই তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতে হয় এবং তাদেরকে যেই জীবন হানির সম্মুখীন হতে হয়, কয়েকজন মর্যাদাবান ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীকে, যাঁরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শক্তির উৎস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদদগার ও মুহাফিজ ছিলেন, শাহাদাত বরণ করতে হতো সবই ছিল আসলে সেই সব তীরন্দাযের ভুলের পরিণতি, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই সুস্পষ্ট নির্দেশ ও দিক-নির্দেশনাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পালন করেননি এবং নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করেন যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মোতায়েন করেছিলেন।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ج حَتّٰى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ط مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৭৮-৮০ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

"আর আল্লাহ তাঁর সেই ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করেছিলে, এমন কি তোমরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিলে এবং কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছিলে আর যা তোমরা চাইছিলে তা দেখার পর অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিল; তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদেরকে সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। বস্তুত তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।"

[সূরা আল-ইমরান : ১৫২ আয়াত]

ভালবাসা ও প্রাণোৎসর্গের নবতর দৃষ্টান্ত

হযরত আবূ উবাদা ইবনুল-জাররাহ (রা) লৌহ শিরস্ত্রাণের একটি কড়া (যা হুযূর আকরাম ﷺ-এর মাথায় ঢুকে গিয়েছিল)[১] দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে ফেলেন। তা তুলতে গিয়ে তাঁর দাঁতই পড়ে যায়। দ্বিতীয় কড়াটি বের করতে গিয়ে আরেকটির অবস্থা একই হয়। হযরত আবূ দুজানা (রা) [কাফিরদের তীর বর্ষণের হাত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাঁচাতে গিয়ে] ঢাল হিসাবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যান। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়ছিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করতে থাকেন। তীরের আঘাতে তাঁর পিঠ চালুনির মত হয়ে যায়। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে হুযুর ﷺ-কে রক্ষা করতে গিয়ে শত্রুর ওপর তীর ছুঁড়তে থাকেন। হুযুর ﷺ এক একটি তীর আপন হাতে তাঁকে তুলে দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন– ارم فداك ابى امى। তীর নিক্ষেপ করতে থাক। তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! কাতাদা ইবন নুমান (রা)-এর চোখে এমন আঘাত লাগে যে, চোখ কোটরের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং গালের ওপর এসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন হস্ত মুবারক দিয়ে চোখটিকে যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। চোখটি এমনভাবে ঠিক হয়ে গেল যে, এর দৃষ্টিশক্তি আগের চেয়েও তীব্র হয়ে গেল![২]

মুশরিকরা হুযুর আকরাম ﷺ-এর খোঁজ করছিল, তিনি জীবিত না মৃত? কিন্তু তকদীরে ইলাহীর ফয়সালা ছিল অন্য কিছু। তারা যখন দলে দলে হুযুর ﷺ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তখন প্রায় দশজন তাঁর সামনে আসেন এবং সকলেই একে একে হুযুর আকরাম ﷺ-কে রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হন। অতঃপর হযরত তালহা ইবন উবায়দিল্লাহ (রা) নিজের হাতকে সামনে বাড়িয়ে দেন এবং নিক্ষিপ্ত তীর ঠেকাতে থাকেন। এভাবে তীর ঠেকাতে গিয়ে তার হাতের আঙ্গুলগুলো

---

১. সীরাত ইবন হিশাম ২য় খ., ৮০-৮২ পৃ.; বুখারী, ওহুদ যুদ্ধ বিষয়ক অধ্যায় اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. শীর্ষক অধ্যায়।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৮২ পৃ.।

জখমে রক্তাক্ত হয়ে যায় এবং হাত অবশ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পাথরের ওপর উঠতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আহত হওয়ার দরুন তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ফলে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। এটা দেখে হযরত তালহা (রা) হুযুর আকরাম ﷺ-এর নীচে বসে গেলেন এবং তিনি তাঁকে ধরে পাথরের ওপর তুললেন। নামাযের সময় হলে তিনি বসে নামায আদায় করেন।[১]

এটি ছিল এমন এক মুহূর্ত যখন পরাজিত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু আনাস ইবন নযর (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর চাচা ছিলেন, এ সময়ও পরাজয় স্বীকার করেন নি। তিনি সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। পথিমধ্যে হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর সঙ্গে তাঁর দেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আনাস ইবন নযর (রা) বললেন, সা'দ! আমি ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিক থেকে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি![২] আনাস ইবন নযর (রা) আনসার ও মুহাজিরদের কিছু লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁরা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে বসে তোমরা কি করছ? তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়ে গেছেন! আনাস ইবন নযর (রা) বললেন, তাঁর (শাহাদাতের) পর বেঁচে থেকে কি লাভ? ওঠো, যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবন দিয়েছেন তার ওপর তোমরা জীবন দিয়ে দাও। এই বলে তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং শত্রুর সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, ঐ দিন আমরা তাঁর শরীরে সত্তরটি যখম গণনা করেছি। যখম বেশী হওয়ার কারণে তাঁকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। তাঁর বোন তাঁর আঙুলের অস্থির ওপরের পোশবের দাগ দেখে তাঁকে শনাক্ত করেন।[৩]

যিয়াদ ইবনু'ল-সাকান (রা) পাঁচজন আনসারসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হেফাজত করে লড়াই করছিলেন এবং একে একে শহীদ হচ্ছিলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তিনিও পড়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। লোকেরা তাঁকে উঠিয়ে এনে হুযুর আকরাম (সা)-এর সামনে শুইয়ে দিল। তিনি তাঁর মাথা উঠিয়ে আপন পায়ের ওপর রাখলেন। তাঁর গণ্ডদেশ হুযুর ﷺ-এর পদযুগলের ওপর থাকা অবস্থায় তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেল।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, ২য় খ., ৭৬ পৃ. ও যাদু'ল মা'আদ, ১ম খ., ৩৫০ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, আসল বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৮৩ পৃ.।

৪. প্রাগুক্ত, ৮১ পৃ., এ উপলক্ষে মওলানা শিবলী নু'মানী "সীরাতুন্নবী"-তে ফারসীতে ও কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মনসুরপুরী "রাহমাতুল'ল-লিল-'আলামীন' গ্রন্থে উর্দূর এক একটি নির্বাচিত কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এগুলোকে ঘটনার চিত্র অংকন করা হয়েছে যার চেয়ে উত্তম চিত্র অংকন করা কঠিন।

'আমর ইবনু'ল-জামূহ (রা) ছিলেন খোঁড়া। তাঁর ছিল চার পুত্র। সকলেই যুবক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কুরবানী ও আত্মোৎসর্গে প্রতিটি মুহূর্তেই হাজির থাকতেন। তাঁরা যখন ওহুদ যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন তখন 'আমর ইবনু'ল-জামূহ (রা)-ও যাত্রার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর পুত্ররা বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে (যুদ্ধে যোগদান থেকে) মুক্তি দান করেন। আপনি যদি ঘরেই থাকেন তাহলে ভাল হয়। আপনার থেকে আমরা যথেষ্ট। আপনার ওপর জিহাদ ফরজ নয়।

'আমর ইবনু'ল-জামূহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলেরা আমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে চাইছে। আল্লাহর কসম! আমি শাহাদাত লাভ করি এটা আমার একান্ত কামনা এবং আমি বেহেশতে এভাবেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে চাই, চলাফেরা করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহ জিহাদ করা থেকে তোমাকে মাফ করেছেন। এরপর তিনি ছেলেদেরকে বললেন, তাকে জিহাদে যেতে দিলে তোমাদের কিই বা ক্ষতি হবে (সে তো বাসনা পূরণের সুযোগ পাবে)? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ওহুদ যুদ্ধে শরীক হন এবং তাঁর শাহাদাত লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।[১]

হযরত যায়দ ইবন ছাবেত (রা) বর্ণনা করেন, "ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সা'দ ইবনু'র-রবী (রা)-এর খোঁজে পাঠান এবং বলেন, যদি তার দেখা পাও তাহলে তাকে আমার সালাম বলবে এবং বলবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চেয়েছেন, এ সময় তুমি কেমন অনুভব করছ? যায়দ ইবন ছাবেত (রা) বলেন, নিহতদের লাশের ভেতর আমি তাঁকে তালাশ করলাম। এমন সময় তাঁকে এক স্থানে দেখতে পেলাম। আমি কাছে গেলাম। দেখতে পেলাম, তাঁর শেষ মুহূর্ত এসে গেছে। তাঁর শরীরে ছিল নেযা, তলোয়ার ও তীরের সত্তরটি আঘাত। আমি বললাম, সা'দ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে তোমার অবস্থা কেমন তা জানতে চেয়েছেন। জওয়াবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার সালাম দেবে এবং বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখন জান্নাতের খোশবু অনুভব করছি। আর আমার কওম আনসারদেরকে বলবে, যদি শত্রু রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তোমাদের ধড়ে এক বিন্দু নিশ্বাসও বাকী থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের কোন ওযর গ্রাহ্য হবে না। একথা বলতেই তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়।[২]

---

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৩৫৩ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

আবদুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ (রা) ওহুদ যুদ্ধের সিলসিলায় বলেন, হে আল্লাহ! ...মার কসম, আমি কাল যেন এমন শত্রুর মুকাবিলা করি যে আমাকে হত্যা ...বে! এরপর আমার পেট চিরবে– আমার নাক-কান কাটবে! এরপর তুমি ...কে জিজ্ঞেস করবে, এসব কি জন্য হয়েছিল? আমি জওয়াব দেব, তোমার ...।[১]

...লমানদের পুনরায় জমায়েত

মুসলমান যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চিনতে পারল তখন তারা যেন নব জীবন ...ত করল এবং আরেক বার তারা উঠে দাঁড়াল, তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে আবার ...ত্যকার দিকে এগুলেন। পথিমধ্যে উবাই ইবন খালাফ আঁ-হযরত ﷺ-কে ...খা মাত্রই বলতে থাকে : মুহাম্মদ! তুমি নিরাপদে থাকা পর্যন্ত আমার কল্যাণ ...ই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওকে আসতে দাও। অতঃপর সে একেবারে কাছে ...তেই তিনি একজন সাহাবীর কাছ থেকে নেযা নিয়ে তার গর্দানে মারলেন। ...ত লাগতেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল এবং কয়েকবার ডিগবাজি ...ল।[২] এ সময় হযরত আলী (ক.) ঢাল ভর্তি করে পানি নিয়ে আসলেন এবং হুযূর ﷺ-এর চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) চেহারা মুবারক নিজ হাতে ধুচ্ছিলেন আর হযরত আলী (রা) ঢাল থেকে পানি ...রে ঢালছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) যখন দেখতে পেলেন, কোন কিছুতেই রক্ত ...রণ বন্ধ হচ্ছে না, বরং আরও জোরে প্রবাহিত হচ্ছে তখন তিনি চাটাইয়ের একটি ...রা পুড়িয়ে এর ভস্ম আহত স্থানে লাগিয়ে বেঁধে দিলেন। এর ফলে তক্ষুনি রক্ত ...রণ বন্ধ হয়ে যায়।[৩]

হযরত আয়েশা ও উম্মু সুলায়ম (রা) এই যুদ্ধে মশক ভর্তি করে কাঁধে বয়ে ...তদেরকে পানি পান করান। পানি ফুরিয়ে গেলে আবার মশক ভর্তি করে পানি ...য়ে আসতেন। এভাবে বারবার পানি নিয়ে এসে তাঁদের পিপাসা মেটাতেন।[৪] উম্মু ...ত (রা) মশক ভর্তি পানি তাঁদের হাতে তুলে দিতেন।[৫]

আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা কিছু সংখ্যক নারীসহ মুসলিম ...দদের লাশগুলোর সঙ্গে অসম্মানসূচক আচরণ করে এবং সেগুলো কেটেকুটে ...ত করে। শহীদদের লাশের নাক-কান কাটতে শুরু করে। সে হযরত হামযা

---

১. ...ক্ত।
২. ...রাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৮৪ পৃ.।
৩. ...হীহ বুখারী, ওহুদ যুদ্ধ, ما اصاب النبي ﷺ من يوم احد ও সহীহ মুসলিম, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়; ...ছুটা পার্থক্যসহ ইবন হিশাম, ২য় খ., ৮৫ পৃ. ও যাদু'ল-মা'আদ; এ (৩৫২, ১খ.)।
৪. ...খারী, ওহুদ যুদ্ধ, اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا ও মুসলিম, পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের যুদ্ধে গমন ...ধ্যায়।
৫. ...খারী।

(রা)-এর কলিজা টেনে বের করে চিবাতে থাকে, কিন্তু গলাধঃকরণ করতে ব
হয়ে উগড়ে দেয়।[১]

ফেরার সময় আবূ সুফিয়ান পাহাড়ে উঠে সজোরে ধ্বনি দিয়ে বলতে থাকে
যুদ্ধ পাশা খেলার মত অনিয়মে ভরা। আজ এর জয় হচ্ছে তো কাল জয় হবে
অন্যের! দেবতা হোবলের জয় হোক! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওমর! দাঁড়িয়ে এর
জওয়াব দাও আর বল, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। তিনি ভিন্ন আর কেউ নেই
আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে।[২] এ কথা শুনে
আবূ সুফিয়ান বলল, لنا العزى ولا عزى لكم "আমাদের ওয্যা দেবতা রয়েছে আর
তোমাদের ওয্যা নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এর জওয়াব দাও। সাহাবারা জিজ্ঞেস
করলেন, আমরা এর কী জওয়াব দেব? তিনি বললেন, বল, الله مولنا ولامولى
لكم "আল্লাহ আমাদের প্রভু আর তোমাদের কোন প্রভু নেই।"[৩] যখন তারা
নিজেদের গন্তব্যে চলল আর মুসলমানরা তাদের নিজেদের গন্তব্য পথে চলতে
শুরু করল তখন তারা আবারও চিৎকার করে বলে ওঠে : আগামী বছর বদর
প্রান্তরে আবার তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন
সাহাবীকে বললেন, তুমি বল, হ্যাঁ, আমাদের ও তোমাদের মাঝে এই তারিখই
বহাল রইল।[৪]

লোকেরা আপন আপন নিহতদের জন্য শোকাহত ছিলেন, ছিলেন বিষণ্ন। তারা
তাদের দাফন-কাফনে ছিলেন ব্যস্ত। হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদাতের বিরাট
প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যিনি ছিলেন আঁ-হযরত
ﷺ-এর চাচা ও দুধভাই এবং যিনি তাঁর জন্য সর্বক্ষণ ঢালস্বরূপ ছিলেন।

একজন ঈমানদার মহিলার ধৈর্য

সাফিয়্যা বিনতে 'আবদুল মুত্তালিব (রা) ছিলেন হযরত হামযা (রা)-এর আপন
বোন। তিনি শহীদ ভাইকে দেখার উদ্দেশে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র যুবায়র
ইবনু'ল-'আওয়াম (রা)-কে বলেন, তোমার মাকে ফিরিয়ে দাও। তাঁর ভাইয়ের
লাশকে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছে তা যেন তিনি দেখতে না পারেন! তিনি
নির্দেশ মাফিক মাকে গিয়ে ফিরে যাবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ
জানিয়ে দিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, তাঁকে ফিরে যেতে হবে কেন? আমি জানি

---

১. সীরাত ইবন হিশাম (২ : ৯১)।

২. প্রাগুক্ত, এ (২ : ৯৩)।

৩. সহীহ বুখারী, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

৪. সীরাত ইবন হিশাম (২:৯৪)।

আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে আল্লাহর রাস্তায়। এজন্য আমি আল্লাহ্ চাহেত পুরস্কার ও সওয়াব প্রাপ্তির আশা পোষণ করব এবং পুরোপুরি ধৈর্য ধারণ করব। এরপর তিনি লাশের নিকট গেলেন এবং শহীদ ভাইয়ের লাশ দেখলেন, ইন্না লিল্লাহ পাঠ করলেন এবং তাঁর জন্য প্রাণভরে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করলেন। এরপর তিনি তাঁকে দাফন করবার নির্দেশ দিলেন এবং ওহুদের শাহাদতগাহের মাটিতে শুইয়ে দিলেন।[১]

মুস'আব ইবন উমায়র (রা) ও অপরাপর শহীদদের দাফন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকাবাহী হযরত মুস'আব ইবন উমায়ের (রা) ইসলাম গ্রহণের আগে কুরায়শদের অন্যতম ধনীর দুলাল ছিলেন এবং আপন সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও উত্তম পোশাকের কারণে তিনি প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। শাহাদাত লাভের পর তাঁর ভাগ্যে একটি মাত্র কাফনের কাপড় জুটেছিল যার দৈর্ঘ্য এতই ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকতে গেলে পায়ের পাতা ঢাকে না আর পায়ের পাতা ঢাকতে মাথা বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দেখে বললেন, তাঁর মাথা ঢেকে দাও আর পায়ের পাতা ইযখির ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দু'জন শহীদকে একই কবরে দাফনের নির্দেশ দেন। তিনি বলতেন, কুরআন মজীদের 'ইলম ও হেফ্‌জ-এর ক্ষেত্রে কার ভাগ বেশি? এরপর যার দিকে ইশারা করা হতো তিনি প্রথমে তাঁকে কবরে নামানোর জন্য বলতেন, আমি কেয়ামতের দিন তাঁর সাক্ষী হব। তিনি শহীদদেরকে আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করবার নির্দেশ দেন।[৩] তাঁদের জানাযা যেমন পড়া হয়নি, তেমনি তাঁদের গোসলও দেয়া হয়নি।[৪]

---

১. সহীহ বুখারী, ওহুদ যুদ্ধ।

২. প্রাগুক্ত।

৩. সহীহ বুখারী من قتل من المسلمين يوم احد শীর্ষক অধ্যায়।

৪. শহীদদের গোসল না দেয়া সম্বন্ধে মতভেদ নেই। তাঁদেরকে রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করা হয়ে থাকে যাতে তাঁরা এই অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে পারেন। অবশ্য তাঁদেরকে জানাযা দেয়া হবে কি না সে সম্বন্ধে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মতে জানাযা আদায় করা হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অপরাপর ইমাম (যেমন আওযাঈ, সুফিয়ান ছাওরী ও ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ)-এর মতে শহীদদের জানাযা আদায় করা হবে। ইমাম আহমদ (র)-এরও একটি মত এরূপ। তাঁদের দলীল সেই সব বর্ণনা যেসব বর্ণনায় ওহুদের শহীদদের জানাযা পাঠ করবার উল্লেখ রয়েছে। স্বয়ং উকবা ইবন আমের (রা) থেকে ইমাম বুখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা) একদিন ওহুদে যান এবং তিনি সেখানে শহীদদের তেমনি জানাযা নামায আদায় করেন যেমনভাবে মৃতদের জন্য আদায় করা হয় (বুখারী, কিতাবুল জানাইয)। বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন, শরাহ মা'আনিউল-আছার, তাহাবী, বাবু'স-সালাত, আলা'শ-শুহাদা ও ইমাম যায়লাঈকৃত নসবু'র-রায়া, বাব আহাদীছুস-সালাত 'আলা'শ-শুহাদা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মহিলা সাহাবীর আত্মোৎসর্গ

মুসলমানগণ মদীনায় পৌঁছবার কালে বনী দীনার গোত্রের এক মহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হয়। এই মহিলার স্বামী বাপ-ভাই সকলেই যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানরা তাঁকে এসব খবর দিতেই তিনি বলে ওঠেন, আগে তো বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন আছেন?

লোকেরা উত্তরে জানাল, তোমার ঐকান্তিক আরজ মাফিক হুযুর ﷺ সহীহ সালামতেই আছেন। মহিলা তখন বলতে লাগলেন, আমাকে দেখাও। আমি তাঁকে স্বয়ং দেখতে চাই। লোকেরা হুযুর ﷺ-এর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিতেই মহিলাটি সেদিকে গেলেন এবং হুযুর ﷺ -এর চেহারা মুবারক দেখে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সহীহ-সালামতে থাকলে আর সকল মুসীবতই তুচ্ছ![১]

আত্মোৎসর্গ ও আনুগত্যের একটি দৃষ্টান্ত

এদিকে দীনের দুশমন ও কাফির মুশরিকরা একে অপরকে তিরস্কার ও গালিগালাজ করতে শুরু করল এবং বলতে লাগল, তোমরা কিছুই করতে দিলে না। তোমরা একদিকে তো তাদের শক্তি ও শৌর্য-বীর্যকে আহত করেছ, তাদের জোর ভেঙ্গে, এরপর তাদেরকে পুরোপুরি দমন না করেই তাদেরকে ছেড়ে দিলে (অতএব, এবার মুসলমানদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস জন্য তারা পুনরায় মদীনা আক্রমণের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ পেতেই সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন, এখনই দুশমনকে পিছু ধাওয়া করতে হবে। এ ছিল এমন এক মুহূর্ত যখন মুসলমানরা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। পরদিন রোববার ভোরবেলা তাঁর ঘোষক ঘোষণা দিল, সকলে যেন শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে বেরিয়ে পড়ে। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দেয়া হয়, এই অনুসরণে কেবল তারাই শরীক হবে যারা গতকাল এই যুদ্ধে শরীক ছিল।

এদিকে অবস্থা তো ছিল এই, এমন একজন মুসলমানও এমন ছিলেন না যিনি কোন না কোনভাবে আহত না হয়েছেন, কোন না কোন প্রকার তকলীফের শিকার না হয়েছেন! কিন্তু তাঁরা সকলেই নত মস্তকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি পেছনে থেকেছেন। সকলেই মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল-আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান নেন এবং সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার মোট তিন দিন থাকেন। এরপর তিনি মদীনা ফিরে আসেন।[২]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম।

২. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খ., ৯৭ পৃ.।

আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের এই প্রেরণা ও রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ নত মস্তকে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে নেবার কথা তাঁর অবিনশ্বর গ্রন্থ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ . اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ . فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْۤءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ . اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

"যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। যাদেরকে লোকেরা বলেছে, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকেরা জমা করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; অতএব, তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর কতই না চমৎকার সাফল্য দানকারী! অতঃপর মুসলমানরা ফিরে এল আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে; তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।" [সূরা আলইমরান : ১৭২-৭৫ আয়াত]

প্রাণের চেয়েও প্রিয়

হিজরতের তৃতীয় বছরে আযল ও কারা গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে দরখাস্ত পেশ করে, তাদেরকে এমন কিছু লোক দেয়া হোক যাঁরা তাদেরকে দীনের তা'লীম দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে থেকে ছয়জনের একটি দল এই কাজের জন্য পাঠান যাঁদের ভেতর হযরত আসেম ইবন ছাবিত, খুবায়ব ইবন 'আদী ও যায়দ ইবনুদ দাছিন্না (রা)-ও ছিলেন। তাঁরা রাজী নামক স্থানে পৌঁছলে (রাজী 'উসফান ও মক্কার মাঝে অবস্থিত) গোত্রের লোকেরা গাদ্দারী করে এবং বলে, আমরা আল্লাহর সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা কাউকে জানে মারব না। কিছু মুসলমান বললেন, আমরা মুশরিকদের কোন

অঙ্গীকার কবুল করি না। তাঁরা মুকাবিলা করেন এবং শহীদ হন। যায়দ ইবনুদ দাছিন্না, খুবায়ব ইবন 'আদী ও 'আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা) অস্ত্র সংবরণ করেন। তাঁদেরকে বন্দী করা হয়। 'আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা)-কে পথিমধ্যে শহীদ, খুবায়ব ইবন 'আদী ও যায়দ ইবন দাছিন্না (রা)-কে তারা মক্কার কুরায়শদের নিকট বিক্রয় করে দেয়।

খুবায়ব (রা)-কে হুজায়র ইবন আবী ইহাব ক্রয় করে তার বাপ ইহাবের হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার উদ্দেশে। যায়দ ইবনুদ দাছিন্না (রা)-কে সাফওয়ান ইবন উমায়্যা তার পিতা উমায়্যা ইবন খালাফ-এর বদলি হিসাবে ক্রয় করে। যায়দ (রা)-কে হারাম শরীফের বাইরে হত্যার জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেখানে কুরায়শদের বহু লোকের জমায়েত হয়েছিল। এদের মধ্যে আবূ সুফিয়ানও ছিল। সে হযরত যায়দ (রা)-কে বলে, যায়দ! আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি এটা পসন্দ করবে, তুমি আরামে নিজের ঘরে ফিরে যাও আর তোমার জায়গায় মুহাম্মদ ﷺ হোক! হযরত যায়দ (রা) উত্তর দিলেন, আমি তো এও পছন্দ করি না, আমি আমার ঘরে থাকি আর মুহাম্মদ ﷺ-এর পায়ে একটি কাঁটাও ফুটুক! এরপর আবূ সুফিয়ান মন্তব্য করে, আমি কাউকে কোন লোককে এত ভালবাসতে দেখিনি যতটা ভালবাসে মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা। এরপর তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়।[১]

এসব লোক হযরত খুবায়ব (রা)-কে যখন শূলে চড়াবার উদ্দেশে নিয়ে এল তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা এতে কিছু মনে না কর তবে তোমরা আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায়ের অনুমতি দাও। তারা বলল, হ্যাঁ, পড়তে পার। তিনি দু' রাক'আত সালাত অত্যন্ত প্রশান্তি ও পূর্ণ আদব সহকারে আদায় করলেন। অতঃপর তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, যদি আমার এই ধারণা না হতো, তোমরা একে (আমার সালাত আদায়কে) মৃত্যু ভয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবে তাহলে আমি আরও সালাত আদায় করতাম। এরপর তিনি নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

فلست ابالى حين اقتل مسلمًا * على اى شق كان فى الله مصر عى
وذلك فى ذات الاله وان يشاء * يبارك على اوصال شلوممزع.

"আমি যখন ইসলামের জন্য নিহত হচ্ছি তখন আমার আর এ ব্যাপারে কোন পরওয়া নেই আল্লাহর রাস্তায় কোন্ দিকে কাৎ হয়ে আমি জীবন দিচ্ছি। যা কিছু

১. ইবন ইসহাক বর্ণিত, ইবন হিশাম, ২/১৭৪।

...ে নির্ভেজাল আল্লাহর জন্যই হচ্ছে। যদি তিনি চান তবে আমার ছিন্নভিন্ন ও ...িত দেহের ওপর বরকত নাযিল করবেন।"

এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতেই তিনি সত্যের পথে শহীদ হলেন।[১]

...'র মাউনার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আমের ইবন মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে ...লামের দাওয়াত ও তবলীগের উদ্দেশে একটি জামা'আত পাঠান। এতে ৭০ ...ন সর্বোত্তম ও নির্বাচিত মুসলমান শামিল ছিলেন। জামা'আত যথাসময়ে রওয়ানা ... এবং বী'রে মা'উনা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনী সুলায়ম-এর ...সায়্যা, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র একত্র হয়ে গোটা কাফেলাকে ঘিরে ফেলে। ...ফেলার লোকেরা এটা দেখে তলোয়ার হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সকলেই ...হাদাত বরণ করেন। কেবল কা'ব (রা) ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পান যিনি পরে ...ন্দক যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন।[২]

...একজন শহীদের অন্তিম বাক্য যা ঘাতকের ...ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ ছিল

এই অভিযানে হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা) শহীদ হন। তাঁকে জব্বার ...বন সুলমা হত্যা করে। হারাম ইবন মিলহান (রা) ইনতিকালের সময় যেই বাক্য ...চারণ করেছিলেন তাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়। জব্বার স্বয়ং বর্ণনা ...রেন, আমাকে যে জিনিস ইসলামের দিকে টেনে এনেছিল তা ছিল এই : আমি ...দের একজনের দুই কাঁধের মাঝখানে বল্লম নিক্ষেপ করি। দেখতে পেলাম বল্লম ...র বক্ষদেশ ভেদ করেছে। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য উচ্চারিত হয়, فزت ورب الكعبة - فزت ورب الكعب... "কাবার প্রভু প্রতিপালকের কসম! আমি কামিয়াব ...য়ে গেছি, হয়েছি সফলকাম।" আমি বিস্ময়ের সঙ্গে মনে মনে বললাম, "এ কী ...রনের কামিয়াবী! আমি কি তাঁকে হত্যা করিনি? পরে আমি বিষয়টি সম্পর্কে ...োঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানতে পারলাম, এর অর্থ ছিল শাহাদাত লাভ যা ছিল তাঁর ...ফলতা লাভের কারণ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি সফলকাম হয়েছেন। ...র এ বাক্যই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।[৩]

---

১. বিস্তারিত দেখুন সীরাত ইবন হিশাম, ২/১৬৯-৭৬; সহীহ বুখারী, কিতাবু'ল-মাগাযী, বাবু'ত-তওহীদ ওয়া'ল-জিহাদ; ইবন কাছীর, ২/১২৩-২৫।

২. বুখারী, মুসলিম ও সীরাত ইবন হিশাম।

৩. এই ঘটনা বুখারীতে কিতাবু'ল-মাগাযীর রাজী যুদ্ধের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ইবন হিশাম, ২/১৮৭।

বনূ নাদীরের নির্বাসন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নাদীর গোত্রের নিকট গমন করেন। বনূ নাযীর ছিল ইয়াহূদীদের সবচেয়ে বড় গোত্র। সেখানে গিয়ে তিনি তাদের নিকট বনী 'আমের-এর দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনা করেন। তাদের ও বনী 'আমের-এর মধ্যে মৈত্রী চুক্তি ছিল। তারা এ সময় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে খুবই মিষ্ট বাক্য বলে এবং খুবই আশা-ভরসার বাণী শোনায়, কিন্তু পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একটি ঘরের দেওয়ালের কাছে বসা ছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, এ রকম সুযোগ তোমরা আর কখনো পাবে না। যদি আমাদের একজন ওপরে উঠে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার ওপর ফেলতে পারে তবে আমরা চিরতরে তাঁর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এ সময় কয়েকজন সাহাবা বর্তমান ছিলেন। এঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক, হযরত ওমর ও হযরত আলী (রা)-ও ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী মারফত তাঁর রাসূলকে দুশমনের এই নাপাক অভিসন্ধি সম্বন্ধে জানিয়ে দেন। তিনি তক্ষুণি সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। মদীনায় উপস্থিত হতেই যুদ্ধের জন্যে তৈরী হন এবং তাদের মুকাবিলার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের গোত্রে গিয়ে ছাউনি ফেলেন। এই ঘটনা ছিল ৪র্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের। তিনি ছয় রাত পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখেন। তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এতটা ভীতি সৃষ্টি করেন যে, তারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন জানায়, আপনি আমাদেরকে এই শর্তে এখান থেকে অন্যত্র যাবার অনুমতি দিন, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে। যতটা পারি উট নিয়ে যেতে পারব। অবশ্য সাথে তারা কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিতে পারবে না। তিনি তাদের আবেদন সে শর্তে কবুল করেন। ফলে তারা তাদের সকল আসবাবপত্র ও রসদসম্ভার যতটা উটের পিঠে চাপিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল, নিয়ে যায়। অতঃপর এ দৃশ্যও দেখা যায়, একজন মানুষ তার সমস্ত ঘর-বাড়ী নিজের হাতেই ভাঙছে, ধ্বসিয়ে দিচ্ছে এবং যতটা সামান উটের পিঠে চাপানো সম্ভব চাপিয়ে রওয়ানা হচ্ছে।[১]

এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নীচের আয়াত নাযিল করেন :

هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য়., ১৯০-১।

اللّٰهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ق فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ.

"কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তিনিই তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর এমন দিক থকে আসল যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে ও মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করেছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

সূরা হাশর : ২ আয়াত]

তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, কিছু লোক সিরিয়ার পানে চলে যায়, আর মুসলমানরা এর ফলে ধোঁকা ও প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও মুনাফিকীর এক বিরাট বড় আড্ডা থেকে নিষ্কৃতি পায়, অথচ লড়াই-সংঘাতের প্রয়োজনও পড়ল না! وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ "যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" তাদের নির্বাসনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সকল ধন-সম্পদ প্রথম দিককার মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

যাতু'র-রিকা যুদ্ধ

হি. চতুর্থ বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ নজদ এলাকার দিকে জিহাদের উদ্দেশে মুখ ফেরালেন। বনী মাহারিব ও বনী ছা'লাবা (গাতাফান গোত্র)-কে কিছুটা শিক্ষা দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। তিনি রওয়ানা হয়ে নাখল' নামক স্থানে অবতরণ করেন। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেন, "আমাদের ছয় জনের মধ্যে একটি মাত্র উট ছিল। ফলে পদব্রজে চলতে গিয়ে সকলের পায়ে ফোস্কা পড়ে যায় এবং পায়ের নখ পর্যন্ত উপড়ে যায়। এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য লোকে নিজেদের পায়ে পট্টি বেঁধে নেয়। এজন্য এ যুদ্ধ গাযওয়া যাতুর-রিকা অর্থাৎ পট্টিওয়ালা যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করে।[১]

---

১. সহীহ বুখারী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বর্ণিত, যাতু'র-রিকা অভিযান শীর্ষক অধ্যায়। ইমাম বুখারী বলেন, যাতু'র-রিকা খায়বরের পর সংঘটিত হয়। হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বর্ণিত।

উভয় পক্ষ একে অপরের কাছাকাছি হয়। কিন্তু ফল যুদ্ধ পর্যন্ত [illegible] লোকে একে অন্য থেকে ভীত ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতু [illegible] আদায় করেন।[১]

এই মুহূর্তে তোমাকে কে বাঁচাতে পারে?

এই যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) দুপুর বেলা একটি বা[illegible] ছায়ায় বিশ্রাম নেন। এ সময় সাহাবায়ে কিরাম পাশাপাশি অন্যান্য বৃক্ষের [illegible] আরাম করবার জন্য চলে যান। তিনি নিজে আপন তলোয়ারখানা গাছের [illegible] লটকিয়ে গাছের ছায়ায় আরাম করতে থাকেন।

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, ইতোমধ্যে আমাদের ঘুম পেয়ে [illegible] আমরা কিছুটা ঘুমিয়েছি। এমন সময় আমরা অনুভব করলাম, রাসূলুল্লাহ [illegible] আমাদেরকে ডাকছেন। আমরা গিয়ে দেখি, এ বেদুঈন তাঁর পাশে বসা। [illegible] বললেন, আমি শুয়ে ছিলাম। এমন সময় সে এই তলোয়ার হাতে উঠিয়ে [illegible] আমি চোখ মেলতেই দেখতে পেলাম সে আমার মাথার ওপর তলোয়ার [illegible] রেখেছে। সে আমাকে বলল : এখন (আমার হাত থেকে) তোমাকে কে [illegible] পারে? আমি বললাম, আল্লাহ! এই দেখ, সে এখন বসে আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন সাজা দেননি।[২]

সংঘর্ষবিহীন অভিযান

হিজরী ৪র্থ বছরে শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের উদ্দেশে র[illegible] হলেন। আবূ সুফিয়ান আজই তারিখ ঠিক করে রেখেছিল। তিনি সেখানে [illegible] ছাউনি ফেলেন, আট রাত সেখানে অবস্থান করেন এবং আবূ সুফিয়ানের অ[illegible] থাকেন। আবূ সুফিয়ানও মুকাবিলার উদ্দেশে বের হয়, কিন্তু ফিরে যাবার [illegible] কল্যাণ দেখতে পায়। সে তার লোকদেরকে বলল, এটা শুষ্ক ও দুর্ভিক্ষের [illegible] আমার ফিরে যাবার ইচ্ছা আর তোমাদেরও ফিরে যাওয়াই ভাল। মোটের [illegible] লড়াই-সংঘর্ষ পর্যন্ত আর ঘটনা গড়ায়নি। আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে [illegible] নষ্টামি থেকে নিরাপদ রাখেন।

দূমাতু'ল-জান্দাল অভিযানেও যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। তিনি নিরাপ[illegible] মদীনায় ফিরে আসেন।[৩]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২০৪।

২. সহীহ বুখারী, কিতাবু'ল-মাগাযী।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ১/২০৯-২১৩।

খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ

(শাওয়ালা ৫ হি.)

৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ হয়।[১] এটি সেই সব ত্বপূর্ণ ঘটনা ও অভিযানের অন্যতম যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ইসলাম ও মানদের ইতিহাস, ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের ভবিষ্যত, দীনে হকের র ও বিস্তার এবং ইসলামের অভিযানের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে ীত হয়েছে। এটি ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং এমন একটি কঠিন পরীক্ষা যার জ্ঞতা মুসলমানদের ইতোপূর্বে তার কখনো হয়নি।

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَـ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ـ هُنَالِكَ ابْتُلِـ
الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে, যখন াদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, সে সময় মুমিনগণ পরীক্ষিত ল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।" [সূরা আহযাব : ১০-১১ আয়াত]

এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ইয়াহূদীরা। ঘটনার বিবরণ এই, বনী নযর ও বনী লের কিছু লোক মক্কায় যায় এবং কুরায়শদের সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে ল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে ও উত্তেজিত করতে শুরু করে। শদের এ ধরনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল এবং তারা বহু আগে থেকেই এর ভোগ করে আসছিল। এজন্য তারা আর সাহস করছিল না। কিন্তু ইয়াহূদীদের নিধি দলটি অবস্থাকে অত্যন্ত অনুকূল ও উপযোগী করে তাদেরকে সামনে রে। তারা এও আশ্বাস দেয়, এ অবস্থায় আমরা আপনাদের সাথেই থাকব তদিন না এই দীনকে জড়েমূলে উৎখাত করতে পারব ততদিন আমরা দম না। এ কথায় কুরায়শরা খুব খুশী হয় এবং তাদের এই আহ্বান কবুল করে। ই এ বিষয়ে একমত হয় এবং যুদ্ধের আনজামে লেগে যায়। প্রতিনিধি দল

---

১. ইবন হিশাম, ২/২১৪।

এখান থেকে বেরিয়ে গাতাফান গোত্রে কাছে যায় এবং তাদেরকেও এই যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। তাদের বিভিন্ন গোত্রের ভেতর ঘুরে ফিরে মদীনার ওপর হামলার নতুন পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তাদের সামনে তুলে ধরে এবং কুরায়শরা যে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধে আসছে সে বিষয়েও সবাইকে জানিয়ে দেয়।[১]

ফলে তাদের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি হয় যার গুরুত্বপূর্ণ শরীক ছিল কুরায়শ, ইয়াহূদী ও গাতাফান গোত্র। তারা আরও কিছু শর্তের ব্যাপারেও একমত হয় যার ভেতর একটি প্রধান শর্ত ছিল, গাতাফান গোত্র এই মিত্র বাহিনীতে ছয় হাজার সৈন্যসমেত অংশ নেবে। এর বিনিময়ে ইয়াহূদীরা গাতাফান গোত্রকে খায়বারের বাগানগুলোর গোটা বছরের ফসল দেবে। মোটের ওপর কুরায়শরা চার হাজার যোদ্ধা একত্র করে গাতাফান করে এবং ছয় হাজার। আর এ সংখ্যা সাকল্যে দাঁড়ায় দশ হাজারে। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় আবূ সুফিয়ানকে।[২]

প্রজ্ঞা মুমিনদের হারানো সম্পদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই সম্মিলিত অভিযানের সংবাদ পেতেই, তারা মুসলমানদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে ফেলবে, এটা বুঝতে পেরে পরিস্থিতির নাযুকতা সম্বন্ধে জানান। মুসলমানরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী হন। তারা এবার মদীনার ভেতরে দুর্গবন্দী থেকে প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে প্রাধান্য দেন। এ সময় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার।

এবার হযরত সালমান ফারসী (রা) মদীনার সামনে[৩] খন্দক (পরিখা) খননের পরামর্শ দিলেন। এটি ছিল ইরানীদের অতি পরিচিত সামরিক কর্মকৌশল। হযরত সালমান (রা) আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইরানে যখন আমরা অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার আশংকা করতাম তখন আমরা তাদের মুকাবিলায় খন্দক খনন করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই অভিমত অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ময়দানে খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন। এটি ছিল সেই খোলা অংশ যেখান থেকে শত্রু মদীনার ভেতরে প্রবেশের সহজ সুযোগ পেতে পারত।[৪]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২১৪।

২. প্রাগুক্ত, ২/২১০-২০।

৩. প্রাগুক্ত, ২/২২৪।

৪. খনন কাজ মদীনার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত শেষ হয়। এর পূর্ব প্রান্ত হাররাহ ওয়াকিমের সঙ্গে করে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত শেষ হয়। এর পূর্ব প্রান্ত হাররাহ ওয়াকিমের সঙ্গে মিলে এবং পশ্চিমের প্রান্ত বাতহান উপত্যকার পশ্চিম থেকে যেখানে পশ্চিমা হাররাতু'ল-ওয়াবরা অবস্থিত। দ্র.মদীনা শহরের চিত্র; আছারু'ল-মাদীনাতি'ল-মুনাওয়ারা, উস্তায আবদুল কুদ্দুস আল-আনসারীকৃত

রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দক খননের কাজ তাঁর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এভাবে ... করে নিলেন যে, প্রতি দশজনের ভাগে চল্লিশ (৪০) হাত খননের দায়িত্ব ...।[১] খন্দকের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫ (পাঁচ) হাজার হাত, গভীরতা সাত থেকে দশ ... এবং প্রস্থ সাধারণত নয় হাতের কিছু বেশি হবে।[২]

...মানদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সাম্যের নতুন স্রোত

রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দক খননের ক্ষেত্রে ও মুসলমানদের সঙ্গে শরীক ছিলেন ... সকলে মিলে পূর্ণ হিম্মত ও কঠিনভাবে এই কাজে আঞ্জাম দেন।[৩] শৈত্য ... ছিল খুব তীব্র। খাদ্যের পরিমাণ ছিল এত কম যাতে কোনক্রমে জীবন রক্ষা ... চলে। কখনও আবার তাও মিলত না। হযরত আবূ তালহা (রা) বলেন, আমরা ...ল্লাহ ﷺ -এর কাছে ক্ষুধার কথা বললাম এবং নিজেদের পেট খুলে ...লাম। সেখানে তখন একটা পাথর বাঁধা ছিল। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ...টের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন। আমরা দেখতে পেলাম সেখানে দু'টো ... বাঁধা।[৪]

এত কিছুর পরেও সবাই ছিলেন উৎফুল্ল। সকলেই আল্লাহ তা'আলার শোকর ... করতেন, ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করতেন, তাঁর প্রশংসা গীত গাইতেন ... তাঁদের মুখে অভিযোগের একটি বাক্যও ছিল না।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের নিকট ...ফ নিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, মুহাজির ও আনসাররা সকাল সকাল ঠাণ্ডার ... খন্দক খননে ব্যস্ত। তাঁদের নিকট গোলামও ছিল না এবং কর্মচারীও ছিল না ... তাঁদের বদলে এই কাজ আঞ্জাম দিত। তাঁদের এই কঠিন পরিশ্রম ও ...-তৃষ্ণা তাঁর যবান মুবারক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দোয়া উচ্চারিত হলো ঃ

اللهم لا عيش الا عيش الاخرة
فاغفر الانصار والمهاجرة

"হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; অতএব, আনসার ও ...জিরদের তুমি ক্ষমা কর।"

এ কথা শুনে উত্তরে তাঁরা বললেন :

نحن الذين بايعوا محمدا ـ على الجهاد ما بقينا ابداً.

---

১. ...রাত ইবন কাছীর, ১৯২।

২. ...ওয়াতুল-আহযাব, উস্তাদ আহমদ বাশমীলকৃত।

৩. ...রিত দ্র. সীরাত ইবন হিশাম, ৪১৬।

৪. ...রমিযী; আল্লামা তীবী মিশকাতের ব্যাখ্যায় লেখেন, সেই যুগে আরবে রেওয়াজ ছিল, তাকে ক্ষুধায় কষ্ট ...ত। ফলে পেট চুপসে যেত। সে নিজেকে খাড়া রাখার জন্য পেটে পাথর বাঁধত, মিশকাত-৪৪৮।

"আমরা তো তারাই যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমাদের জীবন প্রদীপ থাকা পর্যন্ত জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেছি।"[১]

হযরত আনাস (রা) আরও বর্ণনা করেন, কোথাও থেকে এক মুষ্টি যব মিলে গেলে তার মলীদা (পানির দ্বারা দলিত ময়দা বা আটা পিণ্ড) বানানো হতো এবং এতে অল্প পরিমাণ চর্বি মিশিয়ে নেয়া হতো, অথচ তার স্বাদ ও গন্ধে সবটার ভেতরই পার্থক্য দেখা দিত।

সঙ্কট সন্ধিক্ষণ ও অবরোধের আঁধারে ইসলামী বিজয়ের আলোকরশ্মি

খন্দক খনন করা কালে এক জায়গায় একটি বিরাট আকারের পাথর সামনে পড়ল। কোদাল পাথরের কাছে হার মানায় সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে জানালেন। পাথরটি দেখার পর তিনি নিজেই কোদাল তুললেন এবং বিসমিল্লাহ্ বলে এমন জোরে পাথরে আঘাত করলেন যে, পাথরের এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেল। তিনি তখন বললেন, আল্লাহু আকবার! আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি অপর তৃতীয়াংশও ভাঙলেন এবং বললেন : আল্লাহু আকবার! আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছও দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের চোখে মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। এরপর তৃতীয় বারের মত বিসমিল্লাহ্ বলে বাকি অংশের ওপর আঘাত করতে পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ আকবার! আমাকে য়ামানের চাবিগুচ্ছও দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! এক্ষণে আমি এই জায়গায় সান'আ' শহরের দরজা দেখতে পাচ্ছি।[২] এই কথা তিনি তখন বলেছিলেন যখন মুসলমানদের নিজেদের নিরাপদে বেঁচে যাওয়াটাই নিশ্চিত ছিল না। একদিকে ক্ষুধা তাঁদেরকে ক্লান্ত ও কাহিল করে তুলছিল, অপরদিকে তীব্র শৈত্য প্রবাহ তাঁদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছিল। তৃতীয়ত, শত্রু ছিল মাথার ওপর।

খন্দক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি মু'জিযা

এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি মু'জিযা প্রকাশ পায়। মুসলমানরা যখন খন্দক খনন করতে কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীন হতেন অথবা এ ধরনের কোন বাধা সামনে এসে দেখা দিত তখন তিনি কোন পাত্রে পানি চাইতেন। এরপর তিনি তাতে কুলি করতেন এবং যা কিছু আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়ে বলাতেন তা দিয়ে দু'আ করতেন। এরপর উক্ত পানি পাথরের ওপর ছিটিয়ে দেয়া হতো তখন তা বালির টিবির মত নরম হয়ে যেত।[৩]

---

১. সহীহ বুখারী, আনাস (রা) বর্ণিত, কিতাবুল-মাগাযী, খন্দক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

২. বায়হাকী, বারা'আ ইবন আযিব আল-আনসারী (রা) বর্ণিত।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২১৭-২১৮।

খাবারে এমন খোলামেলা বরকত হতো যে, অল্প খাবারও বিরাট সংখ্যক লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কেবল যথেষ্টই হতো না, বরং সমগ্র বাহিনীই পরিতৃপ্ত হয়ে যেত।

হযরত জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা খন্দকের দিন খননের কাজ করছিলাম। এমন সময় বিরাট বড় এক শক্ত পাথর সামনে এসে দেখা দিল। সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং বললেন, এই একটি বিরাট বড় শক্ত পাথর সামনে এসে দেখা দিয়েছে যা খন্দক খননে বাধার সৃষ্টি করছে। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি নামছি। এরপর তিনি এমন অবস্থায় নামলেন যে, তাঁর পেটে তখন একটি পাথর বাঁধা। সে সময় আমাদের অবস্থা ছিল এ রকম যে, তিনদিন যাবত আমাদের পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কোদাল তুললেন এবং ঐ পাথরের ওপর মারলেন। মারার সাথে সাথেই পাথরটি বালির মতই ধ্বসে গেল। আমি আরজ করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছুক্ষণের জন্য আমাকে আমার ঘরে যাবার অনুমতি দিন। (অনুমতি পাবার পর) ঘরে গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, দেখার ধৈর্য আমার নেই। তোমার কাছে কি খানাপিনার মত কিছু আছে? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, কিছু যব আছে আর আছে একটি বকরীর বাচ্চা। আমি বকরীর বাচ্চাটাকে যবেহ করলাম, যব পিষলাম এবং এক ডেকচিতে গোশত চড়িয়ে দিলাম।

আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যাচ্ছি তখন আটা মাখা হয়ে গিয়েছিল। ডেকচি ছিল চুলার ওপর। রান্না প্রায় শেষ হওয়ার পথে। আমি ফিরে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, আমি অল্প কিছু খানার ব্যবস্থা করেছি। আপনি দুই-একজনকে সাথে নিয়ে মেহেরবানী করে চলুন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, খানার পরিমাণ কতটা হবে? আমি বিস্তারিত বললাম। শুনে তিনি বললেন, এ তো অনেক বেশি! ঠিক আছে তুমি ঘরে গিয়ে বল, আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা থেকে যেন না নামায় এবং উনুন থেকে রুটিও যেন বের না করে! এরপর তিনি সকলকে ডেকে বললেন, লোক সকল! বিসমিল্লাহ। অতঃপর সমস্ত মুহাজির ও আনসার দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম এবং বললাম, খবর রাখ কিছু? ওদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল আনসার, মুহাজির ও সাথে যত লোক ছিল সবাইকে সাথে করে আসছেন। স্ত্রী বললেন, খাবারের ব্যাপারে তিনি কি কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন? জাবির (রা) বললেন, হ্যাঁ। (ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে উপস্থিত হয়ে) বললেন, লোক সকল! তোমরা ভেতরে ঢোক আর ভিড় করো না। এরপর তিনি রুটি টুকরো করে এক একটি টুকরোর ওপর গোশত দিলেন আর একজনকে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর গোশত ও রুটি নেবার পর ডেকচি ও উনুন ঢেকে দিচ্ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের সামনে গোশ্‌ত রুটি

পেশ করছিলেন। এরপর কাপড় সরিয়ে পূর্বের মতই রুটি ছিঁড়তেন, গোশ
নিতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে দিতেন। শেষে সবার পেট ভরে গেল এব
এরপর খাবার বেঁচে গেল। এরপর তিনি জাবির (রা)-এর স্ত্রীকে বললেন, এখন
তুমি খাও এবং অন্যদেরকেও খেতে দাও। কেননা সকলেই এখনও ক্ষুধা ও
অনাহারে রয়েছে।[১]

অপর এক বর্ণনায় হযরত জাবির (রা) থেকে এ কথাও উদ্ধৃত হয়েছে, আমি
হুযুর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আস্তে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আমরা একটা জানোয়ার যবেহ করেছি আর আমাদের কাছে অল্প কিছু যব ছিল যা
পিষেছি। আপনি সাথে দুই-একজনকে নিয়ে চলুন। (একথা শুনতেই) তিনি
সজোরে ডাকলেন : খন্দকবাসি! জাবির এক বিরাট দাওয়াতের ইন্তেজাম
করেছে।[২]

কঠিন পরীক্ষা

কুরায়শরা সামনে এগিয়ে এসে মদীনার কাছে ছাউনি ফেলল। তাদের সৈন্য
সংখ্যা ছিল দশ হাজার। গাতাফান গোত্র ও তাদের অধীন গোত্রসমূহসহ ঐ জায়গায়
থানা গড়ল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন হাজার মুসলমানসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশে
রওয়ানা হলেন। খন্দক ছিল এই উভয় বাহিনীর মাঝ বাধাস্বরূপ। মুসলমান ও
কুরায়জা গোত্রের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। বনূ নাদীরের সর্দার হুয়াই ইবন আখতাব
তাদের কথায় পড়ে গোত্রের লোকদের চুক্তি ভঙ্গে উৎসাহিত করল। বনী কুরায়জা
কিছুটা অস্বীকৃতি ও দ্বিধার সঙ্গে এই কাজের প্রতি সমর্থন দেয়। এর ফলে ভীতি ও
সন্ত্রাস সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মুনাফিকরাও সুযোগ বুঝে হাত-পা মেলতে শুরু
করল। (এরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধারণা করলেন, এ অবস্থায়
গাতাফান গোত্রের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি ও সমঝোতা করা ভাল হবে, মদীনায়
উৎপন্ন ফলের এক-তৃতীয়াংশ সব সময় তাদেরকে দেয়া হবে।

আর এ ধারণার পেছনে আনসারদের প্রতি মমত্ববোধ ও সহানুভূতিই ছিল
একমাত্র কারণ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধারণায় যুদ্ধের দরুন আনসারদের
ওপর সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ছে। কাজেই তিনি তাদেরকে আরও বেশি পরীক্ষার
মাঝে ফেলতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আওস ও খাযরাজ দলপতি সাদ ইবন মুআয ও
সাদ ইবন উবাদা (রা)-এর হিম্মত ও অটুট মনোবল এবং তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ও
একাগ্রতায় তিনি স্বীয় মত দিলেন। তাঁরা বললেন, যে সময় আমরা শির্ক ও মূর্তি
পূজার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম, যখন না আমরা আল্লাহর ইবাদত করতাম

---

১. সহীহ বুখারী, খন্দক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

২. সহীহ বুখারী।

...র না তাঁকে চিনতাম, সে সময়ও আমরা খেজুরের একটি দানাও (খানাপিনার ...ফত[1] ও কেনা-বেচা ছাড়া) তাদেরকে দেয়ার জন্য তৈরী ছিলাম না। আর এখন ...ন আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ধন্য ও মেহেরবানী করেছেন, তিনি ...াদেরকে হেদায়াত দান করেছেন, আপনার পবিত্র সত্তা ও ইসলাম দ্বারা ...াদেরকে সম্মানিত করেছেন তখন আমরা তাদেরকে আমাদের মাল-সম্পদ কেন ...? আল্লাহর কসম! আমাদের এর কোনই প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে ...দের জন্য তলোয়ার ছাড়া আর কিছু নেই যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের ও ...াদের মাঝে ফয়সালা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বললেন, ...মাদের ইচ্ছাই পূরণ করা হবে।

...ফির ও মুসলিম বীরের শক্তি পরীক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথে সমস্ত মুসলমানই সেখানে (ছাউনি ফেলে) ...স্থান নিলেন। দুশমন তাঁদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল, কিন্তু অবস্থা তখনও ... পর্যন্ত গড়ায়নি। অবশ্য শত্রুর দুই-একজন অশ্বারোহী সৈনিক ঘোড়া ছুটিয়ে ...নে এগিয়ে এসে খন্দক প্রান্তে এসে থেমে গেছে। তারপর গভীর খন্দক দেখে ...বলি করেছে, এ যে দেখছি এক নতুন কৌশল, নতুন জাল বিছানো হয়েছে, ... যার সঙ্গে পরিচিত নয়! এরপর এভাবে তাদেরই একটি দল খোঁজ করতে ...তে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যেখানে খন্দকের প্রশস্ততা ছিল খুবই কম। ...খানে পৌঁছে তারা ঘোড়ার পাঁজরে গুঁতা মারতেই ঘোড়া এক লাফে খন্দক ...রিয়ে চলে এল এবং মদীনার ভূখণ্ডে দৌড়ে বেড়াতে লাগল। এই দলের মধ্যে ...বের প্রখ্যাত অশ্বারোহী বীর 'আমর ইবন আবদূদও ছিল যাকে এক হাজার ...রোহী সৈনিকের সমকক্ষ মনে করা হতো। সে এক স্থানে থেকে হাঁক ছাড়ল, ...ছে এমন কেউ যে আমার মুকাবিলা করবে? এটা শুনে হযরত আলী (রা) তার ...নে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমর! তুমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার ...ছিলে, কুরায়শদের কেউ তোমাকে দু'টো বিষয়ে দাওয়াত দিলে তার একটি ...মি অবশ্যই কবুল করবে। 'আমর স্বীকার করল এবং বলল, হ্যাঁ, আমি এ কথা ...ছিলাম। হযরত আলী (রা) বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে আল্লাহর তাঁর ...লের ও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। সে বলল, আমার এর কোন প্রয়োজন ...। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে আমি তোমাকে মুকাবিলার দাওয়াত ...। সে তখন বলতে লাগল, ভাতিজা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে হত্যা ...তে চাই না। হযরত আলী (রা) বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! তোমাকে আমি ...শ্যই হত্যা করতে চাই।

---

[1] ...ছে এ সময় খানার জন্য سور শব্দ এসেছে। এ সম্বন্ধে আল্লামা তাহির পাটনী "মাজমা'উ" বিহারিল ...ওয়ার"-এ লিখেছেন, শব্দটি ফারসী, বিয়ে উপলক্ষে বিরাট দাওয়াত বোঝাতে ব্যবহৃত।

এ কথা শুনে আমরের রক্ত গরম হয়ে গেল। সে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল এবং তার বুরুশ কেটে দিল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সে তার মুখে সজোরে এক থাপ্পর মারল। এরপর সেই অবস্থায় হযরত আলী (রা)-এর দিকে ফিরল।

শুরু হলো শক্তি পরীক্ষা। কিছুক্ষণ উভয়েই আপন আপন রণনৈপুণ্য ও তলোয়ার চালনার অপূর্ব কৌশল দেখাল। অতঃপর হযরত আলী (রা) আমরের ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।[১] আমরের সঙ্গী অপর ঘোড়সরওয়ারের নাম ছিল নাওফল ইবন মুগীরা। সে এসব দেখে লাফিয়ে খন্দক পার হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য মায়ের অনুপ্রেরণা দান

উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) সে সময় বনী হারিছার দুর্গে অন্য মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। তখন পর্যন্ত পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি। তিনি বর্ণনা করেন, সাদ ইবন মু'আয (রা) একদিন দুর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন এত ছোট লৌহবর্ম পরেছিলেন যে, তাঁর গোটা হাতটাই ছিল এর বাইরে। তিনি রণসঙ্গীত গাইতে গাইতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে এ অবস্থায় দেখে বললেন, বেটা! তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছ, তাড়াতাড়ি যাও। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি তাকে বললাম, উম্মু সা'দ (সা'দ-এর মা)! আল্লাহর কসম, আমার মন বলছে, সা'দ-এর লৌহবর্ম এর চেয়ে যদি আরেকটু বড় হতো। অতঃপর তাই হলো যার আশঙ্কা হযরত আয়েশা (রা) প্রকাশ করেছিলেন। এই খোলা হাতের ওপর একটা তীর এমনভাবেই এসে লাগল যে, তাতে হাতের মূল শিরাটাই কেটে গেল। ফলে তিনি এই আঘাতে বনী কুরায়জা অভিযানে শাহাদাতবরণ করেন।[২]

গায়বী মদদ

মুশরিকরা মুসলমানদেরকে এভাবে ঘিরে ফেলে যেভাবে কোন দুর্গে কোন বাহিনীকে অবরুদ্ধ করা হয়। এই অবরোধ প্রায় এক মাস কাল চলতে থাকে। ইতোমধ্যে তাদেরকে সব রকমের মুসীবত ও তকলীফের মুখোমুখি হতে হয়। এ সময় মুনাফিকদের মুনাফিকীও জাহির হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মদীনায় ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে। আর এজন্য বাহানা পেশ করে, তাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, অথচ ব্যাপার তা ছিল না। সকলের ঘরই নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল। এ ছিল কেবল পালাবার ফন্দি মাত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ ভয় ও পেরেশানীর মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গাতাফান গোত্রের নু'আয়ম ইবন মাসঊদ তাঁর খেদমতে হাজির

---

১. ইবন কাছীর ৩/২০২-৩।

২. প্রাগুক্ত, ৩/২০৭।

হন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার কওম আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানে না। এখন আপনার ইচ্ছা মাফিক হুকুম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একলা মানুষ। তুমি ওখানে থেকেই আমাদের সাহায্য কর। যুদ্ধ চাতুরী বা কৌশলের নাম। নু'আয়ম ইবন মাসউদ (রা) সেখানে থেকে বিদায় নিয়ে বনী কুরায়জার কাছে গেলেন এবং তাদের সঙ্গে এমন কিছু কথাবার্তা বললেন, তাদের নিজেদের গৃহীত অবস্থান ও নীতির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তাদের মনে এই সন্দেহ দেখা দেয়, কুরাইশ গাতাফান গোত্রের সঙ্গে (যারা বাইরের লোক) তাদের এই সম্পর্ক ও মাখামাখি এবং মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গে (যারা স্থানীয় বাসিন্দা ও তাদের পুরনো প্রতিবেশী) তাদের এই একতা কতটা ঠিক হচ্ছে! নু'আয়ম (রা) তাদেরকে এও পরামর্শ দিয়েছিলেন, কুরায়শ ও গাতাফানের সমর্থনে লড়াই করবার পূর্বে তাদের কিছু বিশিষ্ট লোক ও সর্দারকে তাদের (বনূ কুরায়জার) জামিন হিসাবে রেখে দেয়া ভাল যাতে তাদের ওপর ভরসা করা যায়। তারা এ কথা শুনে বলল, আসলেই তুমি আমাদেরকে খুবই ভাল কথা শুনিয়েছ।

এরপর তিনি সেখান থেকে উঠে কুরায়শ নেতৃদের কাছে যান এবং নিজেকে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও কল্যাণকারী হিসাবে তুলে ধরার পর বলেন, ইয়াহূদীরা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। তারা এখন ভাবছে, কুরায়শদের কিছু অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় লোক বন্ধক হিসাবে তাদের হাতে থাকুক যাতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কোনরূপ আশঙ্কা না থাকে। তাদের ইচ্ছা, এই নেতৃদেরকে তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতে তুলে দেবে এবং তিনি তাদের মাথা তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। এরপর তিনি গাতাফান-এর কাছে গেলেন এবং তাদেরকেও তাই বললেন যা তিনি কুরায়শদেরকে বলেছিলেন। ফল দাঁড়াল, উভয় পক্ষ পরস্পর সম্পর্কে সতর্ক ও সজাগ হয়ে গেল এবং তাদের মনে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে গভীর ঘৃণা দেখা দিল। সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং পরস্পর পরস্পরকে ভয় পেতে লাগল। অতঃপর যখন আবূ সুফিয়ান ও গাতাফান গোত্রের নেতৃরা যখন চূড়ান্ত যুদ্ধের সূচনা করতে চাইল তখন ইয়াহূদীরা তালবাহানা করতে শুরু করল এবং তাদের কিছু লোক জামিন হিসাবে চেয়ে বসল। এ কথা শুনতেই তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল, নু'আয়ম ইবন মাসউদ (রা) যা কিছু বলেছিল তা ঠিকই এবং তা অক্ষরে হরফে সত্যি! তারা এই দরখাস্ত গ্রহণ করতে পরিষ্কার অস্বীকার করল। অপরদিকে ইয়াহূদীরাও অনুমান করতে পারল, তাঁর কথা সত্য ছিল। আর এভাবেই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্পে ভাটা পড়ল এবং ঐক্য ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার মদদ দেখা দিল। কাফির মুশরিকদের ফৌজ ও ইসলাম দুশমনদের বাহিনীর ওপর শীতের রাত এমন প্রবল শৈত্য প্রবাহ শুরু হলো না, তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে গেল, ডেকচিগুলো উল্টে গেল। এ দেখে আবূ

সুফিয়ান বলল, কুরায়শগণ! এখন আর এখানে থাকার মত অবস্থা নেই। আমাদের খচ্চর ও ঘোড়াগুলো শেষ হয়ে গেছে। বনূ কুরায়জা আমাদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে এবং খুবই ভয়ংকর ও কষ্টদায়ক খবর আমরা তাদের সম্পর্কে পেয়েছি এই প্রবল শৈত্য প্রবাহ যে কেয়ামত সৃষ্টি করেছে তাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডেকচি পর্যন্ত চুলার ওপর টিকছে না। আগুন জ্বালাতে কষ্ট হচ্ছে। আমাদের কোন অবস্থান ও আশ্রয়স্থলই নিরাপদ ও অক্ষত নেই। এখন এখান থেকে বেড়িয়ে পড় আমি ফিরে যাবার ইচ্ছা করেছি। এই বলে আবূ সুফিয়ান তার বাঁধা উটের নিকট গেল, তার পিঠে চড়ে বসলেন, পাশে গুঁতা মারল। অতঃপর উট খাড়া হতেই তিনি এর রশি খুলে দিল।

কুরায়শরা স্বদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে, গাতাফান এই খবর পেতেই নিজেরাও যে যার বাড়িঘরের পথ ধরল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় নামায পড়ছিলেন। হুযায়ফা ইবনুল-য়ামান (রা) [যাঁকে তিনি সম্মিলিত বাহিনীর ভেতর গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারেন] এ সময় ফিরে আসেন। তিনি যা কিছু দেখেছিলেন সে সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন।[১]

ভোর হতেই তিনি খন্দক ছেড়ে মদীনা চলে যান। মুসলমানরাও ফিরে এল এবং যে যার অস্ত্র রেখেছিল।[২] কুরআন করীম এই ঘটনা সম্বন্ধে নীচের বর্ণনা প্রদান করে :

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু ও এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।" [সূরা আহযাব : আয়াত ৯]

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا.

---

১. সহীহ মুসলিম, গাযওয়াতুল-আহযাব শীর্ষক অধ্যায়, ইবন ইসহাক কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে।

২. বিস্তারিত বর্ণনা সীরাত ইবন কাছীর, ৩/২১৪ দ্রষ্টব্য।

"আল্লাহ্ পাক কাফিরদেরকে রাগান্বিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" [সূরা আহযাব : ২৫ আয়াত]

এভাবে যে মেঘ বিরাট জোরেশোরে উঠেছিল তা গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক দেখিয়ে কোনরূপ বর্ষণ ছাড়াই উড়ে যায় এবং মদীনার আকাশ মুক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ বছরের পর কুরায়শরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণে উদ্যত হবে না, বরং তোমরাই তাদের ওপর হামলা করবে।[১]

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের সব চেয়ে বেশী হলে সাতজন শহীদ হন এবং মুশরিকদের চারজন নিহত হয়।

১. প্রাগুক্ত, ৩/২২১।

বনী কুরায়জা যুদ্ধ

(৫ম হিজরী)

বনী কুরায়জার চুক্তিভঙ্গ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় তশরিফ এনেছিলেন তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এমন একটি চুক্তিনামা করেছিলেন যেই চুক্তিনামায় ইয়াহূদীদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গেও পারস্পরিক চুক্তি করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে তাদের ধর্ম ও ধন-সম্পদের হেফাজতের যিম্মাদারী গ্রহণ করা হয়েছিল। এজন্য কিছু শর্ত তাদের অনুকূলে আরোপ করা হয়েছিল আর কিছু শর্ত তাদের ওপর চাপানো হয়েছিল। এই চুক্তিনামার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

"ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা আমাদের সহযোগী হবে তাদের সাথে সাহায্য-সহযোগিতা ও সাম্যের আচরণ করা হবে। তাদের ওপর জুলুম করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করা হবে না। মদীনার কোন মুশরিক কুরায়শদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় যেমন দেবে না, তেমনি কোন মু'মিন মুসলমানের মুকাবিলায় তার জন্য বুকও পেতে দেবে না। ইয়াহূদীরা লড়াইয়ের ময়দানে যতদিন শরীক থাকবে মুসলমাদের মতই যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। ইয়াহূদীদের বিভিন্ন গোত্র[১] মুসলমানদের সঙ্গে একই জাতিগোষ্ঠীর মত বসবাস করবে। ইয়াহূদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে, মুসলমানরাও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। তারা তাদের অধীনস্থ গোলাম ও নিজেদের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন থাকবে।"

অঙ্গীকারপত্রে এও ছিল, এই অঙ্গীকারনামা ও লিখিত চুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করা বাধ্যতামূলক হবে বৈধ ও ঐশী আনুগত্যের সীমারেখার ভেতর কল্যাণ কামনা, নিষ্ঠা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার মনোভাব পোষণ করবে। ইয়াছরিবের ওপর বহিঃশত্রুর হামলা হলে সকলে সম্মিলিতভাবে তার মুকাবিলা করবে।[২] কিন্তু বনী নাযীর-এর সর্দার হুয়াই ইবন আখতাব ইয়াহূদী বনী কুরায়যাকে মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে এবং কুরায়শদের সঙ্গে ঐক্য ও বন্ধুত্ব স্থাপনে

---

১. এই চুক্তিপত্রে যেসব য়াহূদী গোত্রের নাম ছিল তারা হলো বনী আওফ, বনী সায়েদা, বনী জুশাম, বনী আল-আওস ও বনী ছা'লাবা।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২/৫০৩-৪।

উৎসাহী করে তোলে, অথচ তাদের সর্দার কা'ব ইবন আসাদ আল-কুরাজী বলেছিল, আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর ভেতর সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া আর কিছু দেখিনি। যা-ই হোক, কা'ব ইবন আসাদ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভেতর যা কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চুক্তি ভঙ্গের কথা জানতে পেরেই আওস গোত্রের সর্দার হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-কে (আওস ছিল বনূ কুরায়জার মিত্র) ও খাযরাজ গোত্রের সর্দার সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে আনসারদের কিছু লোকসহ এই সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠান। তাঁরা সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তাঁরা যতটা শুনেছেন অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। কুরায়জার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অশোভন কথাবার্তা বলে এবং তিক্ত ভাষায় বলতে থাকে, কিসের আল্লাহর রাসূল? আমাদের ও মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝে কোন চুক্তি নেই।[১]

তারা রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেয় এবং মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাত করতে চেষ্টা চালায়।[২] এ ধরনের কাজ প্রকাশ্য ও খোলাখুলি আক্রমণ এবং সামনাসামনি যুদ্ধের থেকেও অনেক বেশি কঠিন ও বিপজ্জনক। এ ধরনের অবস্থার চিত্র অংকন করা হয়েছে কুরআনুল-কারীমের নীচের আয়াতে :

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ.

"আর তারা যখন তোমাদের ওপর ও নীচের দিক থেকে আক্রমণ উদ্যত হলো।" [সূরা আহযাব : ১০ আয়াত]

মুসলমানদের জন্য এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটময় এবং এ অবস্থা স্বাভাবিকভাবে সকলেই বুঝতে পারে। এ অবস্থা আমরা এ থেকেও অনুমান করতে পারি, সা'দ ইবন মু'আয (রা), যিনি তাদের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ, বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতাকারী ও রোগে-শোকে সহানুভূতিশীল ছিলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় তাঁর কাঁধে একটি তীর লাগে, এর ফলে সেখানকার একটি নায়ুক ও গুরুত্বপূর্ণ শিরা কেটে যায়। তিনি যখন তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত জানলেন তখন তিনি এই

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২১০-২৩।

২. মন্টগোমারী ওয়াট-এর বই Cambridge History of Islam-এ বলা হয়েছে, মদীনা মুনাওয়ারায় একটি বড় গোত্র বাকী থেকে গিয়েছিল। এটি ছিল বনী কুরায়জা। মুশরিকরা যখন মদীনা অবরোধ করেছিল তখন এরা মুসলমানদের সঙ্গে নিষ্ঠা ও বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটাত। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই, তারা গোপনে মুশরিকদের সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল এবং পেছন থেকে আঘাত করবার জন্য প্রথম সুযোগের অপেক্ষায় ছিল (১ম খ., ৪৯ পৃ.)।

দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ না আমার চোখ বনী কুরায়জার ধ্বংস দেখে শীতল হয়।[১]

বনী কুরায়জা অভিমুখে অভিযান

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে নিয়ে যখন খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং মদীনায় পৌঁছে মুসলমানরা সবাই অস্ত্র রেখেছিলেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ) এলে রেখে দেননি এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এতে হযরত জিবরাঈল বললেন, ফেরেশতারা এখনও তাদের অস্ত্র রেখে দেননি। আল্লাহ পাক আপনাকে বনী কুরায়জার উদ্দেশে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি যাতে তাদের ভেতর ভীতি ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ঘোষককে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে ঘোষণা দিতে বললেন, মুসলমান মাত্রই যেন যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং আসরের নামায বনী কুরায়জা পল্লীতে গিয়ে পড়ে![২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী কুরায়জা পল্লীতে পৌঁছেই তাদেরকে অবরোধ করলেন আর এই অবরোধ চলল পঁচিশ দিন ধরে। অবশেষে অবরোধের কারণে তারা অস্থির হয়ে উঠল। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করলেন।[৩]

অনুতপ্ত ও লজ্জিত আবূ লুবাবা ও তাঁর তওবার কবূলিয়ত

ইতোমধ্যে বনী কুরায়জা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বার্তা পাঠায়, আপনি আমাদের কাছে বনী আমর ইবন আওফকে পাঠিয়ে দিন[৪] (এরা আওস গোত্রের মিত্র ছিল) যাতে আমরা আমাদের ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি। তাদের আবেদনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ লুবাবা (রা)-কে সেখানে পাঠালেন। তাঁকে দেখতেই কুরায়জার নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে যায় এবং মহিলা ও শিশুরা চিৎকার করে

---

১. হযরত সা'দ (রা) জনৈক কুরায়শীদের তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, বনী কুরায়জার কারো আঘাতে নয়। সহীহ বুখারীতে তার নাম ইবনুল-গারাকা কুরায়শী বলা হয়েছে। এজন্য একথা মনে করা ঠিক হবে না, ঐ তীরের আঘাতের কারণে তিনি বনী কুরায়জার প্রতি কুপিত ছিলেন এবং এর জন্যে তিনি তাদের প্রতি এই কঠোর ফয়সালা দিয়েছিলেন।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২৩৩-৩৪।

৩. সহীহ বুখারীতে এই ঘটনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে مرجع النبي ﷺ من الاحزاب ومخرجه الى بنى قريظة ومحاصرته اياهم শীর্ষক অধ্যায়ের বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে কিতাবুল-জিহাদ ওয়া'স-সিয়ার قتال من نقض العهد وجواز انزال الحصن على حكم عادل حكيم اهل للعدل. অধ্যায়ে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

৪. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২৩৫।

কাঁদতে থাকে। এ দেখে আবূ লুবাবার মন কিছুটা নমনীয় হয়। এরপর ঐ সমস্ত লোক বলতে লাগল, আবূ লুবাবা! আমরা কি মুহাম্মদ ﷺ-এর ফয়সালা মাথা নীচু করে মেনে নেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সেই সঙ্গে তিনি গলার দিকে ইশারা করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, তাদের গলায় ছুরি চালানো হবে। আবূ লুবাবা (রা) বলেন, আমি সেখান থেকে সরিও নি এমন সময় আমার মনে হলো, (গোপনীয়তা প্রকাশ করে) আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করেছি। অতঃপর তিনি তখনই ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত না হয়ে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলেন এবং ঘোষণা করেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্থান ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আল্লাহতাআলা আমার অপরাধ ক্ষমা করেন। তিনি আল্লাহতা'আলার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেন, তিনি ভবিষ্যতে বনী কুরায়জা এলাকায় পাও রাখবেন না এবং সেই জায়গার চেহারাও দেখবেন না যেখানে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করেছিলেন।

অতঃপর আল্লাহতাআলা তাঁর তওবা কবুল করেন এবং এই আয়াত নাযিল করেন :

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও অন্য একটি বদ কাজ। শীঘ্রই হয়ত আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"

[সূরা তওবাহ : ১০ আয়াত]

এই আয়াত নাযিল হতেই লোকেরা তাঁর হাতের বাঁধন খোলার জন্য তৎক্ষণাৎ দ্রুত বেগে ধাবিত হলো। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, না, কখনও নয়। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে তাঁর মুবারক হাতে আমাকে মুক্ত করবেন আমি এই অবস্থায় থাকব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের জন্য বাইরে তশরীফ নিলেন এবং তাঁর কাছ দিয়ে গেলেন তখন তাঁর বাঁধন খুললেন। তিনি খেজুরের একটি খুঁটির সঙ্গে প্রায় বিশ রাত বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। প্রতিটি সালাতের সময় তাঁর স্ত্রী আসতেন এবং সালাতের জন্য তাঁকে বন্ধনমুক্ত করতেন। সালাত শেষ হতেই তিনি আবার নিজেকে বেঁধে নিতেন।[১]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২৩৬-৩৮।

সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর সত্যপ্রীতি ও অটল সিদ্ধান্ত

বনূ কুরায়জা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা মেনে নেয়। কিন্তু আওস গোত্রের মনে বনূ কুরায়জার জন্য সহানুভূতি কাজ করছিল। তারা দ্রুত বেগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল এবং বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাযরাজের মুকাবিলায় আমাদের তাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে আর তারা আমাদের ভাইয়ের মিত্র (অর্থাৎ বনী কায়নুকা')-দের সঙ্গে মিলে যা করেছে, আপনার তা জানা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বললেন, আওসের লোক সকল! তোমরা কি এ ব্যাপারে রাজি আছ তোমাদেরই কোন লোক তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দিক। তারা সমস্বরে বলল: জ্বী, হ্যাঁ, আমরা তৈরী। তিনি তখন বললেন, আমি এ দায়িত্ব সা'দ ইবন মু'আযকে সোপর্দ করতে চাচ্ছি। তাঁকে ডাকা হলো। তিনি যখন আসলেন তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা বলল, আবূ 'আমর! আপন মিত্রের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার হাতে এই মামলা এজন্যই সোপর্দ করেছেন যাতে আপনি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। তারা যখন এ ব্যাপারে বেশি পীড়াপীড়ি করতে থাকল তখন তিনি বললেন, সা'দ ভাগ্যক্রমে এই সুযোগ পেয়েছে, আজ তাঁকে ঐশী নির্দেশের সামনে হাজির হতে হচ্ছে যে মুহূর্তে কারো গালাগালের পরওয়া তিনি করবেন না। হযরত সা'দ (রা) বললেন, আমি এই ফয়সালা দিচ্ছি, পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, তাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করা হোক, শিশু ও মহিলাদেরকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা হোক। (এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ফয়সালা করেছ।[১]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২/২৩৯-৪০; মুসলিম শরীফের বাক্য এই রকম : ... بحكم الله وربما قال بحكم الملك। অর্থাৎ তুমি আল্লাহর বিধান মুতাবিক ফয়সালা করেছ এবং সম্ভবত তিনি ... বলেছিলেন, মহারাজাধিরাজের ফয়সালা মুতাবিক ফয়সালা করেছ। মশহুর বর্ণনা যেরসহ আর ... উল্লিখিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা যবরসহ আর এ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে ... হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা যে ফয়সালা নিয়ে এসেছিলেন সেই মুতাবিক ... ফয়সালা করেছ (সহীহ মুসলিম, كتاب الجهاد والسير جوار قتال من نقض العهد শীর্ষক অধ্যায় ...) নিহতদের সংখ্যা ছিল আট শত (মালি, ইবন কাছীর, ২/১২৭)।

কোন কোন সমসাময়িক লেখক মদীনার মত ছোট্ট শহর ও দয়ার নবী করুণার ছবির উদার ... নিরিখে ঐতিহাসিক সূত্রের পরিবর্তে অনুমাননির্ভর যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে এই সংখ্যাকে ... অসম্ভব বলেছেন। দেখুন ড. বারাকাত আহমদ-এর Muhammad and the Jews শীর্ষক ...

এই ঘটনা সম্পর্কে (যা ইয়াহূদীদের ধর্মীয় চেতনাকে প্রভাবিত করে) ইয়াহূদী উৎসগুলোও ... স্যামুয়েল স্যাক নামক একজন ইয়াহূদী লেখক খৃষ্টীয় ১৬ শ' শতাব্দীতে "মা'আছির হুদায় ..." নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু তিনি বনী কায়নুকা ও বনী নাযীর-এর মদীনা নির্বাসন এবং বনী কুরায়জার যুদ্ধবাজদের হত্যার কথা উল্লেখ করেননি।

ইসরাঈলী শরীয়ত (ধর্মীয় বিধান) মুতাবিক শাস্তি

এই ফয়সালা ছিল ইসরাঈলের শরীয়তের সামরিক বিধি মুতাবিক। তাওরাতের ১১-১৩ আয়াতে আছে :

"যখন তুমি কোন নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার কাছে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবে। তাহাতে যদি সে সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দেয় তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায় তাহারা তোমাকে কর দিবে এবং তোমার দাস হইবে। কিন্তু যদি সে সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গধারে আঘাত করিবে; কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা, পশুযুগল প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুটের দ্রব্য আপনার জন্য লুটস্বরূপ গ্রহণ করিবে আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবে" (দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ২০, আয়াত ১০-১৪, পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা-১৯৭৩)।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই এ নিয়মই প্রচলিত ছিল। তাওরাত গ্রন্থে আছে, "পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর দত্ত আজ্ঞানুসারে তাহারা মিদিয়নের সহিত যুদ্ধ করিল এবং সমস্ত পুরুষকে বধ করিল। আর তাহারা মিদিয়নের রাজগণকে তাহাদের জন্য নিহত লোকদের সহিত বধ করিল; ইবি, রেশম, সূর, হূর ও রেবা, মিদিয়নের এই পাঁচ রাজাকে বধ করিল; বিয়োরের পুত্র বিলয়মকেও খড়্গ দ্বারা বধ করিল। আর ইসরাঈল সন্তানগণ মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে বন্দী করিয়া লাইয়া গেল এবং তাহাদের সমস্ত পশু, সমস্ত মেষপাল ও সমস্ত সম্পত্তি লুটিয়া লইল, আর তাহাদের সমস্ত নিবাস-নগর ও সমস্ত ছাউনি পোড়াইয়া দিল।"[১]

মূসা (আ)-এর যুগে এই বিধানের ওপর আমল করা হতো এবং এর ওপর তাঁর অনুমোদন ও সমর্থন ছিল। তাওরাত গ্রন্থেই আছে :

"আর মোশি, ইলিয়াসর যাজকমণ্ডলীর সমস্ত অধ্যক্ষ তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে শিবিরের বাহিরে গেলেন। তখন যুদ্ধরত সেনাপতিদের অর্থাৎ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের ওপরে মোশি ক্রুদ্ধ হইলেন। মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি সমস্ত স্ত্রীলোককে জীবিত রাখিয়াছ?"[২]

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ফয়সালা ও নির্দেশ পলিত হয় এবং এভাবেই মদীনা ইয়াহূদী ষড়যন্ত্র চক্রান্ত, ধোঁকা, প্রতারণা ও ফেতনার হাত থেকে মুক্ত ও নিরাপদ হয়ে গেল। মুসলমানরা নিশ্চিন্ত হলো, এখন আর তারা পেছন

---

১. পবিত্র বাইবেল, গণনা পুস্তক, ৩১ অধ্যায়, ৭-১০ আয়াত, বাইবেল সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৩।

২. পবিত্র বাইবেল, গণনা পুস্তক, আয়াত ১৩-১৪।

থেকে আক্রান্ত হবে না এবং কোন রকম অভ্যন্তরীণ চক্রান্তও মাথা চাড়া দেবার সুযোগ পাবে না।

খাযরাজ গোত্র সালাম ইবন আবি'ল-হাকীককেও হত্যা করে, যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই সব দল এনে খাড়া করেছিল এবং তাদেরকে অসৎ উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এর আগে আওস গোত্র কা'ব ইবন আল-আশরাফকে খতম করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে দুশমনিতে ও তাঁর বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপানো ও গোলযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে-ই ছিল এগিয়ে। এ দু'জনের হত্যার ফলে মুসলমানরা ফেতনা-ফাসাদের আড্ডা থেকে মুক্তি পায়, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত এবং নিত্য নতুন আন্দোলন ও পরিকল্পনা সৃষ্টি করতে থাকত। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী কুরায়জার সঙ্গে যে ব্যবহার করেন তা সামরিক কৌশল, আরবের ইয়াহূদী গোত্রগুলোর প্রকৃতি ও ভ্রষ্ট স্বভাব মুতাবিক ছিল। তাদের জন্য এ ধরনের শক্ত রকমের ও শিক্ষণীয় শাস্তিরই দরকার ছিল যার ফলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী ও ধোঁকাবাজরা যেন চিরদিনের তরে শিক্ষা পেয়ে যায় এবং ভবিষ্যত বংশধরগণও এ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে! R.V.C. Bodley তাঁর The Messenger— The Life of Muhammad নামক গ্রন্থে এই ঘটনার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন,

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবে একা ছিলেন। এই ভূখণ্ডটি আকার আয়তনের দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং এ লোকসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লাখ। তাঁদের নিকট এমন কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না যারা লোকদেরকে আদেশ পালনে ও আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, কেবল একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ছাড়া, সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এই বাহিনীও আবার পুরোপুরিভাবে অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য কিংবা গাফিলতিকে প্রশ্রয় দিতেন এবং বনী কুরায়জাকে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গের কোনরূপ শাস্তি দান ছাড়াই ছেড়ে দিতেন তবে আরব উপদ্বীপে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হতো। এতে কোনই সন্দেহ নেই, ইয়াহূদীদের হত্যার ব্যাপার খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু ইয়াহূদীদের ধর্মীয় ইতিহাসে এটা কোন নতুন ব্যাপার ছিল না এবং মুসলমানদের দিক দিয়ে এ কাজের পেছনে পূর্ণ বৈধতা ও অনুমোদন বর্তমান ছিল। এর ফলে অপরাপর আরব গোত্রসমূহ ও ইয়াহূদীরা কোনরূপ চুক্তিভঙ্গ ও গাদ্দারী করবার পূর্বে কয়েকবার চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়। কেননা এর পরিণতি কত খারাপ হতে পারে তারা দেখেছিল এবং স্বচক্ষেই দেখেছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ফয়সালা কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন।"[২]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম।

২. The Messenger— The Life of Muhammad, London 1946, Page 202-3

স্যার স্টানলী লেনপুল লিখছেন, "মনে রাখতে হবে, তাদের অপরাধ ছিল দেশের সঙ্গে গাদ্দারী এবং তাও আবার অবরোধকালীন। যে সব লোক ইতিহাসে এটা পড়েছে, (জেনারেল) ওয়েলিংটনের ফৌজ যে পথ দিয়ে যেত সে সব পথ চিনতে পারা যেত পলাতক সৈনিক ও লুটপাটকারীদের লাশ দ্বারা যা গাছের ডালে টাঙানো থাকত, তাদের একটি গাদ্দার গোত্রের একটি কাতুকুতু ফয়সালার ফলশ্রুতিতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।"[১]

মদীনায় ইয়াহূদীদের এই সর্বশেষ কেল্লা ও মোর্চার পতনে আরেকটি লাভ হলো এই, মুনাফিক শিবির স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে যায়; মুনাফিকদের তৎপরতায় ভাটা পড়ে, তাদের মনোবল স্তিমিত হয়ে যায় এবং তাদের আস্থা ও নির্ভরতার অনেকটাই ও বড় বড় আশা-ভরসা কর্পূরের মত উবে যায়। কেননা এটাই ছিল তাদের সুদৃঢ় দুর্গগুলোর সর্বশেষ দুর্গ যা বিজিত হয়। ড. ইসরাঈল ওয়েলফিন্সন বনী কুরায়জা যুদ্ধের ওপর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই বাস্তব সত্যকে নিম্নের ভাষায় স্বীকৃতি দিয়েছেন,

"মুনাফিকদের সম্পর্কে যতটা বলা যায় তা হলো, বনী কুরায়জা যুদ্ধের পর তাদের আওয়াজ উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রামে নেমে আসে এবং এরপর তাদের কথা ও কাজে এমন কোন কিছু প্রকাশ পায়নি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ফয়সালার বিরুদ্ধে যেত যেমনটি এর পূর্বে আশংকা করা হতো।"[২]

ক্ষমা ও উদারতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নজদের দিকে কিছু সওয়ারীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। ফেরার সময় তারা বনী হানাফীর সর্দার ছুমামা ইবন আছালকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং তাকে মসিজদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিক দিয়ে যাবার সময় তাকে সম্বোধন করে বলেন : ছুমামা! তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও? ছুমামা বললেন : হে মুহাম্মদ ﷺ! যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে এমন একজনকে হত্যা করবেন যার ঘাড়ে রক্ত আছে। যদি আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ও সদয় ব্যবহারের স্বীকৃতি দানকারীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবেন। আর আপনি যদি ধন-দৌলত চান তাহলে তাও আপনি বলুন, আপনি যা চাইবেন পাবেন। এ কথা শুনে তিনি সামনে এগিয়ে

---

১. Selection from the Koran; page ixv.

২. আল-য়াহূদ ফী বিলাদিল আরাব, ১৫৫, উস্তাদ মুহাম্মদ আহমাদ বাশমীল ঠিকই লিখেছেন, "আহযাব যুদ্ধে কেবল ইয়াহূদী যুদ্ধ ছিল যা ইয়াহূদীদের চক্রান্তকারী দুষ্ট বুদ্ধি খায়বারে সৃষ্টি করে এবং এতে ইয়াহূদী পুঁজি ব্যয় হয়। এ কেবল যুদ্ধ বাঁধাবার ও ইয়াহূদীদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য জামানত লাভের উদ্দেশেই ব্যয় হয়ে থাকে।

বনী কুরায়জা যুদ্ধ আহযাব যুদ্ধের বিস্তৃত রূপ ছিল। কেননা বনী কুরায়জা ইয়াহূদী-কুরায়শ-ইয়াহূদী সামরিক ঐক্যের ছিল তৃতীয় বাহু যা মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে উন্মুক্ত ছিল, ১৪৯-৫৫।

গেলেন। দ্বিতীয়বার তিনি যখন এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন তখনও তিনি তাঁকে একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনিও তাঁকে একই উত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের মতই একই আচরণ করলেন।

তৃতীয়বার যখন তিনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি ছুমামাকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁকে মুক্তি দেয়া হলো। এরপর ছুমামা মসজিদের কাছে একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করলেন এবং আরজ করলেন, আল্লাহর কসম! এক সময় ছিল যখন আপনার চেহারার চেয়ে বেশি খারাপ আর কারো চেহারা আমার কাছে লাগত না। কিন্তু আজ আপনার নূরানী চেহারা আমার নিকট দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের মুকাবিলায় অধিকতর প্রিয়। আল্লহর কসম! আপনার ধর্মের চাইতে বেশি হিংসা-বিদ্বেষ আর কোন ধর্মের প্রতি আমি পোষণ করতাম না। কিন্তু আজ আপনার ধর্ম দুনিয়ার তাবৎ ধর্ম ও মাযহাবের তুলনায় আমার নিকট অধিক প্রিয় ও ভালবাসার।

আমার ঘটনা হলো, আমি ‘উমরার নিয়তে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আপনার সওয়ারীরা আমাকে বন্দী করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সুসংবাদ দান করলেন এবং উমরা আদায়ের নির্দেশ দিলেন। ছুমামা (রা) যখন কুরায়শদের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তারা বলল, ছুমামা! তুমি বেদীন হয়ে গেছ! তিনি জওয়াবে বললেন: না, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতের ওপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের কাছে ইয়ামাম থেকে গমের একটি দানাও আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল ﷺ তার অনুমোদন দেন। ইমামা ছিল মক্কার খাদ্যশস্যের পাইকারী বাজার আর সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আসত। এরপর তিনি তাঁর এলাকায় ফিরে যান এবং গম বোঝাই উটের কাফেলা মক্কা গমনে বাধা দেন। ফলে কুরায়শরা না খেয়ে মরবার উপক্রম হলো। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আবেদন পেশ করল যাতে তিনি ছুমামা (রা.)-কে কুরায়শদের নিকট খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী প্রেরণের অনুমতি দেয়ার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আবেদন কবুল করেন।[১]

বনী মুস্তালিক যুদ্ধ ও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরীর শা’বান মাসের রাসূলুল্লাহ ﷺ খবর পান, বনী মুস্তালিক (খুযাআ গোত্রের একটি শাখা) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই খবর পেতেই তিনিও তাদের

---

১. যাদু’ল-মা’আদ, ১ খ., ৩৭৭ পৃ. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার ... الملائكة يوم بدر শীর্ষক অধ্যায়।

মুকাবিলায় বের হন। তাঁর সাথে মুনাফিকদের একটি বিরাট দলও সহগামী হয় যা ইতোপূর্বে আর কোন অভিযানে দেখা যায়নি।[১] তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যি ইবন সলূলও সাথে ছিল। আহযাব যুদ্ধে (যে যুদ্ধে কুরায়শরা পূর্ণ ঐক্যের পরিচয় দিয়েছিল এবং অন্যান্য গোত্রকেও তাদের সঙ্গী বানিয়েছিল) মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য তাদের রাগ আরও উস্কে দেয়। মুসলমানদের সৌভাগ্য তারকা ছিল ক্রমশ উন্নতির পথে আগুয়ান। পর পর সাফল্য মক্কার কাফির ও মদীনা ও তার পাশের এলাকায় বসবাসকারী ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের জন্য ছিল গলার এমন একটি কাঁটা যার জন্য তাদের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি বলতে কিছু ছিল না। তারা বুঝে নিয়েছিল, মুসলমানদেরকে এখন আর যুদ্ধের ময়দানে ও সংখ্যা শক্তির বৃদ্ধিতে বা সামরিক সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা পরাজিত করা যাবে না। এজন্য তারা ভেতরে থেকে পদে পদে বাধা সৃষ্টি গোলযোগ পাকানোর পথ ধরল।

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য জাতীয় ও গোত্রীয় অহংকারে ফুঁ দিতে লাগল। নবুওয়াত ও রিসালাতের মহামর্যাদাকে হেয় ও অসম্মান এবং এর ওপর মুসলমানদের আস্থা ও নির্ভরতাকে দুর্বল করার তারা পরিকল্পনা তৈরি করে। তারা নবুওয়াতের শানের বিরুদ্ধে বল্গাহীন উক্তি ও অপবাদ আরোপের বিপজ্জনক অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের ধারণা ছিল, এভাবেই তারা এই নতুন ও অনন্য সমাজের ভিত্তি নড়বড়ে করে তুলতে পারবে যে সমাজের প্রত্যেক সদস্য একে অপরের আয়নাস্বরূপ। যখন সে তার ভাই সম্পর্কে কোনরূপ অশোভন ও অসৌজন্যমূলক কথা শোনে তখন নিজের সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখে। যদি সে নিজের আত্মাকে পাক-সাফ পায় তাহলে সে যে রকম নিজের সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও অমূলক কথা বলে না, তেমনি অপরের বেলায়ও তা বলে না। তেমনি নবুওয়াতে আহলে বায়তের ওপর তার যদি আস্থা না থাকে তাহলে এই সমাজের একে অপরের ওপর থেকেও আস্থা উঠে যাবে, কারো ওপরই আর আস্থা আর থাকবে না। এটি নিঃসন্দেহে ছিল মুনাফিকদের একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গভীর ষড়যন্ত্র। এই কূটচাল ও প্রতারণা বনী মুস্তালিক যুদ্ধে যেভাবে নগ্নভাবে ধরা পড়ে এতটা অন্য কোন যুদ্ধে ধরা পড়েনি।

অবশেষে যুদ্ধের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুকাবিলার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বনী মুস্তালিকের ঝরনাধারার পাশে, যাকে মার্ব-মুরায়সী[২] বলা হয়, তিনি অবস্থান নেন। স্থানটি ছিল সমুদ্রতীরের দিকে "কুদায়দ" নামক জায়গার

---

১. ইবন সাদ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে বলেন, এই যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে মুনাফিকদের এমন এক সংখ্যা শরীক হয় যা এর আগে কোন যুদ্ধে হয়নি (তাবাকাত, ২য় খ., লাইডেন ১৩২৫ হি., ৪৫ পৃ.।

২. এই দিক দিয়ে এই যুদ্ধকে আল-মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয় (দ্র. তাবাকাত ইবন সাদ প্রভৃতি)।

কাছেই। এখানেই উভয় সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং শেষে বনী মুস্তালিক পরাজিত হয়।[১]

এ সময় হযরত ওমর (রা)-এর আজীরের (اجير), যিনি বনী গিফার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং খাযরাজ গোত্রের মিত্র, জুহায়নার জনৈক লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। এমন সময় জহায়নি লোকটি চিৎকার দিয়ে ডাক দেয়, ওহে আনসাররা, আমার সাহায্যে এগিয়ে এসো। ওদিকে (اجير) লোকটিও তার সাহায্যে এগিয়ে আসবার জন্য মুহাজিরদের ডাক দেয়। এটা শুনে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সলূল খুবই রেগে যায়। সে তখন তার লোকজনের মধ্যে বসে ছিল। সে বলল, আচ্ছা, মুহাজিরদের সাহস তাহলে এত দূর পৌঁছে গেছে? তারা কি না আমাদের এলাকায় এসে আমাদের সঙ্গেই লড়াই করতে চাচ্ছে আর নিজেরদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছে? আল্লাহর কসম! ব্যাপারটি ঠিক এ রকম যে রকমটি এই প্রবাদ বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে : سمن كلبك يأكلك তোমার কুকুরকে খাইয়ে-দাইয়ে খুব মোটা-তাজা কর; শেষে সে তোমাকেই খাবে। আল্লাহর কসম! যখন মদীনা ফিরে যাব তখন ওখানকার সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা সেখানকার ছোটলোকদেরকে বের করে দেবে। এরপর সে নিজের লোকদের দিকে ফিরে বলল, এসব কিছু তোমরা নিজের হাতে করেছ। তোমরা নিজেদের বাড়িতে তাদেরকে জায়গা দিয়েছ। নিজেদের সম্পদ নিজেদের ও তাদের ভেতর ভাগ-বণ্টন করেছ। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি নিজেদের হাত একটু গুটিয়ে নিতে আর এভাবে উদার হস্তে ও অকৃপণভাবে সব কিছু না করতে তাহলে তারা অবশ্যই অন্য ঘর দেখত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একথা শুনতে পেলেন তখন তিনি তাঁর বাহিনীকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন যাতে লোক ফেতনার মাঝে না পড়ে এবং শয়তান যেন কুমন্ত্রণা দানের সুযোগ না পায়! এই করাটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ। নির্দেশ পেতেই সকলেই রওয়ানা হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। সেদিন তিনি অবিরামভাবে পথ চললেন। চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তারপর সারা রাত ধরে সফর চলতেই থাকল। এরপর এক সময় ভোর হলো। এভাবেই বাড়ল বেলা। সূর্যতাপে পথ চলা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। কষ্ট হতে লাগল সকলের। এ সময় তিনি যাত্রা বিরতি দিলেন। পথশ্রমে সকলেই এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, শুতে না শুতেই সকলে গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যির ছেলে আবদুল্লাহ বাহিনীর আগেই মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাঁর পিতাকে দেখতেই নিজের

১. বনী মুস্তালিক যুদ্ধ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বেরও অধিকারী এজন্য যে, এর সদর মুরায়সী মক্কার বাণিজ্যিক সড়কের ওপর অবস্থিত। এটি মক্কা থেকে মদিনার একটি শাখা সড়ক যে পথ দিয়ে মুসাফির ও বাণিজ্যিক কাফেলা চলাচল করত।

বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে দেব না যতক্ষণ না নিজের মুখে বলবে, তুমিই ছোটলোক এবং মুহাম্মদ ﷺ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এসব শুনে আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন, ওকে যেতে দাও। সে যতক্ষণ আমাদের ভেতর আছে আমরা তার সাথে ভাল ব্যবহারই করব।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। যাঁর নাম উঠত তাঁকে তিনি সাথে নিতেন। বনী মুস্তালিক যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা)-এর নাম ওঠে। ফলে এ সফরে তিনিই হন তাঁর সফর সঙ্গী। ফেরার সময় মদীনার কাছাকাছি হতেই তিনি সেখানেই থাকেন এবং রাত্রির কিছু অংশ সেখানেই যাপন করেন। এরপর তিনি যাত্রা শুরুর ঘোষণা দেন। হযরত আয়েশা (রা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গেলে গলার হারটি কোথাও খুলে পড়ে যায় তা তিনি টের পাননি। তিনি তাঁর হাওদায় ফিরে আসার পর জানতে পারেন, তাঁর গলায় হার নেই। হারের খোঁজে তিনি পুনরায় সেখানে যান। ইতোমধ্যে যাত্রার ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে। তাঁর হাওদা উটের পিঠের ওঠাবার দায়িত্ব যাঁর ওপর ছিল তিনি নিয়ম মাফিক আসেন এই ধারণায় যে, তিনি (হযরত আয়েশা) হাওদার ভেতরই আছেন, হাওদা উঠিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা (রা) এ সময় খুবই অল্প বয়স্কা এবং খুবই হাল্কা-পাতলা গড়নের ছিলেন। এজন্য তিনি বুঝতে পারেননি, তিনি (হযরত আয়েশা) ভেতরে নেই। এ ব্যাপারে তাঁর কোনরূপ সন্দেহও হয়নি। হযরত আয়েশা (রা) ফিরে এসে দেখতে পান সেখানে কেউ নেই, সকলেই রওয়ানা হয়ে গেছে। তিনি তখন (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে) সেখানেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ইতোমধ্যে সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল আস-সুলামী, যিনি কোন এক প্রয়োজনে কাফেলার থেকে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন, এসে উপস্থিত হন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে এভাবে দেখতেই বুঝতে পারেন, এ তো দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন-সঙ্গিনী! তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে নিজের উটটি তাঁর কাছে ঠেলে দেন এবং স্বয়ং পেছনে সরে যান। হযরত আয়েশা (রা) উটের পিঠে চড়ে বসলে তিনি উটের রশি (নাকাল) ধরে কাফেলার ধরবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন। তিনি যখন কাফেলার কাছাকাছি উপস্থিত হন তখন কাফেলা মনযিলে পৌঁছে ছাউনি ফেলেছে এবং বিশ্রাম করছে। এখানেই ঘটনার শেষ। এতে কারো মনেই সন্দেহের ক্ষীণতম রেখাপাতও করেনি। কেননা মরুচারী জীবনে ও কাফেলার আনাগোনায় তারা এতে অভ্যস্ত ছিল। সম্মান ও মর্যাদার হেফাজত তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে ছিল এবং এই ধরনের নীচ কল্পনা তাদের আরবী গুণাবলীর সঙ্গে আদৌ কোন

১. তবাকাত ইবন সাদ, ২য় খ., ৪৬ পৃ., লাইডেন সংস্করণ।

সম্পর্ক রাখত না। জাহিলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগই এই নীতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ছিল। জাহিলী যুগের জনৈক কবি বলেন,

واغض طر فى ان بدت جارتى حتى يوارى جارتى ماواها.

"যদি প্রতিবেশী কোন মহিলার ওপর আমার নজর পড়ে যায় তাহলে আমি আমার চোখ নামিয়ে নিই যতক্ষণ না সে তার বাসার ভেতর চলে যায়।"[১]

অপর দিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এমন সম্পর্ক ছিল এমন যেমন সম্পর্ক থাকে পিতার সাথে সন্তানের। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণিগণ ছিলেন মু'মিনদের মাতৃসম। তিনি স্বয়ং তাঁদের দৃষ্টিতে প্রকৃত পিতা, এমন কি সমগ্র দুনিয়া থেকেও প্রিয় ছিলেন। সাফওয়ান ইবন মু'আত্তালও দীনদারী, তাকওয়া-পরহেযগারী, লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধের ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী ছিলেন। এও কথিত আছে, মহিলাদের প্রতি তাঁর কোনরূপ দুর্বলতা কিংবা আকর্ষণ ছিল না।

মোটের ওপর এটা এমন কোন সমস্যা ছিল না যা লোকের মনোযোগ আকর্ষণের বিষয় হতে পারে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যি ইবন সলূল ব্যাপারটা লুফে নেয় এবং মদীনায় এসে এর খুব ফলাও প্রচার করে। মুনাফিকরা এ ধরনের সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, এতে দুর্লভ মুহূর্ত জ্ঞানে এর খুব ফলাও করে। তাদের কাছে এটি এমন এক অস্ত্র ছিল যা দিয়ে মুসলমানরা খুব সহজেই ফেতনায় পড়তে পারত এবং মাকামে রিসালাত ও আহলে বায়ত-এর সঙ্গে তাঁদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক দুর্বল করা যেত। এতে মুসলমানদের পারস্পরিক আস্থা এবং একে অপরের ভরসা ও নির্ভরতা আহত হতো। এই চক্রান্তে এমন কিছু সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুসলমানও শিকার হন যাঁদের কথা বলার আগ্রহ ছিল বেশি এবং

---

১. এই কর্মপন্থার একটি ঝলক আমরা হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর ঘটনায় দেখতে পাই যখন তাঁকে [illegible] স্বামীর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করা থেকে জোর করে থামিয়ে দেয়া হয়। তিনি প্রতিদিন সেখানে [illegible] বসতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতেন। প্রায় এক বছর যাবত তাঁর এই অবস্থা চলতে থাকে। তাঁর [illegible] করুণ দৃশ্যে পাষণ্ডদের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয় এবং তাঁকে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দেয়। [illegible] আল্লাহর নামে উটের পিঠে উঠে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি উছমান ইবন [illegible] দেখা পান। তাঁর এই অবস্থা তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং স্বেচ্ছায় উটের রশি ধরে মদীনার [illegible] এগিয়ে চলেন। মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি সাথে থাকেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন, [illegible] চেয়ে শরীফ এর আগে আর কাউকে দেখিনি। তাঁর অবস্থা ছিল, কোন মনযিল এসে গেলেই [illegible] বসিয়ে পেছনে চলে যেতেন। আমি নেমে গেলে তিনি আসতেন, সামান নামিয়ে উট [illegible] বাঁধতেন। তিনি আরও বলেন, মদীনা না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি এমনটিই করেছেন (সীরাত ইবন [illegible] খ., ২১৫-১৭)। এ সেই সময়কার কথা যখন উছমান ইবন তালহা ইসলাম কবুল করেননি। [illegible] দিয়ে সাফওয়ান ইবন মু'আত্তাল আস-সুলামী পবিত্র স্বভাব ও উন্নত চরিত্রের সবচেয়ে বেশি [illegible] ছিলেন যেহেতু তিনি অনেক আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর [illegible] সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

যাঁরা কোনরূপ খোঁজ-খবর ছাড়াই ও যাচাই-বাছাই না করেই শোনা কথা বলতে ছিলেন অভ্যস্ত।[১]

হযরত আয়েশা (রা) যখন মদীনায় হঠাৎই এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি বিস্ময়ে ও দুঃখে হতবাক হয়ে গেলেন! দুঃখ ও বিষাদে তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, তাঁর কান্না থামতে চাইত না। রাতের ঘুম উবে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ব্যাপারটা ছিল খুবই কঠিন ও নাযুক। তিনি যখন জানতে পারলেন, কথা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল তখন তিনি আসলেন আবদুল্লাহ ইবন উবায় সম্পর্কে কিছু বলার অনুমতি চাইলেন। তিনি মসজিদের মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, "মুসলমানগণ! আমাকে সেই লোকের বিষয়ে কিছু বলার ব্যাপারে কে অনুমতি দেবে যে ব্যক্তি আমার পরিবারের লোকদের সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে যার সম্পর্কে আমি জানি? আল্লাহর কসম! আমি আমার ঘরের লোকদের সম্পর্কে যতটা জানি তাতে আমি তৃপ্ত। লোকে এ ব্যাপারে যে লোক সম্পর্কে বলাবলি করছে তার সম্পর্কেও আমি ভালই জানি। সে যখন আমার ঘরে আসত আমার সাথেই আসত।" আওস গোত্রের কিছু লোক এ কথা শুনে রাগে অধীর হয়ে বলতে লাগল, যে লোক এত বড় কথা মুখ দিয়ে বের করেছে আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেবার জন্য তৈরী, চাই সে আওস গোত্রের লোকই হোক, চাই খাযরাজের। 'আবদুল্লাহ ইবন উবায় ছিল খাযরাজ গোত্রের। এ কথা শোনার পর তার ভেতর গোত্রীয় অহংকার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ফলে উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে পড়ল। শয়তান উভয়ের ঘাড়ে সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করতেই এবং লড়াই বাঁধবার মত অবস্থা সৃষ্টি হতেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষিপ্র বুদ্ধি, কৌশল, ধৈর্য ও সহনশীলতার বরকতে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াবার আগেই মিটে যায়।

এদিকে হযরত আয়েশা (রা) নিজের নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী। এজন্য তিনি চলনে-বলনে আস্থা, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত ছিলেন এবং এসব তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত। তাঁর অবস্থা ছিল নিরপরাধ ও নিষ্পাপ সেই ব্যক্তির ন্যায় যিনি সব রকম সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। তাঁর পূর্ব বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই অপবাদ থেকে মুক্তি দেবেন এবং নবুওয়াতের অঞ্চল প্রান্তে অমূলক সন্দেহ ও অপবাদের কলংক থাকতে দেবেন না। কিন্তু তাঁর এ ধারণা ছিল না, আল্লাহতাআলা তাঁর জন্য বিশেষভাবে ওয়াহয়ি নাযিল করবেন এবং এই আয়াত কুরআন মজীদের অংশ হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

---

১. কুরআন মজীদে এ আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে ঃ اذتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم وتسبونه هينا وهو عند الله عظيم. যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে এ নিয়ে আলোচনা করতে এবং নিজ মুখে এমন সব কথা বলতে যে ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। আর তোমরা একে হাল্কা ভাবতে, অথচ আল্লাহর নিকট ব্যাপারটা ছিল গুরুতর। [সূরা নূর : ১৫ আয়াত]

তাঁকে বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। তাঁর সম্পর্কে কুরআন মজীদের নি
আয়াত নাযিল হয় এবং সপ্ত আসমানের ওপর থেকে তাঁর নির্দোষ হওয়া ঘো
হয়:

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ج وَالَّذِيْ
تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ
الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا إِفْكٌ مُّبِيْنٌ.

"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তো
একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজ
তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তা
মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে বিরাট শা
তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারিগণ কেন নিজে
লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং কেন বলনি, এটা তো নির্জলা অপবাদ

[সূরা নূর : ১১-১২ আয়া

এভাবেই এই বিরাট ফেতনা চিরতরে খতম হয়ে যায় এবং এ কথা এ
মুছে যায় যেন কোন কিছুই হয়নি! মুসলমানগণ স্বাভাবিক নিয়ম মাফিক এক
উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নিজেদের সেই মহান কর্মের পূর্ণতা সাধনে মশগুল হ
যার ওপর কেবল তাদের নয়, বরং সমগ্র মানবতার সাফল্য ও কামিয়াবী
নির্ভরশীল।[১]

---

১. এই ঘটনা সীরাত ইবন হিশাম [illegible] উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড, ২৮৯-৩০২; এছাড়া বুখারী বর্ণিত হযরত
(রা) -এর হাদীছ।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

(যি'ল-কা'দাহ, ৬ হি.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন ও মক্কা প্রবেশের জন্য মুসলমানদের প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন!

এ স্বপ্ন ছিল সত্য স্বপ্ন (رویائے صادقة), কিন্তু এতে কাল, মাস কিংবা বছরের কোন নির্ধারণ ছিল না।[১] তিনি সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় এই স্বপ্নের কথা বলেন। এই সুসংবাদ শুনে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হন। মক্কা ও কা'বা (যাঁর প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ তাঁদের অস্থিমজ্জায় শামিল এবং তাঁদের শিরা-উপশিরায় মিশে ছিল) বহু দিন হয় তাঁদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল। তাঁদের হৃদয়ে এর তাওয়াফ ও যিয়ারতের জন্য গভীর আকুতি বিরাজ করছিল এবং তাঁরা অস্থির চিত্তে সেই দিনের অপেক্ষা করছিলেন যেদিন এই সৌভাগ্য তাঁরা আবারও লাভ করবেন। মুহাজিরদের মধ্যে মক্কার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বেশি ছিল। কেননা তাঁরা সেখানেই জন্মেছিলেন, লালিত-পালিত ও বড় হয়েছিলেন এবং এর ভালবাসা তাঁদের প্রকৃতিতে মিশে গিয়েছিল।

মোটকথা, দীর্ঘকাল থেকে তাঁরা এর দীদার ও যিয়ারত থেকে মাহরূম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁদেরকে এই খবর শোনালেন তখন তাঁদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়নি, এই স্বপ্নের তা'বীর এই বছরেই বাস্তবে ফলবে! এ কথা তাঁদের আগ্রহের ধিকিধিকি আগুনকে আরও উস্কে দেয় এবং সকলেই তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার জন্য আগ্রহভরে রাজী হয়ে যায়। খুব কম লোকই ছিল যারা এ সফরে যেতে ইচ্ছুক ছিল না। ওমরার জন্য ইহরামও তিনি বেঁধে নিয়েছিলেন যাতে লোকেরা জানতে পারে, তিনি কেবল বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্যই যাচ্ছেন।[২]

সেখানে পৌঁছে তিনি খুযাআ গোত্রের এক গুপ্তচরকে কুরায়শদের অবস্থান ও গতিবিধি জানার জন্য মোতায়েন করেন। তিনি যখন উসফান[৩] নামক একটি জায়গার কাছাকাছি ছিলেন তখন গুপ্তচর তাঁকে জানায়, কা'ব ইবন লুওয়াই গোত্র

---

১. সূরা আল-ফাতাহর তাফসীর দেখুন (২৭ আয়াত); ইবন কাছীর; لقد صدق الله।

২. যাদুল-মাআদ, ৩৮০; ইবন হিশাম, ৩০৮ পৃ.।

৩. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা।

তাঁর মুকাবিলা করবার এবং তাঁর যাত্রা রোধ করবার জন্য আহাবীশ[১]-কে একত্র করে রেখেছে এবং একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফৌজ সংগঠিত করেছে। তাদের ইচ্ছা, যুদ্ধ করে হলেও আপনাকে বায়তুল্লাহ পৌঁছতে তারা বাধা দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভিযান চলতেই থাকল। তিনি যখন সেই ঘাঁটিতে গিয়ে পৌছলেন যেখান থেকে তাদের পানে উৎরাই শুরু হয় তখন তাঁর উটনী 'কাসওয়া' বসে পড়ল। এ দেখে লোকে বলাবলি শুরু করল, "কাসওয়া বেঁকে বসেছে, কাসওয়া বেঁকে বসেছে", রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কাসওয়া বেঁকে বসেনি, বেঁকে বসা তার অভ্যাস নয়। যিনি হাতীগুলোকে থামিয়ে দিয়েছিলেন[২] তিনিই একেও থামিয়েছেন। কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জান! ওই সব লোক এমন যে কোন পরিকল্পনা কিংবা প্রস্তাবই পেশ করুক না কেন, যার ভেতর আল্লাহতাআলার সম্মান রক্ষিত হয়েছে আর তারা যদি আমার নিকট আত্মীয়তা সম্পর্কের দাবি জানায়, তাহলে আমি তাদের দাবি অবশ্যই পূরণ করব। অতঃপর তিনি তাঁর উটনীকে শাসাতেই উটনী লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু গতি পথ তার পাল্টিয়ে হুদায়বিয়া দিকে চলতে শুরু করল এবং এর শেষ প্রান্তে পানির একটি অগভীর কুয়া আছে, যাতে যৎসামান্য পানি ছিল, থেমে পড়ল। লোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের পিপাসার কথা জানাল। তিনি তখন তূণীর থেকে একটি তীর বের করে একে সেই কুয়ার ভেতর নিক্ষেপ করতে বললেন। তীর নিক্ষেপ করতেই পানি প্রবল বেগে উঠতে লাগল। অতঃপর সকলেই তৃপ্তিভরে পানি পান করল।[৩]

মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে কুরায়শদের আপত্তি ও উদ্বেগ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন ও উল্লিখিত স্থানে তাঁর অবস্থানের খবর পেয়ে কুরায়শরা ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে এবং তারা ঘাবড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্বেগ ও অস্থিরতা দূর করার জন্য সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে থেকে কাউকে মক্কায় পাঠানো সঙ্গত মনে করলেন। এজন্যে তিনি হযরত ওমর (রা)-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি হাজির হলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মক্কায় বনূ 'আদিয়্যি ইবন কাব-এর একজন লোকও নেই যারা আমাকে তাদের আক্রোশ ও জিঘাংসার হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে। আপনি বরং উছমান (রা)-কে সেখানে যাবার জন্য বলুন। কেননা সেখানে তাঁর গোটা খান্দানই বর্তমান রয়েছে এবং তিনি

---

১. যুদ্ধবাজ লোক যারা ছিল বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

২. তাঁর ইঙ্গিত আবরাহার হাতীর দিকে ছিল যাকে আল্লাহতাআলা মক্কায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

৩. যাদু'ল-মাআদ, ১ম খ., ৩৮১ পৃ.।

বার্তা বহনের দায়িত্ব বেশ ভালভাবেই আঞ্জাম দিতে পারবেন। তিনি তখন হযরত উছমান (রা)-কে ডেকে কুরায়শদের নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে বল, আমরা যুদ্ধ করবার জন্য আসিনি, আমরা ওমরাহ্ আদায়ের নিয়তে এখানে এসেছি। তাদেরকে ইসলামেরও দাওয়াত দেবে। তিনি তাঁকে এও বলে দিলেন, মক্কায় যে সব বিশ্বাসী (মু'মিন) নারী-পুরুষ রয়েছে তাদের কাছে গিয়ে বিজয়ের সুসংবাদ দেবে এবং তাদেরকে এ খোশ খবরও শোনাবে, আল্লাহতাআলা মক্কায় তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন। ফলে তখন আর ঈমান গোপন করার প্রয়োজন থাকবে না।[১]

প্রেম ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা

হযরত উছমান (রা) রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি আবূ সুফিয়ান ও কুরায়শ নেতৃবর্গের নিকট গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পয়গাম পৌঁছালেন। তিনি তাঁর বার্তা পেশ করলে হযরত উছমান (রা)-কে তারা বলল, তুমি চাইলে এই মুহূর্তে তাওয়াফ করে নিতে পার। উত্তরে তিনি বললেন, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফ করছেন ততক্ষণ আমি তাওয়াফ করতে পারি না।[২]

হযরত উছমান (রা) ফিরে আসলে মুসলমানরা বলতে লাগল, আবূ আবদুল্লাহ! তুমি তো খুব মজায় ছিলে! তুমি তো তাওয়াফ করে তোমার দিলের আশা পূরণ করেছ। উত্তরে হযরত উছমান (রা) বললেন, তোমরা আমার সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা করেছ। কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আমাকে এক বছর কালও সেখানে অবস্থান করতে হতো আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় তশরীফ নিতেন তবুও আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তওয়াফ করতাম না যতক্ষণ না তিনি তাওয়াফ করতেন।

কুরায়শরা আমাকে তাওয়াফ সেরে নেবার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল, কিন্তু আমি অস্বীকার করেছি।[৩]

বায়আত-ই রিদওয়ান

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খবর পান, হযরত উছমান (রা)-কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। খবর পেতেই তিনি সমবেত সকলকে বায়আত গ্রহণের দাওয়াত দেন। সকলেই উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তাঁর চারপাশে জমায়েত হন। সে সময় তিনি এক গাছের নীচে বসে ছিলেন। তিনি তাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তারা কেউ (জিহাদের ময়দান ছেড়ে) পালাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং বাম

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ ম খ., ৩৮১ পৃ.।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩১৫ পৃ.।
৩. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৩৮২ পৃ.।

হাত দিয়ে ডান হাত আঁকড়ে ধরেন এবং বলেন, এটি উছমান (রা)-এর পক্ষ থেকে।[১] এটাই ছিল সেই বায়আত-ই রিদওয়ান বা হুদায়বিয়া নামক স্থানে একটি বাবলা গাছের নিচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কুরআন শরীফের নিম্নের আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।" [সূরা আল-ফাতহ : ১৮ আয়াত]

সালিসী আলোচনা ও সন্ধির প্রয়াস

এরূপ অবস্থায় হঠাৎ বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা আল-খুযাঈ খুযাআ গোত্রের কিছু লোকসহ সেখানে পৌঁছেন। তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চান এবং তাঁর আসার কারণ কারণ জানতে চান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমরা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসিনি, আমরা কেবল ওমরার নিয়তে এসেছি। যুদ্ধ কুরায়শদেরকে আগেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমি তাদের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য সিদ্ধান্তে আসতে চাই এবং তারা আমার ও অপরাপর লোকদের মধ্যবর্তী রাস্তা ছেড়ে দেবে। আর যদি তারা চায় তাহলে তারা সেই দলেই শামিল হোক যে দলে আরও লোক শামিল হয়েছে। অন্যথায় তারা কিছু সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ তো অবশ্যই পাবে! কিন্তু তারা যদি যুদ্ধই করতে চায় এবং যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন কিছু কবুল করতে না চায় তাহলে সেই সত্তার কসম করে বলছি যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ! আমি এ ব্যাপারে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আমার মাথা আমার ধড় থেকে আলাদা হয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করেন।

বুদায়ল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পয়গাম তাদেরকে পৌঁছালেন তখন ওরওয়া ইবন মাসউদ আছ-ছাকাফী বললেন, তিনি তো খুবই বিচক্ষণতাসুলভ প্রস্তাব দিয়েছেন! আমার মত হলো, তোমরা তাঁর এই প্রস্তাব মেনে নাও এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দাও। তারা অনুমতি দিতেই ওরওয়া ইবন মাসউদ নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করলেন এবং আলোচনা শুরু করলেন। ওরওয়া খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে দেখছিলেন আর তাঁদের অবস্থা দেখ

১. প্রাগুক্ত।

ছিল এই, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ থুথু ফেলতেন তাহলে কেউ না কেউ তা হাতে নিতেন এবং মুখমণ্ডল ও সর্বশরীরে তা মেখে নিতেন। তিনি কিছুর নির্দেশ দিতেই প্রত্যেক মানুষ তা পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ওযু করলে ওযুর পানির ওপর জীবন দানকারী এসব ভক্তের দল এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যে, মনে হতো বুঝি বা লড়াই বেঁধে যায়! তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁরা সকলেই তাঁর দিকে মনোযোগী হতেন। সম্মান ও আদবের কারণে কেউ তাঁর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতেন না। ওরওয়া কুরায়শদের নিকট ফিরে গিয়ে তাঁর সাথীদেরকে বললেন, হে আমার জাতিগোষ্ঠী! আমি রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়েছি, আমি রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার সম্রাটদের শান-শওকতও দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি কোন বাদশাহ দেখিনি সভাসদ ও মোসাহেবকে এমন সম্মান ও আদব দেখাতে যেমনটি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথীরা তাঁকে করে থাকেন। এরপর তিনি সেখানে যা কিছু দেখেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা তাদের দিলেন এবং বললেন, তিনি খুব উত্তম প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও।[১]

সন্ধি ও সুলেহনামা

এরই ভেতর বনী কিনানার আর এক ব্যক্তি মিকরায ইবন হাফসও সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং উভয়েই তাদের চাক্ষুষ ঘটনাগুলো কুরায়শদের সামনে বর্ণনা করলেন। কুরায়শরা অতঃপর সুহায়ল ইবন আমরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে প্রেরণ করল। তিনি তাকে আসতে দেখেই বললেন, তাকে আসতে দেখে মনে হচ্ছে কুরায়শরা সন্ধি করতে ইচ্ছুক। তিনি এও বললেন, তোমরা সন্ধির লিখিত দস্তাবীয তৈরি কর।[২]

ইলম ও হিকমত-এর সম্মিলন

তিনি সন্ধিপত্রের মুসাবিদা তৈরির জন্য তাঁর সেক্রেটারী (হযরত আলী)-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, লেখ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এতে সুহায়ল ইবন আমর আপত্তি তুললেন এবং বললেন ঃ আমরা (আল্লাহ সম্পর্কে জানলেও) তাঁর রহমান ও রাহীম হওয়া, আল্লাহর কসম! তা তো আমরা জানি না। সেই পুরনো দস্তুর মাফিক باسمك اللهم লেখ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঠিক আছে এখন باسمك الله অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নামে। মুসলমানরা এটা দেখে বলে উঠলেন : না, আমরা তো بسم الله الرحمن الرحيم লিখব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : باسمك اللهم-ই লেখ।

---

১. যাদু'ল-মাআদ, ১ম খ., ৩৮২ পৃ.।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩১৬ পৃ., অধিকন্তু সহীহ বুখারীর কিতাবু'ল-মাগাযী, উমরাতু'ল-কাযা অধ্যায়, কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ।

এরপর তিনি বললেন, লেখ, এটা সেই সন্ধিপত্র যা আল্লাহর রাসূল সম্পাদন করছেন। এ কথা শুনে সুহায়ল বললেন : আল্লাহর কসম! যদি আমরা বিশ্বাসই করতাম, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আর আপনার বায়তুল্লাহ যাবার পথে কেন বাধা খাড়া করতাম? আর আপনার সঙ্গে এত যুদ্ধ-বিগ্রহই বা করতাম কেন? আপনি এর বদলে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ লিখুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল, তোমরা তা যতই অস্বীকার কর না কেন। লেখ, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ। তিনি হযরত আলী (রা)-কে আগের শব্দটি (রাসূলুল্লাহ) মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। এতে হযরত আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমা দ্বারা তা সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে, আমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দাও। তাঁকে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়া হলে তিনি নিজেই তা মুছে দিলেন।[১]

সন্ধি ও পরীক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর রাসূল এই কথাটি (অর্থাৎ সন্ধি চুক্তিটি) এজন্য সম্পাদন করছেন যাতে তোমরা আমাদের ও আল্লাহর ঘরের মাঝে বাধা না হও আর আমরা তা নিরাপদে তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়ল বললেন, আমরা ভয় পাচ্ছি, না জানি আরবদের মাঝে এমন বলাবলি শুরু হয়ে যায়, আমরা ভয়ে এই সন্ধি চুক্তি করেছি। আগামী বছর আপনি তাওয়াফ করতে পারবেন। তিনি এই দফাটিও সন্ধিচুক্তির মাঝে শামিল করে নেন।

সুহায়ল বললেন, এটাও অবশ্যম্ভাবী বিবেচিত হবে যদি আমাদের এখান থেকে কোন লোক আপনার ওখানে চলে যায়, চাই সে আপনার ধর্মেরই কেউই না হোক, তবু আপনি তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাবেন। মুসলমানরা সুহায়লের এ ধরনের প্রস্তাবের কথা শুনে অদ্ভুত বিস্ময়ে বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! কেউ যদি মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে চলে আসে তাহলে তাকে আমরা মুশরিকদের নিকট কি করে সোপর্দ করতে পারি?

এ নিয়ে আলোচনা চলছিল এমন সময় হঠাৎ সেখানে সুহায়ল পুত্র আবূ জান্দাল লোহার বেড়ি-পরা অবস্থায় এসে উপস্থিত হন। তিনি মক্কার উচ্চ ভাগ থেকে এসেছিলেন এবং কোন রকম কুরায়শদের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে মুসলমানদের কাছে এসে পৌঁছতে পেরেছিলেন। সুহায়ল বললেন, মুহাম্মদ ﷺ এই প্রথম ব্যক্তি যাকে ফিরিয়ে দেবার দাবি (সন্ধি চুক্তির আলোকে) আমি আপনার কাছে পেশ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখনও তো সন্ধিপত্র লেখাও সম্পূর্ণ হয়নি। সুহায়ল উত্তর দিলেন, যদি তাই হয় তাহলে এরপর আমি কোন ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে নিষ্পত্তিতে পৌঁছতে প্রস্তুত নই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার বলায় তাকে

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবু'ল-জিহাদ ওয়া'স-সিয়ার, হুদায়বিয়ার সন্ধি শীর্ষক অধ্যায়।

অনুমতি দিন। সুহায়ল বলল, আপনার বলায় আমি তাকে অনুমতি দিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, ঠিক আছে, যা খুশি করুন! সুহায়ল বললেন, আমার কিছু করার নেই। এ কথা শুনে আবূ জান্দাল বললেন, মুসলমানগণ! আমি মুসলমান হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। এরপরও আমাকে মুশরিকদের নিকট সোপর্দ করা হচ্ছে। তোমরা কি দেখছ না, আমার সঙ্গে কি করা হচ্ছে? আল্লাহর রাস্তায় তিনি কঠিন দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সয়েছিলেন।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাবির প্রেক্ষিতে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির শর্ত হিসেবে এও স্থির হয়, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষ রক্তপাত ও লড়াই-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবে যাতে লোকে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারে এবং কেউ কারো ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে। দ্বিতীয় বিষয় স্থির হয়, যদি কুরায়শদের কেউ তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট এসে পড়ে তাহলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর মুসলমানদের মধ্যে থেকে কেউ কুরায়শদের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয় তাহলে কুরায়শরা তাকে ফিরিয়ে দেবে না। এ ছাড়া কেউ চাইলে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পারে, তাদের নিরাপত্তায় প্রবেশ করতে পারে। আবার কেউ চাইলে কুরায়শদের সঙ্গেও মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করতে পারে, তাদের ছত্রছায়ায় যেতে পারে। এ ব্যাপারে সাধারণ অনুমতি রইল।[২]

মুসলমানদের পরীক্ষা

মুসলমানরা যখন এই সন্ধি ও মদীনা ফেরার কথা শুনতে পেল এবং দেখল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে একে সহ্য করে নিলেন তখন এ বিষয়টি তাদের কাছে এতটা মর্মপীড়ার কারণ হলো যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হযরত ওমর (রা) তো সোজা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়েই হাযির! তিনি উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আমাদেরকে একথা বলেননি, আমরা বায়তুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব? এ কথা শুনে তিনি বলেন, হ্যাঁ! তিনি বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কি তোমাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা এ বছরই বায়তুল্লাহ যাবে এবং তাওয়াফও করবে?[৩]

সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর পশুগুলোর দিকে মনোযোগ করলেন এবং সেগুলো যবাহ করলেন। এরপর তিনি মাথা মুণ্ডন করলেন। মুসলমানদের জন্য এ ছিল এক বেদনাদায়ক ঘটনা। কেননা মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁদের অন্তরে এ কল্পনা ঘুর্নাক্ষরেও জাগেনি, তাঁরা মক্কায়

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৩৮৩ পৃ.। সহীহ বুখারীতে এই ঘটনা الشروط فى الجهاد। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩১৭-১৮ পৃ.।

৩. সহীহ বুখারী- الشروط فى الجهاد والمصالحة مع اهل العرب।

যাওয়া ও ওমরাহ্ আদায়ের সুযোগ পাবেন না। কিন্তু তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কুরবানী করতে ও মস্তক মুণ্ডন করতে দেখলেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তাঁর অনুসরণে কুরবানী দিতে ও মস্তক মুণ্ডন করতে মশগুল হয়ে গেলেন।[১]

অবমাননাকর সন্ধি অথবা সুস্পষ্ট বিজয়?

এরপর তিনি মদীনায় তশরীফ নেন এবং পথিমধ্যেই আল্লাহতাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ـ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ـ وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ـ

"নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত বিজয় দান করেছি যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং তোমার প্রতি তাঁর নে'মত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন এবং তোমাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। [সূরা আল-ফাতাহ : ১-৩ আয়াত]

(আয়াত শোনার পর) হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাই কি বিজয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[২]

ব্যর্থতার আড়ালে সাফল্যের হাতছানি

তিনি মদীনা পৌঁছতেই তাঁর নিকট আবূ বাসীর উতবা ইবন উসায়দ নামক একজন নও মুসলিম কুরায়শদের হাত থেকে পালিয়ে এসে উপস্থিত হন। কুরায়শরা তাঁর খোঁজে দু'জন লোক পেছন পেছনেই পাঠিয়ে দেয় এবং সন্ধি চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে ফেরত দেবার দাবি জানায়। এরপর তিনি তাঁকে লোক দু'জনের নিকট সোপর্দ করেন। লোক দু'জন তাঁকে সাথে নিয়ে মক্কায় ফেরার পথে আবূ বসীর কৌশলে তাদের হাত থেকে পালাতে সমর্থ হন এবং সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে গিয়ে আস্তানা গাড়েন। অপরদিকে আবূ জান্দাল ইবন সুহায়লও কোন কৌশলে কুরায়শদের খপ্পর থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং আবূ বসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হন। এরপর অবস্থা দাঁড়াল, মক্কার কেউ মুসলমান হতেই কুরায়শদের হাত থেকে জীবন ও ঈমান বাঁচাতে পালিয়ে সোজা আবূ বসীরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতো। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁদের একটি ক্ষুদ্র দল তৈরি হলো। এরপর তাঁরা এ পথ দিয়ে সিরিয়ায় গমনকারী কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা আটকাতে এবং কাফেলার

---

১. বিস্তারিত জানতে দেখুন যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৩৮৩ পৃ.।

২. দ্র. সহীহ্ মুসলিম কিতাবু'ল-জিহাদ ওয়া'স-সিয়ার, হুদায়বিয়া সন্ধি শীর্ষক অধ্যায়।

দ্রব্যসম্ভার কেড়ে নিত। অতঃপর কাফেলার লোকদেরকে তাঁরা হত্যা করত। অবশেষে আর না পেরে কুরাইশরা আল্লাহর দোহাই ও আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই পেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আবেদন জানাল, তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান। এরপর থেকে মক্কার কোন নও মুসলিম মদীনায় আঁ-হযরত ﷺ-এর খেদমতে পৌঁছলে তাকে আর ফেরত দিতে হবে না, নিরাপদ শান্তিতে সে সেখানে অবস্থান করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।[১]

এই সন্ধি কিভাবে বিজয় ও সাফল্যে পরিবর্তিত হলো?

পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রমাণ করে দেয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকেই [যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজস্ব অবস্থান থেকে অনেকখানি নিচে নেমে এসে এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং কুরায়শদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছিলেন আর কুরায়শরাও একে তাদের জিত ও লাভের সওদা বলে মনে করেছিল, পক্ষান্তরে মুসলমানরা একে তাদের ঈমানী শক্তি ও নবীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রেরণাবলে বরদাশত করে নিয়েছিলেন] মূলত মুসলমানদের বিজয় ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায় এবং এরই ফলে ইসলাম আরব উপদ্বীপে এত দ্রুততর গতিতে বিস্তার লাভ করে যা এর আগে আর কখনও হয়নি। এই সন্ধি মক্কা বিজয়ের সূচনা করে এবং এরই পরিণতিতে রোম ও পারস্য, মিসর অধিপতি মুকাওকিস, আবিসিনিয়াধিপতি নাজাশী ও বিভিন্ন আরব নেতাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেন :

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"আশ্চর্য নয় যে, তোমরা এক জিনিসকে খারাপ মনে করবে, অথচ তা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক এবং এও আশ্চর্য নয়, তোমরা এক জিনিসকে ভাল মনে করবে, অথচ তাই তোমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর। আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তোমরা জান না।" [সূরা বাকারা : ২১৬ আয়াত]

এই সন্ধি থেকে প্রাপ্ত সর্বোত্তম ফলাফল ও পরিণতির মধ্যে এও একটি যে, এই সর্বপ্রথম কুরায়শরা মুসলমানদের স্বতন্ত্র অবস্থান ও মর্যাদাকে স্বীকার করে নেয় এবং একটি মর্যাদাবান ও শক্তিশালী পক্ষ হিসাবে মেনে যার সঙ্গে সন্ধি করা চলে, আলোচনা করা যায় এবং তাদেরকে বৈধ স্থান দান করে। এই সন্ধি থেকে সর্বোত্তম যে ফল লাভ করা গিয়েছিল তা হলো, যুদ্ধ বন্ধের ফলে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয় যদ্দরুন মুসলমান (যারা দীর্ঘ কাল ধরে এক অব্যাহত যুদ্ধে জড়িত ছিল যা

১. যাদু'ল-মাআদ, ১ম খ., ৩৮৪ পৃ.।

তাদের সমগ্র শক্তি ও সামর্থ্য নিংড়ে ও শুষে নিয়েছিল) স্বস্তির নিশ্বাস নেবার এবং কিছুটা আরামে বসার। এ ছাড়াও এই শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ অবকাশে পুরোপুরি একাগ্রতা ও মনোযোগ সহকারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছবার ও তাবলীগী দায়িত্ব পালনের সর্বোত্তম সুযোগ মিলে যায়।

এই সন্ধি মুসলমান ও কাফির মুশরিকদেরকে, যারা আজও পরস্পর সংঘর্ষরত ছিল, একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার এবং একে অন্যকে বোঝাবার মওকা এনে দেয়। এর ফলে ইসলামের সেই সব সৌন্দর্য ও গুণ কাফির মুশরিকদের সামনে আসে যা তখন পর্যন্ত অতটা সুন্দরভাবে তাদের সামনে আসেনি। যেমন শির্ক ও মূর্তি পূজার অপবিত্রতা থেকে একেবারে মুক্তি, শত্রুতা, মানুষের রক্তের পিপাসা, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি সার্বিক ঘৃণা যা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, চারিত্রিক ও মানসিক অবস্থা ও বিপ্লব যা পনের বছরের স্বল্প মুদ্দতে তাদের জীবনে ফুটে উঠেছিল, যারা অন্য কোন জাতির সদস্য কিংবা অপর কোন দেশের বাসিন্দা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন তাদেরই গোত্র ও গোষ্ঠীর সমবর্ণেরও। তাঁরা তাঁদের মত মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের জীবনের একটা অংশে তাদেরই সঙ্গে ব্যয়িত হয়েছিল। তারপর এ কোন্ যাদুমন্ত্র বলে তাঁরা কয়েক বছরের মধ্যেই মাটি থেকে স্বর্ণপিণ্ডে এবং পাথর থেকে পরশ পাথরে পরিণত হলেন? ইসলামের শিক্ষা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচার্য ছাড়াই মক্কাবাসী ও মুহাজিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আর কোন জিনিস ছিল না। এরপর এই সন্ধির পর এক বছরও পার হয়নি এবং মক্কা বিজয়ের তখনও বাকি, এ সময় এত বিপুল সংখ্যক আরববাসী ইসলাম কবুল করে যা বিগত পনের বছরেও করেনি।

ইমাম ইব্ন শিহাব যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.) বলেন, "এর পূর্বে ইসলামের এত বড় বিজয় আর হয়নি। উভয় পক্ষের (কুরায়শ ও মুসলিম) মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলো, যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হলো এবং লোকে নির্ভয়ে ও নির্ভাবনায় একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল, পরস্পরের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে লাগল, থাকতে লাগল, আলাপ-আলোচনার সুযোগ মিলল এবং যে কোন সমঝদার মানুষের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করল সেই ইসলামে দাখিল হলো।"

"কেবল দু'বছরই এত লোক ইসলামে দাখিল হলো যতটা তখন পর্যন্ত হয়েছিল, বরং সম্ভবত তার চেয়েও বেশি।"[১]

ইবন হিশাম বলেন, "যুহরীর মতের সপক্ষে দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার (জাবির ইবন 'আবদিল্লাহর বর্ণনা মুতাবিক) চৌদ্দ শ' সাহাবী ছিলেন আর এর দু'বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দশ হাজার সাহাবীর এক বিপুল সমাবেশ।"[২]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩২২ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

এই যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধির বদৌলতে সেই সব মুসলমান উপকৃত হয় যারা তাদের অপারকতা ও অসহায়ত্বের দরুন তখনও মক্কায় থেকে গিয়েছিল এবং কুরায়শদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়েছিল। এক আবূ জান্দালের হাতেই কুরায়শ যুবকদের এক বিরাট সংখ্যক ইসলাম কবুল করে। ইসলামের এই নতুন দাঈ (আহ্বায়ক), মুবাল্লিগের তাবলীগী প্রয়াস ও মক্কায় ইসলামের বিস্তার কাফির মুশরিকদের জন্য এক মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে।

এসব লোক (নও মুসলিম) আবূ বসীরের কাফেলার সঙ্গে মিলিত হয় এবং দেখতে দেখতে ইসলামের দাওয়াত, শক্তি ও শান-শওকতের এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে তারা কুরায়শদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন জানায়, যেন তিনি তাদেরকে মদীনায় ডেকে নেন। তিনি তাই করেন। আর এভাবেই সমস্যা-সংকট আর দুঃখ-কষ্টের শিকার এসব নও মুসলিমের সব দুর্ভোগের শেষ হয়। আর এসবই ছিল মূলত এই সন্ধির বরকত এবং এই যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ফল।[১] এই সমঝোতামূলক ও শান্তিপ্রিয় আচরণ যা তিনি এ সময় দেখিয়েছিলেন, তা ছাড়া যুদ্ধের প্রতি নিস্পৃহ মানসিকতা, সন্ধির প্রতি আবেগপ্রসূত প্রেরণা, সহিষ্ণুতা ও ভারসাম্যমূলক কর্মপন্থার যে প্রকাশ তাঁর থেকে ঘটেছিল তার ফলে আরও একটি ফায়দা হয়েছিল, যে সব আরব কবীলা তখন পর্যন্ত ইসলামে প্রবেশ করেনি তারা এই নবতর ধর্ম ও এর দাঈকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তাদের অন্তর-মানসে ইসলামের আজমত এবং এর প্রতি সেই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সৃষ্টি হলো যা এর পূর্বে ছিল না। এটি ছিল এমন এক তাবলীগী ও দাওয়াতী ফায়দা যাকে কিছুতেই মামুলী বলা চলে না, যদিও এর কোন চেষ্টা তদবীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানেরা করেন নি।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আমর ইবনু'ল-আস-এর ইসলাম গ্রহণ

হুদায়বিয়ার সন্ধি অন্তররাজ্য বিজয়ী প্রমাণিত হয়। এর পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, যিনি কুরায়শ অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এবং যিনি বিরাট বিরাট যুদ্ধ জয় করেছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তলোয়ার) উপাধি দান করেছিলেন। আল্লাহর রাহে তিনি সর্বপ্রকার সফল, সার্থক ও সৌভাগ্যবান পুরুষ হিসাবে অভিহিত হন এবং আল্লাহতাআলা তাঁর হাতে সিরীয় এলাকার বিজয় দান করেন।

'আমর ইবনুল আসও ছিলেন একজন বিরাট জেনারেল ও সিপাহসালার যিনি পরবর্তীকালে মিসর বিজেতা হিসাবে আর্বিভূত হন, তিনিও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়ে মদীনায় হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যবান হন এবং উন্নত মর্যাদা লাভ করেন।[২]

---

১. যাদুল-মাআদ, ৩৮৮-৮৯ পৃ.।

২. দেখুন সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ২৭৭-৭৮ পৃ.।

আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

(৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগ থেকে ৭ম হিজরীর ১ম ভাগ)

দাওয়াতের বিজ্ঞ পন্থা

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। ইসলামের দাওয়াত স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পায় এবং উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার নতুন রাস্তাসমূহ বিস্তৃত হতে থাকে। এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন শাহানশাহ, সম্রাট ও আরবের আমীর-উমারা বরাবর কতকগুলো চিঠি লেখেন এবং তাদেরকে বড় বিজ্ঞজনোচিত পন্থায় ইসলামের দাওয়াত দেন।[১] এজন্য তিনি বেশ আয়োজন করেন এবং প্রত্যেক সম্রাটের জন্য এমন সব দূত নির্বাচিত করেন যাঁরা তাদের সম্মান ও মর্যাদা মুতাবিক কথাবার্তা বলতে পারেন এবং সেখানকার ভাষা তাছাড়া দেশের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।[২]

---

১. অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো, এসব পত্র হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যি'ল-হাজ্জ মাসে হিজরী ৬ সনে পাঠানো হয়। ওয়াকিদীর এটাই অভিমত। খৃ. সন হিসাবে এটি ৬২৭ খৃস্টাব্দের ঘটনা এজন্য যে, ঐ সব সম্রাটের মধ্যে শিরোনামে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয ছিলেন যিনি মার্চ ৬২৮ খৃস্টাব্দে মারা যান। সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে পত্র লেখা হয় তার সনও যদি ৬২৮ খৃ. মেনে নেয়া হয় তাহলে এই পত্র তাঁর হাতে পৌঁছা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কেননা ঐ বছরই তিনি আর্মেনিয়া সফরে গিয়েছিলেন। দেখুন আরবদের মিসর বিজয় (আরবী অনু.), আলফ্রেড বার্টলার, ১৩৯-৪০ পৃ.। এজন্য আমাদেরকে মেনে নিতে হয়, এসব পত্র খৃ. শতাব্দী মুতাবিক ৬২৭ খৃ. পাঠানো হয়েছিল (মুতাবিক ৬ষ্ঠ হি.)।

২. ইবন সা'দ তাঁর তাবাকত গ্রন্থে (২য় খ., ২৩ পৃ.) এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন এবং সুয়ূতী তাঁর আল-খাসাইসু'ল-কুবরা গ্রন্থে (২য় খ., ১১ পৃ.) এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তা থেকে জানা যায় এটি অস্বাভাবিক উপায়ে মুজিযা হিসাবে প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁরা উভয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এই বাক্য রয়েছে, "তাদের প্রত্যেকেই সেসব দেশের ভাষায় যেখানে তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল, অনর্গল কথা বলতে থাকেন।" বর্তমান গ্রন্থকার এই মুজিযার সম্ভাবনা ও সংঘটন সম্পর্কে সন্দিহান নন এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ও আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর জীবন-চরিত এ ধরনের মুজিযা ও অস্বাভাবিক ঘটনায় পূর্ণ, তথাপি লেখকের মতে এও সম্ভব ও যৌক্তিক বলেই মনে হয়, এটি মূলত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সর্বোত্তম মনোনয়নের ওপরও স্থাপিত হতে পারে এজন্য যে, রোমক ও পারসিক ভাষা, অধিকন্তু মিসরের কিবতী অধিবাসীদের ও আবিসিনিয়ার লোকদের ভাষা আরবদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ও আসা-যাওয়ার দরুন তাদের পক্ষে কোন অভাবিতপূর্ব ব্যাপার ছিল না। সমস্যা ছিল কেবল সেই চারটি ভাষার। আরব উপদ্বীপের অপরাপর আমীর-উমারা গোত্রের সর্দারদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা ছিল না এবং আরবী ভাষায় তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা হয়। এজন্য এটি খুবই যুক্তিসঙ্গত, এই অভিযানের জন্য সেই সব লোককেই নির্বাচিত করা হয় যাঁরা রোমক, পারসিক, কিবতী ও আবিসিনীয় ভাষা আগে থেকেই জানতেন এবং এ ধরনের লোক থেকে আরব ভূখণ্ড একেবারে শূন্য ছিল না যাঁরা ঐসব দেশে বরাবর গিয়ে দীর্ঘকাল ধরে অবস্থান করার কারণে ওপরের চারটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত এবং সেসবের মাধ্যমে দৌত্যকর্মের দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরজ করেন, এ সব দেশের শাসকবর্গ এমন কোন পত্র গ্রহণ করেন না যার ওপর মোহর অংকিত না করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য একটি বিশেষ মোহর (সীল) তৈরি করেন যার বৃত্ত ছিল রৌপ্যের এবং যেখানে الله। رسول محمد এভাবে অঙ্কিত ছিল।[১]

এসব লিপি আমাদের বলে দেয়, এই ধর্ম কেবল আরবদের কিংবা আরব উপদ্বীপের নয়, বরং গোটা মানব সমাজের ছিল। এরপর তা আরবের বাইরের সভ্য ও প্রভাবশালী হুকুমের ভেতর তাদের পতন দেখতে পায় এবং সিদ্ধান্ত নেয়, তারা নিজেরা এই দাওয়াতকে কবুল করবে না অথবা নিদেনপক্ষে তাদের প্রজাদেরকে এই দাওয়াত বোঝাবার ও সে সম্পর্কে ফয়সালা করবার সুযোগ দেবে না।

নবী করীম ﷺ-এর পত্রাবলী

যে সব রাজা-বাদশাহ ও সম্রাটের নামে এসব পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয, আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশী ও মিসরের বাদশাহ মকাওকিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হেরাক্লিয়াসের নামে প্রেরিত পত্র তিনি হযরত দাহিয়্যাতুল-কালবী মারফত পাঠান এবং তিনি বসরার শাসক ও সর্দারের মাধ্যমে এই পত্র সম্রাট হেরাক্লিয়াস কাছে পৌঁছে দেন। পত্র নিম্নরূপ :

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم ـ سلام على من اتبع الهدى ـ اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم اليرِيسيين ـ يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদের পক্ষ থেকে যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, এই পত্র রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামে প্রেরিত হচ্ছে। হেদায়াতের অনুসারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম কবুল কর, শান্তি পাবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর তুমি যদি তা না মান, এর থেকে মুখ

---

[১] সহীহ বুখারীর কিতাবু'ল-জিহাদ الخ دعوة والنصارى وعلى ما يقاتلون শীর্ষক অধ্যায়।

ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমার প্রজাবর্গের গোনাহও তোমার কাঁধে চাপবে। "হে কিতাবধারিগণ! এমন একটি কথার দিকে এস যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে বরাবর আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর ইবাদত করব না। আর আমাদের কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের কাউকে 'রব' তথা প্রভু-প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করব না। আর যদি তোমরা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে বল, সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।"[১]

খসরু পারভেযের নামে নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন:

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد رسول الله الى كسرى
عظيم فارس ـ سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله
وشهد ان لا اله اله الله وانى رسول الله الى الناس كافة لينذر
من كان حيا ـ اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس ـ

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর উদ্দেশে (পত্র প্রেরিত হচ্ছে)। তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের অনুসারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী এবং যে এই সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি সমগ্র মানবমণ্ডলীর উদ্দেশে রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি যাতে প্রত্যেক জীবিত মানুষকে আমি সতর্ক করতে পারি, করতে পারি ভীতি প্রদর্শন। ইসলাম কবুল কর, শান্তি পাবে। অন্যথায় অগ্নি-উপাসক প্রজাবর্গের সকল পাপ তোমার কাঁধে চাপবে।"[২]

নাজাশীর নামে প্রেরিত পত্র নিম্নরূপ:

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد رسول الله الى
النجاشى عظيم الحبشة ـ سلام على من اتبع الهدى اما بعد!
فانى احمد اليك الله الذى لا اله هو الملك القوس السلام
المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى بن مريم روح الله وكلمة
القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من
روحه ونفخه كما خلق ادم بيده وانى ادعوك الى الله وحده لا
شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعنى وتؤمن بالذى

১. সহীহ বুখারী كيف كان بدء الوحى الرسول الله ﷺ শীর্ষক অধ্যায়।
২. তাবারী, ৩য় খ., ৯০ পৃষ্ঠা।

جاءنى فانى رسول الله وانى ادعوك وجنودك الى الله عز وجل وقدبلغت ونصحت فاقبل نصيحتى والسلام على من اتبع لهدى

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদের পক্ষ থেকে, যিনি আল্লাহর রাসূল, আবিসিনীয় অধিপতি নাজাশীর প্রতি (এই পত্র প্রেরিত হচ্ছে)। হেদায়াত অনুসারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমি তোমার নিকট সেই আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। যিনি সম্রাট, পবিত্র, শান্তিপ্রদাতা, মুমিন ও রক্ষক এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈসা ইবন মরিয়ম আলায়হির-সালাম আল্লাহর রূহ ও তাঁর বাক্য যা তিনি পবিত্র আত্মা ও সতী সাধ্বী মরিয়মের মধ্যে ফুঁকেছিলেন। এরপর তাঁর রূহ ও তাঁর ফুৎকারে ঈসা (আ) তাঁর গর্ভে স্থিতি লাভ করেন, হযরত আদম (আ)-কে যেমন তিনি তাঁর কুদরতী হাতে বানিয়েছিলেন। আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি এক আল্লাহয় বিশ্বাস স্থাপনের যাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর প্রভুত্বের, আনুগত্যের। আর তুমি আমার আনুগত্য কর এবং ওয়াহী হিসাবে আমার ওপর যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ কর। তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চিতই আমি আল্লাহর রাসূল আর আমি তোমাকে ও তোমার সেনাবাহিনীকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং আমার নসীহত পূর্ণ করেছি। অতএব, আমার নসীহত কবুল কর। যারা হেদায়াতের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম।"[১]

কিবতী অধিপতি ও বাদশাহ মুকাওকিসের নামে প্রেরিত চিঠি ছিল নিম্নরূপ :

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد عبد الله ورسول الله الى المقوقس عظيم القبط ـ سلام على من اتبع الهدى اما بعد! فانى ادعوك بدعاية الاسلام ـ اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين ـ فان توليت فان عليك اثم اهل القبط ـ ياأهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ـ فان تولوا فقلوا اشهدوا بانا مسلمون ـ

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কিবতী অধিপতি মকাওকিসের নামে। হেদায়াত অনুসারীদের

১. তাবাকাত ইবন সা'দ, ৩য় খ., ১৫ পৃ.।

ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত জানাচ্ছি ইসলাম কবুল কর, শান্তি পাবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত করবেন আর যদি তুমি না মান তাহলে তোমার দেশবাসীর গোনাহও তোমার ওপর বর্তাবে ওহে আহলে কিতাব! একটি বিষয়ের দিকে আস যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর তারা যদি স্বীকার না করে তাহলে বলে দাও, সাক্ষী থাক, আমরা তো অনুগত মুসলিম।"
[সূরা আল ইমরান : ৬৪ আয়াত]

কিন্তু খসরু পারভেযের পত্রে এই আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল না। কেননা এসব পত্রে সেই সব গ্রন্থধারী (আহলে কিতাব)-কে সম্বোধন করা হয়েছে যারা ঈসা মসীহ (যীশু খৃস্ট)-এর ঈশ্বরত্বের সমর্থক এবং যারা আল্লাহ ছাড়া ধর্মীয় পণ্ডিত সাধু-সন্তদেকে ও মসীহ (আ)-কে নিজেদের 'রব' তথা প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। হেরাক্লিয়াস বায়যান্টিয়াম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন আর মুকাওকিস ছিলেন মিসরের বাদশাহ। উভয়েই তৎকালীন খৃস্টান বিশ্বের নেতা ও [হযরত মসীহ (আ) সম্পর্কে মামুলী কিসিমের মতভেদ ছাড়া] স্বীকৃত ধর্মীয় রাহনুমাও ছিলেন।[১]

খসরু পারভেয ও তার জাতি সূর্য পূজারী ও অগ্নিপূজক ছিল এবং দুই খোদা (মঙ্গল ও কল্যাণের খোদা 'য়াযদান' এবং অমঙ্গল ও অকল্যাণের খোদা হিসেবে 'আহরিমান'-কে মান্য করত। তারা নবুওয়াত ও রিসালাতের সঠিক মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। সেজন্য পারস্য সম্রাটের প্রেরিত পত্রে এই কথা লেখা হয়েছিল : رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا "আমি সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য আল্লাহর এমন এক রাসূল যেন সচেতনভাবে তিনি জীবিত লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন!"

এসব সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কারা?

আমরা এই পয়গম্বরসুলভ পদক্ষেপের গুরুত্ব ও উপযোগিতা (যা এসব পত্রে ব্যক্ত হয়েছে) ততক্ষণ পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারব না যতক্ষণ না ওপরের রাজন্য চতুষ্টয় (হেরাক্লিয়াস, খসরু পারভেয, নাজাশী ও মুকাওকিস)-এর সমসাময়িক ইতিহাসে অবস্থান ও মর্যাদা, তাদের সাম্রাজ্যের পরিধি ও বিস্তৃতি এবং তাদের শান-শওকত সম্পর্কে আমরা জানব। যদি কেউ খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে না জানেন এবং তিনি যদি ঐসব দেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন লেখকের ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين গ্রন্থ। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' বইটি মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত।

জেনে থাকেন তাহলে তিনি মনে করতে পারেন, এসব পত্র কতকগুলো স্থানীয় শাসক ও দেশীয় রাজার[১] নামে লেখা হয়েছিল যা সর্বকালে ও সর্বত্র পাওয়া যায়।

এর বিপরীতে যিনি সেই যুগের রাজনৈতিক চিত্রে ঐসব রাজা-বাদশাহর গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত, তাঁদের ইতিহাস, জীবন-চরিত ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানেন, তাঁদের শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারেন, তিনিই অনুভব করবেন, এই বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ ও সাহসিকতা প্রদর্শন কেবল সেই নবীই করতে পারেন যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য আদিষ্ট, যাঁর ওপর এই দাওয়াত ও পয়গামের পরিপূর্ণ যিম্মাদারী অর্পিত, যাঁর ওপর দুর্বলতা ও ভীতির সামান্যতম ছায়াও পড়েনি এবং আসমান ও যমীনের প্রকৃত শাহানশাহ রাজাধিরাজের তাঁর ওপর এমন তাজাল্লি হবে যে, রাজমুকুট ও শাহী তখতের মালিক তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিংবা নিষ্প্রাণ কাঠের তৈরী পুতুল মনে হয়, যাঁকে বাদশাহদের পোশাকে সজ্জিত করে হুকুমতের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সেজন্য এখানে সমসাময়িক ইতিহাস ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্যের সাহায্যে তাঁদের পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে।

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস ১ম (৬১০-৬১৪ খৃ.)

বায়জানন্টাইন সাম্রাজ্যের অধিপতি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস ১ম এক সুবিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন যিনি পারস্য সম্রাটের সঙ্গে মিলে সে যুগের সমগ্র সভ্য জগতকে নিজেদের মধ্যে আপসে ভাগ-বন্টন করে নিয়েছিলেন এবং যার মুদ্রা অর্ধ দুনিয়াব্যাপী চলছিল। তিনটি মহাদেশ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় তার সমৃদ্ধ, শক্তিশালী, প্রাচুর্যপূর্ণ, উন্নত, সভ্য ও নব্য উপনিবেশ (Dominions) ছিল। এই সাম্রাজ্য মহান রোম সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত ছিল যার অধীনে প্রায় সমগ্র প্রাচীন সভ্য দুনিয়াটাই ছিল।[২]

এই সম্রাট এক গ্রীক পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি কাপুডেশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং (কুর্তাজেনা) কার্থেজ-এ লালিত-পালিত হন। তিনি আফ্রিকার একজন শাসকের পুত্র ছিলেন। তাঁর ভেতর এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে তার অস্বাভাবিক মেধা, উৎসাহব্যঞ্জক ও নেতৃসুলভ যোগ্যতার পরিচয় মিলত। ফোকাস যখন জোরপূর্বক বায়জানন্টাইন সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট মরিকাস মরিস (পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয যার দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন)-কে হত্যা করেন তখন ইরানীরা

---

১. যেমন বৃটিশ যুগের হায়দারাবাদের নিজাম, ভূপালের নওয়াব অথবা গোয়ালিয়ার মহারাজা সিন্ধিয়া ও বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড়ের নামে তাবলীগী চিঠি লেখা।

২. এই সম্রাটের সীমা ও এর অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য ও প্রদেশগুলোর বিস্তৃত বর্ণনা যা সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে ছিল, গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে 'প্রাচ্যের রোম সাম্রাজ্য' শিরোনামে আমরা বর্ণনা করেছি।

বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর সৈন্য পরিচালনার বাহানা পেয়ে যায় এবং বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে। এই বিশাল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ নিঃশ্বাস চলছিল।[১] ফলে হেরাক্লিয়াসকে কার্থেজ থেকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি ফোকাসকে হত্যা করেন এবং ৬১০ খৃস্টাব্দে[২] সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সে সময় গোটা দেশ জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাচ্ছিল এবং শুষ্ক ও খরা, সংক্রামক ব্যাধি, দারিদ্র্য ও সম্পদহানির ফলে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল।

হেরাক্লিয়াস তাঁর হুকুমতের প্রথম বছর পরিপূর্ণ শান্তি ও স্বস্তিপ্রিয় মানুষের ন্যায় কাটিয়ে দেন এবং কোন বড় ধরনের কাজ আনজাম দেননি। কিন্তু ৬১২ খৃস্টাব্দে তাঁর ভেতর অকস্মাৎ এক বিপ্লব সৃষ্টি হলো (এটি ছিল সেই বছর যেই বছর কুরআন মজীদ কয়েক বছরের ভেতর রোমকদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল)[৩] এবং তিনি দেখতে না দেখতেই একজন আরাম ও বিলাসপ্রিয় সম্রাট থেকে একজন আবেগদীপ্ত ও মর্যাদাবান নেতা ও জেনারেলে পরিণত হন। এই ধারণা তাঁর সমগ্র সত্তার ওপর পুরোপুরিভাবে চেপে বসে। তার ভেতর জাতীয় মর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

এরপর তিনি ইরানের হৃৎপিণ্ডের প্রতি গতি ফেরালেন, আপন হৃতভূমি ও সম্মান আবার উদ্ধার করলেন, ইরানের বিখ্যাত শহরগুলো দখল করলেন, ইরানের হৃৎপিণ্ডে অবতরণ করে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে তাঁর ঝাণ্ডা গেড়ে দিলেন, মহান ও প্রাচীন ইরানী শাহানশাহীর সম্মান ও মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন, তাদেরকে আঘাতে আঘাতে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেন যে, মনে হচ্ছিল পারস্য সাম্রাজ্য অন্তিম দশায় উপনীত হয়েছে এবং সাসানী বংশের সিংহাসনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। বিজয়ী সম্রাট অতঃপর ফিরে এসে ৬২৫ খৃস্টাব্দে বিজয়ীর বেশে কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করেন এবং ৬২৯ খৃস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশকাষ্ঠ (ইরানীরা যা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল) সেখানে পুনরায় স্থাপন করেন এবং আপন মানত পুরা করবার জন্য বায়তুল-মাকদিসের উদ্দেশে রওয়ানা হন। লোকে সম্মান ও ভক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর রাস্তায় ফরাশ ও গালিচা বিছিয়ে দিত, পুষ্প বর্ষণ করত এবং আতর ছিটিয়ে দিত।[৪] ক্রুশ কাষ্ঠ আবার স্থাপনের আনন্দে সেখানে এক বিরাট আনন্দ উৎসব

---

১. এর বিস্তৃত বিবরণ ঐতিহাসিক গিবনের Decline and fall of Roman Empire ও আর্থার ক্রিস্টিনসিন সাসানী আমলে ইরান নামক গ্রন্থে দেখুন।

২. এই ঘটনার এক বছর পর আরব উপদ্বীপে হুযূর (সা) নবুওয়াত লাভ করেন।

৩. দেখুন সূরা রূম-এর প্রাথমিক আয়াত, অধিকন্তু লেখকের مطالعۂ قران کی اصول ومبادی গ্রন্থের "কুরআন মজীদে রোমকদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী" শীর্ষক অধ্যায়।

৪. ফাতহু'ল-বারী, ১ম খ., ২১ পৃ.।

আয়োজন করা হয়। এক সময় হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র মুবারক পান যে পত্রে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল।[১]

কিন্তু এর পরপরই হেরাক্লিয়াস অলসতা, গাফিলতি, আরাম-আয়েশ ও বিলাসপ্রিয়তার সেই অবস্থায় ফিরে আসেন যেই অবস্থায় তিনি পূর্বে ছিলেন, এমন কি ইসলামের জানবায মুজাহিদবৃন্দ এই সাম্রাজ্যের পতনের ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে তার অবসানও ঘটল। সম্রাটের বিশাল সাম্রাজ্য কেবল য়ূরোপ ও এশিয়া মাইনরে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। যা-ই হোক, তাঁকে তাঁর যুগের মহান সম্রাটদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। সাম্রাজ্যের পরিধি ও বিস্তৃতি, সমর শক্তি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যদি কেউ তার সমকক্ষ ও সমমর্যাদার থেকে থাকেন তবে তিনি ছিলেন ইরানী শাহনশাহ খসরু ২য়। ৬৪১ খৃ. কনস্টান্টিনোপলে তিনি ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

খসরু পারভেয ২য় (৫৯০-৬২৮ খৃ.)

ইনি হরমুযের ৪র্থ পুত্র ও খসরু ১ম, যিনি ন্যায়বিচারক বাদশাহ নওশেরওয়াঁ নামে খ্যাত, এর পৌত্র ছিলেন। আরবের লোকেরা তাকে কিসরা পারভেয নামে স্মরণ করে থাকে। তার পিতার হত্যার পর ৫৯০ খৃ. তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহরাম চুবীন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। খসরু পরাজিত হন, সাসানী রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে বায়যান্টাইন অধিপতি মরিস (Maruice)-এর আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং আপন রাজ্য পুনরুদ্ধারে তার সাহায্য চান। মরিস বিশাল সেনাবাহিনী সহকারে তাকে সাহায্য করেন। বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাহরাম পরাজিত হন এবং খসরু তার পিতা-পিতামহের সিংহাসনে পুনরায় বসেন। ৬১২ খৃ. খসরু বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর তার আত্মিক (معنوی) পিতা ও অনুগ্রহদাতা অভিভাবক, মরিসের হত্যার বদলা তার ঘাতক ও রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসন ছিনতাইকারী ফোকাস থেকে, গ্রহণের স্থির সংকল্প করেন। অবশেষে ফোকাসের হত্যাও তাকে আরও অভিযান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং তার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের বারটা বাজিয়ে ছাড়েন যার নজীর পূর্বে মেলে না। ৬১৫ খৃ. পর্যন্ত তার বিজয় ও সৌভাগ্য অর্জন করেন, এমন কি হেরাক্লিয়াস ইরানীদেরকে তার দেশ থেকে উৎখাত করেন এবং সাসানী সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের ওপর হামলা করেন। খসরু পারভেযকে তার দেশকে বিদায়

---

১. খসরু পারভেযের বিপরীতে হেরাক্লিয়াসের পত্র পেতে যে বিলম্ব হয়েছিল এর কারণ হলো, এই পত্র প্রথমত বুসরার শাসককে সোপর্দ করা হয় যাতে তিনি তা সম্রাটকে দেন। তিনি সম্রাটের সামরিক ব্যস্ততা ও রাজধানী থেকে দূরত্বের কারণে সম্ভবত এ পত্র সময়মত তাকে দিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে ৬২৮ খৃ. তাকে আর্মেনিয়া যেতে হয় বলে তিনি ৬২৯ খৃ. উল্লিখিত মানত পুরা করেন।

সম্ভাষণ জানিয়ে একটি সুরক্ষিত ও দূরদরাজ এলাকায় আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু সত্বরই ৬২৮ খৃস্টাব্দে একটি বিদ্রোহের ফলে সকল কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইরানের ঐতিহাসিকগণ একমত, খসরু ২য় ইরানের সবচেয়ে মহান ও শান-শওকতের অধিকারী সম্রাট ছিলেন। তার আমলে সাসানী সাম্রাজ্য উন্নতি ও সমৃদ্ধি, জীবনের প্রাচুর্য, বিলাসসামগ্রী ও সৌন্দর্য-উপকরণের সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম রাজ্যগুলোতে পর্যন্ত তাঁর মুদ্রা চালু ছিল।[১] তাঁর নামের সঙ্গে এসব শানদার ভূমিকা যোগ করা হতো :

"ঈশ্বরসমূহের মধ্যে অবিনশ্বর মানব, মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় খোদা, তার নামের বিজয়গাথা, সূর্যের সঙ্গে উদয়কারী, রাত্রির চক্ষু উন্মীলনকারী।"[২] তার যুগে দেশ যতটা উন্নতি করেছিল এবং তিনি যতটা শান-শওকত লাভ করেছিলেন সে সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারীর বক্তব্য নিম্নরূপ:

"এই বাদশাহ ছিলেন সবচেয়ে বেশি কঠোর স্বভাবের, সবচেয়ে বেশি সিদ্ধান্ত প্রদানে শক্তিসম্পন্ন ও দূরদৃষ্টির অধিকারী, বীরত্বে ও শৌর্যবীর্যে, বিজয় ও সফল কৃতিত্বে, সম্পদের প্রাচুর্যে, ভাগ্যের সহায়তা ও যুগোত্তীর্ণ হবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যতটা তার অধিকারে ছিল আর কোন বাদশাহর তা ছিল না। ফলে তার উপাধি হয়ে গিয়েছিল পারভেয আরবীতে যার অর্থ মুজাফফার অর্থাৎ বিজয়ী ও সৌভাগ্যশালী।[৩] সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুনত্ব নিয়ে আসায় এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে তার কোন জুড়ি ছিল না। খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় শাখায় নিত্য নতুন আবিষ্কার তিনি করেছিলেন।[৪]

আতর ও সুগন্ধি দ্রব্য উদ্ভাবনে তার স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তার আমলে জাঁকজমকপূর্ণ রকমারী খানা, উন্নত ধরনের পানীয় এবং সর্বোত্তম আতর ও সুগন্ধির প্রতি লোকের এক ধরনের বিশেষ রুচি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। গান-বাজনা ও সঙ্গীত তার আমলে উন্নতির এতটা চরম শিখরে পৌঁছেছিল যে, লোকের এসব জিনিসের প্রতি এক অস্বাভাবিক রকমের মোহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সম্পদ জমা করা, গহনাসামগ্রী ও সুন্দর সুন্দর দ্রব্য একত্র করার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ ও বড় শখ। যখন তার রাজকোষের মালামাল (৬০৭ খৃ. - ৬০৮ খৃ.) পুরাতন ভবন থেকে তেসিফোন (মাদায়েন)-এর নতুন ভবনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার পরিমাণ ছিল ৪৬৮ মিলিয়ন (অর্থাৎ ছেচল্লিশ কোটি আশি লাখ) মিছকাল স্বর্ণ যা সাইত্রিশ কোটি ৫০ লাখ রৌপ্য (طلائی) ফ্রাংকের সমমানের। সিংহাসনে আরোহণ ত্রয়োদশ বর্ষে

১. সাসানী আমলে ইরান, ৬০২ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ৬০৪ পৃ.।

৩. তারিখে তাবারী , ২য় খ., ১৩৭ পৃ.।

৪. প্রাগুক্ত ইতিহাস, ৯৯৫ পৃ.।

তাঁর রাজকোষে ৮৮০ মিলিয়ন (অর্থাৎ ৮৮ কোটি) মিছকাল স্বর্ণ মজুদ ছিল।[১] তিনি ৩৭ বছর রাজত্ব করার পর তার পুত্র শায়রেয়া সিংহাসনে বসেন।

মুকাওকিস (হি. ৬ষ্ঠ খৃ. ১২শ)

তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর ও মিসরে বায়যান্টাইন সম্রাটের ভাইসরয় ছিলেন। আরব ঐতিহাসিকদের অনেকেই তাকে মুকাওকিস নামে স্মরণ করেন। তার আসল নাম ও ডাকনামের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক আবূ সালেহ হিজরী ৬ষ্ঠ/খৃ. ১২ শ শতকে, যিনি তার ইতিহাস লিখেছিলেন, জুরায়জ ইবন মীনা আল-মুকাওকিস নামে তার উল্লেখ করেছেন। ইবন খালদূন লিখেছেন, তিনি কিবতী (কপ্ট) ছিলেন। ঐতিহাসিক মাকরীযী তাকে "আল-মুকাওকিস আর-রূমী" লিখেছেন। ইরানীরা যখন মিসরের ওপর হামলা করে তখন বায়জান্টাইনীয়দের নিযুক্ত গভর্নর পালিয়ে যান। তার নাম ছিল Johnthe Almober। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পালিয়ে সাইপ্রাস পৌঁছেন এবং সেখানেই মারা যান। এরপর হেরাক্লিয়াস অপর একজন ভাইসরয় নিযুক্ত করেন যার নাম ছিল জর্জ। সম্ভবত ইনিই তিনি যাকে আরবরা জুরায়জ বলে। সম্রাট তাকে রাষ্ট্রীয় গির্জার প্রধানও নিযুক্ত করেন। কতক ঐতিহাসিক লেখেন, তার নিযুক্তি হয় ৬২১ খৃ.। আলফ্রেড বাটলার লেখেন,

আরবদের ধারণা ছিল, যেই গর্ভনর বায়যান্টাইন সরকারের পক্ষ থেকে ইরানের ওপর বিজয় লাভের পর মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন তার উপাধি ছিল মুকাওকিস। তিনি একই সঙ্গে দেশের গভর্নর, গির্জার প্রধান ও ধর্মীয় নেতাও হতেন। তারপর তিনি জর্জের জন্য (যিনি সেখানে ভাইসরয় ছিলেন) এই উপাধি ঠিক করেন। তারা এ ব্যাপারে প্রাধান্য দেন, মুকাওকিস তার আসল নাম নয়, বরং উপাধি যা প্রাচীন কিবতী বা কপ্ট ভাষার শব্দ। এটাও সম্ভব, মিসরের ওপর ইরানীদের বিজয়, প্রাধান্য ও ক্ষমতা লাভের সময় কোন কিবতী লাট পাদরী গির্জার নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লাগাম নিজ হাতেই নিয়ে থাকবেন; তথাপি সন্ধিচুক্তি তথা সুলেহনামা ৬২৮ খৃ. লিখিত হয়। এজন্যই এটা সম্ভব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিপি মুবারক মুকাওকিসের নামে এই সময়েই পৌঁছে যখন মিসরের গভর্নর প্রায় স্বাধীন ছিলেন।[২]

আর এটাই কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামের সঙ্গে عظيم القبط তথা কিবতীদের মহান নেতা শব্দ প্রয়োগে সম্বোধন করেন।

মিসর বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উর্বর রাজ্য ছিল এবং উৎপাদন ও জনসংখ্যা– উভয় ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিল। রোমের রাজধানীতে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ

---

১. সাসানী আমলে ইরান, পৃ. ৬১১।

২. দ্র. আলফ্রেড বাটলারকৃত "আরবদের মিসর বিজয়" নামক গ্রন্থ। কোন কোন গ্রন্থে গর্ভনরের নাম আল-জাদ কীবোস বা কীদাস বলা হয়েছে।

এখান থেকেই হতো। মিসর বিজয়ী হযরত 'আমর ইবনুল-আস (রা), যিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পত্র প্রেরণের চৌদ্দ বছর পর সেখানে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন. আমিরুল-মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনুল-খাত্তাব (রা)-এর নামে স্বীয় প্রেরিত পত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় মিসরের প্রশংসা করেছিলেন,

"মিসরের যমীন অত্যন্ত সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যমলা। এর দৈর্ঘ্যও এক মাসের দূরত্ব এবং প্রস্থে দশ দিনের পরিমাণ।[১] এর বসতি ও জনসংখ্যার পরিমাপ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, হযরত 'আমর ইবনুল-আস (রা) যখন ২০ হিজরী মুতাবিক ৬৪০ খৃ. মিসর বিজয়ের পর এই জরিপ করেন, জিযয়া কর কারা দিতে পারে, তখন দেখা গেল, এ সংখ্যা ষাট লাখের বেশি।[২] রোমকদের সংখ্যা এদের ভেতর ছিল এক লাখ। হযরত 'আমর ইবনুল-আস (রা) পত্রে এও লিখেছিলেন,

"আমি এমন এক শহর জয় করেছি যার প্রশংসায় আমি এতটুকু লিখছি, আমি সেখানে চার হাজার সমুন্নত ও সুদৃঢ় জায়গা দেখতে পেয়েছি যেখানে চার হাজার হাম্মাম (গোসলখানা) ছিল, ইয়াহূদীদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার আর বাদশাহর জন্য ছিল চার শত বিনোদন কেন্দ্র।"[৩]

নাজাশী (৫২৫-৫৭৫ খৃ.)

এই দেশটি প্রাচীনকাল থেকে হাবশা (Abyssinia)[৪] বর্তমান ইথিওপিয়া (Etheopia) নামে পরিচিত। এটি পূর্ব আফ্রিকার অংশ এবং লোহিত সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। যে যুগের কথা আমরা আলোচনা করছি তখন এর সীমা কী ছিল তা নির্ধারণ করা আজ খুব সহজ নয়।

এখানকার হুকুমতও পৃথিবীর প্রাচীনতম হুকুমতগুলোর অন্যতম। ইয়াহূদী উৎস থেকে জানা যায়, সাবার রাণী আবিসিনিয়াতেই থাকতেন এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর বংশধর আজও এর শাসন ক্ষমতায় সমাসীন।[৫] হাকাল-ই সুলায়মানীর ধ্বংসের পর এখানেই ইয়াহূদীরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। খৃ. চতুর্থ শতক থেকে খৃস্ট ধর্ম সেখানে বিস্তার লাভ করতে থাকে। য়ামানের বাদশাহ যখন তার দেশে খৃস্টানদের ওপর জুলুম করতে শুরু করে তখন রোম সম্রাট ১ম জাস্টিনিয়ান আবিসিনিয়ার বাদশাহ্র নিকট খৃস্টানদের সাহায্য করার এবং তাদের ওপর কৃত জুলুমের অবসানের দাবি জানান। এরপর ৫২৫ খৃ. তিনি য়ামান দখল

১. আন-নুজূমুয-যাহিরা, ইবন তাগরীবিরদীকৃত, ১ম খ., ৩২১ পৃ.।

২. দাইরায়ে মা'আরিফ আল-কিরান আল-ইশরীন, মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদীকৃত, মিসর শিরো। লেখক বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে এই সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এজন্য যে, মিসরের জনসংখ্যা এই মুহূর্তেও চল্লিশ মিলিয়নের বেশি নয়।

৩. হুসনুল-মুহাদারা, সুয়ূতীকৃত।

৪. সম্রাট হাইলে সেলাসী পর্যন্ত ওপরের তথ্য সঠিক ছিল। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সম্রাটের পতনের পর দেশটির ওপর দিয়ে পরিবর্তনের অনেক ঝড়ই বয়ে গেছে। -অনুবাদক।

করেন এবং য়ামানের ওপর আবিসিনিয়ার নিয়ন্ত্রণ ৫০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকে। ঐ সময় আবিসিনিয়ার পক্ষ থেকে য়ামানের বাদশাহ আবরাহা বায়তুল্লাহর ওপর আক্রমণ চালায় এবং হাতীর ঘটনা সংঘটিত হয়।

আবিসিনিয়ার রাজধানী ছিল Axum, এটি ছিল একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত হুকুমত যা কোন ভিনদেশী হুকুমতের অধীন ছিল না এবং কাউকে খাজনা কিংবা ট্যাক্স দিত না। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কেবল ধর্মীয় আর সে ধর্মীয় সম্পর্ক খৃস্ট ধর্মের। এর প্রমাণ পরিষ্কারভাবে এ থেকে মেলে, বায়যান্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান খৃ. তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি জুলিয়ান নামে এক ব্যক্তিকে আবিসিনিয়ার শাহী দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন।[১] Delacy O'leary তার Arabia before Muhammad নামক গ্রন্থে লেখেন,

"৫২ খৃ. থেকে শুরু করে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত আবিসিনিয়া পূর্ব লোহিত সাগর আফ্রিকার সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করত, বরং সম্ভবত সে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রণ করত।"[২]

আবিসিনিয়ার বাদশাহকে সর্বদা নাজাশী (Nagusa, Nagashi) বলা হতো। অবশ্য এই নাজাশী কে ছিলেন তা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় যাঁর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং যাঁকে ইসলামের দাওয়াত জানিয়েছিলেন। এই সূত্রে আমাদের সামনে দু'জন এবং একে অপরের থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছেন। প্রথমজন হচ্ছেন যাঁর শাসনামলে মক্কার মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে জা'ফর (রা) ইবন আবী তালিবও ছিলেন। এটি নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের ঘটনা। এটি একটি যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় এই পত্র পাঠিয়েছিলেন। কেননা তখনকার অবস্থা এর একেবারেই অনুমতি দেয় না এবং এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল মুহূর্তও তখন আসেনি। তিনি হিজরতের পূর্বে কোন রাজা-বাদশাহর নামে পত্র দিয়েছিলেন এবং ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিয়েছিলেন এর কোন হদিস আমরা পাই না। খুব বেশি যা পাওয়া যায় তা হলো, তিনি এ সময় তাঁকে সেসব মুসলমানকে আশ্রয় দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন যাঁরা কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। ইবন হিশাম ও অপরাপর লেখক এই অধ্যায়ে যা কিছু লিখেছেন তা থেকে এতটা অনুমান অবশ্যই করা যায়, তাঁর অন্তরে ঈমান আসন গেড়েছিল এবং তিনি একথা স্বীকার করতেন, ঈসা আলায়হিস-সালাম ইবন মরিয়ম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর হুকুম যা তিনি মরিয়ম (আ)-এর ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন।

---

১. A.H.M. Jones & Elizabeth Monroe-কৃত, A History of Abyssinia 1935, p.p. 63.
২. Arabia before Muhammad, London.1927. P. 120.

এই নাজাশী সম্পর্কে যতটা জানা যায় যাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক হাফিজ ইবন কাছীরের ধারণা মুতাবিক, তিনি সেই নাজাশী যিনি সেই মুসলিম নাজাশীর পর (আবিসিনিয়ার) শাসক হন, হযরত জা'ফর (রা) যাঁর দরবারে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ইব্ন কাছীর বলেন, এটি সেই সময় ঘটেছিল যখন তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন শাসকের নামে পত্র লেখেন এবং তাদেরকে দীনে হকের দাওয়াত দেন। আমাদের মতে প্রাধান্য পাবার যোগ্য অভিমত হলো, ইনিই সেই নাজাশী যিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই মুসলমানদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনায় দু'আ করেছিলেন। উবায়্যি ওয়াকেদী ও অন্যান্য জীবন-চরিতকারের বরাতে লেখেন, "ইনিই সেই নাজাশী যাঁর জন্য তিনি মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন।" এই ঘটনা তাবূক অভিযান থেকে ফেরার সময় ৯ম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

আর এভাবেই বিভিন্ন বর্ণনার সত্যতা সমর্থিত হয় এবং কার্যকারণ দ্বারাও এর সমর্থন মেলে। আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রেরিত পত্রের সঙ্গে রাজা-বাদশাহদের আচরণ

হেরাক্লিয়াস, নাজাশী ও মুকাওকিস– এই তিনজন নবী করীম ﷺ-এর পত্রের সঙ্গে ভক্তি ও সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করেন। তাদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত জাওয়াব ছিল বিনয়-মিশ্রিত ও শ্রদ্ধাবিজড়িত। নাজাশী ও মুকাওকিস রাসূল ﷺ-এর দূতকে খুবই সম্মান করেন। মুকাওকিস তাঁকে উপঢৌকনও পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে দু'জন বাঁদীও ছিল। এঁদের একজনের নাম ছিল মারিয়া (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রা) তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয পত্র পেতেই তা ছিঁড়ে ফেলে এবং বলে, আমার গোলাম হয়ে আমাকে এভাবে লেখে![1] রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলেন: আল্লাহ তার রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দিন।[2]

---

১. নিজামী গাঞ্জাবী, যিনি ইরানের ঈমানদার কবি ছিলেন, পারস্য সম্রাটের এই ধৃষ্টতাকে তার স্বরচিত কবিতায় খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

دریدان نامه گردن شکن را * نه نامه بلکه نام خویشین را.

২. সহীহ বুখারী كتاب النبى ﷺ الى كسرى وقيصر শীর্ষক অধ্যায়ে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নামে লিখিত সেই পত্র পাওয়া গেছে এবং এ পত্রে ছেঁড়ার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান যা মাঝখানে ওপরের দিক থেকে নিচের দিকে ডান দিকে একটু ঝোঁকানো এবং এটি সেলাই করে জোড়া দেয়া হয়েছে। এই ফরমান মুবারক সীসায় ফ্রেম করা অবস্থায় লেবানন সরকারের একজন মন্ত্রী হেজী ফিরআওনের নিকট রক্ষিত (নিবন্ধটি ড. ঈয্যুদ্দীন ইবরাহীম পেশকৃত সীরাত কনফারেন্স দোহা রবী'উল আওয়াল ১৪০০ হি. ড. সালাউদ্দিন আল-মুনজিদ, আল-হায়াত পত্রিকায় রয়েছে।

হেরাক্লিয়াস : তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধও করেছ?

আবূ সুফিয়ান : হ্যাঁ (করেছি)।

হেরাক্লিয়াস : যুদ্ধের ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে?

আবূ সুফিয়ান : যুদ্ধের পাশা আমাদের ও তাঁদের মধ্যে পাল্টাতে থাকে। কখনো আমরা, আবার কখনো তাঁরা বিজয়ী হন।

হেরাক্লিয়াস : তিনি কিসের তা'লীম দিয়ে থাকেন?

আবূ সুফিয়ান : তিনি বলেন, এক আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে অপর কাউকে শরীক করো না। সালাত আদায় কর, চরিত্রের হেফাজত কর, সত্যি কথা বল, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর।

হেরাক্লিয়াস দোভাষীকে বললেন, তাঁকে বল, আমি তোমাকে তাঁর (রাসূল ﷺ-এর] বংশ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের ভেতর শরীফ বংশের। পয়গম্বরগণ সব সময় উত্তম খান্দানেই জন্ম নিয়ে থাকেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, উক্ত খান্দানে আর কেউ নবূওয়াত দাবি করেছিল কি না? তার জওয়াবে তুমি না বলেছ। যদি এর আগে আর কেউ এই দাবি করত তাহলে আমি বলতাম, তিনি পূর্বসূরীর নকল করছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর খান্দানে কোন বাদশাহ অতিক্রান্ত হয়েছেন কি না? তুমি বলেছ, না। যদি কেউ বাদশাহ হতেন তাহলে আমি বলতাম, নবূওয়াত দাবি দ্বারা তিনি বাদশাহী হাসিল করতে চান, তিনি ক্ষমতাপ্রত্যাশী। আমি আরও জানতে চেয়েছি, তাঁর নবুওয়াত দাবির পূর্বে তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখেছ কি না? তুমি বলেছ, না।

আমি জানি, এটা অসম্ভব। কেননা যিনি মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলেন না, তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কি করে মিথ্যা বলতে পারেন? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, অভিজাত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকে তাঁর অনুসরণ করছে, না কি দুর্বল লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বল লোকেরা। পয়গম্বরদের (প্রাথমিক কালে) অনুসরণ সব সময় গরীব ও দুর্বল লোকেরাই করে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে? জওয়াবে জানিয়েছ, বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারে এমনটিই হয়ে থাকে। তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, এমন কি তা পূর্ণতায় গিয়ে পৌছে ! আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাদের কেউ কি একবার ধর্ম গ্রহণের পর নারাজ হয়ে পুনরায় পূর্ব ধর্মে ফিরে গেছে (অর্থাৎ মুরতাদ হয়েছে কি না)? তুমি বলেছ, না। ঈমানের অবস্থা এ রকমই হয়ে থাকে। যখন একবার ঈমানের স্বাদ কেউ আস্বাদন করতে সক্ষম হয় তখন আর সে তা ত্যাগ করে না। আর ঈমান একবার কারও হৃদয়ে প্রবেশ করলে তা আর বেরিয়ে আসে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। পয়গম্বরগণ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

আমি আরও জানতে চেয়েছি, তিনি কী শিখিয়ে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করতে, মূর্তি পূজা না করতে বলে থাকেন। নামায আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষার তালীম দিয়ে থাকেন। যদি তোমার কথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে অতি সত্বর যেখানে এই মুহূর্তে আমি আছি তা তাঁর অধীনে চলে যাবে। আমার অবশ্যই এ ধারণা ছিল, একজন পয়গম্বর আসছেন, কিন্তু আমার জানা ছিল না, তিনি আরবে পয়দা হবেন। আমি যদি সেখানে যেতে পারতান তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর সাক্ষাতে যেতাম। আর আমি যদি তাঁর খেদমতে থাকতাম তাহলে আমি তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।[১]

এরপর হেরাক্লিয়াস সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান সভাসদ ও অমাত্যের একটি সভা রাজপ্রাসাদে আহ্বান করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, হে রোমের অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা কি কল্যাণ ও মঙ্গল চাও? তোমরা কি চাও তোমাদের দেশের অস্তিত্ব অটুট ও অক্ষুণ্ন থাকুক? যদি চাও তাহলে এই নবীর ওপর ঈমান আন। উপস্থিত সকলেই দ্রুত বেগে দরজার দিকে দৌড়াল। গিয়ে দেখতে পেল দরজা বন্ধ। অতঃপর হেরাক্লিয়াস তাদের অসন্তোষ ও উগ্র মূর্তি দর্শনে তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং বললেন, এখনই আমি যে কথা বলছিলাম তা এজন্য বলেছিলাম, তোমরা তোমাদের ধর্মের ওপর কতটা মযবুত। আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমি তা দেখতে পেলাম। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে বাদশাহকে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করল।

মোটকথা, হেরাক্লিয়াস সৌভাগ্য ও মুক্তির এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়ে দিলেন এবং সেই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পদের ওপর তিনি নশ্বর সাম্রাজ্যকে প্রাধান্য দিলেন যার পরিণতি হলো, ফারূকী খিলাফত আমলে তাঁকে এই সাম্রাজ্য খোয়াতে হয়।[২]

উরায়সী কে ছিলেন?

'উরায়সিয়্যীন' বা 'য়ুরায়সিয়্যীন' শব্দের বর্ণনায় মতভেদ সত্ত্বেও কেবল সেই পত্রেই শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে যে পত্র হেরাক্লিয়াসের নামে লেখা হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি যত পত্র বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নিকট পাঠিয়েছিলেন কোন পত্রেই আমরা শব্দটি পাই না। হাদীছ ও অভিধানশাস্ত্রের আলিমগণ এই শব্দের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে

১.২. জামি সহীহ বুখারীকৃত, ১খ. । অধ্যায় كيف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ

বেশ খানিকটা মতভেদ করেছেন। বিখ্যাত মত হলো, 'উরায়সিয়্যীন' উরায়সীর বহুবচন আর শব্দটি খেদমতগার, শাগরিদ, পেশাজীবী ও কৃষিজীবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।[১]

ইবন মানজূরও 'লিসানুল-আরাব' গ্রন্থে একে কৃষিজীবীদের সমার্থক বলেছেন এবং একে অভিধানশাস্ত্রের ইমাম ছা'লাব থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনু'ল-আরাবীর উক্তির বরাত দিয়েও এর মূল উৎসের এই অর্থই লিখেছেন এবং আবূ উবায়দার উক্তি নকল করেছেন, "আমার মতে উরায়স 'সর্দার' ও 'বড়'দেরকে বলা হয় যাঁদের হুকুম তামিল করা হয় আর যখন তাঁরা আনুগত্য চান তখন তাঁদের আনুগত্য করা হয়।"[২]

এই মুহূর্তে একজন লেখাপড়া জানা মানুষ, যাঁর দৃষ্টি সেসব দেশের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থার ওপর রয়েছে, এই প্রশ্ন করতে পারেন, যদি উরায়সিয়্যীন-এর অর্থ কৃষিজীবীই হবে, তাহলে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয এর বেশি হকদার ছিলেন, তাঁকে তাঁদের সম্পর্কে, তাঁর যিম্মাদারী সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করা হতো এবং এই শব্দটি সেই পত্রে আসত যা খসরু পারভেযের নামে পাঠানো হয়েছিল এজন্য যে, কৃষকশ্রেণীর সংখ্যা বায়যান্টাইনীয় সাম্রাজ্যের তুলনায় সাসানী সাম্রাজ্যে খুব বেশি বিস্তৃত ও উল্লেখ করার মত ছিল এবং ইরানের জাতীয় আমদানী রাজস্ব ও অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের বেশির ভাগ নির্ভরশীলতা ছিল কৃষির ওপর। আযহারী এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং ইবন মানজূর তার বরাতে উদ্ধৃত করেন :

"ইরাকের সাওয়াদ এলাকার লোক, যারা পারস্য সম্রাটের ধর্মানুসারী ছিল, কৃষিজীবী ছিল। রোমকরা সাজ-সরঞ্জাম তৈরি ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিল। আর এজন্য তারা অগ্নি উপাসকদেরকে 'উরায়সিয়্যীন' বলত। উরায়স-এর দিকে সম্বন্ধ করত যার অর্থ 'কৃষক', আরবরাও ইরানীদেরকে 'ফাল্লাহীন' (কৃষক) উপাধিতে স্মরণ করত।"[৩]

এসব কারণে আমাদের নিকট প্রথম গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, উরায়সিয়্যীন অর্থ 'আরিয়ূস' মিসরীর অনুসারী (Arius, 280-336), যিনি এমন একটি স্থায়ী খৃস্টান উপদলের প্রতিষ্ঠাতা যিনি খৃস্টান 'আকীদা-বিশ্বাস ও সংস্কার শাখায় এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই উপদল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য ও খৃস্টান গির্জাকে দীর্ঘকালব্যাপী পেরেশান করে রেখেছিল। আরিয়্যুস সেই ব্যক্তি যিনি তাওহীদ তথা একত্ববাদের ধ্বনি বুলন্দ আওয়াজে তুলে ধরেন এবং খালিক ও মাখলুক তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি (খৃস্টানদের ভাষায়) "পিতা-পুত্রে"র মাঝে পার্থক্য করার দাওয়াত দেন।

---

১. শরহে মুসলিম; নববীকৃত ও আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনীকৃত, মাজমা বিহারিল-আনওয়ার।

২. লিসানু'ল-আরাবা, ارس ماده

৩. লিসানুল-'আরব।

তিনি এই বিষয়ের ওপর আলোচনা-সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন এবং খৃস্টান সমাজে বহু শতাব্দী যাবত এটাই আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁর ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্তসার এই, "এক আল্লাহর এই শান নয়, তিনি যমীনে প্রকাশিত হবেন। এজন্য তিনি হযরত ঈসা মসীহ (আ)-কে শক্তি ও আল্লাহর কালাম দ্বারা ভরপুর করে দেন। আল্লাহর মৌলিক গুণাবলীর ভেতর ওয়াহদানিয়াত (এককত্ব) ও আবাদিয়্যাত (চিরন্তনত্ব) রয়েছে এবং তিনি তাঁর সত্তা থেকে সরাসরি কাউকে পয়দা করেননি। 'পুত্র' স্বয়ং 'খোদা' নয়, বরং আল্লাহর হুকুমের কৌশলের *একটি প্রকাশ আর তাঁর উলূহিয়্যাত আপেক্ষিকতা, (اضافى)* সর্বাত্মক নয়।[১]

James Makinon তাঁর গ্রন্থ From Christ Constantine, London, 1936-এ লেখেন,

"আরিয়ূসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, কেবল আল্লাহর সত্তাই আদি, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি যিনি অনস্তিত্ব থেকে পুত্রকে অস্তিত্ব দান করেছেন, সেজন্য পুত্র আদি নয়। আল্লাহ হামেশা বাপ বা পিতা নন। অনন্তর এক যমানা এমন গেছে, পুত্রের অস্তিত্বই ছিল না। পুত্র তার একটি স্থায়ী হাকীকত রাখেন যেখানে আল্লাহ তার শরীক নন। তিনি (পুত্র) পরিবর্তন ও বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হন আর তিনি বিশুদ্ধ ও সঠিক অর্থে আল্লাহ হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নন। হ্যাঁ, তাঁকে বড়জোর 'কামেল' হিসাবে বলা যেতে পারে, কিন্তু তিনি মোটের ওপর একজন কামেল মখলুক তথা পরিপূর্ণ সৃষ্টি।"

অপর দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জা খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর ঈশ্বরত্বের সমর্থক ছিল। এই গির্জার মতে খালেক ও মাখলুক তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং পিতা ও পুত্রের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না।

তাঁকে (আরিয়ূসকে) মিসরীয় গির্জার পাদ্রীপ্রধান আলেকজান্ডার ৩২১ খৃস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জা থেকে উৎখাত ও বেদখল করে দিয়েছিল। আরিয়ূস শহর ছেড়ে চলে যান, কিন্তু তাঁর বেদখলী দ্বারা এই ঝগড়া শেষ হয়নি। সম্রাট কনস্টানটাইন এটা দূর করার চেষ্টা চালান। কিন্তু এতে তিনি সাফল্য লাভ করেননি। ৩২৫ খৃস্টাব্দে তিনি Nicea-তে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে দুই হাজার তিরিশ জন পাদরী যোগদান করেন। সম্রাটের ঝোঁক ছিল মসীহ (আ)-এর ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপের দিকে। এজন্য তিনি আরিয়ূসের বিপক্ষে ফয়সালা দেন। এতদসত্ত্বেও প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশই আরিয়ূসের সমর্থক ছিলেন এবং কেবল তিন শত আঠারো জন পাদ্রীই বাদশাহর সাথে ছিল; তথাপি সম্রাট আরিয়ূসকে ইলিরিয়ায় (Illyria) নির্বাসন দেন এবং তাঁর সকল লিখিত বই-পুস্তক জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া যার কাছেই তাঁর লেখা কোন কিছু পাওয়া যেত তাকেই কতল

১. Encyclopaedia of Religion and Ethics, ১খ.।

শাস্তি দেয়া হতো। কিন্তু এত কিছু করার পরও আরিয়ূসের গুরুত্ব ও মানুষের মনে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিঃশেষ করা যায়নি।

শেষ পর্যন্ত কনস্টানটাইনকেই তাঁর ভূমিকা নমনীয় করতে হয়। তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের ওপর থেকে আরোপিত বাধা-নিষেধ উঠিয়ে নেন। তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্ডারের মৃত্যু এবং তার স্থলাভিষিক্ত Athania Sius-এর নির্বাসনের পর আরিয়ুস পুনরায় আলোকজান্দ্রিয়া ফিরে আসেন। সম্ভাবনা ছিল, কনস্টানটাইন তাকে মিসরীয় গির্জার প্রধান নিযুক্ত করবেন এবং তার ধর্মমত কবুল করবেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে সেই সুযোগ দেয়নি।[১]

ড্রেপার তার Conflict between Religion and Science নামক পুস্তকে লিখেছেন, তেরটি খৃস্টান অধিবেশন খৃ. ৪র্থ শতকে আরিয়ূসের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিয়েছিল। পঞ্চদশ খৃস্টান অধিবেশন এর সমর্থন যুগিয়েছিল। ১৭শ অধিবেশন যে মত প্রকাশ করেছিল তা এই অভিমতের খুবই কাছাকাছি ছিল। এভাবেই ৪৫তম খৃস্টান অধিবেশন এই সমস্যার ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা ও ফয়সালা করার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘটনা হলো, খৃস্টান জগতে চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের সাধারণ প্রচলনের কথা জানা যায় না। New Catholic Encyclopedia-য় বলা হয়েছে :

"ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের নব গঠন ও এর গোপন রহস্যের ওপর থেকে অবগুণ্ঠন কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই উঠতে পেরেছে। সাধারণ তৌহিদী আকীদার ওপর যদি কেউ কোন আলোচনা করে তবে তার অর্থ হলো, তা খৃস্টান ইতিহাসের সূচনা থেকে ৪র্থ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়ে যায় আর তা হলো, একজন উপাস্যের তিন রকম প্রকাশ রয়েছে। খৃস্টান জগতে এই মতবাদ সেই নির্দিষ্ট সময়কালীন বিস্তার লাভ করেছিল।[২]

এই আকিদা বিশ্বাস ও দাওয়াত যীশু খৃস্টের খোদায়িত্বের প্রকাশ্য দাওয়াতের সঙ্গে সর্বদা সাংঘর্ষিক থাকে। কখনো এর পাল্লা ভারি হতো, কখনও বা ওর পাল্লা। বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলগুলোতে খৃস্টানদের বিরাট বড় সংখ্যা আরিয়ূসে বিশ্বাস পোষণ করত, এমন কি থিওসোডিয়াস (Thoesdius the Great)-এ বিষয়ে একটি সম্মেলন কনস্টান্টিনোপলে আহ্বান করেন যিনি যীশু খৃস্ট, ঈশ্বর ও তিনি ঈশ্বরপুত্র– এই বিশ্বাসকে যথারীতি অনুমোদন দেন এবং এর ঘোষণা প্রদানের পর আরিয়ূসের ধর্মবিশ্বাসের দাওয়াত শেষ হয়ে যায় এবং এই আন্দোলন দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়। এত কিছুর পরও খৃস্টানদের একটি দল এই বিশ্বাসের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখে। আর এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকগুলো "উরায়সিয়্যা ফের্কা" বা "উরায়সিয়্যীন" নামে মশহুর হয়।

---

১. Encyclopaedia of Religion and Ethics, নিবন্ধ Arianism
২. The New Catholic Encyclopedia Holy Trinity শীর্ষক নিবন্ধ, ১৪ শ , খ., ২৯৫ পৃ.।

এজন্য প্রথমে গ্রহণযোগ্য ও অনুমানসিদ্ধ কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কথার فان توليت فان عليك اثم الارسيين অর্থ এজন্য যে, তৎকালীন খৃষ্টান জগতে, যাঁর নেতৃত্ব ছিল মহান বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের হাতে এবং যার প্রধান ছিলেন হেরাক্লিয়াস, এই উপদলই ছিল তুলনামূলকভাবে তাওহীদ তথা একত্ববাদের ধারক-বাহক এবং এর ওপর তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রথম যুগের কতক জলীলু'ল-কদর মুসলিম আলেমও এই ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। ইমাম তাহাবী (র) [মৃ. ৩১২ হি.] তাঁর "মুশকিলু'ল-আছার" নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

"কোন কোন তত্ত্বজ্ঞ আলেম বর্ণনা করেছেন, হেরাক্লিয়াসের দলে একটি উপদল ছিল যাদেরকে উরায়সিয়্যা বলা হতো। এরা আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত ও হযরত মসীহ ('আ)-এর আবদিয়াত অর্থাৎ ঈসা মসীহ আল্লাহর পুত্র নন, বান্দা-এই মতের সমর্থক ছিলেন। খৃস্টানরা মসীহ (আ)-এর রবূবিয়াত তথা ঈশ্বরের পুত্র হওয়া সম্পর্কে যা কিছু বলত এই উপদল তা স্বীকার করত না। এরা মসীহ (আ)-এর দীনের ওপর কায়েম ছিল এবং ইনজীলে যা কিছু ছিল তার ওপর আমল করত। খৃস্টানরা এ ব্যাপারে আরও অগ্রসর হয়ে যা কিছু বলত তারা তা বিশ্বাস করত না। যদি একথা সত্যি হয় তাহলে এই উপদলকে "উরায়সিয়্যূন" পেশসহ ও "আরীসিয়্যীন" বা "ইরিসিয়্যীন" যবর ও যেরসহ উভয় রকম পাঠই জায়েয। উলামায়ে হাদীছের এটাই ধারণা।"[১]

এরই কাছাকাছি মত ব্যক্ত করেছেন মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (র) [মৃ. ৬৭৬ হি.]। তিনি বলেন, "দ্বিতীয় মত হলো, এরা সেই সব ইয়াহূদী ও খৃস্টান যারা আবদুল্লাহ ইবন উরায়স[২]-এর অনুসারী ছিল যার দিকে করে তার মতবাদকে "আরূসী" মতবাদ বলা হয়।"[৩]

আরব নেতৃবৃন্দের নামে পত্র

আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি মুনযির ইবন সাবী (বাহরায়ন[৪]-এর শাসক), জীফার উবনু'ল-জুলান্দা, 'আবদ ইবন আল-জুলান্দা[৫] আযদী (আম্মানের

---

১. মুশকিলু'ল-আছার, ২য় খ., ৩৯৯ পৃ.।

২. এটা ইমাম নববী (র)-এর পরোক্ষ সম্মতি থেকে জানা যায় এজন্য যে, ইসলামের আবির্ভাবের তিন শ বছর পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল এবং এর নামও কোন ইসলামী আরবী নাম ছিল না।

৩. সহীহ মুসলিম-এর শরাহ, নববীকৃত, ২য় খ., ৯৮ পৃ.।

৪. বাহরায়ন নজদের সেই অংশকে বলা হয় এখন যার নাম আল-আহসা'। হযরত আবূ উবায়দা (র)-এর নেতৃত্বে যে বাহিনী পাঠানো হয়েছিল এবং যে অভিযানে বিরাট আকারের মাছ মুসলমানদের হস্তগত হবার ঘটনা সংঘটিত হয় তা এদিকেই পাঠানো হয়েছিল। সহীহ হাদীছগুলোতে এই প্রসঙ্গে "আল-বাহর" শব্দ এসেছে। এখান থেকেই বিপুল পরিমাণ মালে গনীমতও হস্তগত হয়েছিল যার [পরের পৃ. দেখুন]

আমীর-উমারা'), হাওয়াহ[১] ইবন আলী (য়ামামার শাসক) ও হারিছ ইবন শাম্মার আল-গাসসানীর নামে পত্র প্রেরণ করেন।[২] মুনযির ইবন সাবী, এছাড়া জুলান্দার দুই পুত্র জীফার ও আব্‌দ ইসলাম কবুল করেন। য়ামামার শাসক হাওয়াহ্ ইবন আলী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দরখাস্ত পেশ করে, তাকে ক্ষমতায় শরীক করা হোক। তিনি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর সত্বর তার মৃত্যু হয়।[৩]

বনী লেহয়ান ও যী-কার্দ যুদ্ধ

হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬ হি.) ও খায়বার যুদ্ধের মাঝে বনী লিহয়ান ও যী-কারাদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৪] যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং তাশরীফ নেন এবং ইবন মাকতূম (রা)-কে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রথম যুদ্ধের কারণ ছিল রাজী'র ঘটনায় খুবায়ব ইবন 'আদী ও তাঁর সাথীদের শহীদী খুনের বদলা গ্রহণ। আর দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জঙ্গলে বিচরণরত উটনী পালের ওপর কাফির মুশরিকদের হামলা, বনী গিফারের এক ব্যক্তিকে খুন এবং তার স্ত্রীকে অপহরণ।[৫]

[চলমান] উল্লেখ হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। এখন এই নাম এখান থেকে জাযীরাতুল-আরবের সেই অংশের দিকে চলে গেছে যা (চলমান) উপসাগরীয় রাজ্যগুলোর ভেতর অন্যতম এবং বাহরায়ন নামে বিখ্যাত। এর অধিকাংশ বাসিন্দা বনী আবদুল-কায়স, বনী বাকর ইবন ও ওয়াইল ও তামীম কবিলার। ঐসব পত্র লেখার সময় সেখানকার শাসনকর্তা ও গভর্নর ছিলেন বনী তামীম কবিলার মুনযির ইবন সাবী। ঐসব পত্রের মূল পাঠ যা আরব রাজন, নেতৃবর্গ ও গোত্রপ্রধানদের বরাবর লেখা হয়েছিল, পত্রবাহক যাদের নামে এসব পত্র প্রেরিত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ইমাম মুহাম্মদ ইবন তূলুন দামিশকী ৮৮০-৯৫৩ হি. রচিত গ্রন্থ اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ﷺ . موسسة الرسالة। সং.।

১. ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল-জুলান্দা কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম ছিল না। এটি ছিল একটি উপাধি যার অর্থ আম্মানবাসীদের ভাষায় সর্দার কিংবা ধর্মীয় নেতা। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত বাদশাহ বয়সে তাঁর ভাইয়ের থেকে বড় ছিলেন। (দেখুন "নিহায়াতুল-আরাব" ও "তারীখুল-আরাব কাবলাল-ইসলাম)"।

১. হাওয়াহ ইবন 'আলী আল-হানাফী য়ামামার বাদশাহ ছিলেন এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সলীত ইবন আমরকে তার নিকট পাঠিয়েছিলেন। সে যুগে য়ামামার সীমান্ত পূর্ব দিকে বাহরায়ন এবং পশ্চিমে হেজাযের সঙ্গে গিয়ে মিলিত। য়ামামার একটি জায়গার নাম মানফুহা যা জাহিলী কবি আশার জন্মভূমি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে বনূ হানীফা সেখানকার উল্লেখযোগ্য কবিলা ছিল। এই গোত্রে মুসায়লমা ইবন হাবীব জন্ম নেয় নবুওয়াত দাবী করার দরুন যার উপাধি হয়েছিল "কাযযাব" অর্থাৎ মিথ্যাবাদী।

২. তারীখে তাবারী, ৩য় খ., ৮৪-৮৫ পৃ.।

৩. যাদুল-মাআদ, ২য় খণ্ড, ৫৮ পৃ.।

৪. সহীহ মুসলিম হযরত সালামা ইবন আল-আকওয়া' (রা)-এর বর্ণনাকে ইবন হাজার তাঁর 'ফতহুল-বারী' গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবন-চরিতকারগণ একমত, যী-কারাদ যুদ্ধ হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে সংঘটিত হয়।

৫. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ২৭৯-৮৯ পৃ.।

খায়বার যুদ্ধ
(৭ম হিজরী)

আল্লাহর পুরস্কার

আল্লাহতা'আলা হুদায়বিয়াতে অনুষ্ঠিত বায়'আতে রিদওয়ানের অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (রা)-এর আনুগত্য করেছিলেন এবং আল্লাহতা'আলার হুকুমকে নিজেদের কামনা-বাসনা, স্বীয় অভিমত ও বোধশক্তির ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন, আসন্ন বিজয় ও প্রচুর ধন-সম্পদের সুসংবাদ দান করে ইরশাদ হয় :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ
وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

"মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জানতেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা ওরা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
[সূরা ফাত্হ : ১৮-১৯ আয়াত]

খায়বার যুদ্ধ ছিল এসব বিজয়ের সূচনামাত্র। খায়বার ছিল একটি ইয়াহূদীর উপনিবেশ। এখানে বড় বড় মযবুত ও সুদৃঢ় দুর্গ ছিল।[১] এটি ছিল ইয়াহূদীদের সামরিক অবস্থান ও জাযীরাতুল-আরবে তাদের শেষ দুর্গ। এই ইয়াহূদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বরাবর শত্রুতায় লিপ্ত থাকত এবং একথা কোন সময় ভুলত না, তাদের অপরাপর ভাইদের সঙ্গে যা হয়েছে তা তাদের সঙ্গেও হতে পারে। তারা গাতাফান কবিলার সঙ্গে মিলিত হয়ে মদীনা তায়্যিবার ওপর হামলার চক্রান্ত

---

১. এসব কেল্লার মধ্যে নাইম, কামূম, হিসনু'শ-শাক, হিস্‌ন নাতাত, হিসনুস-সুলামি, হিসনুল-... হিসনুল-কীতারা: সর্বাধিক বিখ্যাত ছিল। য়াকূবী লিখেছেন, খায়বারে ২৫ (পঁচিশ) হাজার যুদ্ধ... বর্তমান ছিল (২য় খ., ৫৬; মৌলবী মুজিবুল্লাহ নদভীকৃত গ্রন্থ "সাহাবা ও তাবিঈন" থেকে ... দারুল-মুসান্নিফীন, (আজমগড় প্রকাশিত)।

করছিল।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ইরাদা করলেন, এখন তাদের ও তাদের চক্রান্তের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং সেই সব ফ্রন্টের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে হবে যাতে নিরাপত্তা থাকে। এই এলাকা মদীনার উত্তর-পূর্বে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

নবী করীম ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়া থেকে বেরিয়ে মদীনায় যি'ল-হাজ্জ মাসের গোটা ও মুহাররাম মাসের কিছু সময় অবস্থান করেন। এরপর তিনি খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হন। 'আমের ইবনু'ল-আকওয়া' (রা) বাহিনীর সাথে ছিলেন এবং নিম্নোক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

والله لولا الله ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا

انا اذا قوم بغوا علينا * وان أر ادوا فتنة ابينا

فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام ان لاقينا

"কসম হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাদেরকে হেদায়াত না করতে তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। না আমরা সাদাকা দিতাম আর না আমরা সালাত আদায় করতাম!

"আমরা তো সেই যাদের ওপর কোন সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠী হামলা করলে কিংবা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইলে আমরা তাদেরকে স্পষ্টত প্রত্যাখ্যান করি।

"অতএব, তুমি আমাদের ওপর সাকীনা (খাস রহমত, প্রশান্তি) নাযিল কর এবং শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলার মুহূর্তে আমাদের কদমসমূহকে দৃঢ় রাখ।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই ঈমানী বাহিনী সহকারে সেখানে গমন করলেন। বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১৪০০ এবং তাঁদের সঙ্গে ছিল দু'শ' ঘোড়া। তিনি তাদেরকে

---

১. বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারী ওয়াট তাঁর ÍMohammad Prophet and Statesman" নামক গ্রন্থে লিখছেন, খায়বারের ইয়াহূদীরা, বিশেষত বনী নাযীর গোত্রের সেই সব সর্দার যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন, মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে অন্তরে হিংসা পোষণ করত। এরাই ছিল সেই সব লোক যারা আরবের অপরাপর গোত্রকে নিজেদের সম্পদের মাধ্যমে উস্কে দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছিল। আর এটাই ছিল সেই বুনিয়াদী কারণ যদ্দরুন মুহাম্মদ (সা) খায়বরে অভিযান চালিয়েছিলেন। (পৃ. ১৮৯, লন্ডন ১৯৬১)

এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য কেবল ইয়াহূদীদের সেই শক্তি চূর্ণ করাই ছিল না যা খায়বারে সমবেত হয়েছিল, বরং হেজায ও নজদের মধ্যবর্তী উত্তর ও জাযীরাতুল-আরবের মাঝে এক বিরাট শক্তিশালী গোত্র গাতাফানের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ায়ও উদ্দেশ্য ছিল যা আরব গোত্রগুলোর একটি অত্যন্ত যুদ্ধবাজ ও শক্তিশালী দল ছিল। তাদের দিক থেকে নিরাপদ না হয়ে মক্কার দিকে নিশ্চিন্তে সেনাভিযান পরিচালনা সম্ভব ছিল না।

খায়বার অভিযানে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন নি যারা হুদায়বিয়াতে ছিল। মহিলা সাহাবীর সংখ্যা যাঁরা রোগীদের চিকিৎসা, সেবা, আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ ও পট্টি বাঁধা এবং খাদ্য ও পানির এন্তেজামের যিম্মাদারী ছিল তাঁরা ছিলেন ২০ জন।

তিনি ইয়াহূদী ও গাতাফান গোত্রের মাঝখানে অবস্থিত 'রাজী' নামক স্থানে ছাউনি ফেলার নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাদের ও খায়বারবাসীদের মধ্যে রসদ সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খতম করা এজন্য যে, তারা পরস্পর মিলিত, সংঘবদ্ধ ও একে অপরের সমর্থক ছিল। সত্বর এর সুফল দেখা দিল। এরা তাদের সমর্থন ও সাহায্য করতে সক্ষম হলো না। তারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও কায়কারবার নিয়েই পড়ে রইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খায়বারবাসীদের জন্য তারা রাস্তা পরিষ্কার করে দিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহের নির্দেশ দিলে দেখা গেল কেবল ছাতু পাওয়া গেছে। শেষে ছাতু খেয়েই সকলে পরিতৃপ্ত হলেন।[১] এরপর খায়বারের সামনে তশরীফ নিলে তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, খায়বার বিজয়ের জন্য সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন এবং এই স্থানের অনিষ্ট ও স্থানীয় লোকদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করলেন। তাঁর মুবারক অভ্যাস ছিল যখন তিনি কোন যুদ্ধে গমন করতেন তখন রাত্রিকালে হামলা করতেন না, বরং ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যদি আযানের শব্দ কানে ভেসে আসত তাহলে তিনি অভিযান বন্ধ রাখতেন, হামলা করতেন না। ঠিক তেমনি এখানেও তিনি রাত কাটালেন। সকাল হলো, আযানের আওয়াজ শুনতে পেলেন না। এটা দেখে তিনি হামলার নিয়তে সামনে আগালেন। পথিমধ্যে খায়বারের কৃষক- মজুরদেরকে কাস্তে-কোদাল হাতে দেখতে পেলেন। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বাহিনী দেখতে পেল তখন চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনী এসে গেছে! আর এই বলে তারা পালিয়ে গেল। এ দেখে তিনি বললেন, الله اكبر خربت خيبر। আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ! খায়বার ধ্বংস হলো। انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين "আমরা যখন কোন জাতির ওপর আক্রমণ আরম্ভ করি তখন তাদের সকাল খারাপ হয়ে থাকে যাদেরকে প্রথমেই ভয় দেখানো ও সতর্ক করা হয়েছে।"[২]

বিজয়ী ও সফল অধিনায়ক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম খায়বারের দুর্গগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন এবং এক এক করে ঐ সব দুর্গ জয় করা শুরু করলেন। ঐ সব কেল্লার মধ্যে এমন একটি কেল্লা ছিল যা নামকরা ইয়াহূদী ঘোড়সওয়ার মারহাবের তখতগাহ ছিল।

---

১. ইবন কাছীর, ২য় খ., ৩৪৫-৬৪; এছাড়া সহীহ বুখারী, গাযওয়ায়ে খায়বার শীর্ষক অধ্যায়।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩২ বর্ষ ৩০; ৩. দুর্গের নাম ছিল কামূস।

৩. দুর্গের নাম ছিল কামূস।

যে সময় এই আয়াত নাযিল হয় اليوم اكملت لكم دينكم। "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম", তখনও বহু জলীলুল-কদর সাহাবা অনুভব করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের সময় আসন্ন।[১]

পরম প্রভুর সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহ ও দুনিয়ার প্রতি বিদায় সম্ভাষণ

বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন সব কথাবার্তা প্রকাশ পেত যদ্দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যেত, তাঁর ইনতিকালের সময় আসন্ন।[২] তিনি এই সফরের জন্য প্রস্তুত এবং পরম প্রিয়ের মিলন কামনায় উন্মুখ। তিনি উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য আট বছর পর এভাবে দু'আ করেন যেন তিনি শিগগিরই স্বীয় সাহাবা-ই কিরাম (রা) থেকে পৃথক হতে যাচ্ছেন যেমন কোন জীবিত ব্যক্তি মৃত মানুষকে শেষ বিদায় জানিয়ে থাকে।

এরপর তিনি মিম্বরের দিকে যান এবং সেখানে বসে সমবেত সাহাবা-ই কিরাম (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। এরপর তোমাদের সঙ্গে আমার হাওয-ই কাওছারে সাক্ষাৎ হবে। আমি আমাকে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমাকে তামাম যমীনের ধন-ভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছিল। আমি এ বিষয়ে মোটেই ভীত নই, তোমরা আমার পর শির্ক-এ লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার ভয় হয়, না জানি তোমরা পরস্পর দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও এবং যেভাবে আগেকার জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে তেমনি তোমরাও ধ্বংস হও![৩]

রোগের সূচনা

সফর মাসের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়।[৪] এর প্রাথমিক আলামত এভাবে প্রকাশ পায়, তিনি রাত্রির মাঝামাঝি জান্নাতুল বাকীতে গমন করেন এবং কবরবাসীদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করেন। এরপর তিনি ঘরে ফিরে আসেন। ভোর হলো এবং সেদিন থেকেই রোগের আলামত শুরু হয়।[৫]

---

১. দ্র. ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৪২৭ পৃ.।

২. সহীহ মুসলিম-এ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জামরাতুল আকাবার কাছে থেমে তিনি আমাদের বললেন, তোমরা আমার কাছে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কেননা সম্ভবত এ বছরের পর আমার আর হজ্জ করার সুযোগ হবে না।

৩. বুখারী মুসলিম।

৪. বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, দিনটি ছিল সোমবার।

৫. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৪২ ও ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৪৪৩।

এটি হযরত আলী (রা) জয় করেন। ঘটনা হলো, দুর্গ মুসলমানদের পক্ষে জয় করা খুবই কঠিন ও কষ্টকর প্রমাণিত হয়। কোনভাবেই এটি জয় করা যাচ্ছিল না। হযরত আলী (রা)-এর চোখে সে সময় ব্যথা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান: আগামীকাল পতাকা এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন; তার মাধ্যমেই এই দুর্গের বিজয় হবে। এই মহান পদ লাভের জন্য বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রার্থী ছিলেন। সবাই আশা করছিলেন, এই মহাসৌভাগ্য তাঁর কপালেই জুটুক! সকালে তিনি হযরত 'আলী (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁর চোখে তখন ব্যথা। তিনি এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের লালা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তাঁর চোখের যন্ত্রণা তখনই এমনই হলো যে, মনে হচ্ছিল চোখে বুঝি কখনো কোন অসুখই হয়নি! তিনি তাঁকে পতাকা হস্তান্তর করেন।[১]

হযরত আলী (রা) আরয করেন, "আমি ইয়াহূদীদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এখান থেকে দাওয়াত দাও এবং আল্লাহতাআলার এই ক্ষেত্রে যে হক বা অধিকার রয়েছে সে বিষয়ে তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! যদি তোমা দ্বারা একটি লোকও আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।[২]

শেরে খোদা বনাম খ্যাতনামা ইয়াহূদী বীর

হযরত আলী (রা) ইসলামী পতাকা ও মুসলিম সেনাবাহিনী সমভিব্যহারে খায়বারে উপস্থিত হলে খ্যাতনামা ইয়াহূদী অশ্বারোহী বীর মারহাব কবিতা আবৃত্তি করতে করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে এল। অতঃপর উভয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলো।

হযরত আলী (রা) প্রথমে তার ওপর একটিই কঠিন আঘাত হানলেন। আঘাতের ফলে তার ঢাল কেটে লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেদ করে মেরুদণ্ডে গিয়ে তা পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।[৩]

---

১. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, খায়বার যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

২. সহীহ বুখারী, বাব গাযওয়া খায়বার, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ; লাল উট আরবে বিরাট সম্পদ এবং একটি দুর্লভ বস্তু মনে করা হয়।

৩. কোন কোন সীরাত প্রণেতা একে নাইম দুর্গ জয়ের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ একে কামূস দুর্গ জয়ের সঙ্গে। বুখারীতে এর বিভিন্ন টুকরো লিখিত হয়েছে, কিন্তু দুর্গের নাম নেই। ইবন হিশাম প্রভৃতিতে মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে মারহাবের হত্যাকারী বলা হয়েছে। কিন্তু সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় হযরত আলী (রা)-এর নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে পঠিত কবিতাও।

মেহনত কম, পারিশ্রমিক বেশি

খায়বারের একজন হাবশী গোলাম, যে তার মালিকের নির্দেশে বকরী চরাত, একদিন দেখতে পেল, খায়বারের লোকজনের হাতে অস্ত্র এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সে তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি চান আর কিই বা আপনাদের ইচ্ছা? তারা জওয়াব দিল, আমরা ঐ লোকটির সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যেই লোকটি নবুওয়াতের দাবিদার। নবুওয়াতের উল্লেখে তার অন্তর মানসে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। সে তার বকরীর পাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং জিজ্ঞেস করল, আপনি কী বলে থাকেন এবং কোন জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? তিনি জওয়াবে বললেন, আমি ইসলামের দিকে আহ্বান জানাই এবং এই কথার দিকে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ ছাড়া করো ইবাদত কর না। গোলাম বলল, আমি যদি এ সাক্ষ্য দিই এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার ওপর ঈমান আনি তাহলে কী পাব? তিনি বললেন, যদি তোমার এই বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু হয় তাহলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। এত কথা শুনে সে ইসলাম কবুল করল এবং বলতে লাগল, হে আল্লাহর নবী! আমার কাছে এই বকরীগুলো আমানত রয়েছে। (এগুলো আমি কি করব?) তিনি বললেন, তুমি এগুলো নিয়ে হিসবার ময়দানে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তোমার এই আমানত আদায় করে দেবেন। সে তাই করল।

আল্লাহর কুদরত দেখুন। বকরীগুলো তাদের মালিকের কাছে এমনিতেই ফিরে গেল। আর ইয়াহূদী মালিকও জানতে পারল, তার গোলাম মুসলমান হয়ে গেছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সকলকে সম্বোধন করলেন, তাদরেকে উপদেশ দিলেন এবং জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করলেন। যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধে রত হলো তখন শহীদদের কাতারে কৃষ্ণকায় গোলামটিও ছিল। মুসলমানরা তাঁর লাশ তুলে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে এল। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ শামিয়ানার দিকে দৃষ্টি দিলেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের দিকে ফিরে বললেন, "আল্লাহতাআলা এই গোলামের সাথে খুবই সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন এবং তাকে খায়বারে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি দেখলাম, তার শিয়রের দিকে জান্নাতের দু'টি হুরী বিদ্যমান, অথচ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে সে একটি সিজদাও করেনি।"[১]

এজন্য আপনার সাহচর্য এখতিয়ার করিনি

এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলো, ঈমান আনল, তাঁর আনুগত্য কবুল করল এবং বলল, আমিও আপনার সঙ্গে হিজরত করব। তিনি তাঁকে কতক সাহাবার হাতে সোপর্দ করলেন এবং বললেন, এর দিকে খেয়াল

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৩৯৪ পৃ.।

রেখ। খায়বার যুদ্ধের সময় কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হলে তিনি তা বণ্টন করেন। এই বেদুঈন সে সময় চারণক্ষেত্রে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে দেখতে পেল তাকেও একটা অংশ দেয়া হয়েছে। সে বলল, এগুলো কী? লোকেরা তাকে বলল, এটা তোমার অংশ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে দিয়েছেন। সে ঐগুলো নিয়ে হুযূর ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলো এবং জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো কী? তিনি বললেন, এগুলো তোমার অংশ। সে বলল, এর খাতিরে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে আসি নি। আমি তো এজন্য আপনার আনুগত্য করেছিলাম যাতে আমার এই জায়গায়, নিজের কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করে, শত্রুর নিক্ষিপ্ত কোন তীর লাগবে, আমি মারা যাব এবং জান্নাতে পৌঁছে যাব। তিনি বললেন, যদি তোমার নিয়ত সহীহ-শুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তেমনটিই আল্লাহ করবেন।

খায়বারে যখন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ হলো এবং শহীদদের লাশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আনা হলো তখন ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির লাশও সেখানে ছিল। লাশটিকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই ব্যক্তির লাশ? সাহাবায়ে কিরাম (রা) জওয়াব দিলেন: জী, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সে মুআমালা সত্য করেছে, তাই আল্লাহতা'আলাও তার ইচ্ছা সত্য করে দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন জোব্বা মুবারক দিয়ে তাঁকে কাফন দিলেন, এরপর তার জানাযা আদায় করলেন এবং তার জন্য এই দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা তোমার রাস্তায় হিজরতের জন্য বেরিয়েছিল, এ তোমার রাস্তায় শহীদ হয়েছে আর আমি তার সাক্ষী।"[১]

খায়বারে অবস্থানের শর্ত

মোটের ওপর এভাবেই একের পর এক কেল্লার পর কেল্লা মুসলমানদের হাতে বিজিত হতে থাকে এবং কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ ও অবরোধের মাঝে কেটে যায়, এমন কি এ অবস্থায় আর না পেরে শেষ পর্যন্ত ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এবার তাঁর ইচ্ছাই ছিল তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা ও নির্বাসনে পাঠানো। তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আমাদেরকে আপনি এখানেই অবস্থান করবার অনুমতি দিন। যমীনের দেখাশোনা ও ক্ষেত-খামারে আমরা মশগুল থাকব যেহেতু এ বিষয়ে আপনাদের তুলনায় আমরাই বেশি ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ক্ষেত-খামার ও কৃষিকর্মের অভিজ্ঞতা ছিল না। যদি তাঁরা এ কাজ হাতে তুলে নিতেন তাহলে তাঁদের গোটা সময় এ কাজেই ব্যয়িত হতো। এরপর তিনি তাদেরকে এই শর্তে খায়বারে অবস্থানের অনুমতি দিলেন, সমস্ত উৎপাদিত

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৩৯৪ পৃ.।

ফল-ফসলের অর্ধেক তারা মুসলমানদেরকে দেবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যতদিন চাইবেন কেবল ততদিনই এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎপাদিত ফল-ফসল বণ্টনের জন্য তাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে পাঠাতেন। তিনি সে সব পরিমাপ করে দু'অংশে ভাগ করে দিতেন। এরপর তিনি তাদেরকে বলতেন : এ দু'টোর ভেতর যেটা তোমাদের পছন্দ নিয়ে নাও। এ দেখে তারা বলত, এরূপ ইনসাফের ওপরই আসমান-যমীন টিকে আছে।[২]

ধর্মীয় সহনশীলতা ও অন্তরের প্রশস্ততা

খায়বার যুদ্ধে যেসব যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে তাওরাতের কয়েকটি কপিও ছিল। তারা (ইয়াহূদীরা) দরখাস্ত করল, তা তাদেরকে দিয়ে দেয়া হোক! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সব কপি তাদেরকে সোপর্দ করার নির্দেশ দিলেন।[৩]

ইয়াহূদী পণ্ডিত ড. ইরাঈল ওয়েলফিনগন এ ঘটনার ওপর পেশ করতে গিয়ে বলেন :

"এই ঘটনা থেকে আমরা পরিমাপ করতে পারি, এই সব ধর্মীয় সহীফার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে কোন্ পর্যায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর এই উদারতা ও সহনশীলতার বিরাট প্রভাব পড়ে ইয়াহূদীদের ওপর। তারা তাঁর এই বদান্যতা ভুলতে পারে না, তিনি তাদের পবিত্র ধর্ম পুস্তকের সঙ্গে এমন কোন আচরণ করেননি যদ্দারা তার অসম্মান হয়। এর বিপরীতে তাদের এই ঘটনা বেশ ভালই মনে আছে যখন রোমানরা জেরুসালেম খৃ. পৃ. ৭০ সনে জয় করে ঐ সব পবিত্র সহীফায় আগুন লাগায় করে এবং সে সব পদদলিত করে। ঠিক তেমনি ঈর্ষাকাতর ও সাম্প্রদায়িক খৃস্টানরা স্পেনে ইয়াহূদীদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানোকালীন তাওরাতের সহীফাগুলোকে আগুনে পড়িয়ে দেয়। এই সেই বিরাট পার্থক্য যা রোম বিজয়ী (যাদের কথা একটু ওপরে বলা হলো) ও ইসলামের নবীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই।"[৪]

জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা)-এর আগমন

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই জা'ফর ইবন আবি তালিব (রা) ও তাঁর বন্ধুরা এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের আগমনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান

---

১. যাদু'ল-মা'আদ, ৩৯৪-৯৫ বিস্তারিত দ্র. সুনানে আবী দাউদ, আল-মুসাকাত অধ্যায়।

২. ফুতুহুল-বুলদান, বালাযুরী, ৩৪ পৃ.।

৩. তারীখু'ল-খামীস, ২য় খ., ৬০ পৃ.।

৪. তা'রীকু'ল-য়াহূদ ফী বিলাদি'ল-'আরব, পৃ. ১৭০।

তাঁর কপালে চুমু দেন এবং বলেন, "আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমি কিসে বেশি খুশি হয়েছি: খায়বার বিজয়ে, নাকি জা'ফর (রা)-এর আগমনে?"[১]

ইয়াহূদীদের জঘন্যতম ষড়যন্ত্র

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষ প্রদান করা হয়। সালাম ইবন মাশকাম নামক ইয়াহূদীর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারিছ বিষমিশ্রিত একটি ভুনা বকরী তোহফা হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেশ করে। সে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, বকরীর কোন্ অংশ তাঁর বেশি প্রিয়? তিনি বলেছিলেন, রান। এতে সে রানের অংশে বেশি করে বিষ মিশিয়েছিল। তিনি যখন রানের থেকে কিছু অংশ ভেঙে খেতে শুরু করেন তখন ঐ গোশতের টুকরোই তাঁকে জানিয়ে দেয়, এতে বিষ মেশানো রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তা উগরে ফেলে দেন।

এরপর তিনি ইয়াহূদীদের সমবেত করে তাদেরকে বলেন, আমি যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করি তোমরা কি তার ঠিক জওয়াব দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এই বকরিতে বিষ মিশিয়েছিলে? তারা স্বীকার করল, হ্যাঁ, তারা বিষ মিশিয়েছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : কিসে তোমাদেরকে এতে উৎসাহ দিয়েছিল? উত্তরে তারা জানায়, আমরা ভেবেছিলাম, আপনি যদি (না'উযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমরা আপনার হাত থেকে মুক্তি পাব। আর আপনি যদি সত্যি সত্যি নবী হন তাহলে বিষ আপনার ওপর কোন ক্রিয়াই করবে না। এরপর ঐ মহিলাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির করা হলো। সেও তার অপরাধ স্বীকার করল এবং বলল, আমি আপনাকে জানে মারার ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহতা'আলা তোমাকে আমার ওপর জয়ী হতে দিতে পারেন না। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) অনুমতি চাইলেন মহিলাটিকে তার এই ঘৃণ্য অপরাধের দরুন হত্যা করতে। কিন্তু তিনি বললেন, না, তা হয় না। এ সময় তিনি এ ব্যাপারে মহিলাটিকে আর কিছু বলেন নি এবং তাকে কোন প্রকার শাস্তিও দেননি, হত্যা করার অনুমতি তো দূরে থাক! কিন্তু পরে যখন তার বিষমেশানো খাবার গ্রহণের ফলে বিশর ইবনুল-বারাআ ইবন মা'রূর (রা) সাহাবীর ইনতিকাল হলো তখন কিসাস হিসাবে মহিলাটিকে হত্যা করা হয়।[২]

খায়বার যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

খায়বার যুদ্ধ ও এ যুদ্ধে মুসলমানদের শানদার বিজয় আরবের সেই সব গোত্রের ওপর বিরাট শুভ ও কল্যাণকর প্রভাব ফেলে যারা তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেনি। তারা খায়বারে ইয়াহূদীদের সামরিক শক্তি, তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য, সমরোপকরণের আধিক্য, সুদৃঢ় দুর্গসমূহ, আক্রমণকারী

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৩৯৭ পৃ.।

২. বুখারী, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে খুব সংক্ষেপে এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

ফৌজ ও অভিজ্ঞ জেনারেলদের কারণে যে অজেয় ও দুর্ভেদ্য হওয়া সম্পর্কে ভাল রকম জানা ছিল। তারা আরও জানত, তাদের মধ্যে মারহাব ও হারিছ আবী যয়নবের মত অভিজ্ঞ অশ্বারোহী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমর বিশেষজ্ঞ আছে। কিন্তু খায়বার বিজয় তাদের সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে এবং তাদের মনোবল ও পরবর্তী ঘটনাবলীর ওপর এর গভীর প্রভাব ফেলে।

ড. ইসরাঈল ওয়েলফিন্সন খায়বার যুদ্ধ ও ইসলামের ইতিহাসের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখছেন :

"এতে কোন সন্দেহ নেই, মুসলিম বিজয়ের ইতিহাসে খায়বার যুদ্ধের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এটার কারণ হলো, আরবের সমস্ত গোত্র খুবই উৎকণ্ঠা নিয়ে এর পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিল। আর এর ফয়সালা আনসার ও ইয়াহূদীদের তলোয়ারের ঝংকারের ওপর নির্ভর করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু দুশমন আরবের বিভিন্ন শহর ও পল্লীতে এই যুদ্ধের ব্যাপারে বড় আশায় বুক বেঁধেছিল।"[১]

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার বিজয় থেকে অবসর পেলেন তখন তিনি ফিদাকে (একটি আবাদী পল্লী এলাকা, হেজাযের একটু ওপরের অংশে অন্যান্য আবাদী পল্লী এলাকার মতইএকটি ছোটখাট ক্ষুদ্র রাজ্য[২])-এর দিকে মনোযোগ দিলেন। ইয়াহূদীরা সব কিছুর অর্ধেক প্রদানের শর্তে সন্ধি করতে চাইল। তিনি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এ থেকে যা পাওয়া যেত তিনি তা নিজের ও মুসলমানদের কল্যাণে যেখানে যেমন দরকার ব্যয় করতেন।[৩]

এরপর তিনি ওয়াদীউল-কুরায়[৪] গমন করলেন। এটি খায়বার ও তায়মা'র মাঝখানে একটি নতুন বসতি ছিল যা ইসলামের পূর্বে ইয়াহূদীরা আবাদ করেছিল। অবস্থানের কারণে তাদের জন্য এর একটি কেন্দ্রীয় মর্যাদা ছিল। আরবের কিছু লোকও এসে তাদের সাথে শামিল হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, "যদি তোমরা ইসলাম কবুল কর তাহলে তোমাদের জীবন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকবে আর তাদের হিসাব হবে আল্লাহর যিম্মায়।"

এই যুদ্ধে কয়েকটি মুকাবিলা হয় যেগুলোতে হযরত যুবায়র ইবনুল-আওয়াম (রা)-এর বীরত্ব প্রকাশিত হয় এবং বিজয় ও সাফল্যের স্বর্ণ মুকুট তিনি মাথায় পরেন। দ্বিতীয় দিনেই ইয়াহূদীদের হাতে যা কিছু ছিল তা তারা মুসলমানদের হাতে

---

১. তা'রীখুল ইয়াহূদ ফী বিলাদিল-আরাব, ১৬২ পৃ.।

২. এই পল্লীর জনবসতি ইয়াহূদী বনী মুররা ও বনী সা'দ ইবন বাকরের গোত্রের জনসম্বলিত ছিল (নিহায়াতুল-আরাব ১৭/২০৯)।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২খ., ৩৮৮।

৪. ওয়াদিউল-কুরা বহু গ্রামসহ উপত্যকাকে বলা হয়। এখানে আরব ও ইয়াহূদীরা বাস করত। জযীরাতুল আরবের শস্য-শ্যামল ও সবুজ এলাকার অন্তর্গত। এতে ঝর্ণা ও কুয়াও পাওয়া যায়।

দিয়ে দেয়। এসব যুদ্ধে মুসলমানদের প্রচুর গনিমত হস্তগত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব সম্পদ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং ভূ-সম্পত্তি ও খেজুর বাগান ইয়াহূদীদের হাতে ছেড়ে দেন আর এর ওপর সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি ঘটে।

তায়মা'র[১] ইয়াহূদীরা যখন জানতে পারল, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার, ফিদাক ও ওয়াদীউল কুরার বাসিন্দাদের সঙ্গে এভাবে নিষ্পত্তি করেছেন তখন তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। তাদের মালমাত্তা ও সহায়-সম্পত্তি তাদেরই দখলে থাকল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ফিরে এলেন।[২]

মুহাজিরদের আত্মশুদ্ধি ও সংযম

মুসলমানরা যখন মদীনায় ফিরলেন তখন মুহাজিররা আনসারদের সেই সব দানসামগ্রী ফিরিয়ে দিতে চাইলেন যা তারা (আনসাররা) মুহাজিরদের দুরবস্থা ও সঙ্কটের সময় খেজুর বৃক্ষ ও অন্যান্য বাগ-বাগিচার আকারে দিয়েছিলেন। কেননা খায়বারে মুহাজিররা নিজেরাই ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের কাছে বাগ-বাগিচাও ছিল। আনাস ইবন মালিক (রা)-এর মাতা উম্মু সুলায়ম (রা) সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু খেজুর গাছ দান করেছিলেন। তিনি তা তাঁর মুক্ত ক্রীতদাসী উম্মু আয়মানকে দান করেছিলেন। ফিদাক থেকে পাবার পর তিনি এই গাছ উম্মু সুলায়ম (রা)-কে ফিরিয়ে দেন এবং উম্মু আয়মানকে প্রতিটি খেজুর গাছের বিনিময়ে দশটি করে ফাদাকের বাগানের খেজুর গাছ দান করেন।[৩]

খায়বার যুদ্ধের পরও অনেক অভিযান রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠিয়েছিলেন এবং জলীলু'ল-কদর সাহাবাদেরকে এসব অভিযানে আমীর নিযুক্ত করেন। এসব অভিযানের কোন কোনটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং কোন কোনটিতে পরিণতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায় নি।[৪]

'উমরাতু'ল-কাযা

৭ম হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে নিয়ে 'উমরাতুল-কাযা আদায়ের নিয়াতে মক্কা শরীফে গমন করেন। কুরায়শরা এতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করেনি। তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয় এবং নিজেদের ঘরে তালা লাগিয়ে কুআয়কিআন পর্বতে[৫] চলে যায়। তিনি তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন এবং 'উমরা আদায় করেন।

---

১. এটি ওয়াদীউ'ল-কুরা ও সিরিয়ার কাছে একটি পল্লী। প্রাচীনকালে সিরিয়া থেকে আগত হাজী সাহেবানের পথে পড়ত। ইয়াহূদী কবি সামওয়ালের বিখ্যাত দুর্গ আল-আবলাকুল-ফারদ এখানেই অবস্থিত ছিল।

২. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৪০৫ পৃ.।

৩. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৪০৬; মুসলিম এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে "কিতাবুল-জিহাদ ওয়া'স-সিয়ার"-এ, رد المهاجرين الى الانصار শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এতে কুরায়জা ও নযীর বিজয়েরও উল্লেখ রয়েছে।

৪. বিস্তারিত যাদুল-মা'আদ, ১ম খ., ৪০৯-১০।

৫. সহীহ বুখারী, 'উমরাতুল-কাযা শীর্ষক অধ্যায়।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَاتَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

"আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তোমরা নিশ্চিতভাবেই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে যদি আল্লাহ চান নিরাপদ শান্তির সঙ্গে মাথা মুণ্ডিত অবস্থায় ও চুল ছাঁটা অবস্থায় শঙ্কাহীনভাবে। আল্লাহ জানেন যা তোমরা জান না; এরপর তিনি নির্ধারিত করেছেন এর আড়ালে এক আসন্ন বিজয়।" [সূরা ফাতহ]

মেয়ে প্রতিপালনে প্রতিযোগিতা ও অধিকারের সাম্য

ইসলামের প্রভাবে ঐ সব লোকের মন-মস্তিষ্কে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হয়। যেই কন্যা সন্তান এককালে খান্দানের জন্য ও অভিজাত কওমের নেতৃদের চোখে লজ্জা ও শরমের বিষয় ছিল (এবং কোন কোন গোত্রে তাদেরকে জীবিত দাফন করার প্রথা ছিল) আজ এমন প্রিয় বিষয়ে পরিণতি হয়েছিল যে, কন্যা সন্তান প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পর্যন্ত দেখা দিল। মুসলমান ছিল সকলেই সমান এবং তাদের অধিকারও ছিল সমান। কারো যদি কোন বিষয়ে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তবে সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য ছিল ইলম, 'আমল ও কোন যৌক্তিক ভিত্তির ওপর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা থেকে ফেরার ইচ্ছা করলেন তখন সায়্যিদুনা হযরত হামযা (রা)-এর ছোট্ট বাচ্চা উমামা' 'চাচা, চাচা' বলে ডাকতে ডাকতে পেছনে দৌড়লেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে কোলে তুলে নিলেন, হযরত ফাতেমা (রা)-কে সোপর্দ করলেন এবং বললেন : দেখ, এ আমার চাচার মেয়ে। এখন 'আলী, যায়দ (ইবন হারিছা) ও জা'ফর (রা)-এর মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। সকলেরই ইচ্ছা উমামাকে সেই প্রতিপালন করবে।

হযরত আলী (রা) বললেন : একে আমি নিচ্ছি, এ আমার চাচাতো বোন। হযরত জা'ফর (রা) বললেন: এতো আমারও চাচাতো বোন আর তার খালা আমার স্ত্রী। হযরত যায়দ (রা) বললেন : (ইসলামের আত্মীয়তা সূত্রে) এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জা'ফরের দিকে রায় ছিলেন এবং বললেন, যেহেতু মেয়ের খালা তার ঘরে এবং খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে (সে সেখানে বেশি আদর পাবে এবং সেখানে সে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে)। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন : তুমি আমার এবং আমি তোমার। হযরত জা'ফর (রা)-কে বললেন: "তুমি আকারে-প্রকারে ও জীবন-চরিতের দিক দিয়ে আমার মত।" হযরত যায়দ (রা)-কে বললেন: "তুমি আমার ভাই ও বন্ধু (মওলা)।"

মূতার[১] যুদ্ধ

(জুমাদা'ল-উলা, ৮ হি.)

মুসলিম দূতকে হত্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিছ ইবন উমায়র আল-আযাদী (রা)-কে তাঁর পত্র দিয়ে বুসরার শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবন 'আমর-গাসসানীর নিকট পাঠান। সে ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। শুরাহবীল প্রথমে তাঁকে বাঁধবার হুকুম দেয়, এরপর তাঁকে সামনে ডেকে শহীদ করে দেয়।[২] দূত হত্যার কখনো কোনদিন নিয়ম ছিল না, তা প্রতিপক্ষের সঙ্গে মত বিরোধ যত তীব্রই হোক না কেন বা পত্রের বিষয়বস্তু যত তিক্তই হোক! এটি ছিল এমন এক ঘটনা যা উপেক্ষা করবার বা পাশ কাটিয়ে যাবার মত ছিল না। এটি ছিল সাধারণ দূতদের জন্য বিপদের কারণ এবং পত্র ও পত্র লেখকের উভয়ের জন্য চরম অপমান। এজন্য এ ধরনের গোস্তাখী যে দেখায় তাকে শায়েস্তা ও মজলুমের বদলা গ্রহণ করা সঙ্গত কারণে জরুরী ছিল যাতে করে ভবিষ্যতে কেউ এ জাতীয় দুঃখজনক ঘটনা আর করতে সাহসী না হয় এবং দূতদের রক্ত বৃথা না যায়।

রোম সাম্রাজ্যে প্রথম মুসলিম ফৌজ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই খবর পৌঁছতেই তিনি একটি সেনাবাহিনী বুসরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ ঘটনা ৮ম হিজরীর জুমাদাল-উলার।

তিন হাজার মুজাহিদ নিয়ে একটি সেনাবাহিনী এর জন্য তৈরি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিযানে বিশিষ্ট, বড় বড় জলীলুল-কদর ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আনসার ও মুহাজির থাকা সত্ত্বেও একজন মুক্ত গোলাম যায়দ ইবন হারিছা (রা)-কে বাহিনীর অধিনায়ক (আমীর) নিযুক্ত করেন। এরই সাথে তিনি এও হেদায়াত দান করেন, যদি সে শহীদ হয় কিংবা আহত হয় তবে জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা) আমীর হবে। যদি সেও একই অবস্থার মুখোমুখি হয় তাহলে 'আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহা (রা) বাহিনীর আমীর হবে। রওয়ানা হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে এল তখন

---

১. মূতা পূর্ব জর্দান-এর কির্ক শহরের দক্ষিণে ১২ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত। মদীনা ও মূতার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ১১০০ কি.মি.। মুসলমানরা এই দূরত্ব উট ও অশ্বপৃষ্ঠে এভাবে অতিক্রম করেন যে, তাঁদের রসদ সরবরাহের ধারা ছিল বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং গোটা সফরই ছিল দুশমনের পেটের ভেতর।

২. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৪১৪।

লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিযুক্ত আমীরদেরকে বিদায় জানান এবং তাঁদেরকে নিজেদের সালাম পেশ করেন।[১] তাঁদের সামনে ছিল এক দীর্ঘ ও কষ্টপূর্ণ সফর এবং তাঁদের মুকাবিলা হতে যাচ্ছিল এমন এক দুশমনের সঙ্গে যার পৃষ্ঠপোষক ছিল তৎকালীন এক সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য।

মুসলিম ফৌজ রওয়ানা হলো এবং সামনে এগিয়ে গিয়ে মা'আন নাম স্থানে ছাউনি ফেলল। এখানে মুসলমানরা জানতে পারলেন, হেরাক্লিয়াস বালকা' নামক স্থানে এক লক্ষ রোমক সৈন্য সমভিব্যাহারে অবস্থান করছেন এবং তাঁর সঙ্গে বিরাট সংখ্যক আরব কবিলা, যথা : লাখম, জুখাম, বালকায়ন, বাহরা ও বিল্লী এসে মিলিত হয়েছে। মুসলমানরা দু'রাত মা'আনেই কাটিয়ে দিলেন এবং অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। সিদ্ধান্ত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পত্র পাঠানো হোক এবং দুশমনের সংখ্যা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হোক! এতে হয় তিনি অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন অথবা মুকাবিলা করার হুকুম করবেন আর তা তা'মীল করা হবে।[২]

আমরা শত্রুর সাথে সংখ্যা ও শক্তির ভিত্তিতে লড়াই করি না

এ সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) মুসলিম মুজাহিদদের সাহস জোগালেন, উৎসাহিত করলেন এবং বললেন : আল্লাহর কসম! আজ তোমরা একে অপছন্দনীয় ও তিক্ত মনে করছ যার জন্য তোমরা বেরিয়েছিলে আর যা ছিল তোমাদের আন্তরিক কামনা অর্থাৎ শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ। তিনি বললেন : আমরা দুশমনের মুকাবিলা সংখ্যা কিংবা শক্তির ভিত্তিতে করি না। আমরা তো এর মুকাবিলা করি সেই দ্বীনের শক্তিতে যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন! অতএব, তোমরা রওয়ানা হও। উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য কল্যাণকর; জিতলেও লাভ আর শাহাদাত অর্জনেও লাভ। এ কথা শুনে লোকেরা তখনই দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কাফনবাঁধা মুজাহিদবৃন্দ

মুসলিম বাহিনী যখন বালকার কাছাকাছি পৌঁছল তখন রোমক ও আরবদের একটি বিশাল বাহিনী তাদের সামনে! এই বাহিনী মাশরিক নামক স্থানে মোতায়েন ছিল। মুসলমানদের দেখে তারা আরও কাছে এল। মুসলমানরা মূতা নামক একটি গ্রামে মোর্চাবন্দী হলো এবং এভাবে যুদ্ধের সূচনা ঘটল।[৩]

যায়দ ইবন হারিছা (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দেয়া পতাকা বহন করছিলেন, যুদ্ধের সূচনা করলেন এবং শেষে শহীদ হলেন। বল্লমের আঘাত তাঁর

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২খ., ৩৭৩; যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৪১৫।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২খ., ৩৭৩; যা'দুল-মাআদ, ১ম খ., ৪১৫।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ৩৭৭-৭৮।

টা দেহ ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। এবার হযরত জা'ফর (রা) স্বহস্তে পতাকা তুলে লেন এবং যুদ্ধ করতে থাকলেন। যুদ্ধের চাপ বৃদ্ধি পেতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মে পড়লেন এবং ঘোড়ার সামনের দু'পা কেটে দিলেন এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে দ্ধ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে শত্রুর আঘাতে তাঁর দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে ল। তিনি তখন বাম হাতে পতাকা ধরলেন। বাম হাতও কাটা পড়লে তিনি তাকা কেটে যাওয়া বাহুর অবশিষ্ট অংশ দিয়ে জাপটে ধরলেন। অবশেষে এক য় তিনিও শাহাদাতের পরম সৌভাগ্যে ধন্য হলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৩ র।[১] তাঁর বুক ও দুই বাহুর মাঝে ও সামনের অংশে নব্বইটি যখম ছিল যার ই ছিল তলোয়ার ও বল্লমের। এসবের একটিও পিঠে ছিল না।[২] মোটকথা, বে এই নির্ভীক যুবক জান্নাতের নে'মতসমূহের গান গাইতে গাইতে এবং র সংখ্যাধিক্য, শক্তি, শান-শওকত, আসবাবপত্র ও দুনিয়ার বাহ্যিক আড়ম্বর ও জসজ্জাকে দু'পায়ে দলতে দলতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

জা'ফর (রা)-এর শাহাদতের পর 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) পতনোন্মুখ কা হাত দিয়ে সামলে নিলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনিও তাঁর অশ্ব গ করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর পিতৃব্য পুত্র একটি হাড্ডি, যার গায়ে কিছুটা শত লেগেছিল, নিয়ে এলেন এবং বললেন: এইটুকু খেয়ে নাও যাতে কিছুটা শক্তি ফিরে আসে। কয়েক দিন যাবত তোমার পেটে দানাপানি তো কিছুই নি! আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) তাঁর হাত থেকে নিয়ে কিছুটা গোশত মুখে লেন। এরপর তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তলোয়ার হাতে নিয়ে তিনি সামনে লেন এবং শত্রুর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অবশেষে শাহাদতের অমিয় লা পান করলেন।[৩]

রত খালিদ (রা)-এর অভিজ্ঞ নেতৃত্ব

এরপর সকলে মিলে যুদ্ধের অধিনায়কের দায়িত্বভার হযরত খালিদ ইবন লীদ (রা)-এর ওপর চাপিয়ে দিলেন এবং তিনি পতাকা নিজ হাতে তুলে লেন। তিনি খুব বীর পুরুষ এবং যুদ্ধ বিষয়ে ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি লিম বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিলেন আর শত্রু উত্তর দিকে চলে গেল।[৪] র দিকে রাতের অন্ধকার সমগ্র বিশ্বচরাচরকে গ্রাস করল এবং উভয় পক্ষ এই তকে দুর্লভ সুযোগ মনে করল এবং যুদ্ধ চালিয়ে না যাওয়ার ভেতর নিজেদের ন দেখতে পেল।

-মাআদ, ১ম খ., ৪১৫।

কাছীর, ৩য় খ., ৪৭৪ ও যাদুল-মআদ, ১ম ৪১৫; সহীহ বুখারী বর্ণিত: আমরা নিহতদের ভেতর দেখলাম। তাঁর শরীরে ৯০টির বেশি তীর ও বল্লমের আঘাত ছিল।

-মাআদ, ১ম খ., ৪১৫; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩৭৯।

।

এটি এক বাস্তব সত্য, পশ্চাদপসরণ (যেমনটি ইরাকী জেনারেল মাহমুদ শী
খাত্তাব মনে করেন) পরাজয়ে রূপ নেবার আশংকায় খুবই কঠিন ও দুরূহ হয়ে ওঠে
আর পরাজয় এমন এক বিপদ হয়ে দেখা দেয় যা পরাজিতদের জন্য সাধারণত
খুবই ক্ষতির কারণ হয়। এজন্য মূতায় মুসলমানদের মামুলী ক্ষতি সেই সামরিক
উপকারের তুলনায় নেহায়েত সামান্যই যে, এ দ্বারা রোমকদের সামরিক শক্তি,
তাদের শৃঙ্খলা, সংগঠন ও তাদের যুদ্ধ-পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যায় য
পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের কাজে লেগেছে।[১]

হযরত খালিদ (রা) তাঁর লোকদেরকে একটা বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আপন
বাহিনীর পশ্চাতে মোতায়েন করেন। তারা প্রভাতে এমন বুলন্দ আওয়াজে তুলে
যুদ্ধের ময়দানে এসে উপস্থিত হয় যে, শত্রু ভেবে বসে, বুঝি বা মদীনা থেকে নতুন
কোন সাহায্যকারী বাহিনী এসে গেছে! ফলে রোমক ফৌজের অন্তরে
মুসলমানদের ভীতিকর প্রভাব পড়ে এবং তারা নিজেদের মধে বলাবলি করতে
থাকে, তিন হাজার ফৌজই যখন আমাদের সামনে এই বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে
এবং তুলকালাম কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তখন তাদের আরও নতুন সাহায্যকারী সৈন্য, যার
সংখ্যা ও শক্তির পরিমাপ আমাদের জানা নেই, না জানি এ মুহূর্তে কী করে বসে।
এই ভেবে রোমকদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে।
আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে যুদ্ধের কষ্ট-তকলীফ থেকে মুক্ত
ও নিরাপদ রাখেন।[২]

চোখে দেখা অবস্থা

এদিকে মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের শক্তিমত্তা দেখাচ্ছিলেন আর ওদিকে
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় বসে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নিকট চাক্ষুষ অবস্থার
বর্ণনা দিচ্ছিলেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ,
জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহা (রা)-এর শাহাদাতের খবর মদীনায় এসে
পৌঁছুবার আগেই দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "এখন যায়দ পতাকা হাতে নিল, সে
শহীদ হলো। জা'ফর পতাকা নিল, সেও শহীদ হলো। ইবন রাওয়াহা নিল, শহীদ
হলো (সে সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল), এমন কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর
তলোয়ারগুলোর ভেতর একটি তলোয়ার (সায়ফুল্লাহ খালিদ বিন ওয়ালীদ রা)
পতাকা হাতে তুলে নিল এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় দান
করলেন।"[৩]

---

১. আর-রাসূলু'ল-কায়েদ, ২০৬-৭।

২. ওয়াকেদীর মাগাযী।

৩. সহীহ বুখারী, মূতা যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

জা'ফর ত্যায়্যার (রা)

জা'ফর (রা) সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহতা'আলা তার দুই বাহুর বিনিময়ে তাকে দু'টো পাখা দান করেছেন যার সাহায্যে সে বেহেশতের যেখানে খুশি উড়ে বেড়ায়।[১] এজন্য তাঁর উপাধি হয় জা'ফর তায়্যার (উড্ডয়নরত জা'ফর) ও যু'ল-জানাহায়ন (দুই বাহু বা ডানাবিশিষ্ট)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা ও সান্ত্বনা দান

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জা'ফর (রা)-এর স্ত্রীকে বললেন, জা'ফরের বাচ্চাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারা যখন এল তিনি তখন তাদের আপন চোখের সঙ্গে ঠেসে ধরলেন আর তাঁর চোখ থেকে অমনি অবিরল ধারায় অশ্রু বইতে হতে লাগল। এরপর তিনি তাঁদেরকে তাঁর শাহাদাতের খবর দিলেন। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে শাহাতাদের খবর এসে পৌঁছল তখন তিনি আপন পরিবারস্থ লোকদেরকে বললেন, জা'ফরের ঘরের লোকদের জন্য খাবার তৈরি কর। এই দুর্ঘটনা তাদেরকে খাবার রান্না করবার দিকে মনোযোগ দেবার মত অবস্থায় রাখেনি। তাঁর নিজের চেহারা মুবারক থেকেও দুঃখ ও বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল।[২]

হামলাকারী, পলাতক নন

ফেরার সময় সেনাবাহিনী যখন মদীনার কাছাকাছি হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণ সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান। শিশুরাও তাঁদের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন তখন সওয়ারীর পিঠে। তিনি বললেন, "তোমরা সকলে বাচ্চাদেরকে নিজেদের সঙ্গে বসিয়ে নাও আর জা'ফরের বাচ্চা আমাকে দাও।" তাঁর নিকট তখন জা'ফর পুত্র আবদুল্লাহকে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাঁকে নিজের কোলে বসিয়ে নিলেন। মুসলমানরা যেহেতু যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটতে অভ্যস্ত ছিলেন না, এটা ছিল তাদের প্রথম ঘটনা, এজন্য তারা ঐসব গাযী মুজাহিদের ওপর ধূলি নিক্ষেপ করছিলেন এবং বলছিলেন: পলাতকেরা! আল্লাহর রাস্তা থেকে পালিয়েছে? তিনি তখন তাদের রক্ষার্থে বললেন: পলাতক নয়, আল্লাহ চাহে তো তারা হামলাকারী (হবে)![৩]

---

১. সহীহ বুখারীতে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা)-এর যখন হযরত জা'ফর (রা)-এর ছেলের সাথে দেখা হতো, তখন তিনি বলতেন, "আসসালামু আলায়কা ইয়া ইবন যী'ল-জানাহায়ন" এবং দ্র. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪১৫।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩৮০-৮১।

৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বর্ণিত।

মূতার যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়

মূতার যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মাঝামাঝি যাতু'স-সালাসিল নামে একটি সারিয়্যা (অভিযান) ৮ম হিজরীর জুমাদাল-উখরা মাসে পাঠানো হয়। এই জায়গাটি ওয়াদীউল-কুরার পেছনে ও কুদা'আ গোত্রের এলাকায় অবস্থিত ছিল। মুসলিম বাহিনী এই সুযোগে শত্রু সম্পূর্ণ খতম করেন। দ্বিতীয় সারিয়্যার নাম ছিল সারিয়্যাতুল-খাব্ত। এর আমীর ছিলেন আবূ উবায়দা ইবনু'ল-জাররাহ (রা)। এই সারিয়্যা ৮ম হিজরীর রজব মাসে পাঠানো হয়। এতে মুহাজির ও আনসারদের ৩০০ জন শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুহোয়না নামক একটি গোত্রকে শায়েস্তা করবার জন্য সমুদ্রের কাছে এই অভিযান পাঠিয়েছিলেন। রাস্তায় এই সব মুজাহিদকে দুঃসহ ক্ষুধা ও উপবাসের মুখোমুখি হতে হয়, এমন কি গাছের পাতা খেয়েও দিন কাটাতে হয়। সে সময় সমুদ্র তাদের জন্য 'আম্বর নামে একটি বিরাট আকারের মাছ সরবরাহ করে যা খেয়ে মুসলিম বাহিনী পক্ষকাল কাটায়। মাছ থেকে প্রচুর তেলও পাওয়া যায় এবং তা বেশ কাজে লাগে। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতি হয় এবং হারানো শক্তি ফিরে আসে। শরীর তরতাজা হয়ে যায়। হুযূর ﷺ এই ঘটনা শুনে বলেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের মেহমানদারী ছিল। তিনিও এর (মাছের) কিছু অংশ গ্রহণ করেন।[১]

---

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৪১৭ পৃ.। সহীহ বুখারীতে এই বর্ণনা "সায়ফু'ল-বাহর যুদ্ধ" শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

মক্কা বিজয়

(৮ম হিজরী রমযান[1])

মক্কা বিজয়ের পটভূমি

দীনে হক তথা ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের ভিত্তি যখন আল্লাহর হুকুমে বেশ ভাল রকম মযবুত হয়ে গেল, আল্লাহতাআলা মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করে নিলেন এবং তাদের দিল ও নিয়তের পুরো পরীক্ষা নিলেন, কুরায়শদের জুলুম ও বিদ্রোহ, সত্য গ্রহণে অস্বীকার, সত্যের পথে বাধার প্রাচীর খাড়া করা, মুসলমানদেরকে অবিরাম কষ্ট প্রদান ও নানা রকমের অভিযোগ আরোপ ও নিপীড়নের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন আল্লাহর ফয়সালা হলো, এখন এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করুক! চাইলেন কা'বাকে মূর্তির ময়লা ও আবর্জনাময় অস্তিত্ব, মিথ্যা ও অশ্লীল বাক্যের দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা থেকে তিনি পাক-সাফ করবেন, মক্কার পুরাতন সম্মান ও মর্যাদা আবার উদ্ধার করবেন, বায়তুল্লাহকে সমগ্র মানবতার জন্য হেদায়াত ও বরকতের উৎসে পরিণত করবেন এবং তাঁর রহমতের ধারাকে সমস্ত মানুষের জন্য ব্যাপক করে দেবেন।

বনী বকর ও বনী কুরায়শদের চুক্তি ভঙ্গ

আল্লাহতাআলা এই নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট বিজয়ের জন্য বিশেষ উপকরণও সৃষ্টি করে দিলেন এবং স্বয়ং কুরায়শদেরকেই অজান্তে এর উপলক্ষে পরিণত করলেন। তাদের দ্বারা এমন একটি ব্যাপার ঘটল যা কেবল মক্কা বিজয়কেই বৈধতা ও অনুমোদন দান করল না, বরং তাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ "আর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণেই আসমান ও যমীনের সেনাবাহিনী।"

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির একটি ধারা ছিল, যে ব্যক্তি বা যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতিশ্রুতি ও আশ্রয়ে আসতে চায় আসতে পারে। আর যে ব্যক্তি বা যারা কুরায়শদের আশ্রয় ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে চায় গ্রহণ করতে পারে, এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন। এরই আওতায় বনূ বকর কুরায়শদেরকে প্রাধান্য দেয় এবং তাদের সাহায্য-সমর্থন ও আশ্রয় গ্রহণ করে। বনূ খুযা'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করে।[2]

---

১. [illegible]বিক অনুযায়ী ৬৩০ খৃ.।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩৯০।

বনূ বকর ও খুয'আর মধ্যে বহু পুরনো শত্রুতা ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের এক অন্তহীন সিলসিলা চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাবের প্রথম থেকেই ছিল। ইসলাম এসে উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেয় এবং এই ব্যাপারটি ছাড়া আর কোন জিনিসের ওপর গভীরভাবে ভেবে দেখার সুযোগ লোকের হয়নি। যখন সন্ধি হলো এবং এই চিরশত্রু ও প্রতিপক্ষ গোত্র দু'টি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হলো তখন বনূ বকর এই সুযোগকে এক দুর্লভ সুযোগ ভেবে খুযা'আ গোত্র থেকে এতদিনের হিসাব চুকাতে চাইল। বনূ বকরের কিছু লোক চক্রান্ত করে বনূ খুযা'আর ওপর সেই সময় রাত্রিকালে হঠাৎ হামলা চালায় যখন তারা একটি ঝর্ণার ধারে অবস্থান করছিল। লড়াই হলো। এতে খুযা'আ গোত্রের কয়েকজন মারা যায়।

কুরায়শরা বনী বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সাহায্য করে এবং রাতের অন্ধকারে কুরায়শদের বড় বড় সর্দার এই যুদ্ধে অংশ নেয়। এরা খুযা'আ গোত্রের লোকদের ঠেলতে ঠেলতে হারাম শরীফে পৌঁছে যায়। কুরায়শদের কেউ কেউ তখন বলছিল: এখন আমরা হারাম শরীফের সীমানায় এসে গেছি! আমাদের উপাস্য মা'বূদের দিকে একটু খেয়াল কর। এর জওয়াব মিলল: আজকের দিনে কোন মাবূদ নেই। বনী বকর! আজ তোমরা প্রাণভরে প্রতিশোধ নিয়ে নাও। এরপর আর তোমরা এর সুযোগ পাবে না।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ফরিয়াদ

এ সময় 'আমর ইবন সালেম আল-খুযাঈ মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসেন এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কবিতা পাঠ করেন। কবিতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুযা'আ গোত্রের মধ্যে যে চুক্তি ছিল, ছিল পরস্পরকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি, তার দোহাই দিয়ে তাঁর সাহায্য-সমর্থন কামনা করলেন। 'আমর এও জানান, কুরায়শরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং আপনার সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা খতম করেছে। তারা এই অবস্থায় তাদের ওপর রাত্রিকালীন হামলাই চালিয়েছে যখন তারা ঝর্ণার পাড়ে ছিল এবং রুকু ও সিজদারত অবস্থায় আমাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন : 'আমর ইবন সালেম! তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।

শেষ সুযোগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করা সমীচীন বলে মনে করলেন যাতে কুরায়শদের কাছে বলার মত আর কিছু না থাকে। তিনি তাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাকে বলে দিলেন, তাদের সামনে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে: (১) তারা খুযা'আ গোত্রের নিহতদের রক্তপণ আদায় করবে অথবা (২) যারা এই

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪১৯ ও সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩৯০।

চুক্তি ভেঙেছে এবং খুযা'আদের ওপর হামলা করেছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে। এরা ছিল বনূ বকরের শাখা বনূ নাফাসার সঙ্গে সম্পর্কিত; (৩) অন্যথায় তারা যা করেছে তাই তাদের সঙ্গে করা হবে। এতে তাদের কোন কোন সর্দার বলল: এ ক্ষেত্রে আমরা সমান সমান উত্তর দেয়া পছন্দ করি। আর এভাবে মুসলমানরা কুরায়শদের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হয়ে গেল এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সুযোগও মিলে গেল।[১]

সন্ধি চুক্তি নবায়নের জন্য কুরায়শদের চেষ্টা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন এই খবর পৌঁছল তখন তিনি বললেন: আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আবূ সুফিয়ান চুক্তিকে বহাল করবার এবং এর সময়সীমা বাড়ানোর জন্য তোমাদের কাছে এসেছে। শেষে এমনটি হলো, কুরায়শরা যা করেছিল তাতে তাদের মনে এক ধরনের আশঙ্কা দেখা দিল এবং তারা এরূপ রূঢ় জওয়াব প্রদান উচিত হয়নি বলে মত প্রকাশ করল। তাদের কিছু নির্বোধ লোকের এ ধরনের উত্তর প্রদানে তারা পস্তাতে লাগল। অবশেষে তারা আবূ সুফিয়ানকেই এই চুক্তি বহাল ও এর সময়সীমা বাড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিল।[২]

পিতামাতা ও সন্তানের মুকাবিলায় হুযূর ﷺ-কে প্রাধান্য দান

আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে মদীনায় এল এবং স্বীয় কন্যা উম্মুল-মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা)-এর ঘরে গেল। সেখানে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানায় বসতে গেলে হযরত উম্মু হাবীবা (রা) তাকে থামিয়ে দিলেন। তিনি কন্যার এরূপ আচরণে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল : বেটি! আমি বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে এই বিছানার যোগ্য মনে করছ না, নাকি এই বিছানাই আমার যোগ্য নয় ভাবছ ?

তিনি জওয়াব দিলেন, আসল কথা হলো, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা আর আপনি মুশরিক ও নাপাক। আমি পছন্দ করি না, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানায় বসেন। এতে তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! আমার থেকে আলাদা হওয়ার পর তুমি অনেক বদলে গেছ![৩]

---

১. যুরকানী মাওয়াহির গ্রন্থে ইবন আয়েয থেকে ইবন ওমরের বরাতে বর্ণনা করেন, যেই লোককে রাসূলুল্লাহ (সা) এই কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন তার নাম ছিল দামরা এবং কুরায়শদের যেই লোক এর উত্তর দিয়েছিল তার নাম ছিল কুর্ত ইবন আমর (২য় খ., ৩৪৯)।

২. যাদুল-মা'আদ ৪২০/১ম খ., ও সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ২৯৫-৯৬।

৩. যাদু'ল-মা'আদা ১ খ., ৪২০ ও সীরাত ইবন হিশাম, ২ খ., ৩৯৬। মূল আরবী শব্দ এই اصابك بعدى شى অর্থাৎ কসম আল্লাহর! এই নতুন ধর্ম কবুল করার পর তুমি এখন আমাকে চেন না এবং নিজের দীন ও ঈমানের সামনে বাপের দিকেও খেয়াল নেই।

আবূ সুফিয়ানের পেরেশানী ও ব্যর্থতা

এর পর আবূ সুফিয়ান সোজা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে চলে গেল এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু তিনি তাঁর কোন কথার জওয়াব দিলেন না। এরপর আবূ সুফিয়ান হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গেল এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জওয়াবে তাঁর অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করলেন। এভাবে সে পর্যায়ক্রমে হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর সঙ্গে কথা বলল এবং তাঁদেরকে তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। কিন্ত এঁদের কেউ তার সহযোগিতা করতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন, সমস্যা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক যে, আমরা এ ব্যাপারে কথা বলতে পারছি না। এতে তার হয়রানি ও পেরেশানী এতটা বেড়ে গেল যে, সে হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলল, ওহে মুহাম্মাদ কন্যা! তুমি কি তোমার এই ছেলেকে [এই বলে তিনি হযরত হাসান ইবন আলী (রা)-এর দিকে ইশারা করলেন যিনি তখন পাঁচ বছরের শিশু আর তিনি খেলছিলেন] ইশারা করতে পার যেন এতটা মুখ দিয়ে বলে, আমি উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিয়েছি, এই বলে সে কেয়ামত পর্যন্ত আরবদের সর্দার হয়ে যেতে পারে।

তিনি জওয়াব দিলেন, আমার বাচ্চা এতটা যোগ্য এখনও হয়নি (এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে এবং দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করবে) তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউই সন্ধি কিংবা সমঝোতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। এরপর হযরত আলী (রা) যখন তার (আবূ সুফিয়ানের) পেরেশানী দেখতে পেলেন তখন তিনি আবূ সুফিয়ানের মানসিক যন্ত্রণা ও বিপদ আঁচ করতে পারলেন। তিনি তাকে বললেন: আমি বুঝতে পারছি না, এ সময় কোন্‌টা তোমার কাজে আসবে। তুমি বনী কিনানার সর্দার। তুমি দাঁড়িয়ে যাও এবং নিজে থেকেই সন্ধি বহালের পক্ষে লোকের মধ্যে সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দাও। এরপর সোজা বাড়ির পথ ধর।

আবূ সুফিয়ান জওয়াবে বললেন : তোমার ধারণায় এতে কি কোন ফায়দা হতে পারে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এর বেশি আমার মাথায় আর কিছু আসছে না। কিন্তু আমি এর বাইরে আর কোন উপায়ও তোমার জন্য দেখছি না। শুনে আবূ সুফিয়ান মসজিদে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা দিলেন, লোক সকল! আমি সন্ধি বহাল করে গেলাম। এরপর তিনি উটে চড়লেন এবং মক্কার পথ ধরলেন।[১]

কুরায়শরা যখন পুরো ঘটনা শুনতে পেল তখন তারা বলতে লাগল, তুমি তো আমাদের জন্য কিছুই নিয়ে আসতে পারনি! তুমি যা করে এসেছ তা আমদের জন্য তেমন কোন উপকারী নয়, তেমনি নয় তোমার জন্যও।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩৯৫-৯৬।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি ও হাতিব-এর পত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং এরও ব্যবস্থা নিলেন যাতে প্রস্তুতির সব খবর গোপন থাকে এবং কাক-পক্ষীও যেন তা জানতে না পারে! এরপর তিনি মক্কা রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং লোকদেরকে তৈরী থাকার ও সামান প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিলেন। তিনি এও বললেন, হে আল্লাহ! কুরায়শদের কোন গুপ্তচর কিংবা সংবাদবাহক যেন এই খবর সংগ্রহ না করতে পারে তার ব্যবস্থাও তুমিই করে দাও যাতে আমরা হঠাৎ তাদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে হাজির হতে পারি![১]

মদীনা ইসলামী সমাজ আর যা-ই হোক, একটি মনুষ্য সমাজই ছিল এবং এই সমাজে মানবীয় আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনা তার যাবতীয় বাস্তবতা নিয়েই বিদ্যমান ছিল যা যে কোন জীবন্ত, স্বভাবজাত ও কৃত্রিমতামুক্ত সমাজেই থেকে থাকে। এজন্য সে সমাজে সহী-শুদ্ধ কাজ যেমন সাধিত হয়, তেমনি ভুল-ত্রুটিও সংঘটিত হয়। হতে পারে, তারা তাদের সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও আশ্রয় নিয়ে থাকবেন এবং এসব ব্যাখ্যায় তারা সত্যের ওপর থাকতে পারেন।

মূলত এটি সেই সমস্ত মানব সমাজেরই বৈশিষ্ট্য যে সমাজে স্বাধীনতা ও পারস্পরিক আস্থার পরিবেশে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাদের কোন সিদ্ধান্ত ভুল মনে করতেন তবে তার জন্য ওযর তালাশ করতেন এবং তাদের সঙ্গে রে'আয়েত ও দেখেও না দেখার ভান (تسامح) করতেন। যাঁরা ভুল করতেন তাঁদের জন্য তাঁর পবিত্র বক্ষ ছিল খুবই প্রশস্ত এবং তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা, দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ও ইসলামের জন্য তাঁদের পূর্বেকার খেদমতের প্রতি সর্বদাই সহানুভূতিশীল ছিলেন। হাদীছ, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস এ ধরনের খুব কম ঘটনার দলীল রেখেছে যা নিজেই ঐসব গ্রন্থের আমানত ও দিয়ানত, সত্য কথন ও ইনসাফপ্রিয়তার সাক্ষী ও সনদ।

এসব ঘটনার মধ্যে হাতেব ইবন আবী বালতা'আর ঘটনাও রয়েছে। তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম যাঁরা মক্কা থেকে (মদীনায়) হিজরত করেছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে যাওয়ার ইচ্ছা সাহাবাদেরকে জানিয়ে দেন এবং নীরবে এর জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় তখন হাতেব ইবন আবী বালতা'আ (রা) একটি পত্র লেখেন এবং পত্রে মক্কার লোকাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা যাত্রার সংবাদ দেয়া হয়েছিল। তিনি পত্র এক নারীকে দেন এবং তাকে কথা দেন, সে যদি পত্রটি নিরাপদে কুরায়শদেরকে পৌঁছে দিতে পারে তবে তাকে কিছু বিনিময়/পারিশ্রমিক দেয়া হবে। সে পত্রটি তার

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৪২১ পৃ. ও সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৩৯৭।

চুলের খোঁপার ভেতর লুকিয়ে রাখে এবং মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিষয়টি জানতে পারেন এবং তক্ষুণি হযরত আলী ও যুবায়র (রা)-কে তার অনুসরণ করার জন্য পাঠান এবং বলেন, তোমরা দু'জন রওযাতু'ল-খাখ (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান)-এর কাছে গেলে সেখানে একটি মুসাফির নারীকে পাবে যার কাছে কুরায়শদের বরাবর লিখিত একটি পত্র পাবে (পত্রটি নিয়ে আসবে)।

উভয়ে দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে ছুটলেন এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন এবং উক্ত স্থানে এক নারীকে পেলেন। তাঁরা তাকে উটের পিঠ থেকে নামতে বাধ্য করলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি কোন পত্র আছে? সে পত্রের কথা অস্বীকার করল। তার কাছের সামানপত্র খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু পত্রটির হদিস মিলল না। হযরত আলী (রা) তখন বললেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর রাসূলের কথা ভুল হতে পারে না আর আমরাও মিথ্যা বলছি না। আল্লাহর কসম! তোমাকে পত্র বের করে দিতে হবে নতুবা তোমার পরনের কাপড় তল্লাশি করা হবে। অগত্যা সে উপায় না দেখে বলল, ঠিক আছে, তোমার মুখ ওদিকে ফেরাও। তাঁরা মুখ ফেরালে সে চুলের খোঁপার ভেতর থেকে পত্রটি বের করে দিল। পত্র পেতেই তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে হাজির হলেন এবং পত্র সোপর্দ করলেন। পত্রটি খুলে দেখা গেল হাতেব (রা) ইবন আবী বালতা'আর পত্র যেখানে কুরায়শদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা অভিযানে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতেব (রা)-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি উপস্থিত হয়ে (সকল বিষয় জানলেন এবং) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এ বিশ্বাসী। আমি আমার ধর্ম যেমন পরিবর্তন করিনি, তেমনি আমার বিশ্বস্ততাও বিকিয়ে দেইনি। কিন্তু কুরায়শদের সঙ্গে আমার তেমন কোন সম্পর্ক নেই যেমন সম্পর্ক রয়েছে এসব মুহাজিরদের। এদের অনেকেরই তাদের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে যারা তাদের মক্কায় থাকা আত্মীয়তাসূত্রের লোকদের বিপদে আশ্রয় দেবে। কিন্তু আমার ব্যাপার ভিন্ন। আমার সেখানে কোন আত্মীয় নেই, আছে কেবল মিত্রতা সম্পর্ক, অথচ সেখানে আমার পরিবারের লোকেরা রয়েছে, বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে। ফলে তাদের পারিবারিক কিংবা খান্দানীসূত্রে আশ্রয় দেবার মত কেউ নেই।[১] আমি ভেবে দেখলাম, অন্তত যখন এসব নেই তখন আমি তাদের এমন কোন উপকার করি যার ফলে আমার পরিবারের লোকেরা যেন নিরাপদে থাকে!

---

১. হাতেব (রা) ইবন আবী বালতা'আ লাখম গোত্রের লোক ছিলেন। গোত্রটি উত্তর হেজায ও সিরিয়ার আরব কবিলাগুলোর অন্যতম। তারা কুরায়শদের ভেতর কাদের মিত্র ছিল সে সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, তারা বনী আসাদ ইবন হযরত যুবায়র (রা)-এর মিত্র বলেন। [পরের পৃ. দ্রষ্টব্য]

হযরত ওমর (রা) শুনে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন এখনই আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করেছে এবং সে মুনাফিকের একজন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, সে তো বদর যুদ্ধে শরীক ছিল! আর ওমর! তোমার কি জানা আছে, আল্লাহতাআলা বদরে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমরা যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদের সব অন্যায়-অপরাধ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছি। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা)-এর চোখ অশ্রু প্লাবিত হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ বেশি জানেন।[১]

মোটের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার সাহাবা।[২] মারউ'জ-জাহরান উপত্যকায় এসে তিনি ছাউনি ফেলেন। মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরায়শদেরকে বেখবর রাখেন এবং তারা ভয়-ভীতি, অনিশ্চয়তা ও অপেক্ষার মিশ্রিত অবস্থার শিকার হয়।

ক্ষমার পরওয়ানা

পথিমধ্যে পিতৃব্য পুত্র আবূ সুফিয়ান ইবনুল-হারিছ ইবন 'আবদি'ল-মুত্তালিব-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কেননা আবূ সুফিয়ান নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করে হুযূর আকরাম ﷺ -কে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছিল। সে (আবূ সুফিয়ান) এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করে। হযরত আলী (রা) তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখভাগে গিয়ে হাজির হও এবং য়ূসুফ (আ)-এর ভ্রাতৃকুল য়ূসুফ (আ) সম্পর্কে যা বলেছিলেন, تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ "আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর মর্যাদা দান করেছেন। আর নিশ্চিত আমরাই ছিলাম অন্যায়কারী"[৩] তাই বল। এজন্য বল, তিনি পছন্দ করেন না কেউ উত্তম, মধুর ও কোমল কথা বলার ক্ষেত্রে তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাক! সে তাই করল এবং সামনে গিয়ে এ কথাই বললেন।

[চলমান] কেউ বা বলেন, (চলমান) তিনি আবদুল্লাহর ইবন হুমায়দ আসাদীর মুক্ত গোলাম ছিলেন (দ্র. ইবন হাজার আসকালানীকৃত 'আল-ইসাবা')। মশহুর বর্ণনা মুতাবিক মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস-এর নামে হুযুর (সা)-এর লিখিত পত্র নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন। "মারযুবানী মু'জামু'শা-শু'আরা" গ্রন্থে তাঁকে জাহিলী যুগের কুরায়শ অশ্বারোহী ও কবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন। মাদাইনীর বর্ণনা মুতাবিক ৩০ হিজরীতে হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলে ইন্তেকাল করেন।

১. যাদুল-মাআদ ১ম খ., ৪২০ পৃ. ও সিহাহ সিত্তা।

২. সহীহ বুখারী; محزوة الفتح فى رمضان শীর্ষক অধ্যায়।

৩. সূরা য়ূসুফ, ৯১ আয়াত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলল, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ। "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন! আর তিনিই দয়া দেখানোর মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।"[১] এরপর তিনি খুব ভাল দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর আর কখনো লজ্জায় আল্লাহর রাসূলের দিকে চোখ তুলে তাকান নি।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আবূ সুফিয়ান

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে চারদিকে আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পালন করা হয়। সে সময় আবূ সুফিয়ান ইবন হারব গোপনে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশে ও অবস্থা আঁচ করার জন্য এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় প্রান্তরব্যাপী অসংখ্য আগুন প্রজ্বলিত দেখতে পেয়ে ও চারদিকে আলো আর আলো দেখে তিনি বিস্মিত হন! তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় : এত বড় বিশাল বাহিনী এবং এ ধরনের আলো তো আর এর আগে কখনো দেখিনি! হযরত আব্বাস (রা) ইবন আবদিল-মুত্তালিব আগেই ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেছিলেন এবং এই বাহিনীতে ছিলেন। তিনি আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনে চিনে ফেলেন এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখন লোকজন পরিবেষ্টিত আছেন। এখন তুমি ভেবে দেখ, কাল কুরায়শদের কী ভয়াবহ পরিণতি হবে! তারপর এই কথা ভেবে, যদি কোন মুসলমান তাঁকে দেখে ফেলে তাহলে তক্ষুণি তাঁর কম্ম সাবাড় করে দেবে, তাঁকে তাঁর পেছনে খচ্চরের পিঠে তুলে নেন এবং সোজা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে হাজির হন। আবূ সুফিয়ানকে দেখেই তিনি বলে ওঠেন :

আবূ সুফিয়ান! তোমার মঙ্গল হোক। এখনও কি সময় আসেনি, তুমি এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে যিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই।

আবূ সুফিয়ান বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি কত মহানুভব, দয়ালু ও ধৈর্যশীল আর আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহর কসম! আমি তো বুঝছি, যদি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন মা'বুদ কিংবা উপাস্য থাকত তাহলে আজ আমার অবশ্যই কোন উপকারে আসত।

এরপর তিনি বললেন, আবূ সুফিয়ান! আল্লাহ্ তোমাকে সুবুদ্ধি দান করুন! এখনও কি সে সময় আসেনি, তুমি এ কথা স্বীকার করবে, আমি আল্লাহর রাসূল?

আবূ সুফিয়ান বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আপনি কত মহানুভব, দয়ালু ও সজ্জন আর আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও আমার কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে।

---

১. প্রাগুক্ত, ৯২ আয়াত।

২. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪২১।

হযরত 'আব্বাস (রা) কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন, আরে আল্লাহর বান্দা! এখনও সন্দেহ-সংশয়! বাঁচতে চাইলে কেউ এসে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেবার আগেই ইসলাম কবুল করে ফেল এবং সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। শুনে আবূ সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন এবং মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য ঘোষণা করে মুসলিম দলভুক্ত হন।[১]

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষমা, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিধি এই দিন প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর ও ব্যাপক থেকে ব্যপকতর করে দেন এবং বলেন, মক্কার বাসিন্দাদের মধ্যে কেবল তারাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবে যারা নিজেরাই ক্ষমা ও নিরাপত্তা পেতে চায় না এবং যাদের নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। এরপর তিনি ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে আপন ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ, আর আবূ সুফিয়ানের ঘরে যে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীর সদস্যদেরকে নির্দেশ দেন, আজ কেবল তাদের ওপর হাত ওঠানো হবে যারা মক্কায় ঢোকার মুহূর্তে কোনরূপ বাধা দেবে কিংবা বাধা সৃষ্টি করবে। তিনি তাদেরকে আরও নির্দেশ দেন, মক্কার লোকদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে সাবধান থাকবে এবং এক্ষেত্রে যেন কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা হয়।[৩]

আবূ সুফিয়ানের বিজয় মিছিল দর্শন

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন আবূ সুফিয়ানকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতে যেখান থেকে সে মুসলিম পদাতিক বাহিনীর অংশের অভিযানের দৃশ্য দেখতে পায়। বিজয়ী বাহিনীকে তখন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মক্কার উপকণ্ঠে আছড়ে পড়তে দেখা যাচ্ছিল। বিভিন্ন কবিলা আপন আপন পতাকাসহকারে পথ অতিক্রম করছিল। যখনই কোন কবিলা অতিক্রম করত তখন আবূ সুফিয়ান (রা) আব্বাস (রা)-কে তাদের নাম জিজ্ঞেস করতেন, পরিচয় জানতে চাইতেন। নাম-পরিচয় পাবার পর তিনি বলতেন, এই গোত্রের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আসতে দেখা গেল যা বাহ্যত সবুজ দেখা হচ্ছিল। এটি ছিল মুহাজির ও আনসারদের এমন একটি বর্মপরিহিত বাহিনী যাদের কেবল চক্ষুই দেখা যাচ্ছিল।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪০৩ ও যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খ., ৪২২।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪০৯; বর্ণনাটি বুখারী শরীফে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত।
৩. প্রাগুক্ত।

আবূ সুফিয়ান (রা) এই দৃশ্যে বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন, আল্লাহর অপূর্ব শান! 'আব্বাস, এরা কারা? জওয়াবে হযরত আব্বাস (রা) জানালেন, ইনি রাসূলুল্লাহ ﷺ! মুহাজির ও আনসাররা তাঁকে ঘিরে নিয়ে চলেছেন। তিনি বললেন, এদের ভেতর এর পূর্বে এত শক্তি ও শান-শওকত আর কারো ছিল না! আল্লাহর কসম! ও হে আবু'ল-ফযল! তোমার ভাতিজার ক্ষমতা আজকের সকালে কত বিশাল বিপুল! উত্তরে তিনি জানালেন, আবূ সুফিয়ান! তুমি ভুল করছ। এ ক্ষমতার চরম নয়, নবুওয়াতের (অতুলনীয়) মুজিযা!

এবার আবূ সুফিয়ান (রা) (দৌড়ে মক্কায় গিয়ে) উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, ওহে কুরায়শ লোকেরা! মুহাম্মদ ﷺ আজ বিশাল ও বিপুল শক্তি নিয়ে আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত যা তোমাদের ধারণার বাইরে। এখন যারা আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ। লোকেরা এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ানকে বলতে লাগল, তোমার ব্যাপারে আল্লাহই বুঝুন। তোমার ঘরের পরিসরই বা কতটুকু! তাতে আমাদের কতজনের আশ্রয় জুটবে? অতঃপর তিনি বললেন, যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে থাকবে তারাও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং যারা মসজিদুল হারামে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ। এরপরই লোকজন এদিক-ওদিক পালাল, কেউ বা আপন ঘরে, কেউ বা মসজিদুল হারামের দিকে ছুটল আশ্রয় নিতে।[১]

মক্কা প্রবেশ : অবনত মস্তকে, উদ্ধত কিংবা গর্বোন্নত মস্তকে নয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় এভাবে প্রবেশ করেন যে, তাঁর মস্তক আনুগত্য ও অতি বিনয়ে একেবারে ঝুঁকে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর চিবুক বুঝি বা উটনীর কুঁজ ছুঁয়ে ফেলবে! মক্কায় ঢোকার সময় তিনি সূরা ফাতাহ পড়ছিলেন।[২]

বিজয়ীর বেশে মক্কায় ছুঁয়ে ফেলার (যা ছিল আরব উপদ্বীপের হৃৎপিণ্ড বিশেষ এবং এর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র) ন্যায়বিচার ও সাম্য, বিনয় ও আনুগত্যের এমন কোন মানদণ্ড ছিল না যা তিনি অবলম্বন করেন নি। তাঁরই মুক্ত দাস হযরত যায়দ পুত্র উসামা (রা)[৩]-কে এ সময় তিনি তাঁর বাহনে তাঁরই পেছনে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। বনী হাশিম ও কুরাইশ অভিজাতদের ভেতর, যাদের এক বিরাট সংখ্যক সেখানে ছিলেন, আর কারো এই সৌভাগ্য জোটেনি। দিনটি ছিল ২১ রমযান শুক্রবার।

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪০৪ ও যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪২৩।

২. ইবন কাছীর, ৩য় খ., ৫৫৪; সহীহ বুখারীতে মু'আবিয়া ইবন কুররাহ থেকে বর্ণিত, আমি আল্লাহর রসূল (সা)-কে মক্কা বিজয়ের দিন এই অবস্থায় দেখেছিলাম, তিনি তাঁর উটনীর পিঠে ছিলেন আর তরজী সহকারে সূরা ফাত্হ তেলাওয়াত করছিলেন।

৩. ইবন কাছীর, ৩য় খ., ৫৫৬।

মক্কা বিজয়ের দিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, আশ্বস্ত হও, মি কোন বাদশাহ নই। আমি এমন এক কুরায়শ মহিলার সন্তান যিনি গোশতের কনা টুকরো খেতেন।[১]

মা ও দয়ার দিন, রক্তপাতের নয়

আনসারদের আমীর ছিলেন হযরত সা'দ ইবন 'উবাদাহ (রা)। তিনি আবূ য়ান (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন:

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم اذل الله قريشا

"আজ প্রচণ্ড লড়াইয়ের দিন, আজ রক্তপাতের দিন, আজ কাবার সীমানায়ও সব ছু বৈধ হবে। আজ আল্লাহ তা'আলা কুরায়শদেরকে অপমানিত করেছেন।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আপন কোম্পানীসহ আবূ সুফিয়ান (রা)-এর শ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি এ সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন এবং বলেন, হে ল্লাহর রাসূল! আপনি কি শুনেছেন এইমাত্র সা'দ কী বলে গেলেন? তিনি সা'দ কি লছে তা জানতে চাইলে আবূ সুফিয়ান (রা) আবার বললেন। সা'দ (রা)-এর থা তিনি পছন্দ করেননি। তিনি বললেন,

اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا ويعظم الله الكعبة.

"আজ তো দয়া ও ক্ষমা দেখানোর দিন। আজ আল্লাহতা'আলা কুরায়শদেরকে মানিত করবেন এবং কা'বার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"[২]

তিনি হযরত সা'দ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর হাত থেকে ইসলামের তাকা নিয়ে তৎপুত্র কায়স ইবন সা'দ (রা)-কে সোপর্দ করলেন। তিনি এই ধারণা রলেন, ইসলামের পতাকা তৎপুত্র কায়স (রা)-কে দেবার অর্থ এই হবে, যেন তাকা তাঁর হাত থেকে ফেরত নেয়া হয়নি।[৩]

আর এভাবেই একটি হরফের পরিবর্তন (الملحمة-র পরিবর্তে المرحمة বলা) এক হাতকে অপর হাত দ্বারা বদলিয়ে (যার একটি হাত পিতার ও অপর

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী।

২. ইবন উমাবী মাগাযীতে এই বর্ণনার উল্লেখ করেছেন (দ্র. ফাতহুল-বারী, ৮ম খ., ৭; সহীহ বুখারীতে এই টনা কিছুটা শব্দের হেরফেরসহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে সা'দ ইবন উবাদার প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উত্তর লিখিত হয়েছে। উমাবীর পুরো নাম য়াহয়া ইবন সাঈদ ইবন আবান ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়েছে যার জন্য হাদীসের পরিভাষায় صدوق অর্থাৎ সত্যবাদী শব্দ ব্যবহৃত হয়। সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ৫৯৪ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৩. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪২৩।

একটি পুত্রের) তিনি সা'দ ইবন উবাদার (যাঁর ঈমানী ও মুজাহিদসুলভ কৃতিত্ব সূর্যের মত উজ্জ্বল) এতটুকু মনে আঘাত না দিয়ে আবূ সুফিয়ান (রা)-এর (যাঁর অন্তরকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেবার দরকার ছিল) মন জয়ের উপকরণ এত বিজ্ঞোচিত পন্থায় বরং বলা যায়, মুজিযাসুলভ পন্থায় আনজাম দিলেন যার থেকে উত্তম পন্থার কথা কল্পনাও করা যেত না। পিতার বদলে তাঁর পুত্রকে এই পদ দান করলেন যা দিয়ে আবূ সুফিয়ান (রা) আহত অন্তরকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল। অপরদিকে তিনি সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কেও বিষণ্ন ও মনঃক্ষুণ্ন দেখতে চাইছিলেন না যিনি ইসলামের জন্য বিরাট বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

মামুলী সংঘর্ষ

এই সময় সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, ইকরিমা ইবন আবী জাহল, সুহায়ল ইবন 'আমর ও খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কিছুটা সংঘর্ষ হয়। বারো জন কাফির মুশরিক মারা যায়। এরপর তারা পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে যায়। এর কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, মক্কায় ঢোকার সময় কেবল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে যারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।[১]

হারাম শরীফ মূর্তিমুক্ত

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় তাঁর গন্তব্যে পৌছতেই লোকেরা নিশ্চিত হলো। এ সময় তিনি বাইরে এলেন, বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাহর চারদিক তাওয়াফ করলেন। এ সময় তাঁর হস্ত মুবারকে একটি ধনুক ছিল। কা'বা শরীফে তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিল। তিনি ধনুকের সাহায্যে মূর্তিগুলোর দিকে খোঁচা দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

"সত্য সমাগত, মিথ্যা দূরীভূত আর নিশ্চিতই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"

[সূরা ইসরা : ৮১ আয়াত]

তিনি একথা বলছিলেন আর একটি একটি করে মূর্তিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ছিল।[২]

কা'বা শরীফের দেওয়াল গাত্রে তিনি বেশ কিছু ছবি টাঙানো দেখতে পান। তাঁর হুকুমে সেগুলো নামিয়ে ফেলা হয় এবং ছিন্নভিন্ন করা হয়।[৩]

১. প্রাগুক্ত, ৪০৭-৮।

২. যাদুল-মা'আদ, ১ম খ., ৪২৪, আরও দেখুন বুখারী।

৩. প্রাগুক্ত, ৪২৫ পৃ. ও বুখারী।

আজ উত্তম ব্যবহার দেখানোর দিন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাওয়াফ শেষ হতেই কা'বা শরীফে কুঞ্জিরক্ষক হযরত উছমান ইবন তালহা (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তাঁর কাছ থেকে চাবি নিলেন। দরজা খোলা হলো এবং তিনি কা'বার ভেতরে প্রবেশ করলেন। মদীনায় হিজরতের আগে একবার তিনি চাবি চাইলে তাঁকে রূঢ় ভাষায় উত্তর দেয়া হয় এবং তাঁকে অসম্মানজনক কথা বলা হয়। তিনি সেদিন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব মনোভাব দেখিয়ে বলেছিলেন, উছমান! এই চাবি তুমি কোন একদিন আমার হাতে দেখতে পাবে। সেদিন আমি যাকে ইচ্ছা তাকে এই চাবি দেব। এর উত্তরে তিনি (উছমান ইবন তালহা) বলেছিলেন, যদি এমনটিই হয় তবে সেই দিনটি হবে কুরায়শদের জন্য বড়ই অবমাননাকর ও ধ্বংসের। এতে আঁ-হযরত ﷺ বলেন : না, সেদিন হবে প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের। সেদিনের এই কথা 'উছমান ইবন তালহার অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল এবং তিনি অনুভব করেন, যেমনটি তিনি বললেন তেমনটি হবে।

মহানবী ﷺ যখন কা'বা শরীফ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর পবিত্র হাতে ছিল চাবি। তাঁকে দেখতেই হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, আল্লাহ আপনার ওপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন! আপনি হাজীদের পানি পান করাবার ব্যবস্থা (সিকায়া)-এর সাথে আল্লাহর ঘরের দ্বাররক্ষণ (হিজাবা)-র দায়িত্বও আমাকে দান করুন। তিনি উছমান ইবন তালহা কোথায় তা জানতে চাইলেন। তাঁকে ডেকে আনা হলে তিনি বললেন, 'উছমান! এই নাও তোমার চাবি। আজ উত্তম ব্যবহার ও বিশ্বস্ততা দেখানোর দিন। এই নাও চাবি। এ চাবি এখন থেকে তোমার কাছেই থাকবে আর একমাত্র জালিম ছাড়া অন্য কেউ এ চাবি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে না।[১]

তাওহীদে হক ও মানবীয় ঐক্যের ধর্ম

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কা'বার ভেতর থেকে বের হওয়ার জন্য দরজা খুললেন তখন কুরায়শরা গোটা হারাম শরীফে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তিনি কী করেন তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তিনি দরজার দুই বাযু ধরলেন। আর সব লোকেরা তাঁর নীচে ছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده نصر عبده وهز

الاحزاب وحده الا كل ماثرة ومال ودم فهو تحت قدمى هاتين الا

سدانة البيت وسقاية الحجاج يامعشر قريش ان الله ف

---

১. যাদুল-মা'আদ, ১ম খ., ৪২৫, তাবাকাত ইবন সা'দ-এর বরাতে।

اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم من تراب .

"এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং যূথবদ্ধ দলসমূহকে একাই পরাজিত করেছেন। মনে রেখ, সর্বপ্রকার গর্ব, প্রতিহিংসা ও রক্তপণ আমার দুই পদতলে। কেবল কা'বার অভিভাবকত্ব ও হাজীদের পানি পানের বিষয় এর ব্যতিক্রম। ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! জাহিলী যুগের গর্ব ও বংশ গৌরব আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"[1]

এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

[সূরা হুজুরাত : ১৩ আয়াত]

দয়াল নবী, করুণার ছবি

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

"কুরায়শগণ! তোমরা কী আশা করছ, এক্ষণে আমি তোমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করব? তারা জওয়াব দিল : আমরা তোমার নিকট উত্তম ব্যবহার পাবার আশা করি। তুমি হৃদয়বান ও শরীফ ভাই এবং হৃদয়বান ও শরীফ ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে তাই বলছি যা য়ূসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন :

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ .

---

১. যাদু'ল মা'আদ, ১ম খ., ৪২৪।

"তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আর আমার কোন অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা মুক্ত।"[১]

তারপর তিনি কা'বার ওপর উঠে বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। কুরায়শ নেতৃবর্গ ও তাদের অভিজাতবৃন্দ এই ঘোষণা শুনল এবং তামাম মক্কা উপত্যকা আযানের শব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু হানী বিনতে আবী তালিবের গৃহে তশরীফ নিলেন, সেখানেই গোসল করলেন এবং আট রাকাত সালাতুল ফাতহ (বিজয়ের নামায) আদায় করেন।[২]

শরঈ 'হদ' জারীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে বিবেচনার সুযোগ নেই

বনী মাখযুমের ফাতিমা নাম্নী এক মহিলা এই সময় চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। তার গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় ও একান্ত স্নেহভাজন, এই বিশ্বাসে হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর নিকট আসে এবং তাঁকে দিয়ে সুপারিশ করাতে চায়। বিষয়টি তিনি রাসূল আকরাম ﷺ-এর খেদমতে পেশ করতেই তাঁর চেহারা মুবারকের পরিবর্তন ঘটে। তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন হদ্দ সম্পর্কে কথা বলছ? উসামা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যার সময় তিনি সর্বস্তরের লোকদেরকে সম্বোধন করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানা বর্ণনা করলেন যা তাঁর মার্যাদার উপযুক্ত। অতঃপর তিনি বললেন,

"তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন তাদের শরীফ ও মর্যাদাবান লোকেরা চুরি করত তখন তাদেরকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল ও কমযোর লোকেরা চুরি করলে তার ওপর শাস্তির বিধান কার্যকর করত। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! যদি মুহাম্মদ কন্য ফাতিমাও চুরি করত তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম।"

এরপর তিনি মহিলার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পালিত হলো। মহিলা এই বদ আমল থেকে তওবা করল। তার অবস্থা শুধরে গেল। মহিলার পরে বিয়েও হয়েছিল।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. বুখারী ও যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪২৫।

৩. বুখারী ও মুসলিম।

শত্রুর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার

বিজয় সম্পূর্ণ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকেই নিরাপত্তা দান করলেন, দিলেন অভয়। কেবল নয়জন সম্পর্কে হত্যার নির্দেশ জারী করা হয়, এমন কি কা'বার পর্দার আড়ালে আশ্রয় নিলেও তাদের ক্ষমা করা হবে না, বরং হত্যা করা হবে ঘোষিত হলো। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এমন লোকও ছিল যে ধোঁকা দিয়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করেছিল। এমন লোক ছিল আল্লাহর রাসূলের কুৎসা রটনাই যার পেশায় পরিণত হয়েছিল। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবী সারাহও ছিল যে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। 'ইকরিমা ইবন আবী জাহল ছিল যে ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয়ে ঘৃণাবশে ও জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে য়ামানে পালিয়েছিল। তার পলায়নের পর তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে তার নিরাপত্তা কামনা করল। যদিও তিনি জানতেন, সে তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুর পুত্র, তারপরও তিনি তাকে নিরাপত্তা দিলেন, দিলেন অভয়। এরপর ইকরিমার আগমনে তিনি খুশী হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এভাবে ছুটে গিয়েছিলেন যে, কাঁধের চাদর গড়িয়ে পড়েছিল! ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি আরও খুশী হন। মুসলমানদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট আসন লাভ করেন। রিদ্দার যুদ্ধগুলোতে ও সিরিয়ার বিভিন্ন অভিযানে তিনি শানদার খেদমত দেন।

এদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তম চাচা সায়্যিদুন হামযা (রা)-এর হন্তা (জুবায়র ইবন মুত'ইম-এর গোলাম) ওয়াহ্শীও ছিল যার রক্তপাতকে আল্লাহর রাসূল বৈধ করে দিয়েছিলেন। সেও ইসলাম কবুল করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ইসলাম গ্রহণও মেনে নিয়েছিলেন।

এদের ভেতর হাব্বর ইবনুল-আসওয়াদও ছিল যে নরাধম রাসূল-কন্যা হযরত যয়নব (রা)-এর পার্শ্বদেশে নেযার আঘাত হেনেছিল। আঘাতের ফলে তিনি উটের পিঠ থেকে একটি পাথরের ওপর পড়েন এবং তাঁর গর্ভপাত ঘটে। এরপর সে পালিয়ে যায়। পরে সেও ইসলাম কবুল করে। সারা নাম্নী এক নারী ও অপর এক গায়িকা [যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক গান গাইত] সম্পর্কে নিরাপত্তা চাওয়া হয়। তিনি তাদের উভয়কেই নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং উভয়ই ইসলাম কবুল করে।[১]

ওৎবা-কন্যা হিন্দ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথোপকথন

মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশে সকলে এক সমাবেশে মিলিত হয়। তিনি তাদের বায়'আত করবার জন্য সাফা পাহাড়ের ওপর

১. যাদুল-মা'আদ, ১ম খ., ৪২৫।

ওঠেন এবং সেখানে বসে সাধ্যমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ শ্রবণ ও অনুসরণের ওপর তাদের থেকে বায়আত নেন।

পুরুষদের থেকে বায়আত গ্রহণ শেষে তিনি মহিলাদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন। এসব মহিলার মধ্যে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবাও ছিলেন। তিনি মুখে নেকাব দিয়ে এসেছিলেন। সায়্যিদুনা হামযা (রা)-এর শহীদী লাশের সঙ্গে যা করেছিলেন, তদ্দরুন নিজেকে তিনি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এই কথার ওপর আমার নিকট বায়আত কর, আল্লাহর সঙ্গে তুমি কাউকে শরীক করবে না। হিন্দ বলল, আল্লাহ কসম! আপনি আমাদের থেকে সেই স্বীকৃতি নিচ্ছেন যা আপনি পুরুষদের থেকে নেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আর চুরি করবে না। হিন্দ পুনরায় বলল, আমি আবূ সুফিয়ানের সম্পদ থেকে অল্প বিস্তর নিয়েছি। জানি না এটা করা বৈধ হয়েছে না কি অবৈধ। শুনে সেখানে উপস্থিত আবূ সুফিয়ান (রা)-কে বললেন, অতীতে যা কিছু হয়েছে তা থেকে তুমি মুক্ত। যা তুমি নিয়েছ তা তোমার জন্য বৈধ। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা! তাহলে তুমিই ওৎবা-কন্যা হিন্দ? হিন্দ বললেন, হ্যাঁ, আমিই হিন্দ! বিগত দিনগুলোতে আপনার সঙ্গে যত কিছু অন্যায় হয়েছে, যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে সেসব মার্জনা করুন। আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি বললেন, আর ব্যভিচার করবে না। হিন্দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন শরীফ মহিলা কি ব্যভিচার করতে পারে?[১]

এরপর তিনি বললেন, আপন সন্তানদের হত্যা করবে না। এই কথা শুনে হিন্দ বললেন, যতদিন তারা শিশু ছিল ততদিন আমরা তাদেরকে লালন-পালন করেছি। যখন তারা বড় হলো তখন আপনি তাদেরকে হত্যা করলেন। এখন আপনি জানেন আর তারা জানে।

ইরশাদ হলো, প্রকাশ্যে অপবাদ দেবে না কাউকে। হিন্দ বললেন, আল্লাহর কসম! অপবাদ আরোপ খুবই দূষণীয় ও নিকৃষ্ট ব্যাপার। কোন কোন সময় দেখেও না দেখার ভান করা, এড়িয়ে যাওয়া ও ক্ষমা করাই উত্তম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমার অবাধ্য হবে না, আমাকে অমান্য করবে না। তিনি বললেন, হাঁা, ভাল কথা (এটি প্রযোজ্য)।[২]

জীবনে-মরণে তোমাদেরই সাথে আমি

আল্লাহ তা'আলা যখন মক্কার দরজা তাঁর রাসূলের জন্য খুলে দিলেন, যে মক্কা ছিল তাঁর জন্মস্থান ও মূল আবাসভূমি, তখন আনসাররা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন, আল্লাহর রাসূলের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের স্বদেশ ও স্বভূমিকে

১. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খ., ৬০৩।

২. প্রাগুক্ত, ৬০২-৩ পৃ.; অন্যান্য উৎসে কিছুটা বেশি আছে।

বিজয়ের ফসল হিসাবে দান করেছেন। এখন কি আর তিনি মদীনায় ফির
এখন তিনি এখানেই থাকবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের এই পারস্পরিক কানাকানির কথা জানতে পে
তাদেরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা নিজেরা কী বল
করছিলে? অথচ একথা তারা ছাড়া আর কারও জানবার কথা ছিল না। এ
আল্লাহর রাসূল ব্যাপারটা জেনে গেছেন দেখে তাঁরা খুবই লজ্জিত হলেন এ
শেষে স্বীকার করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বললেন, আল্লাহর পানাহ চা
এটা কী করে হতে পারে (আমি তোমাদেরকে ত্যাগ করব)? যত দিন বাঁ
তোমাদের মাঝেই বাঁচব আর মরলে তোমাদের মাঝেই মরব।[১]

শত্রুর চক্ষু নত ও ফাসিক মুত্তাকীতে পরিণত

ফুযালার নিয়াত খারাপ হলো। সে চক্রান্ত আঁটল, যখন আল্লাহ রাসূল তাও
মশগুল হবেন তখন তাঁর কাজ সাঙ্গ করা হবে যা আর কোন হতভাগা পারেনি।
এই ইচ্ছা তাঁর কাছে হতেই তিনি তার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন, ফু
ফুযালা! ডাকে সাড়া দিতেই তিনি তাকে বললেন, তুমি এই মুহূর্তে মনে ম
ভাবছিলে বল দেখি? সে অস্বীকার করল। বলল, কৈ? কিছু না! আমি আল্লা
স্মরণ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে হেসে ফেললেন। এরপর বল
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। অতঃপর আপন মুবারক হাত তার বুকে স্থাপন কর
তার অন্তর সেই মুহূর্তেই প্রশান্তিতে ভরে গেল! ফুযালা বলতেন, তিনি তাঁর
আমার বুক থেকে সরাবার আগেই আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির ভেতর
চেয়ে প্রিয় আমার নিকট আর কেউ ছিল না।

ফুযলা বলেন, এরপর আমি আমার ঘরের দিকে চললাম। পথিমধ্যে প
এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা। সে একান্তে আমার সঙ্গে কিছু কথা বল
সময় কাটাতে চাইল। কিন্তু ফুযালার উত্তর ছিল, না, তা আর হয় না। আ
ইসলাম এক্ষণে আর আমাকে এর অনুমতি দেয় না।[২]

জাহিলিয়াত ও মূর্তি পূজার নিদর্শনগুলো নির্মূল

কা'বার চারদিকে যতগুলো মূর্তি ছিল সেগুলো ধ্বংস করবার জন্য ক্ষুদ্র
বাহিনী পাঠানো হলো এবং সব মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করা হলো। এসব মূ
মধ্যে 'লাত ও 'উয্যা-র মূর্তি যেমন ছিল, তেমনি ছিল 'মানাত'-এর মূ
এরপর তাঁর ঘোষক মক্কায় ঘোষণা দিলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দি

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪১৬।

২. প্রাগুক্ত ৪১৭ পৃ. ও যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪২৬।

ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে সে যেন তার ঘরের প্রতিটি মূর্তিকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্য থেকে কয়েকজনকে বিভিন্ন কবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে মূর্তি ভাঙার এই পবিত্র দায়িত্ব আনজাম দেন।

জারীর (রা) বর্ণনা করেন, জাহিলী যুগে 'যু'ল-খালসা" নামক একটি মূর্তিঘর ছিল। তেমনি "আল-কা'বাতু'ল-য়ামানিয়্যা :" ও "আল-কাবাতুশ শামিয়্যা :" নামক পূজামণ্ডপও ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি "যু'ল-খালসা :" ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমাকে আরাম দেবে না? জারীর (রা) বললেন, আমি আহমাসের খ্যাতনামা দু'শ' অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে সেখানে গেলাম এবং মূর্তিটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলাম। এছাড়া যত লোক সে সময় উক্ত মূর্তির পাশে উপস্থিত ছিল তাদেরকেও মরণ সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দিলাম। এরপর ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সব খবর শোনালাম। তিনি আমাদের জন্য ও আহমাসের জন্য দু'আ করলেন।[১]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় দাঁড়িয়ে এর সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্যই জায়েয হবে না এর সীমারেখার ভেতর রক্তপাত করা কিংবা এখানকার কোন বৃক্ষ কাটা।" তিনি এও বললেন, "আমার পূর্বেও কারো পক্ষে এখানে এসব করা জায়েয ছিল না, আর আমার পরও কারো জন্য কখনো তা জায়েয হবে না।" এরপর তিনি মদীনায় তশরীফ নিলেন।[২]

মক্কা বিজয়ের প্রভাব

মক্কা বিজয় আরবদের অন্তরে মানসের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তর ও মনকে ইসলাম কবুলের জন্য খুলে দেন। ফলে তারা দলে দলে এসে অধিক হারে ইসলাম কবুল করতে শুরু করে। এমন কিছু কবিলা ছিল যারা কুরায়শদের সঙ্গে কোন না কোন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। আর চুক্তির এই দায়বদ্ধতা তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। কিছু কবিলা কুরায়শদেরকে ভয় করত এবং কুরায়শদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আসন তাদের অন্তররাজ্যে আসন গেড়ে ছিল। যখন তারা দেখল, স্বয়ং কুরায়শরাই ইসলামের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে দিয়েছে এবং মস্তক অবনত করেছে তখন তাদের মনেও ইসলাম কবুলের আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং এই বাধা দূর হয়ে গেল।

কোন কোন গোত্র বিশ্বাস করত, মক্কায় কোন জালিম ও জবরদখলকারী প্রবেশ করতে পারে না, পারে না খারাপ নিয়তে একে জয় করতে। তাদের ভেতর এমন

---

১. সহীহ বুখারী, যুল-খালসা যুদ্ধ।

২. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪২৫-২৬।

কোন লোকও বর্তমান ছিল যাদের সামনে হস্তিবাহিনী ধ্বংসের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং তারা স্বচক্ষেই দেখেছিল, আবরাহার পরিণতি কী হলো! তারা বলত, আরে যেতে দাও! তাঁর কওমের পেছনে দৌড়াবার প্রয়োজন নেই। যদি তিনি এই সংগ্রামে জিতে যান তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, তিনি সত্য নবী।[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর নবীর হাতে মক্কা বিজয় করালেন এবং কুরায়শরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, ইসলামের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো তখন আরবরা ইসলামের দিকে ব্যাপক হারে এমনভাবে ঝুঁকতে শুরু করল যে, এর পূর্বে এর কোন নজীর মেলে না। তাদের বড় বড় দল ও গোত্র তাঁর কাছে উপস্থিত হলো এবং আপন মৃত ভাগ্যকে জীবিত করল। এই মওকাতেই আল্লাহ তাআলা কুরাআন মজীদে ইরশাদ ফরমান,

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ . وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا .

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে উপস্তিত হলো এবং তুমি দেখতে পেলে, লোকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে।"[২] [সূরা নাসর : ১-২]

কম বয়স্ক আমীর

মক্কা থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে আল্লাহর রাসূল ﷺ আত্তাব ইবন উসায়দ (রা)-কে মক্কার বিভিন্ন বিষয় ও হজ্জ ব্যবস্থাপনা আনজাম দেবার জন্য আমীর নিযুক্ত করেন।[৩] তাঁর বয়স ছিল সে সময় বিশ বছরের কাছাকাছি, অথচ সে সময় তাঁর চেয়ে অধিক বয়সী, সম্মানী ও মর্যাদার অধিকারী লোক মক্কায় বর্তমান ছিলেন। থেকে প্রমাণিত হলো, দায়িত্ব ও পদ যোগ্যতা, দক্ষতা ও শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তিতে পাওয়া যায়। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফত আমলেও তাঁকে আপন পদে বহাল রাখেন।[৪]

---

১. সহীহ বুখারী, আমর ইবন সালমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত।

২. কাযী মাওলানা মুহাম্মদ সুলায়মান মনসুরপূরী (র)-কৃত "রহমাতুললিল-আলামীন" থেকে গৃহীত

৩. ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৪০।

৪. আল-ইসাবা ও উসদুল-গাবা।

হুনায়ন যুদ্ধ

(শাওয়াল ৮ হিজরী)

ইসলামের উজ্জ্বল প্রদীপকে ফুৎকারে নিভিয়ে দেবার অপচেষ্টা

মক্কা বিজয় সম্পূর্ণ হলো। লোকেরা দলে দলে ব্যাপক হারে ও বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এমনি সময় আশেপাশের লোকেরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের তূণীরের শেষ তীরটিও নিক্ষেপ করল। মূলত এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুকাবিলায় ও আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিস্তার তথা প্রচার-প্রসার রোধের একটি হতাশ চেষ্টা মাত্র।

হাওয়াযিন গোত্রের সমাবেশ

হাওয়াযিন গোত্রকে কুরায়শদের পর দ্বিতীয় শক্তি হিসাবে গণ্য করা হতো। তাদের ও কুরায়শদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল আগে থেকেই। কুরাশয়রা যখন ইসলামের এই উঠতি শক্তির সামনে অস্ত্র সমর্পণ করল এবং নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিল তখন হাওয়াযিন গোত্র আত্মসমর্পণে বেঁকে বসল, ইসলামকে জড়েমূলে উৎখাত করতে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসল এবং একে তারা প্রেরণা ও আবেগের উৎস হিসাবে গ্রহণ করল। তারা ভাবল, এতে তাদের খ্যাতি সারা আরবে ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকে বলবে, বাপের বেটা বটে হাওয়াজিন! যে কাজ কুরাশয়রা করতে পারেনি তা তারা করে দেখাল।

কবিলার সর্দার মালিক ইবন 'আওফ আন-নাসরী যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ ঘোষিত হতেই তার নিজেরই হাওয়াযিন গোত্রের সঙ্গে গোটা ছাকীফ গোত্র, নাসর ও জুশাম কবিলা ও সাদ ইবন বকর তার ডাকে সাড়া দেয়। অবশ্য কা'ব ও কিলাব গোত্র তার ডাকে সাড়া দেয়নি। সবাই মিলে কাতারবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের পানে অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি করে এবং ধন-সম্পদ, নারী ও শিশুদেরকে সেনাবাহিনীর সঙ্গেই রেখে দেয় যাতে তারা তাদের পরিবার-পরিজনের সম্মান ও ধন-সম্পদের হেফাজতের আশায় সাহসিকতার সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করে এবং কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার কথা চিন্তাও না করে।

এই যুদ্ধে দুরায়দ ইবন আস-সাম্মাহও শরীক ছিলেন। দুরায়দ ছিলেন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তার

মতামতকে নির্ভুল মনে করা হতো। তাদের এই বাহিনী আওতাস[১] নামক উপত্যকায় থানা গাড়ে। তাদের উটের ডাক, গাধা ও খচ্চরের চিৎকার, বকরীর ম্যা-ম্যাঁ ও শিশুদের কান্নাকাটি বাহিনীর ভেতর এক হৈ চৈপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল। মালিক ইবন 'আওফ তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, মুসলমানদেরকে দেখা মাত্রই খাপ ভেঙে খোলো তলোয়ার হাতে একযোগে পূর্ণ শক্তিতে হামলা করবে।[২]

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন মক্কার দু'হাজার মুসলমান যাঁদের অধিকাংশই মাত্র কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিছু লোক এমনও ছিল যদের তখনও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। এছাড়া সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ১০ হাজার ফৌজও তাঁর সঙ্গে ছিল যাঁরা মদীনা থেকে তাঁর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ইতোপূর্বে সংঘটিত যে কোন যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ফলে কিছু কিছু মুসলমান (নিজেদের এই অভূতপূর্ব বিপুল সংখ্যা শক্তিতে বিভ্রান্ত ও গর্বিত হয়ে) বলতে লাগলেন, আজ আর আমরা সংখ্যায় কম নই। আমাদের হারবার কোন আশংকা নেই। বিজয় তো আমাদের হাতের মুঠোয়![৩]

এ সময় তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান ইবন উমায়্যার নিকট থেকে, যে তখন পর্যন্ত কাফির ছিল, কিন্তু লৌহবর্মসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ধার নেন এবং হাওয়াযিন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশে রওয়ানা হন।

মূর্তি পূজা আর কখনো নয়

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এমন কিছু লোকও এই বাহিনীতে ছিলেন যাঁরা জাহিলী জীবন পরিত্যাগ করে সদ্যই ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। ঘটনা হলো, আরবের কিছু কিছু গোত্রের যাত আনওয়াত নামক একটি বিরাট ও সবুজ শ্যামল বৃক্ষের ভক্তিযুক্ত সম্পর্ক ছিল। এতে তারা তাদের হাতিয়ার টাঙিয়ে রাখত, এর নীচে তারা পশু বলি দিত এবং একদিন এর ছায়ায় অবস্থান করত। সফরকালে এই বৃক্ষের প্রতি নজর পড়তেই জাহিলী যুগের সেই সব প্রাচীন রসম-রেওয়াজ ও কথাবার্তা মনে করে এবং তাদের যিয়ারাতগাহ দেখে তাদের পুরনো আবেগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তারা অসংকোচে খোলাখুলি বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওদের যেমন "যাত আনওয়াত" ছিল, তেমনি আমাদেরকেও একটি ভক্তিঅর্ঘ্য পেশের কেন্দ্র নির্ধারণ করে দিন। রাসূলাল্লাহ ﷺ একথা শুনে বললেন, আল্লাহু আকবার! তাঁর কসম যাঁর কব্জায় মুহাম্মদের জীবন! তোমরা আমার নিকট

---

১. হাওয়াযিন গোত্রের এলাকায় তায়েফের কাছাকাছি একটি স্থান।

২. তাফসীর তাবারী, ১ খ., ৬২-৬৩।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৪০।

এমন এক জিনিসের দাবি জানিয়েছ যেমনটি মূসা (আ)-এর কওম ইয়াহূদীরা তাদের নবী মূসা (আ)-এর কাছে জানিয়েছিল। তারা বলেছিল, اجْعَلْ لَّنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ "আপনি আমাদের জন্য একজন উপাস্য (দেবতা) বানিয়ে দিন যেমন তাদের বহু উপাস্য দেবতা রয়েছে।" (জওয়াবে) তিনি বলেন, "আরে! তোমরা দেখছি মূর্খের মত কথা বলনেওয়ালা সম্প্রদায়" (সূরা আরাফ : ১৩৮ আয়াত)। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পূর্বের সম্প্রদায়সমূহের এক একটি কথা ও তরীকার অনুসরণ করবে।[১]

হুনায়ন উপত্যকায়

শাওয়াল মাসের ১০ তারিখে (৮ম হি.) মুসলমানরা হুনায়ন উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা ভোরের অস্পষ্ট কুয়াশার ভেতর উৎরাইয়ের দিকে নামতে শুরু করলেন। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাঁদের আগেভাগেই উক্ত উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং এর ঘাঁটি, সংকীর্ণ গিরিপথ ও অপ্রশস্ত খাদে ঘাত ও মোর্চা বানিয়ে নিয়েছিল। মুসলমানদের চোখে দেখা মাত্রই তারা তাদেরকে তীরের লক্ষ্যে পরিণত করল এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করল। অতঃপর তারা এক যোগে পূর্ণ শক্তিতে মুসলমানদের ওপর হামলা করল। তারা ছিল শিক্ষিত তীরন্দায।[২]

অধিকাংশ মুসলমানই এই হঠাৎ হামলায় ঘাবড়ে গিয়ে এমনভাবে পেছনে ফিরলেন যে, কেউ কারো দিকে একবার তাকিয়েও দেখেনি কে কোথায়।[৩] বিপজ্জনক ও চূড়ান্ত একটি মুহূর্ত! আশংকা হচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্র বুঝি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তা বুঝি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায়! এরপর তা সামাল দেয়া এবং নিজেদের কেন্দ্র কায়েম রাখারও অবকাশ না থাকে। এখানে যা কিছু হচ্ছিল তার উহুদ যুদ্ধের সঙ্গে মিল ছিল অনেকটাই, যখন খবর রটে গিয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং তখন মুসলমানদের পদস্খলন ঘটেছিল।

শত্রুদের আনন্দোল্লাস আর দুর্বল ঈমানদারদের পদস্খলন

মক্কার দাম্ভিক লোকেরা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এই অভিযানে বের হয়েছিল, যাদের অন্তরের গহীনতম প্রদেশে ঈমান তখনও পুরোপুরি প্রবেশ করেনি, পরাজয়ের এই দৃশ্য দেখে নানা রকম কথার তুবড়ি ছোটাল। তাদের অন্তরের ভেতরে লুক্কায়িত এত দিনের ঈর্ষা ও দ্বেষ সেই মুহূর্তে সব উগরে দিল। তারা বলল পালিয়ে সমুদ্রের তীরে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা থামবে না। কেউ কেউ বলতে লাগল : আজ তাদের সব ইন্দ্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে![৪]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৪২। সিহাহ গ্রন্থেও এর বর্ণনা আছে।

২. ইবন হিশাম, ৪৪২-৪৩।

৩. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪৪৬।

৪. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৪২-৪৪ সংক্ষেপে।

বিজয় ও প্রশান্তি

মুসলমানদের যতখানি শিক্ষা দেবার ও সতর্ক করার দরকার ছিল, আল্লাহ তাআলা যতটুকু চেয়েছিলেন তা হয়ে গেল। বেশি সংখ্যক হওয়ায় তাদেরকে যতটা উৎফুল্ল করেছিল, আত্মপ্রসাদে উজ্জীবিত করেছিল, আল্লাহ তা'আলা (মক্কা) বিজয়ের মিষ্টতা উপভোগের পর পুনরায় পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ চাখালেন যাতে তাদের ঈমান অধিকতর মজবুত হয় এবং বিজয়ের দরুন তাদের ভেতর কোনরূপ গৌরব করা ও পরাজয়ের দরুন কোনরূপ হতাশার সৃষ্টি না হয়। সেজন্য তিনি তাদেরকে পুনরায় আক্রমণাত্মক ভূমিকায় পৌঁছে দিলেন এবং আপন রাসূল ও সকল মুসলমানের ওপর এক ধরনের প্রশান্তি (সাকীনা) নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সাদা রঙের একটি খচ্চরের ওপর নির্ভীক ও নিঃশংক চিত্তে বসে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মুহাজির, আনসার ও আহলে বায়তের খুব কম লোকই তখন ছিলেন। 'আব্বাস (রা) ইবন আবদিল-মুত্তালিব (রা) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন[১] আর তিনি বলে চলেছিলেন,

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب .

"আমি নবী, মিথ্যা নয় তা; আমি 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।"

এ অবস্থায় মুশরিকদের একটি দল তাঁর মুখোমুখি এসে উপস্থিত হতেই তিনি এক মুঠো মাটি নিয়ে তাদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেন যা তাদের সকলের চোখমুখ ভরে দিল।

তিনি দেখতে পেলেন সকলেই আপন আপন চিন্তায় ব্যস্ত। তখন তিনি পিতৃব্য আব্বাস (রা)-কে এই বলে চিৎকার দিয়ে ডাকতে বললেন, يامعشر الانصار ياصحاب الشجر "হে আনসারেরা! ওহে বাবুল বৃক্ষের সাথী-সাথীবৃন্দ!"[২] তাঁরা এই ঘোষণা শুনতেই লাব্বায়েক! লাব্বায়েক! আমরা হাজির আছি, আমরা হাজির! বলে পলায়নরত মুসলমানরা ফিরে দাঁড়াল। হযরত আব্বাস (রা) খুবই দরাজ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আওয়াজ কারো কানে গিয়ে পৌঁছতেই তিনি উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তেন এবং তলোয়ার ও ঢাল হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে ছুটে আসতেন। এভাবে একটি বিরাট জামা'আত সৃষ্টি হতেই তারা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন বাহিনীসহ একটি টিলায় উঠলেন এবং চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন

---

১. সহীহ বুখারী اذ اعجبتكم كثرتكم। এই বর্ণনায় এও আছে, আবূ সুফিয়ান ইবনুল-হারিছ (রা) তাঁর সাদা খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। এই বর্ণনা সহীহ মুসলিম শরীফে হুনায়ন যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে।

২. এ দ্বারা সেই বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে, বৃক্ষের নীচে হুদায়বিয়াতে "বায়'আতে রিদওয়ান" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আরবীতে বাবলা গাছকে سمرة বলা হয়। এজন্য তাদেরকে আসহাবুস-সামরা বলা হয়েছে।

উভয় পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত। এটা দেখে তিনি বললেন, এখন চুলা গরম হয়ে গেছে।[১] এরপর তিনি কিছু পাথরকণা হাতে নিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। হযরত আব্বাস (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি দেখতে লাগলাম শত্রুর আক্রমণ শক্তিতে ক্রমেই ভাটা পড়ছে এবং তাদের পিছু হটতে দেখা যাচ্ছে।[২]

উভয় পক্ষই প্রাণপণ শক্তিতে লড়াই করে। তখনও লোকে পরাজিত হয়ে পুরোপুরি ফিরেও আসেনি এমনি মুহূর্তে দেখা যেতে লাগল কাফিরদের বন্দীরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে হাজির।[৩] আল্লাহতাআলা বিজয় ও সাহায্যকারী ফেরেশতা নাযিল করেন এবং গোটা উপত্যকা তাঁদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর এভাবেই হাওয়াযিনদের পরাজয় সম্পন্ন হয়।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۔ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۔

"আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে আনন্দিত করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল এবং পরে তোমরা পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী নামান যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল।" [সূরা তওবা : ২৫-২৬ আয়াত]

ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে শেষ যুদ্ধ

আরবদের বুকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল হুনায়ন যুদ্ধের পর তা স্তিমিত হয়ে যায় এজন্য যে, এই যুদ্ধ তাদের অবশিষ্ট

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৪৫ حمى الوطيس চুলা গরম হয়ে গেছে আরবী এই বাগধারা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-ই ব্যবহার করেন এই সময়।

২. সহীহ মুসলিম; ৪, সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৪৫।

৩. প্রাগুক্ত, ৪৪৯ পৃ. সহীহ মুসলিম কিতাবুল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার শিরোনামে হুনায়ন যুদ্ধ অধ্যায়ে এই ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে।

শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে দেয় এবং তাদের তূণীরের সমস্ত তীরই অকেজো করে দেয়। তাদের জনসমষ্টি অপমানিত ও হতবল হয়ে যায় এবং তাদের অন্তর-মানস ইসলাম গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।

আওতাস উপত্যকায়

হাওয়াযিন গোত্র পরাজিত হওয়ার পর তাদেরই একটি দল, যার মধ্যে গোত্রের সর্দার মালিক ইবন আওফ ছিল, তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দেয়। আরেকটি দল আওতাস নামক উপত্যকায় ছাউনি ফেলে। তাদেরকে অনুসরণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ 'আমের আল-আশ'আরী (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযান পাঠান। তাঁরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন।[১] হুনায়ন-এর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, গোলাম-বাঁদী প্রভৃতি এই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে পৌঁছলে তিনি এসব 'জিরানা'[২] নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন এবং তাদেরকে সেখানেই নিরাপদ ও প্রহরাধীনে রাখা হয়।[৩]

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে গোলাম-বাঁদীর সংখ্যা ছিল ছয় হাজার, উট ২৪,০০০ ও বকরি ৪০,০০০-এর বেশি। আরও চার হাজার আওকিয়া রৌপ্য ছিল। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভেতর এই পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়ন যুদ্ধে আপন সাহাবায়ে কিরাম ও জিহাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে এই নির্দেশ দেন, কোন নারী-পুরুষ-শিশু কিংবা গোলাম যারা কাজের উপযুক্ত তাদের ওপর যেন হাত তোলা না হয়! এ সময় তিনি হুনায়ন যুদ্ধে নিহত একজন নারীর জন্য আক্ষেপ করেন।[৪]

---

১. ইবন কাছীর, ৩য় খ., ৪৬০।

২. এটি মক্কা মু'আজ্জমা থেকে উত্তর-পূর্বের রাস্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মনযিল।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৫৯।

৪. সীরাত ইবন কাছির, ৩য় খ., ৬৩৮।

তায়েফ যুদ্ধ
(শাওয়াল ৮ হিজরী)

ছাকীফের অবশিষ্ট বাহিনী

ছাকীফের অবশিষ্ট বাহিনী তায়েফে এল এবং এখানে এসে শহরের দরজা বন্ধ করে দিল। তারা দুর্গের ভেতর এক বছরের খাদ্যশস্য মজুদ করল এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য তায়েফে রওয়ানা হলেন এবং সেখানে শহরের কাছাকাছি এসে ছাউনি ফেললেন। কিন্তু মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করতে পারল না। কেননা শহরের সমস্ত দরজা প্রথম থেকেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ছাকীফের লোকেরা মুসলমানদের ওপর এমন মুষলধারে বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ শুরু করে যে, মনে হচ্ছিল যেন তীর নয়, পতঙ্গের পাল তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে! ছাকীফের লোকদের দক্ষ তীরন্দায হিসাবে পূর্ব থেকেই খ্যাতি ছিল।

তায়েফ অবরোধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব দেখে সেনাবাহিনীকে অন্যদিকে সরিয়ে দিলেন এবং পঁচিশ-তিরিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখলেন। ইতোমধ্যে তাদের সঙ্গে বেশ প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে এবং উভয় পক্ষের মাঝে প্রবল তীর বর্ষণও হয়েছে। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমবারের মত মিনজানীক[১] ব্যবহার করেন। অবরোধ ছিল কঠোর প্রকৃতির। মুসলমানদের কয়েকজন কাফিরদের তীর বর্ষণে শাহাদাত বরণ করেন।[২]

যুদ্ধের ময়দানে দয়া প্রদর্শন

অবরোধ ও যুদ্ধ দীর্ঘ হতে থাকলে আল্লাহর রাসূল ﷺ ছাকীফ গোত্রের আঙুর বাগান কাটবার হুকুম দিলেন। এসব বাগানের আয়ের ওপর তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো। মুসলমানদের এসব বাগান কাটতে দেখে তারা কোন উপায় না দেখে হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ পাঠাল, আল্লাহর ওয়াস্তে ও আত্মীয়তার দিকে তাকিয়ে[৩] বাগানগুলো যেন তিনি না কাটেন! তিনি তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে গাছ কাটা ছেড়ে দিলাম।

---

১. প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৪৭-৮৩, সংক্ষেপে।
৩. সম্ভবত বনী সাদ গোত্রের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানের দুধ পানসহ তিনি শৈশব কাটিয়েছিলেন।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ঘোষণা দিয়ে দিলেন, যেসব ক্রীতদাস দু
থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে তারা মুক্ত ও স্বাধীন। এই ঘোষ
শুনে দশজনের অধিক ক্রীতদাস বাইরে বেরিয়ে আসে যাদের ভেতর আবূ বাকরা
ছিলেন। পরবর্তী কালে আবূ বকরা (রা) একজন বিখ্যাত হাদীছ বর্ণনাকারী
আলিম সাহাবীরূপে পরিচিত হন। তিনি সকলকেই মুক্ত করে দেন এবং এদে
প্রত্যেককে এক একজন মুসলমানের হাতে সোপর্দ করেন এবং এদের খানাপিনা
যিম্মাদারীও তাদের দেন। এই ঘোষণা তাদের খুব মনঃকষ্টের কারণ হয়।[১]

অবরোধের অবসান

আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তায়েফ জয়ের আদেশ দেয়া হয়নি
এজন্য তিনি হযরত ওমর (রা)-কে হুকুম দিলেন, ওমর (রা) যেন ফেরার ঘোষ
দেয়! তিনি ফিরে যাবার ঘোষণা দিতেই লোকে শোরগোল শুরু করে এবং তাকে
জয় না করে ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তারা বলতে থাকে, আমরা তাকে
জয় না করে কিভাবে ফিরে যেতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, আচ্ছা
ঠিক আছে! চলো, আমরা লড়াই করি। তাঁরা লড়াইয়ের সূচনা করলেন এব
পরিণতিতে চরম আঘাত খেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিলেন
আমরা কাল ভোরে ইনশাআল্লাহ ফিরে যাব। মুসলমানরা এই ঘোষণা শুনে খুব
খুশী হন এবং সফরের প্রস্তুতিতে লেগে যান। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই দৃশ্যে
হাসতে লাগলেন।[২]

হুনায়নের গোলাম-বাঁদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে জিরানায় অবস্থান করেন এব
হাওয়াযিন গোত্রকে দশ-বিশ দিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ও তাঁর খেদমতে হাযির
হওয়ার মওকা দেন। এরপর তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করেন এবং
মুওয়াল্লাফাতুল কুলুব (অর্থাৎ সেসব নও মুসলিম যাদের অন্তর-মন জয় ও সান্ত্বনা
দানের জন্য অংশ দেয়া হতো)-এর হক সবার আগে দান করেন। আবূ সুফিয়ান ও
তাঁর দুই পুত্র য়াযীদ ও মু'আবিয়া (রা)-কে তিনি দিল খুলে দান করেন। হাকীম
ইবনুল-হিযাম, নযর ইবনুল-হারিছ, আলা ইবনুল-হারিছা ছাড়াও কুরায়শ নেতৃবর্গকে
অত্যন্ত উদার হাতে ও বিপুল পরিমাণে দান করেন। অতঃপর তিনি সাধারণ যুদ্ধলব্ধ
সমাগ্রী চেয়ে আনেন এবং সমস্ত লোক ডেকে তাদের মধ্যে এসব সামগ্রী বণ্টন
করে দেন।[৩]

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪৫৭ পৃ., ইবনে ইসহাক বর্ণিত।

২. পূর্বোক্ত বরাত; বুখারী ও মুসলিম এই ঘটনা কিছুটা কম বেশিসহ বর্ণিত হয়েছে। হাসার কারণ
এটাই, কাল যখন ফেরার জন্য বলা হলো তখন সকলে ইতস্তত ও অনিচ্ছা প্রকাশ করল। এরপর
যেই থাপ্পর পড়ল তখন খুশী হয়েই প্রস্তুতিতে লেগে গেল। মানব স্বভাবের এই ভোজবাজি
হেসে ফেলেন।

৩. যাদু'ল-যা'আদ, ১ম খ., ৪৪৮, সংক্ষেপে।

আনসারদের ভালবাসা ও তাঁদের আত্মত্যাগ

এসব সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি কুরায়শ সর্দার ও "মুওয়াল্লাফাতুল-কুলুব"-দেরকে বিরাট অংশ দান করেছিলেন এবং আনসারদেরকে দেয়া হয়েছিল খুবই মামুলী পরিমাণ। ফলে কিছু আনসার যুবকের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এবং তারা কানাঘুষা শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টা টের পেতেই তাদেরকে পৃথকভাবে এক জায়গায় জড়ো করলেন এবং তাঁদের সামনে এমন মর্মস্পর্শী ও বলিষ্ঠ ভাষণ দিলেন যে, তাঁদের হৃদয়ে বীণার তারে তা ঝংকার তুলল, চক্ষু হলো অশ্রুসিক্ত এবং ভালবাসা ও আবেগের ধারা তাদের অন্তরে উপচে পড়ল।

তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের কাছে এই অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ছিলে? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করলেন। তোমরা গরীব ও দরিদ্র ছিলে; আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী ও সম্পদশালী বানালেন। তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে; আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদের ভাঙা অন্তরগুলো জোড়া লাগালেন!"

সকলেই জওয়াব দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দয়া ও অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি।" এরপর তাঁরা চুপ করলে তিনি বলেন, "ওহে আনসার! তোমরা কি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে?"

তাঁরা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কথার কি জওয়াব দিতে পারি? সকল অনুগ্রহ ও দয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।"

তিনি বললেন: না, আল্লাহর কসম! যদি তোমরা চাও তবে বলতে পার আর তোমরা যা বলবে তা সত্য হবে এবং আমি সমর্থন করব। তোমরা বল, আপনি তো আমাদের কাছে এসেছিলেন এমন অবস্থায় যখন আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল! সে সময় আমরা আপনাকে সত্য বলে মেনেছি, আপনাকে সমর্থন করেছি। সবাই আপনাকে ত্যাগ করেছিল, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনাকে লোকেরা আশ্রয়হারা করেছিল, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার হাত ছিল খালি, আমরা আপনাকে সমবেদনা জানিয়েছি, আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছি; শোকে-দুঃখে প্রবোধ দিয়েছি।

এরপর তিনি তাঁদের দিকে ফিরে এমন একটি কথা বললেন যার ভেতর গৌরব ও আস্থা যেমন ছিল, তেমনি এই বণ্টন ও বদান্যতার রহস্যও বলে দেয়া হয়েছিল।

তিনি বললেন: ওহে আনসার সম্প্রদায়! দুনিয়ার কয়েক দিনের হাসি-খুশির জন্য যাদের হৃদয়-মনকে শান্ত করবার জন্য তাদেরকে কিছু দিয়েছি যাতে তারা ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ থাকে। তোমাদেরকে ইসলামে তোমাদের গভীর আস্থার

ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন তোমাদের মনে আমার সম্পর্কে নানা কথার উদ্রেক ঘটেছে।

এরপর তিনি এমন এক কথা বললেন যা শুনে তাঁরা নিজেরদেরকে আর সংবরণ করতে পারেননি এবং ঈমানী ভালোবাসার স্রোতধারা তাঁদের মনের গহীনে আপনাআপনি প্রবাহিত হয়ে গেল।

তিনি বললেন: ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা তাদের সঙ্গে ভেড়া-বকরী নিয়ে যাক আর তোমরা তাঁবুতে আল্লাহর রাসূলকে সাথে নিয়ে ফিরে যাও? ওরা ওদরে সাথে যা নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে অনেক উত্তম বস্তু তোমরা নিজেদের সাথে নিয়ে যাবে। যদি হিযরত না থাকত তাহলে আমি আনসারদেরই একজন সদস্য থাকতাম। যদি সমস্ত লোক এক রাস্তায় ও এক উপত্যকার ভেতর দিয়ে পথ চলে আর আনসাররা অন্য উপত্যকায় পথ চলে তাহলে আমি আনসারদের সঙ্গে সেই উপত্যকার পথ ধরেই চলব। আনসাররা আমার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা অঙ্গের অলংকার এবং অন্যান্য লোক চাদরতুল্য বহিরাবরণ। হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের ওপর রহম কর; আনসার সন্তানদের ওপর রহম কর এবং আনসার সন্তানদের সন্তানের ওপর রহম কর।

এ কথা শুনে সকল আনসার কান্নায় ভেঙে পড়ল। চোখের পানিতে তাঁদের দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। তাঁরা বলতে লাগালেন, আল্লাহর রাসূল আমাদের ভাগে আমাদের অংশে পড়েছেন, এতেই আমরা খুশী (আমরা আর কিছু চাই না)।[১]

বন্দীদের ফেরা

হাওয়াযিন গোত্রের ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁর নিকট দয়াপরবশ হয়ে তাদের বন্দীদেরকে ও তাদের মালমাত্তা ফিরিয়ে দেবার জন্য আবেদন জানাল। তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার সঙ্গে কারা কারা রয়েছেন। আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কথা হলো যা সত্য। এখন তোমরা বল, তোমাদের সন্তান-সন্তুতি ও তোমাদের মহিলারা তোমাদের নিকট বেশি প্রিয়, না কি তোমাদের মালমাত্তা ও অপরাপর সামগ্রী?"

উত্তরে তারা জানাল, তাদের সন্তান-সন্ততি ও মহিলারাই তাদের নিকট বেশি প্রিয়। এর সমান তারা অন্য কিছুকে মনে করে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন তাদেরকে বললেন, যাও! কাল ভোরে সালাত আদায়ের পর তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে, আমরা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সুপারিশকারী বানাচ্ছি এবং

১. মূল বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম রয়েছে। যাদু'ল-মাআদ প্রণেতা এই বর্ণনাকে খুবই ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন আর আমরা তাই উদ্ধৃত করে দিয়েছি। দেখুন বুখারী, তায়েফ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে মুসলমানদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে পেশ করছি, আপনি আমাদের গোলাম-বাঁদী ফিরিয়ে দিন। অতঃপর পরদিন তিনি যখন সালাত আদায় থেকে মুক্ত হলেন তখন তারা নির্দেশ মাফিক তাদের আবেদন পেশ করল। তখন তিনি বললেন, আমার অংশ ও বনী আবদুল- মুত্তালিবের অংশে যা কিছু আছে তা তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। আর অন্যদের নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করছি। এবার সুপারিশের দলে মুহাজির ও আনসারগণ বললেন, আমাদের অংশে যা কিছু আছে আমরা আল্লাহর রাসূলের খেদমতে তা পেশ করলাম।

কিন্তু বনী তামীম, বনী ফাযারা ও বনী সুলায়ম-এর তিনজন তাঁদের অংশ ছাড়তে রাজী হলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে বুঝিয়ে বললেন, এই লোকগুলো মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের জন্য অপেক্ষাও করেছি এবং তাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছি। কিন্তু তারা তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের তুলনায় অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয়নি। অতএব, তোমাদের কাছে যদি এমন কোন বন্দী থাকে আর সে যদি খুশী মনে তা দিতে চায় তবে সেজন্য পথ খোলা রয়েছে। আর যদি কেউ তার হক ছাড়তে না চায় তবুও সে তা তাদেরকে দিয়ে দিক। আমি তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এর ছয় গুণ বেশি দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সকলেই বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাতিরে আমরা খুশী মনে হাজির করছি। তিনি বললেন, আমার জানা নেই, তোমাদের মধ্যে কে এতে খুশী আর কে খুশী নও। এখন তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের স্থানীয় নেতারা তোমাদের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে আমাকে জানাবে। মোটের ওপর সকলেই তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে ফিরিয়ে দিল, একজনও এ ব্যাপারে পিছিয়ে রইল না। প্রত্যেক বন্দীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পোশাকও দান করেছিলেন।[১]

কোমল আচরণ ও উদারতা

মুসলমানরা এই অভিযানে যেই বিপুল সংখ্যক গোলাম-বাঁদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর ধাত্রীমাতা হালিমা সা'দিয়ার কন্যা দুধবোন শায়মাও ছিলেন। মুসলমানরা তাঁকে চিনতে পারেনি। এজন্য মুসলমানদের কেউ কেউ তাঁকে নেবার সময় কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করলে তিনি নিজের পরিচয় পেশ করে বলেন, তোমাদের জানা উচিত, আমি তোমাদের সর্দারের দুধ-শরীক বোন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করেনি। তাঁকে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে পৌঁছে দেয়া হয়।

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার দুধবোন। তিনি এর পরিচয়জ্ঞাপক কোন

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪৪৯, বুখারী।

চিহ্ন আছে কি না জানতে চাইলে শায়মা বললেন: হ্যাঁ, আছে। একবার আমি আপনাকে কোলে নিয়েছিলাম। সে সময় আপনি আমার পিঠ কামড়িয়েছিলেন কামড়ের দাগ আজও আমার পিঠে রয়ে গেছে! তিনি দাগ দেখে চিনতে পারলেন তারপর তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন এবং বললেন, যদি তুমি চাও, সম্মান ও প্রীতির সঙ্গে আমার সাথে থাকতে পার। আর চাইলে হাদিয়া তোহফাসহ তুমি যেখানে যেতে চাও পাঠিয়ে দিতে পারি। তোমার গোত্রে ফিরে যেতে চাইলেও যেতে পার। শায়মা বললেন, আপনি আমাকে যা দেবার দিয়ে দিন এবং আমাকে আমার গোত্রের নিকট পৌঁছে দিন। আমি আমার লোকদের সঙ্গেই থাকতে চাই। তিনি তাঁকে প্রচুর উপহারসামগ্রী দান করলেন। শায়মা ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি তাঁকে তিনটি গোলাম, একটি বাঁদী ও কিছু বকরী দান করেছিলেন।[১]

জি'রানা থেকে 'উমরা পালন

হুনায়ন যুদ্ধ থেকে অবসর মিলতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'রানায় পৌঁছে গেলেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের কাজ শেষ করলেন এবং উমরা আদায়ের নিয়াতে ইহরাম বাঁধলেন। এটি ছিল তায়েফবাসীদের মীকাত এবং মক্কা থেকে এক মনযিল দূরে অবস্থিত। উমরা আদায়ের পর তিনি মদীনায় ফিরে এলেন।[২] এ ঘটনা ছিল ৮ হিজরীর যী-কাদা মাসের।[৩]

আপন খুশীতে, আপন ইচ্ছায়

তায়েফ থেকে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে বললেন : বল, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون। অর্থাৎ আমরা সফর থেকে ফিরে আসছি, (গানাহ থেকে) তওবা করছি, (সকল অবস্থায় আল্লাহ পাকের) ইবাদত করছি এবং আল্লাহতাআলা যিনি আমাদের প্রভু, প্রতিপালক, তাঁর প্রশংসা করছি। সাহাবারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ছাকীফ গোত্রের জন্য বদদু'আ করুন তিনি তখন এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ছাকীফকে হেদায়াত দিন এবং তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন।

ওরওয়া ইবন মাসউদ আছ-ছাকাফী আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় পৌঁছুবার পূর্বেই পথিমধ্যে মিলিত হন, ইসলাম কবুল করেন এবং সেখান থেকেই ইসলামের দাওয়াত করার ইচ্ছায় আপন গোত্রে ফিরে যান। তাঁকে তাঁর গোত্রে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হতো এবং তিনি তাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু ইসলামের ঘোষণা দিতেই লোক তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তীরের আঘাতে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

---

১. প্রাগুক্ত।
২. ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫০০।
৩. বুখারী, হুদায়বিয়ার যুদ্ধ।

তাঁর শাহাদাতের পর ছাকীফ গোত্র কয়েক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করে, সমগ্র আরব জাতি ইসলাম কবুল করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। এক্ষণে তাদের গোটা আরবের বিপক্ষে লড়াই করবার মত শক্তি নেই। অতএব, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোই ভাল হবে।

মূর্তি পূজার সঙ্গে আপস সম্ভব নয়

প্রতিনিধি দলটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদের জন্য মসজিদে নববীর এক কোণে একটি তাঁবু স্থাপন করেন। দলটি ইসলাম কবুল করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে দরখাস্ত পেশ করে, তাদের 'লাত' নামক বিশিষ্ট মূর্তিটিকে যেন তিন বছর পর্যন্ত না ভাঙা হয়! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেন। তারা এরপর দু'বছর, অতঃপর এক বছর, অবশেষে এক মাসের সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাদেরকে এক মাস সময় দিতেও অস্বীকার করেন এবং তাদের সঙ্গে হযরত আবূ সুফিয়ান ও মুগীরা ইবন শুবা (রা) [শেষোক্ত সাহাবী ছাকীফ গোত্রেরই লোক ছিলেন]-কে হুকুম দেন যেন তাঁরা দু'জন গিয়ে উক্ত মূর্তিটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেন। এরপর প্রতিনিধি দল তাদেরকে সালাত আদায় থেকে মুক্তি দানের জন্য আবেদন জানায়। তিনি বললেন: যে ধর্মে সালাত নেই তাতে কোন কল্যাণ নেই।

এরপর তারা তাদের মিশন থেকে যখন মুক্ত হলো এবং ঘরে ফেরার উদ্যোগ নিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সঙ্গে আবূ সুফিয়ান ও মুগীরা ইবন শুবা (রা)-কে পাঠিয়ে দেন। মুগীরা (রা) মূর্তি ভাঙার কাজটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেন। এরপর ইসলাম গোটা ছাকীফ গোত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং তায়েফের প্রত্যেক মানুষ ইসলামের মহামূল্য নে'মত লাভে ধন্য হয়।[১]

কা'ব ইবন যুহায়র-এর ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে আসতেই আরবের মশহুর কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমার পুত্র প্রখ্যাত কবি কা'ব ইবন যুহায়র পবিত্র খেদমতে হাজির হন। কবি কা'ব নিন্দাসূচক অনেক কবিতা রচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বহু কষ্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু মক্কার লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে দুনিয়া তার জন্য সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে যায় এবং স্বয়ং তার জীবনের প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। এমন সময় তার মুসলিম ভ্রাতা বুজায়র (রা) তাকে পরামর্শ দেন, বাঁচতে চাইলে সে যেন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং ইসলাম কবুল করে। অন্যথায় তার পরিণতি খুব খারাপ হবে বলেও তিনি তাকে সতর্ক করে দেন।

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ৪৫৮-৫৯, সংক্ষেপে।

কা'ব ভ্রাতা বুজায়র (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করে মদীনায় এসে উপস্থিত হন এবং ফজর সালাত আদায় করার পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন ঠিক সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে পবিত্র সান্নিধ্যে এসেই মুসাফাহা করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে চিনতেন না। এরপর কবি কা'ব বলেন, কা'ব ইবন যুহায়র অনুতপ্ত হৃদয়ে ও মুসলমান হয়ে আপনার খেদমতে হাজির! সে আপনার নিরাপত্তা প্রার্থনা করছে। আপনি কি তার তওবা কুবল করবেন? এ কথা শুনে জনৈক আনসারী তার দিকে ছুটে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন, আল্লাহর দুশমনের গর্দান এখনই আমি উড়িয়ে দিই! তিনি তাকে থামিয়ে করে বললেন, না, থাক। ছেড়ে দাও তাকে। সে তওবা করে এবং তার অতীত অপকর্ম থেকে বিরত হয়ে এখানে এসেছে। এরপর কা'ব তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা কাসীদা-ইসলামিয়া আবৃত্তি করেন :

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول
متیم اثرها لم یفد مکبول

"সু'আদ পৃথক হয়ে গেছে, আমার হৃদয় তো প্রেমের রোগী; সে প্রেমের পেছনে এমনভাবে বন্দী যে, তার পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে আর তাকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণও দেয়া হয়নি।"

অতঃপর কবিতার শেষাংশ তিনি আবৃত্তি করেন ঃ

ان الرسول لنور یستضاء به
مهند من سیوف الله مسلول

"নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ একটি নূর যদ্দারা চারদিকে আলোকিত হয় এবং তিনি আল্লাহর একটি খোলা ধারালো তলোয়ার।"

কবিতা শুনে তিনি তাঁর চাদর মুবারক শরীর থেকে নামিয়ে তাঁকে দান করেন।[১]

---

১. যাদুল-মা'আদ, ১ম খ., ৪৬৬-৬৮, কাস্তাল্লানী তাঁর মাওয়াহিব গ্রন্থে আবূ বকর ইবনুল-আনবারীর সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন তিনি এই পর্যন্ত কবিতা পাঠ করেন তখন তিনি শরীর থেকে চাদর খুলে তাঁকে দিয়েছেন। এটিই সেই চাদর যা হযরত মু'আবিয়া (রা) দশ হাজার দীনার মূল্যে খরিদ করতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি রাসূল (সা) দেয়া চাদরের মুকাবিলায় অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিতে পারি না। কা'ব-এর ইনতিকালের পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে হযরত মু'আবিয়া (রা) উক্ত চাদর বিশ হাজার দীনার মূল্যে খরিদ করেন। তিনি বলেন, এই সেই চাদর যা মুসলিম সুলতানদের নিকট বংশপরম্পরায় রক্ষিত ছিল (আয-যুরকানী, মাওয়াহিব, ৩য় খ., ৭০)।

তাবুক যুদ্ধ[১]

(রজব ৯ হি.)

তাবুক যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও এর কারণ

শত্রুর অন্তরে ভয় ও ভীতিকর প্রভাব ফেলা এবং সেসব লোকের চোখ খুলে দিতে (যারা মনে করতে শুরু করেছিল, ইসলামের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আবার দপ করেই নিভে যাবে কিংবা তা আকাশে এক টুকরো মেঘের মতই দেখা দিয়ে আবার হঠাৎ করেই কোন দিগন্তে মিলিয়ে যাবে) তাবুক যুদ্ধের সেই প্রভাবই পড়েছিল যেই প্রভাব পড়েছিল মক্কা বিজয়ের। এই যুদ্ধ তৎকালীন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষের সমার্থক ছিল, আরবদের চোখে যেই সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিশাল ও বিরাট প্রভাবশালী ছিল। অনন্তর আবূ সুফিয়ান (রা) যখন দেখতে পেলেন, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত পত্রের কতটা গুরুত্ব দিলেন এবং এ দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে আপনাআপনিই বেরিয়ে গেল, [এবং যা পড়ে হেরাক্লিয়াস পরিমাপ করে নিয়েছিলেন, জযীরাতুল-আরবে একজন নবী (আ)-এর আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে] "মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিশন দেখছি বিরাট শক্তি সঞ্চয় করেছে![২] তাঁকে রোমের সম্রাট পর্যন্ত ভয় করতে শুরু করেছে।" তিনি বলেন, "তখন থেকেই আমার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে, একদিন তিনি অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন, এমন কি আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলামপ্রীতির সঞ্চার করলেন"(এবং আমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিলেন)।

সে যুগে আরবের লোকেরা রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধের এবং তাদের ওপর আক্রমণ করবার স্বপ্নও দেখতে পারত না, বরং তারাই সর্বদা ভয়ে তটস্থ থাকত, না

---

১. তাবুক মদীনা মুনাওয়ারা ও দামিশকের মাঝখানে এবং আয়লার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। য়াকূত তাঁর 'মু'জামুল-বুলদান' গ্রন্থে আবূ যায়দ-এর বরাতে লেখেন, 'তাবুক হিজর ও সিরিয়া সীমান্তের মাঝামাঝি হিজর থেকে চার মনযিল দূরত্বে ছিল। কথিত আছে, আসহাবুল-আয়কা, যাদের মধ্যে হযরত শু'আয়ব (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন, এখানেই বাস করত। তাবুক ছিল লৌহিত সাগর থেকে ছয় মনযিল দূরে হসমা ও শারবী নামক দু'টি পাহাড়ের মাঝে (বুস্তানীর দা.মা.)। এক্ষণে এটি সৌদী সামরিক ছাউনি, মদীনা প্রশাসনের অধীন, মদীনা থেকে সাত শত কি.মি. দূরে।

২. আবূ সুফিয়ান হুযূর (সা) সম্পর্কে 'ইবন আবী কাবশা' এই শব্দটি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন। আবূ কাবশা সম্পর্কে দু'টো উক্তি রয়েছে: একটি হলো, তিনি খুযাআ গোত্রের কেউ ছিলেন যিনি তাঁর সময় মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ হবেন (মাজমাউ বিহারিল-আনওয়ার)।

জানি তারা তাদের ওপর হামলা করে বসে! মোটকথা তারা নিজেদেরকে এতটা যোগ্যও মনে করত না, কেউ তাদের দিকে তাকাবে এবং তারা আক্রমণের শিকার হবে। মদীনার মুসলমানদের ওপর কখনো হঠাৎ বিপদ এসে দেখা দিলে কিংবা কোনরূপ হুমকি এসে হাজির হলে তাদের চিন্তাধারা বড় জোর গাসসানের খৃস্টান আরব রাজ্যগুলোর দিকে যেত যেগুলো ছিল রোম সম্রাটের অধীন।

৮ম হিজরীতে সংঘটিত আয়লার ঘটনায় হযরত ওমর (রা)-এর কথা থেকেও বিষয়টি ওপর আলোকপাত ঘটে। তিনি বলেন, আমার একজন আনসারী দোস্ত ছিলেন। আমি যখন হুযূর ﷺ -এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতাম তখন তিনি দরবারে নববীর রোয়েদাদ আমাকে শোনাতেন। আর যখন তিনি অনুপস্থিত থাকতেন তখন আমি তাঁকে খবরাদি পৌঁছাতাম। সে সময় আমরা গাসসানের এক বাদশাহর ভয়ে খুব ভীত থাকতাম। তার সম্পর্কে আমরা প্রায়ই শুনতাম, উক্ত বাদশাহ আমাদের ওপর আক্রমণ করতে ইচ্ছুক। আমরা সব সময় এই ধারণা করতাম কখন আমাদের ওপর আক্রমণ হয়! এ সময় একদিন আমার উক্ত আনসারী দোস্ত আমার কাছে এলেন এবং আমার দরজায় আঘাত করতে লাগলেন। তিনি দরজায় আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন, "দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।" আমি তাঁকে এভাবে দেখে শুধালাম, "গাসসানীরা কি হামলা করে বসেছে?"[১]

এ সময় রোম সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য রবি মধ্যাহ্ন আকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করছিল। হেরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে তাঁর সেনাবাহিনী ইরানী ফৌজকে তছনছ করে দিয়েছিল এবং ইরানের ভেতরে বহু দূর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল। এই বিপুল ও অস্বাভাবিক বিজয়ের আনন্দে ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হেরাক্লিয়াস হেমস থেকে আয়লা গণ্ডি পর্যন্ত একজন প্রবল পরাক্রান্ত বিজেতা হিসাবে শাহী জাঁকজমকের সঙ্গে সফর করেন।[২] এটি ৭ম হিজরীর ঘটনা। হেরাক্লিয়াস সে সময় ইরানীদের থেকে লব্ধ ক্রুশ কাঠ বহন করছিলেন। সমস্ত রাস্তা গালিচা ও ফরাশ দিয়ে ঢাকা ছিল। চারদিক থেকে পুষ্প বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল আর সম্রাট তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। গৌরবমণ্ডিত এই বিজয়ের পর দু'বছরও যায় নি আল্লাহর রাসূল ﷺ রোমকদের মুকাবিলায় মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের মন-মস্তিষ্কের ওপর যার গভীর ছাপ পড়েছিল, আল্লাহ তাআলা সিরিয়ার ওপর হামলার রাস্তা খুলে দেন, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত আমলে যা বিজিত হয়েছিল। এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু এই তাবুক যুদ্ধেই।

এই যুদ্ধ কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে নিচের ঘটনায় বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ পান, রোমকরা আরবদের উত্তর সীমান্তের ওপর হামলার জন্য তৈরি

১. বুখারী এই ঘটনা সূরা তাহরীমের তাফসীরে ও মুসলিম কিতাবুত-তালাক-এ উদ্ধৃত করেছেন।

১. মুসলিম, কিতাবু'ল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার।

হচ্ছে। ইবন সা'দ ও তাঁর উস্তাদ শায়খ ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবাতীয়দের থেকে সংবাদ পান, হেরাক্লিয়াস তার সৈন্যদের এক বছরের খোরাকের ব্যবস্থা করেছেন এবং তার সঙ্গে লাখম, জুযাম, আমেলা ও গাসসান, এছাড়াও আরবের অপরাপর বিজয়ী গোত্রসমূহকে শামিল করে নিয়েছেন এবং তার বাহিনী 'বালকা' পর্যন্ত পৌঁছেও গেছে।[১]

এ বর্ণনা বাদ দিলেও বলা যায়, এই যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল প্রতিবেশী হুকুমতগুলোকে ভীত-চকিত করে তোলা। এতে ইসলামের কেন্দ্রভূমি ও ইসলামের বর্ধিত ও উঠতি দাওয়াত এবং এর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সামর্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার সমূহ আশঙ্কা ছিল। এই যুদ্ধের মাধ্যমে সেই সব হুকুমতকেও সতর্ক করা দরকার ছিল, তারা যেন মুসলমানদের ওপর তাদের ভূখণ্ডে ঢুকে আক্রমণ করার স্পর্ধা ও দুঃসাহস না দেখায় এবং তাদেরকে সহজেই গিলে ফেলা যাবে এমনটিও যেন না ভাবে! যে ব্যক্তির এমন অবস্থা হবে, সে এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করতে পারে না আর না তার সীমান্তে প্রবেশ করে তার জন্য কোন চ্যালেঞ্জ কিংবা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। তার পশ্চাতে সেই হেকমত কার্যকর ছিল যার উল্লেখ কুরআন মজীদ তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে করেছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟
فِيكُمْ غِلْظَةً ط وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ.

"মু'মিনগণ! কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এবং তারা যেন যুদ্ধে তোমাদের দৃঢ়তা ও কাঠিন্য অনুভব করে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।"[সূরা তওবাহ : ১২৩ আয়াত]

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই যুদ্ধ দিয়ে পূরণ হয়ে যায়। রোমকরা এই জওয়াব কোন পাল্টা আক্রমণ, অভিযান, সামরিক চলাচল ও গতিবিধি ফৌজী তৎপরতায় দেয়নি, বরং তারা এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় এক ধরনের পশ্চাতপসরণ ও নীরবতা অবলম্বন করে এবং এই নতুন উদিত শক্তি সম্পর্কে যতটা পরিমাপ তিনি এই সময় করতে সক্ষম হন তা ইতিপূর্বে তার কখনো হয়নি।

দ্বিতীয় উপকারিতা যা এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ থেকে পাওয়া গেল তা, যুদ্ধের ফলে জাযীরাতুল-আরবের সেই সব গোত্র, এছাড়া সেই সব বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন গোত্রের (যারা রোমক শাহানশাহর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তার অধীনে ছিল) অন্তরে মুসলমানদের ভীতিকর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে তারা ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে ভাববার সুযোগ পায়। এও অনুভব করার মওকা পায়,

১. আয-যাকরানী, মাওয়াহিব, ৩য় খ., ৬৩-৬৪।

ইসলাম কোন বুদবুদ নয় যা পানির ওপর ভেসে ওঠার পর মুহূর্তেই মিলিয়ে যায় এর ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সম্ভবত এর মাধ্যমে ঐসব জাতিগোষ্ঠী ইসলামে প্রবেশের কোন সুযোগ পেয়ে যাবে যা স্বয়ং তাদের ভূখণ্ডে ও তাদেরই দেশে প্রকাশিত হয়েছে। ঐসব লোকের উল্লেখ করতে গিয়ে, যারা এই যুদ্ধে বের হয়েছিল, কুরআন মজীদ এই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছে :

وَلاَ يَطَؤُنَ مَوطِئًا يَّغِيظُ الْكُفَّارُ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً اِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ -

"আর তারা যে পদক্ষেপই গ্রহণ করে তা কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এবং শত্রুদের নিকট থেকে (আঘাত কিংবা অন্য কোন প্রকারের ক্ষতি) যা-ই কিছু প্রাপ্ত হয় তা তাদের সৎ কর্মরূপে গণ্য হয়।" [সূরা তওবাহ, : ১২০ আয়াত]

রোমকদের মনে মূতা যুদ্ধের স্মৃতি তখন পর্যন্ত বেশ ভাল রকমই জেগে ছিল যে যুদ্ধে তাদের পরিপূর্ণ সান্ত্বনা লাভ ঘটে এবং যে যুদ্ধে প্রতিটি পক্ষই ফেরাটাই দুর্লভ জ্ঞান করেছে আর এর দরুন বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য ও এর সুবিশাল সেনাবাহিনীর যেই ভীতিকর প্রভাব আরবদের মানসপটে ছিল তা খুবই কমযোর হয়ে যায়।

সারকথা হলো, এই যুদ্ধের সীরাত-ই নববী ও ইসলামের দাওয়াতের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং এ দ্বারা সেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ হয় যা মুসলমান ও আরবদের সপক্ষে খুবই সুদূরপ্রসারী ছিল এবং ইসলামের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ঘটনার ওপর যার গভীর প্রভাব পড়ে।

যুদ্ধের সময়পর্ব

৯ম হিজরীর রজব মাসে এই যুদ্ধ হয়।[১] তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মৌসুম। খেজুর পাকার সময়। রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপ থেকে আশ্রয় খুঁজতে একটু ছায়া তখন অনে

১. তবুক যুদ্ধের দিন তারিখ নির্ধারণ সৌর বছরের নিরিখে খুবই কঠিন। যে তারিখে তিনি মদীনা থেকে তবুকের উদ্দেশে রওয়ানা হন কোন কোন সীরাতকারের মতে উক্ত তারিখ ছিল নভেম্বর মাস। ... হাবীবুর রহমান খানের "জাদীদ মিফতাহুত-তাকবীম"-এ এ মতের সমর্থ মেলে। এঁদের ভেতর ... শিবলী নুমানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ঘটনার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও সহীহ হাদীছের ভাষ্য যা বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, এই যুদ্ধ গ্রীষ্মকালে হয় ... ইবন মালিক (রা)-এর হাদীছে পরিষ্কার লিখিত, ... الله صلعم غزاها فى حرشديد حين طابت الثمار, والظلال। এই হাদীছকেই এই ক্ষেত্রে মাপকাঠি ও বিচারের মানদণ্ড বানানো উচিত এবং ... হিসাব ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা ঠিক নয়। মূসা ইবন উকবা ... শিহাব যুহরী থেকে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার শব্দগুলো এরূপ: "ফসল কাটার মৌসুম, রাত্রিবেলা ও ... গ্রীষ্মে যখন লোকে খেজুর বাগানে থাকা পছন্দ করত" (এই যুদ্ধ হয়।) এ থেকেও [পরের পৃ. দেখুন]

মিষ্টি মধুর মনে হতো। আর তিনি এমনি এক সময় এই যুদ্ধের জন্য দীর্ঘ সফরের নিয়ত করলেন। যেহেতু পানিবিহীন শুষ্ক মরু বিয়াবান পাড়ি দিতে হবে, ওদিকে মুকাবিলা করতে হবে এক কঠিন শত্রুর, তাই তিনি মুসলমানদেরকে আগেভাগেই এ সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবারকার অভিযান কোন্ দিকে পরিচালিত হবে[১] যাতে তারা এজন্য ভাল রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এই সময়টা ছিল খুবই টানাটানির ও দুর্ভিক্ষের বছর।

মুনাফিকরা এ সময় বিভিন্ন বাহানা ও অজুহাত পেশ করে আপন আপন ঘরে বসে রইল। তাদেরকে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক শত্রুর কঠিন ভয়-ভীতি, কঠিন মৌসুম, জিহাদের প্রতি অনীহা, অনাগ্রহ ও দীনে হক তথা সত্য-সুন্দর ধর্মে সন্দেহ ও সংশয় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ও সফরসঙ্গী হওয়া থেকে বিরত রাখল। এদের সম্বলেই আল্লাহ তা'আলা ফরমান :

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ۔

"যারা পেছনে থেকে গেল তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ লাভ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত।" [সূরা তওবা : ৮১ আয়াত]

জিহাদ ও বাহিনীতে যোগদানের জন্য সাহাবাদের আগ্রহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সফরের ব্যবস্থাপনা খুবই যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেন এবং সকলকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ধনী ও সম্পদশালী লোকদেরকে আল্লাহর রাহে অকৃপণভাবে দান করতে উৎসাহিত করেন। ধনিক শ্রেণীর বহু লোক এ সময় সামনে এলেন এবং তাঁরা ঈমান ও সওয়াব হাসিলের প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে এতে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত উছমান (রা) এই পুরো বাহিনীকে, যেই বাহিনীকে :جيش العسرة 'সঙ্কটের বাহিনী' বলা হতো, সাকল্যে রসদসামগ্রী সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এক হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ব্যয়

[চলমান] স্পষ্ট মুনাফিকদের (চলমান) সেই উক্তি যার উল্লেখ আল্লাহতা'আলা সূরা বারা'আতে করেছেন এবং উক্তি প্রত্যাখ্যান করেন: আর তারা বলল, "গরমের ভেতর অভিযানে বের হয়ো না। বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত।" [সূরা তওবাহ : ৮১ আয়াত]

১. বুখারী ও মুসলিম, কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর হাদীছ থেকে নেয়া।

করেন। তাঁর এই বদান্যতার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেন। বহু সাহাবা যাঁদের সামর্থ্য ছিল না তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে সওয়ারীর জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। কিন্তু সওয়ারীর ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি তাঁদেরকে যুদ্ধে যোগদান হতে মুক্তি দান করলেন। জিহাদে যোগ দিতে না পারায় তাঁদের মর্মপীড়ার কোন সীমা ছিল না। আল্লাহতা'আলা তাঁদেরকে এই দায়িত্ব পালন থেকে মুক্তি দেন। ইরশাদ হলো,

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ - تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَنْ لَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ -

"আর ওদের কোন অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না, ওরা অর্থ ব্যয়ে সামর্থ্য না থাকায় দুঃখে অশ্রুসিক্ত চোখে ফিরে গেল।" [সূরা তওবা : ৯২ আয়াত]

কিছু মুসলমান এমনও ছিল যারা কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই কেবল ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণে বিলম্বের দরুন এই যুদ্ধে শরীক হতে ব্যর্থ হয়।

মুসলিম বাহিনীর তাবুক যাত্রা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিরিশ হাজার মুজাহিদসহ মদীনা থেকে তাবুক অভিমুখে রওয়ানা হন। এর আগে আর কোন যুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল না। তিনি ছানিয়্যাতু'ল-বিদা' নামক স্থানে সৈন্যদের ছাউনি ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা আনসারী (রা)-কে মদীনার শাসক নিয়োগ করেন।

আহলে বায়ত-এর দেখাশোনার জন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে নিযুক্ত করেন। এতে মুনাফিকরা হযরত আলী (রা)-এর সম্বন্ধে ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাকার নানা কথা বলাবলি শুরু করল এবং গুজবের ফানুস ওড়াতে লাগল। হযরত আলী (রা) এসব আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জানালে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তুমি কি এতে রাজি নও, মূসা (আ)-এর স্থলে ভ্রাতা হারুন (আ)-এর মতই আমার স্থলে তুমিও প্রতিনিধিত্ব কর। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, আমার পরে কোন নবী আসবে না।[১]

তিনি এই বাহিনীসহ হিজর ও ছামূদ জাতিগোষ্ঠীর এলাকায় অবতরণ করলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বললেন, "এটাই তাদের ভূখণ্ড যাদের ওপর আযাব

১. বুখারী, তাবুক যুদ্ধ অধ্যায়।

নাযিল হয়েছিল।” তিনি আরও বললেন, “যখন তোমরা ঐসব লোকের বাড়িঘরে ঢুকবে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন অনুতপ্ত হয়ে ঢুকবে এই ভয়ে, না জানি, তোমাদেরকেও সেই সব মুসীবতে না পেয়ে বসে যা তাদের ওপর এসেছিল!”[১] তিনি এও বলেছিলেন, “তোমরা এখানকার পানি পান করবে না এবং সালাতের জন্য এই পানি দিয়ে ওযূও করবে না। যদি এই পানি দিয়ে তোমরা আটার খামীর তৈরি করে থাক তাহলে তা তোমাদের উটগুলোকে খাইয়ে দাও এবং এর সামান্যতম অংশও তোমরা খাবে না।”

পানি ফুরিয়ে গেলে সকলেই তাদের অভিযোগ দরবারে রিসালাত পেশ করলেন এবং নিজেদের কষ্টের কথা তুলে ধরলেন। তিনি দু'আ করলেন। ফলে দু'আর বরকতে আল্লাহ্ পাক মেঘ পাঠালেন আর ঐ মেঘে এত বৃষ্টি হলো যে, লোকেরা তৃপ্ত হলেন এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় পানিও ধরে রাখলেন।[২]

আরবের রোমক ভীতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুকের দিকে যাচ্ছিলেন তখন কিছু মুনাফিক তাঁর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে একে অন্যকে বলছিল : তোমরা কি মনে কর, বনী আল-আসকার অর্থাৎ রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধে এতটাই সহজসাধ্য হবে যতটা সহজ মনে করছ স্বদেশের আরব গোত্রগুলোকে? আল্লাহর কসম! আমি দেখতে পাচ্ছি, কাল এঁরা সকলেই বালি ও কাদার মধ্যে পড়ে থাকবেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আয়লার শাসনকর্তার মধ্যে সন্ধি

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক পৌঁছলে সীমান্ত এলাকার শাসক ইউহান্না ইবন রূবা তাঁর খেদমতে হাজির হন, সন্ধি করেন এবং জিযয়া পেশ কনে। জুরবা ও আযরাহার লোকেরাও আসে এবং তিনি তাদেরকে নিরাপত্তানামা প্রদান করেন যার মধ্যে দণ্ডবিধির যিম্মাদারী, পানি, স্থল ও সমুদ্রপথের হেফাজত এবং দুই পক্ষের শান্তির যামানত দান করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মেহমানদারীও করেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তন

এ সময় রোমকদের পিছু হটে যাওয়া এবং সীমান্ত পেরিয়ে সেনা অভিযানের ধারণা পরিত্যাগের খবর এসে পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এলাকায় ঢুকে তাদেরকে পেছনে ধাওয়া করা সমীচীন মনে করেননি। কেননা এই অভিযানের

---

১. যাদুল-মাআদ, ২য় খ., ৪০৩।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫২২; বুখারী, মুসলিমেও অনুরূপ হাদীসে আছে।

৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫২৪-২৬।

৪. প্রাগুক্ত, ৫২৫-২১।

মাধ্যমে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল করার প্রয়োজন ছিল তা হাসিল হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য উকাইদির ইবন 'আবদিল-মালিক আল-কিন্দী নামক দুমাতু'ল-জান্দাল-এর খৃস্টান শাসক ও রোমক ফৌজের পৃষ্ঠপোষকের[1] পক্ষ থেকে আক্রমণের খবর এসে পৌছলে তিনি তাকে শায়েস্ত করার জন্য খালিদ (রা) ইবন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেন। হযরত খালিদ (রা) ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে উকাইদিরকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাকে ক্ষমা করতো জিযয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করেন এবং তাকে মুক্তি দেন।[2]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকে কয়েক রাত কাটিয়ে মদীনা তায়্যিবায় ফিরে আসেন।[3]

গরীব মুসলমানের জানাযায়

আবদুল্লাহ যুল-বিজাদায়ন (রা)-এর ইনতিকাল হয় তাবুকে। ইসলাম গ্রহণের জন্য তাঁর ছিল আন্তরিক চেষ্টা ও আগ্রহ। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করত এবং নানাভাবে তাঁর ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাত। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে একটি মোটা খদ্দর বস্ত্রে ছেড়ে দেয়। লজ্জা নিবারণের মত এছাড়া তাঁর নিকট আর কোন কাপড় ছিল না। তিনি পালিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে হাজির হন। এ সময় ঐ কাপড় খণ্ডটুকু কেটে গিয়েছিল এবং দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তিনি এক টুকরো দিয়ে লুঙ্গি বানালেন, আর এক টুকরো দিয়ে চাদর বানিয়ে শরীর ঢাকার ব্যবস্থা করলেন এবং এই অবস্থায় হুযূর ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। সেদিন থেকেই তাঁর উপাধি হয় যুল-বিজাদায়ন।

তাবুকে তাঁর ইনতিকাল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা) রাতের অন্ধকারে তাঁর জানাযায় অনুসরণ করেন। এ সময় তাঁদের কারো হাতে ছিল আলোর মশাল যার আলোয় সবাই পথ চলছিলেন। কবর তৈরী ছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ স্বয়ং কবরে অবতরণ করলেন। হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা) লাশ নামাতে গেলে তিনি বললেন, তোমাদের ভাইকে আরও

১. দুমাতুল-জানদাল একটি বসতি গ্রাম। এখানে বেদুঈনেরা কেনাবেচার জন্য আসা-যাওয়া করত অর্থাৎ এখানে বাজার ছিল। কিন্তু কালক্রমে এটি অনাবাদী ও বিরান হয়ে যায়। উকাইদির একে নতুন রূপ দেন এবং যয়তুনের চাষাবাদ শুরু করেন। ফলে বেদুঈনদের যাতায়াত পুনরায় শুরু হয়। গ্রামটি ছিল একটি প্রাচীন পাঁচিলঘেরা। পাঁচিলের ভেতরে একটি সুদৃঢ় দুর্গও ছিল। উত্তরের বেদুঈনদের মধ্যে এই দুর্গের একটা বিশেষ খ্যাতি ছিল। এজন্য এর একটি সামরিক গুরুত্ব ছিল। এর অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল কালব গোত্রের। সেই যুগের নিয়ম মাফিক উকাইদর নিজেকে মালিক বাদশাহ বলতেন। সে যুগে দুমাতুল-জানদালের লোকেরা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল (দ্র. তারীখুল-আরব কাবলাল-ইসলাম, ড. জাওয়াদ আলীকৃত)।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫২৬।

৩. প্রাগুক্ত, ৫২৭ পৃ.।

নিচে আমার কাছাকাছি করে দাও। উভয়ে লাশ ধরাধরি করে নিচে নামিয়ে দিলে তিনি তাঁকে কবরে শুইয়ে দিলেন এবং বললেন, اللهم انى امسيت راضيا عنه فارض عنه "হে আল্লাহ! আমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর ওপর রাজী হয়ে যাও।" বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, এ সময় আমার ইচ্ছা জাগছিল, হায়! এই কবরের অধিবাসী যদি আমি হতাম![1]

কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর পরীক্ষা ও তাঁর সাফল্য

এই যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে যাদের মনে এতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা কোন প্রকারের কুমন্ত্রণা ছিল না, অথচ শরীক হতে পারেননি তাঁদের মধ্যে ছিলেন কা'ব ইবন মালিক, মারারা ইবন রবী ও হেলাল ইবন উমায়্যা (রা)। এঁরা ছিলেন প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধান। ইসলামের জন্য তাঁরা অপরিমেয় ও অমূল্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন এবং সত্যের পথে কঠিন ও দুঃসহ কষ্ট-নিপীড়ন সহ্য করেছিলেন। মারারা ইবনুল-রবী ও হেলাল ইবন উমায়্যা (রা) বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ থেকে পালানো কিংবা যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকা ছিল তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। একে হিকমতে ইলাহী ছাড়া অপর কিছুর সঙ্গে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের পরীক্ষা, তাঁদের আত্মার শুদ্ধি ও মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দান। এ ছিল কেবল অলসতা, ইচ্ছার দুর্বলতা, পার্থিব উপায়-উপকরণের ওপর অতিরিক্ত আস্থা ও নির্ভরতা এবং এর গুরুত্ব জোর তৎপরতার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করার ফল। এটি এমন এক বিষয় যা আল্লাহর বহু বান্দাকে, যাঁরা ঈমান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রেমে অন্য মুসলমানদের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিলেন না, বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এটাই ছিল এমন একটি গূঢ় দিক যার প্রতি এ দলের তৃতীয় ব্যক্তি কা'ব ইবন মালিক (রা) নিচের বাক্যে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন :

"আমি প্রতিদিন এই নিয়তে বের হতাম, আমি সফরের জরুরী সামান নিয়ে নেব এবং তাদের সঙ্গে রওয়ানা হব। কিন্ত কোন কিছু না করেই ফিরে আসতাম। এরপর আমি মনে মনে বলতাম, আমার অসুবিধা কি? যখনই চাইব নিয়ে নেব (কেননা আমার নিকট পয়সা আছে, আর বাজারে আছে জরুরী সামান)। আর এভাবেই করি করি করতে করতে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনও আমি কোন সামানই সংগ্রহ করিনি। আমি মনে মনেই ভাবলাম: যাক না, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওয়ানা হওয়ার এক-দু'দিন পরেই বেরিয়ে পড়ব, রাস্তায়ই কাফেলা ধরে ফেলব এবং শামিল হয়ে যাব। তাঁদের সকলের রওয়ানা হওয়ার পরও আমি আমার সামান তৈরির জন্য বের হলাম। কিন্তু তারপরও কিছু না করেই ফিরে আসলাম।

১ সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫২৭-২৮।

দ্বিতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। কিছুই করা হলো না আমার। তাঁরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলেন এবং লড়াইয়ের ব্যাপারে অনেক দূর অগ্রসর হলো। আমি এরপর ইচ্ছা করেছি, এখনও আমি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে তাঁদেরকে ধরে ফেলব কিন্তু হায়! আমি যদি তখনও তা করতাম! কিন্তু তাও হলো না।[১]

আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের ঈমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা, ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সব অবস্থায় দৃঢ়পদ থাকার নাযুক পরীক্ষা নিলেন। তাঁরা লোকের সম্মান, শ্রদ্ধা, মুখাপেক্ষী না থাকা, আল্লাহর রাসূলের লক্ষ্য ও মনোযোগ এবং উপেক্ষা ও অমনোযোগিতা উভয় অবস্থাতেই এমন নিষ্ঠাবান ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করলেন যার নজীর ধর্মীয় সমাজ ও জামা'আতের ইতিহাস (যা ঈমান 'আকীদা, ভালবাসা ও আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়) মেলা ভার।

এতে কোন সন্দেহ নেই, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে সত্য বলেছেন এবং এর পেছনে যা কিছু প্রকৃত সত্য ছিল এতটুকু না লুকিয়ে বলে দেন যখন অন্য লোকেরা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিল। এ সময়ও তাঁরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন, যখন মুনাফিকরা সর্বপ্রযত্নে নিজেদেরকে এ থেকে মুক্তি বলে মনে করছিল। তিনি তাঁর দীর্ঘ অলঙ্কারপূর্ণ ও প্রভাবমণ্ডিত বর্ণনায় নিজের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল অর্থাৎ যারা যুদ্ধে যোগদান করেনি তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে হাজির হলো এবং কসম খেয়ে তাদের ওপর পেশ করতে লাগল। এদের সংখ্যা ছিল আশির ওপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক কথাগুলো কবুল করলেন, তাদের থেকে আনুগত্যের শপথ নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাদের অন্তরের লুক্কায়িত বিষয়গুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করলেন। আমিও তাঁর খেদমতে হাজির হলাম, সালাম পেশ করলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি হাল্কা মুচকি হাসির সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি এগিয়ে গেলাম এবং একেবারে সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন পেছনে পড়ে রইলে? তুমি কি তোমার সওয়ারী খরিদ করনি? আমি বললাম: জী হ্যাঁ! আল্লাহর কসম! আমি তা করেছিলাম। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যদি তাঁর সামনে না হয়ে দুনিয়াবাসী কোন লোকের কাছে হতাম তাহলে মনে করতাম, আমি কিছু ওযর পেশ করে তার অসন্তোষের হাত থেকে বেঁচে যাই। আমার ভেতর কথা বলার এবং সে কথাকে কি করে প্রমাণ করতে হয় তার ধরন জানা ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি বিশ্বাস করি, যদি আমি আজ মিথ্যা

১. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী।

বলে তাঁকে সন্তুষ্ট করে নিই তাহলে সমূহ আশঙ্কা আল্লাহ পাক সত্বর তাঁকে আমার ওপর নারাজ করে দেবেন। আর আমি যদি সত্য বলে আজ তাঁর মনটা তিক্ত ও বিস্বাদও করে দিই, তবুও এর ভেতরই আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা পাবার আশা আছে। আল্লাহর কসম! আমার কাছে কোন ওযর নেই এবং আল্লাহর কসম! যে সময় আমি পেছনে ছিলাম সেই সময়ের চেয়ে বেশি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও প্রাচুর্যের মালিক আর কখনো ছিলাম না।"

শেষে সেই ভয়ংকর মুহূর্তও এসে গেল! রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। মুসলমানরা তো "শুনলাম ও মেনে নিলাম"-এর কট্টর অনুসারী ছিলেন। অতএব, সকলেই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং ভিন্ন মানুষে পরিণত হলেন, এমন কি তাঁদের দৃষ্টিতে আসমান-যমীনেরও পরিবর্তন ঘটল। মনে হচ্ছিল, তাঁরা যেন সেই পৃথিবীতে নন সেই পৃথিবীতে তাঁরা আগে ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁদের পঞ্চাশ রাত্র কেটে গেল। মরারা ইবন রবী', হেলাল ইবন উমায়্যা (রা) উভয়ে ক্লান্ত হয়ে আপন আপন ঘরেই বসে রইলেন এবং কান্নাকাটি করতে থাকলেন। কা'ব ইবন মালিক (রা) এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী যুবক ছিলেন। তিনি বাইরে বের হতেন, মুসলমানদের সাথে সালাত আদায় করতেন, বাজারে আসা-যাওয়া করতেন, কিন্তু অন্য কেউ তাঁর সাথে কথা বলতেন না।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার যে সম্পর্ক ও যোগসূত্রতার ওপর এর কোন প্রভাব পড়েনি যা তাঁদের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে কায়েম ছিল। এর ফলে তাঁদের এই অবস্থার ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহের সেই ধারাও কিন্তু থামেনি, বরং এই ধমক ও তিরস্কার তাঁদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা, হৃদয়ের উত্তাপ, দরদ ও জ্বালা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি (কা'ব) বলেন,

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হাজির হতাম এবং তাঁকে সালাম জানাতাম। সে সময় তিনি সালাত শেষে মজলিসে সাহাবী তাঁকে ঘিরে থাকতেন। আমি (সালামের পর) মনে মনে ভাবতাম, তিনি আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নাড়িয়েছেন কি না। এরপর আমি সালাতের কাতারে তাঁর পাশে ও কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতাম এবং আড় চোখে তাঁকে দেখতাম। আমি যখন সালাতে মনোনিবেশ করতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন এবং এরপর আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।"

মোটের ওপর জগত তাঁদের জন্য বদলে গেল এবং এখন এমন একজনও তাঁদের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যাঁরা তাঁদের বিরাট গর্ব ও আস্থা ছিল, ছিল নির্ভরতা। তিনি বর্ণনা করেন,

"লোকের অত্যাচারে এই সময়টা আমার জন্য খুবই দীর্ঘ ও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। শেষে পাঁচিল পার হয়ে আমি আবূ কাতাদার চৌহদ্দির মধ্যে পৌঁছে গেলাম। সম্পর্কে সে আমার চাচাত ভাই হতো এবং আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। আমি তাকে সালাম করলাম, কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার সালামের জওয়াবটা পর্যন্ত সে দিল না। আমি বললাম, আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসি? এরপরও সে চুপ করে রইল। আমি দ্বিতীয়বার তাকে একই কথা বললাম এবং তাকে একই দোহাই দিলাম। সে নিশ্চুপ রইল। এরপর সে এতটুকু বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। এই কথায় আমার চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু বইতে লাগল। আমি তখনই ঘুরে দাঁড়ালাম এবং পাঁচিল পার হয়ে ফিরে এলাম।"[১]

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হলো না, বরং এই সর্বাত্মক বয়কটের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তাঁদের স্ত্রীদের পর্যন্ত গিয়ে গড়াল। তাঁদের প্রতি নির্দেশ হলো, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের পৃথক করে দেয়। নির্দেশ পালিত হলো।

প্রেম ও বিশ্বস্ততা, দৃঢ়তা ও ধৈর্যের এই পরীক্ষার সবচেয়ে নাযুক মুহূর্ত এল তখন যখন গাসসান অধিপতি ভালবাসা ও সম্পর্ক ভালো করার জন্য তাঁকে খরিদ করতে চাইল। এটা মনে রাখতে হবে, ইনি ছিলেন এমন একজন বাদশাহ যার মোসাহেব ও বন্ধু হওয়া এবং তার মজলিসে হাজির হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করা হতো। এ ব্যাপারে পরস্পরে প্রতিযোগিতা চলত, আরব কবিরা বছরের পর বছর যার বন্দনা গীত গাইত।[২] গাসসান অধিপতির দূত তাঁর নিকট এমন এক মুহূর্তে এসে হাযির হলো যখন তিনি কঠিন মানসিক ও আত্মিক পেরেশানী, লোকদের সম্পর্কচ্ছেদ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপক্ষোর মত কঠোর কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। দূত তাঁকে গাসসান অধিপতির পত্র দিল। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

"আমি জানতে পেরেছি, তোমার প্রভু তোমার সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য লাঞ্ছনা ও নষ্ট হবার মত জায়গা নির্ধারণ করেননি। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাদের সাথে সদয় ব্যবহার করব।"

---

১. কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর হাদিছ; সহীহ বুখারী।

২. দ্র. জুফনা পরিবারের প্রশংসায় কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা)-এর বিখ্যাত কাসীদা যার ... হলো : ...ـسـابة نادمتهم . يوما بجلق في الزمان الاول = يسقون من ورد البريص عليهم . ...ـصفق بالرحيق السلسل .

এই পত্র কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর অন্তরে প্রচণ্ড ঈমানী মর্যাদাবোধ নাড়া দিল এবং তাঁর প্রেম ও ভালবাসা উদ্বেলিত হতে লাগল। তিনি একটি জ্বলন্ত চুলার পাশে গেলেন এবং পত্রটি তাতে নিক্ষেপ করলেন।

এরপর এই তিনজন মু'মিনেরই যখন পরীক্ষা পূর্ণ হলো কুরআন মজীদ তাঁদের কথা উল্লেখ করে তাঁদের স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা দান করলেন। তাঁদের ঘটনা মুসলমানদের জন্য চিরদিনের জন্য একটি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ সরবরাহ করে দিল, তাঁদের ঈমানী শক্তি ও ইসলামের সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রমাণ মিলে গেল এবং তাঁদের জন্য বিশাল পৃথিবী তার বিশালতা ও বিস্তৃতি যেমন সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এমন কি তাঁদের নিজেদের নফসও তাঁদের জন্য সঙ্কীর্ণ ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁদের পা সত্যের পথ থেকে এক মুহূর্তের তরেও বিচ্যুত হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা আসমানের ওপর থেকে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার ঘোষণা দিলেন এবং কেবল তাঁদের তওবার উল্লেখই করলেন না, তাঁরা না জানি এর ফলে নিঃসঙ্গতা ও হীনমন্যতাবোধ অনুভব করেন। এ বিষয়টি তাঁদের জন্য চোখ উঁচিয়ে চাইবার কারণ ঘটে, বরং তাঁদের তওবার ভূমিকায় সায়্যিদুল-আম্বিয়া' ওয়াল-মুরসালীন, মুহাজিরীন ও আনসারদের তওবারও উল্লেখ করেছেন[১] যাঁরা এই যুদ্ধে সবার আগে ছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন, তাঁদের মনকে প্রবোধ দেয়া, লোকের চোখে তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি ও মর্যাদা দ্বিগুণ-চার গুণ বাড়ানো।

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ . وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

"আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তাঁর অনুসরণ করেছিলেন সঙ্কটকালে, এমন কি যখন তাদের এক দলের

---

১ যা ছিল একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত সত্য এবং যার বাহ্যত কোন প্রয়োজন ছিল না।

মনোবিকারের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ ওদের ক্ষমা করলেন, তিনি ওদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই; পরে তিনি ওদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন যাতে ওরা তওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
[সূরা তওবা : ১১৭-১১৮]

এক নজরে রসূল ﷺ পরিচালিত যুদ্ধাভিযানসমূহ

৯ম হিজরীরর রজব মাসে সংঘটিত তাবুক যুদ্ধের সাথেই নবী করীম ﷺ পরিচালিত যুদ্ধ ও যুদ্ধাভিযান (যার সংখ্যা ২৭টি), তাছাড়া ছোটখাট যুদ্ধ ও সৈন্য অভিযানসমূহের (যার সংখ্যা ৬০টি[১]; আরও কতকগুলো যুদ্ধ ও সংঘর্ষ পর্যন্ত গড়ায়নি) ধারা সমাপ্ত হয়।

এসব যুদ্ধ ও ছোটখাট অভিযানে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে পাঠানো হয়েছিল, যে পরিমাণ রক্ত ঝরেছিল, যুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে আমরা এর চেয়ে কম রক্ত ঝরতে আর দেখিনি। এসব যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১০১৮-এর বেশি নয়। আর এই সংখ্যার মধ্যে উভয় পক্ষের নিহতরাই অন্তর্ভুক্ত।[২] কিন্তু এই নগণ্য সংখ্যা মানুষের রক্তকে সস্তা ও সুলভ জরিপ করা মুশকিল, বরং বলা চলে অসম্ভব। এর পরিণতিতে জাযীরাতুল-আরবের চারপাশে এই রকম শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ কায়েম হয়ে গিয়েছিল যে, একজন মহিলা মুসাফির হীরা থেকে একাকী রওয়ানা হয়ে কা'বা শরীফে এসে উপস্থিত হতো এবং তাওয়াফ শেষে ফিরে যেত এবং আল্লাহ্ ভিন্ন তাকে আর কাউকে ভয় করতে হতো না।[৩] একজন মহিলা কাদেসিয়া থেকে উটে চড়ে আসত এবং বায়তুল্লাহ যিয়ারত করত, আর কাউকে সে ভয় করত না।[৪] এর পূর্বে অবস্থা ছিল, গোটা জাযীরাতুল-আরবে হত্যা, রক্তপাত, প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড, গৃহযুদ্ধ ও লড়াই-সংঘর্ষের অব্যাহত ধারা ছিল প্রতিদিনের এবং বড় বড় হুকুমগুলোর কারাভাঁ (কাফেলা) অস্বাভাবিক রকমের ও অতিরিক্ত রাহবারের সাহায্য-সহায়তায় পথ চলত।

এসব যুদ্ধ কুরআন মজীদের দু'টো বিজ্ঞ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে একটি হলো, اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ "গোলযোগ ও অরাজকতা হত্যা

---

১. ইবন কায়্যিম, যাদুল-মাআদ; ইরাকী জেনারেল ও লেখক মাহমূদ শীষ খাত্তাব-এর মতে যেসব যুদ্ধে রাসূল (সা) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার সংখ্যা ২৮।

২. কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মনসুরপুরী "রহমাতুল্লিল-আলামীন" গ্রন্থে এই সংখ্যাই বলেছেন।

৩. বুখারী, আলামাতুন-নবুওয়া।

৪. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫৮১ পৃ.।

অপেক্ষাও ভীষণ গুরুতর।"[১] দ্বিতীয়টি হলো, وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِى الْاَلْبَابِ। "কিসাস গ্রহণের মধ্যেই জীবন নিহিত আছে, (জেনে রাখ) হে বুদ্ধিমানরা![২] এর দরুন মানব জাতির এক বিরাট সময় বেঁচে গেল এবং অবস্থার সংস্কার, সংশোধন ও বিপদের প্রতিরোধের সেই দীর্ঘ প্রচেষ্টার দরকার হতো না যা অধিকাংশ সময় নিষ্ফল হয়েছে। এ ছাড়া ঐসব যুদ্ধের ওপর যেসব নৈতিক শিক্ষা এবং যেসব স্নেহসুলভ ও সহানুভূতিশীল নির্দেশের ছায়া ও প্রতিবিম্ব ছিল তা একে প্রতিশোধ ও ক্রোধের আগুন নেভার পরিবর্তে চরিত্র সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং হেদায়াত ও কল্যাণ লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে হেদায়াত দিতেন,

"আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার এবং যেসব মুসলমান তোমাদের সাথে রয়েছে তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধে রত হবে এবং আল্লাহরই পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী, করেছে; গাদ্দারী করবে না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি করবে না, কোন শিশু, নারী, অসহায় বৃদ্ধ কিংবা খানকাহ, গীর্জা, মঠ, মন্দিরের ধর্মীয় পুরোহিত, বিশপ, যারা কোন না কোন ধর্মের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ স্পর্শ করবে না, কোন গাছ কাটবে না, কোন গৃহ ধ্বসিয়ে দেবে না।"[৩]

এই সামরিক কর্মকাণ্ডের সফলতা যত দ্রুত অর্জিত হয়েছে তার পরিমাপ এভাবে করা যেতে পারে, মাত্র দশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে দৈনিক গড়ে জাযীরাতুল-আরবের প্রায় ২৭৪ বর্গমাইল এলাকা ইসলামের অধীনে এসেছে। মুসলমানদের জীবন হানির হিসাব নিলে দেখা যাবে, গড়পরতা মাসে একজন মানুষের অর্ধেক নিহত হয়েছে, দশ বছর পূর্ণও হয়নি দশ লাখ বর্গমাইল ইসলামের পদানত হয়েছে।[৪]

এসব যুদ্ধ ও অভিযানের তুলনা দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধের (যার প্রথমটি ১৯১৪ সালে শুরু হয়ে ১৯১৮ সালে শেষ হয় এবং দ্বিতীয়টি ১৯৩৯ সালে শুরু হয়ে ১৯৪৫ সালে শেষ হয়) সঙ্গে তুলনা করুন তাহলেই এ উভয়ের পার্থক্যের সঠিক পরিমাপ করতে পারবেন।

---

১. সূরা বাকারা, ১৯১ আয়াত।

২. সূরা বাকারা, ১৭৯ আয়াত।

৩. ওয়াকেদী, যায়দ ইবন আরকাম (রা) বর্ণিত।

৪. জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খানের "হাছীছে দেফা" [বর্তমান অনুবাদক কর্তৃক "মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল" নামে অনূদিত ও প্রকাশিত] থেকে তথ্য গৃহীত।

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বিজ্ঞ নিবন্ধকার এ বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তা থেকে জানা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল চৌষট্টি লক্ষ[১] এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটি থেকে ছয় কোটির মধ্যে।[২]

এই দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধ মানবতার কোন খেদমতই আঞ্জাম দেয়নি, এ কথা সবাই জানে এবং মানব সমাজ এ থেকে কম বেশি কোন রকমের উপকারই পায়নি।

মধ্যযুগে Inquistion Court ও গির্জার জুলুম-নিপীড়ন ও ধর্মীয় পীড়নের যেসব লোক শিকার হয়েছিল তাদের সংখ্যাও হবে এক কোটি বিশ লাখের মত।[৩]

ইসলামের প্রথম হজ্জ

৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরজ হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল-হজ্জ নিযুক্ত করেন এবং মুসলমানদের হজ্জ করাবার যিম্মাদারী তাঁকে সোপর্দ করেন। মুশরিক কাফিররাও হজ্জের জায়গাগুলোতে ছিল।[৫] হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে মদীনা থেকে তিন শ' লোকের একটি কাফেলাও হজ্জ আদায়ের নিয়তে রওয়ানা হয়।[৬]

এ সময় সূরা বারা'আত নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর। তিনি হযরত 'আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন সূরা বারা'আতের প্রথম দিককার আয়াত ও এ সংক্রান্ত আহকাম তথা বিধানসমূহ নিয়ে সেখানে যেতে এবং কুরবানীর দিন যখন সমস্ত লোক মিনায় একত্র হবে তখন এই ঘোষণা দিতে, "জান্নাতে কোন কাফির প্রবেশ করবে না এবং এ বছরের পর থেকে কোন কাফির মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না, উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কারও কোন চুক্তি হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করা হবে।" হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনীর পিঠে চড়ে রওয়ানা হন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে পথিমধ্যে মিলিত হন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আমীর হয়ে এসেছেন না, মা'মুর হয়ে?" হযরত আলী (রা) বললেন, "মা'মুর হয়ে।" অতঃপর উভয়ে মনযিলের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত আবূ বকর (রা) হজ্জের ব্যবস্থাপনায় মশগুল হলেন। কুরবানীর দিন হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ ও হেদায়াত মুতাবিক ঘোষণা দেন।[৭]

---

১. ১৯শ খ., ৯৬৬।

২. প্রাগুক্ত, ১০১৩ পৃ.।

৩. John Devenport, Apology for Muhammad and Qran.

৪. কোন কোন আলিমের অভিমত হলো, হজ্জ ষষ্ঠ হিজরীতে ফরয হয়। শায়খ মুহাম্মদ আল-হাদরামী তাঁর 'তারীখ আত-তাশরীইল-ইসলামী" পুস্তকে এই অভিমতই গ্রহণ করেছেন (দ্র. ৫২ পৃ.)।

৫. ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫৪৩ পৃ.।

৬. যাদুল-মাআদ, ২য় খ., ২৪ পৃ.।

৭. ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫৪২-৪৩ পৃ.।

প্রতিনিধিদলের আগমনের বছর
(৯-১০ হি.)

মদীনায় প্রতিনিধিদলের বাধাহীন আগমন ও আরব জীবনে এর প্রভাব

প্রথমে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুবারক হাতে মক্কা বিজয় দান করলেন। অতঃপর তাবুক যুদ্ধ থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন। এর আগে তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারার নামে পত্র পাঠান যেসব পত্রে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। কেউ কেউ নম্র ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এর জওয়াব প্রদান করেন। কোন বাদশাহ খুশি মনে এবং সম্মান ও ভক্তিসহকারে একে অভ্যর্থনা জানান। কেউ কেউ দ্বিধা-সংশয়ে ও ভয়-ভীতির মধ্যে কাটান আর কেউ ধৃষ্টতা দেখিয়ে একে গ্রহণ করে নি এবং পত্রকে অসম্মান করে এবং গর্বভরে আচরণ করে। আর এর ফলে শিগগিরি তাদেরকে নিজেদের দেশ ও জীবন খোয়াতে হয়। এসব এমন ঘটনা ছিল যার চর্চা চলছিল সারা আরব জুড়ে এবং সর্বত্রই এর আলোচনা চলত।

মক্কা বিজয়ের পর (যা ছিল আরব উপদ্বীপের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কেন্দ্র) কুরায়শ সর্দারের ইসলাম গ্রহণ এবং সত্য ও সুন্দর ধর্মের বিরোধিতার সবচেয়ে বড় দুর্গের পতন তাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন কিংবা ইসলামের ব্যর্থতার স্বপ্ন দেখছিলেন। এসব ঘটনা তাদের ও ইসলামের মধ্যবর্তী পুরাতন বাধা সব দূর করে দেয় এবং তাদেরও ইসলাম কবুলের মাঝে যেই দূরত্ব ছিল তা কমে যায়। মশহুর মুহাদ্দিছ 'আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনী (মৃ. ৯৮৬হি.) তাঁর 'মাজমা'উ বিহারি'ল-আনওয়ার" গ্রন্থে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে লেখেন,

"এই বছরটি ছিল প্রতিনিধিদলের আগমনের বছর। আরব গোত্রগুলো ইসলামের সঙ্গে কুরায়শদের ব্যবহার ও আচরণের অপেক্ষা করছিল। কেননা কুরায়শরাই ছিল সকলের নেতৃস্থানীয় এবং তারাই ছিল আল্লাহর ঘরের যিম্মাদার। অতঃপর তারাই যখন ইসলামের সামনে নিজেদের মাথা নত করে দিল, মক্কা বিজিত হলো এবং ছাকীফ গোত্রও ইসলাম কবুল করল তখন তারা অনুভব করল, এখন আর তাদের ভেতর মুসলমানদের মুকাবিলা করার মত শক্তি নেই, ঠিক

এমনি সময় চারদিক থেকে প্রতিনিধিদলের ব্যাপক হারে আগমন ঘটে এবং লোক দলে দলে আল্লাহর দীনে (ইসলামে) প্রবেশ করতে থাকে।”[১]

এসব কিছুর প্রভাব আরবদের দিল ও দিমাগ তথা মন-মস্তিষ্কের (যারা যার যা-ই হোক, মানুষই তো ছিল) ওপর পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। ফলে ইসলামে প্রবেশ করা ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে তাদের হাজির হওয়ার একটি দরজা খুলে যায়। অতঃপর সত্যের খোঁজে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ইসলামের কেন্দ্রে এতো অধিক হারে আসতে থাকে যেমন তসবীহমালার সুতা ছিঁড়ে গেলে এর দানাগুলো ঝরতে থাকে, ঠিক তেমনি তসবীহ দানাগুলোর ন্যায় ক্রমে ক্রমে আরবের লোকেরা ইসলামের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে থাকে।

এই প্রতিনিধিদল তাদের স্ব স্ব এলাকা ও কেন্দ্রগুলোতে নতুন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে, ঈমানের নবতর নেশা, ইসলামের দাওয়াতের নতুনতর প্রেরণা ও আবেগ-উদ্দীপনা এবং শির্ক ও মূর্তি পূজা, এসবের চিহ্ন, জাহিলিয়াত ও এর প্রভাবসমূহের বিরুদ্ধে একটা তীব্র ঘৃণা নিয়ে ফিরে আসত।

ঐ প্রতিনিধিদলের মধ্যে বনী তামীমেরও প্রতিনিধিদল ছিল যে দলে তাদের গোত্রের মশহুর নেতৃবৃন্দ ও অভিজাত ব্যক্তিরা ছিলেন। তাদের খতীব (বক্তা) ও কবির সঙ্গে মুসলমানদের খতীব ও কবির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় মুসলিম খতীব ও কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বনূ তামীমের নেতারা ও অভিজাত ব্যক্তিরাও তা মেনে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন।[২]

বনী আমের-এর প্রতিনিধিদলও আসে। সা'দ ইবন বকরের পক্ষ থেকে যিমাম ইবন ছালাবা প্রতিনিধি হিসাবে আসেন এবং দাঈ ও মুবাল্লিগ হিসাবে আপন গোত্রে ফিরে আসেন। ফেরার পর তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা ছিল এ ধরনের : অমঙ্গল হোক লাত ও উয্যার! সকলেই চমকে উঠে বলল, “আরে যিমাম! তুমি বল কি? শ্বেত, কুষ্ঠ ও মৃগী রোগের শিকার হতে চাও নাকি (দেবতার অভিশাপকে ভয় কর)?” যিমাম বলতে লাগলেন, তোমাদের অকল্যাণ হোক! আল্লাহর কসম! এরা না কারো ক্ষতি করতে পারে, না পারে কারো উপকার করতে। আল্লাহ নিশ্চিতরূপে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর একটি কিতাব নাযিল করেছেন যার মাধ্যমে তোমরা যার ভেতর ডুবে আছ তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অংশীহীন এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি তাঁর কাছ থেকে সেসবই তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি যা তিনি আদেশ দিয়েছেন এবং যা কিছু থেকে তিনি

---

১. মাজমাউ বিহারিল-আনওয়ার, ৫ম খ., ২৭২।

২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫৬০-৬৮।

নিষেধ করেছেন। এরপর সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁর মহল্লার সকল নারী-পুরুষের এমন কেউ ছিল না যে ইসলাম কবুল করেনি।[১]

বনী হানীফার প্রতিনিধি দল আসে যাদের মধ্যে মুসালামা কাযযাব (মিথ্যাবাদী)-ও ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করে, ইসলাম ত্যাগ করতে মুরতাদ্দ হওয়ার ফেতনা সেই উস্কে দেয় এবং এতেই সে মারা যায়।

বনী তাঈ প্রতিনিধি দলে বিখ্যাত অশ্বারোহী বীর যায়দ আল-খায়লও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে "যায়েদ আল-খায়র" রাখেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমানদের মধ্যে শামিল হন।

সে যুগের বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদী ইবন হাতেমও পবিত্র খেদমতে হাজির হন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর মহানুভব চরিত্র, ব্যবহার ও বিনয় দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলেন, আল্লাহর কসম! এ কোন বাদশাহর আচরণ নয়!

বনী যাবীদ-এর প্রতিনিধিদলও পবিত্র খেদমতে এসে হাযির হয়। প্রতিনিধিদলে আরবের খ্যতনামা বীর 'আমর ইবন মা'দীকারিবও ছিলেন। কিন্দাহ গোত্রের প্রতিনিধিদলে আশ'আছ ইবন কায়স শামিল ছিলেন। আয্দ গোত্রের প্রতিনিধিদল আসে। হামীর সুলতানের দূত এসে পৌঁছে এবং সুলতানের প্রেরিত পত্র পবিত্র খেদমতে পেশ করে। এতে সুলতানের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ জানানো হয়েছিল।

মু'আয ইবন জাবাল ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি য়ামানে পাঠান এবং তাঁদেরকে এই উপদেশ দেন, يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا। "দেখ, তোমরা উভয়ে নরম ও কোমল ব্যবহার করবে, কঠোরতা দেখাবে না, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না।"[২]

ফারওয়াহ ইবন 'আমর আল-জুযামী একজন দূত পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেন। ইনি রোম সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে মা'আন ও তার পাশে সিরীয় এলাকার গভর্নর ছিলেন।

নাজরান বনূ আল-হারিছ ইবন কা'ব হযরত খালিদ (রা) ইবনুল ওয়ালীদ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খালিদ (রা) সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের তা'লীম দেন। অতঃপর খালিদ (রা) বনূ আল-হারিছের একটি প্রতিনিধিদলসহ ফিরে আসেন। প্রতিনিধিদলটি যখন তাদের নিজ এলাকায় ফিরে যায় তখন তাদের তালীমের জন্য রাসূল আকরাম ﷺ 'আমর ইবন হায্মকে পাঠান যাতে তিনি তাদের সুন্নাহ, ইসলামের আদব ও রীতিনীতিসমূহ জানিয়ে দিতে

১. প্রাগুক্ত, ৫৭৪ পৃ.।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী।

পারেন, পারেন যাকাত ও সাদকার ব্যবস্থাপনার আনজাম দিতে। হামদান গোত্রের প্রতিনিধিদলও এ সময় এসে হাজির হয়।[১]

মুগীরা ইবন শুবা (রা)-কে নবী আকরাম ﷺ 'লাত' নামক মূর্তি ভাঙবার জন্য সদল প্রেরণ করেন। তিনি একে ভেঙে খানখান করে দেন। এরপর তিনি মূর্তিঘরের দেয়ালে উঠে একটি একটি করে এর প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড খসিয়ে ছাড়েন এবং সকলে মিলে একে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেন। তিনি দলের অপরাপর সদস্যের সঙ্গে ঐদিনই ফিরে আসেন এবং রাসূল আকরাম ﷺ-এর খেদমতে সব কিছু বলেন করেন। তিনি তাঁদের প্রশংসা করেন।[২]

'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের খোশ আমদেদ জানান। তিনি তাদেরকে সেসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন যার ভেতর দ্রুত নেশা জন্মে। হারাম ও নেশাকর বস্তু থেকে বাঁচার তাগিদে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি এসব নিষেধ করেন। কেননা তারা এতে খুব বেশি অভ্যস্ত ছিল।[৩]

আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের প্রতিনিধি দল বিরাট আনন্দ-উল্লাস সহকারে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এসে উপস্থিত হয়:

غدا نلقى الاحبه محمداً وحزبه.

"কাল আমরা প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হব; মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে।"

তিনি এই প্রতিনিধিদল দেখে বলেন :

اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والينهم قلوباً الايمان يمان والحكمة يمانية.

"তোমাদের কাছে ইয়ামনবাসীর আগমন ঘটেছে যারা খুবই নরম কোমল দিলের মানুষ। ঈমান য়ামানবাসীদেরই অংশ আর য়ামানের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয়।"[৪]

খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জামা'আত সহকারে ইসলাম প্রচারের জন্য য়ামনবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন। এই জামা'আত সেখানে ছয় মাস কাটায়। হযরত খালিদ (রা) তাদেরকে ক্রমাগতই দাওয়াত দিতে থাকেন, কিন্তু তারা তা কবুল করত না। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে পাঠান। তিনি

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৫৭৫-৯৬।

২. সীরাত ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৬২-৬৩।

৩. যাদুল-মাআদ, ২য় খ., ২৮; বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীছ ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণিত।

৪. সহীহ বুখারীতে قدوم الا شردبين واهل اليمن শীর্ষক অধ্যায়ে الفقه يمان। কথাটি বেশি আছে অর্থ দীনের উপলব্ধি য়ামনবাসীদের অংশ।

সেখানে হুযূর ﷺ -এর পত্র পাঠ করে শোনান। ফলে গোটা হামদান গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। হযরত আলী (রা) দরবারে নবুওয়াত এই সংবাদ প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা)-এর পত্র পাঠ শেষ সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বলেন, কাটায় হামাদানীদের ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক! হামাদানের ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক![১]

মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল ছিল চার শ' সদস্যের। নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দলটি ছিল ষাটজন আরোহীর। এদের ভেতর তাদের বড় পাদরী ও পণ্ডিত আবূ হারিছাও ছিলেন, ছিলেন তঁদের নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত শ্রেণীর ২৪ জন। রোম সম্রাট তাদেরকে খুবই সম্মান ও সমীহ করতেন, তাদের সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য দিতেন, তাঁদের গীর্জা নির্মাণ করে দিতেন। এঁদের সম্পর্কে কুরআন করীমের অনেক আয়াত নাযিল হয়।[২]

নাজরানবাসীদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পত্র প্রেরণ করেন। এতে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। পত্র পাঠ করে তারা একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে। প্রতিনিধিদল অনেক প্রশ্ন পেশ করে। প্রশ্নের উত্তরে সূরা আল-ইমরানের অনেক আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মুবাহালার[৩] আহ্বান জানান। কিন্তু তাদের পক্ষে শুরাহ্‌বীল ভয়ে এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি। পরদিন এই লোকগুলো পুনরায় পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে একটি লিখিত পত্র দেন। এতে নির্ধারিত রাজস্বের হার লিখিত ছিল। অতঃপর নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল-জাররাহ (রা)-কে এই বলে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন, ইনি এই উম্মাহর আমীন তথা বিশ্বস্ততম ব্যক্তি (هذا امين هذه الامة)।[৪]

তুজীব গোত্রের প্রতিনিধিদল এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশী হন। তিনি তাদেরকে বিরাট সম্মান ও খাতির-যত্ন করেন। তারা রাসূল ﷺ-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁদেরকে লিখিত উত্তর প্রদান করেন। এরপর তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে বহু বিষয় জিজ্ঞেস করতে থাকেন। এজন্য তাঁদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে খুব ইহতিমামের সঙ্গে তাঁদের যিয়াফত ও মেহমানদারী করতে বলেন। এরা কয়েকদিন তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে কাটান, কিন্তু বেশি দিন তাঁরা অবস্থান করতে পারেননি। তাঁদের

---

১. যাদুল-মাআদ, ২য় খ., ৩৩; বুখারী থেকে।

২. যাদুল-মাআদ, ২য় খ., ৩৫-৩৬।

৩. মুবাহালার প্রকৃতি ও বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাইলে সূরা আল-ইমরানের ৬১ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন।

৪. ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ১০০; ইমাম বুখারী নাজরানবাসীদের আলোচনায় এই ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন।

জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তাঁরা এত তাড়াহুড়া করছে? তাঁরা উত্তরে জানান, আমরা আমাদের লোকদের কাছে গিয়ে বলতে চাই আমরা কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারত লাভ করেছি, তাঁর সঙ্গে আমাদের কী কী কথা হয়েছে এবং তিনি আমাদের কথার কী জওয়াব দিয়েছেন। এরপর তাঁা ফিরে যান। অতঃপর হিজরীর ১০ম বর্ষে বিদায় হজ্জে মিনাতে তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে পুনরায় হাজির হন।[১]

এ প্রতিনিধিদলের মধ্যে বনী ফাযারাহ, বনী আসাদ, বাহরা' ও আযরাহর প্রতিনিধিদলও ছিল। এরা সকলেই ইসলাম কবুল করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তিনি তাদের গণক মহিলার নিকট যেতে এবং তাদের নিকট ভাগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিষেধ করেন।[২] তারা যেসব পশু কুরবানী দিত তাও নিষেধ করেন এবং বলেন, কেবল ঈদুল আযহার কুরবানী তাদের জন্য অনুমোদিত। এছাড়া বালী, যী মার্রাহ ও খাওলানের প্রতিনিধিদল পবিত্র খেদমতে হাজির হয়। তিনি তাদের নিকট খাওলানের মূর্তি সম্পর্কে, যে মূর্তির তারা পূজা করত, জিজ্ঞাসা করেন। জওয়াবে তারা জানায়: আপনার মুবারক হোক আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা দিয়ে আল্লাহতা'আলা এ বদলে দিয়েছেন। অবশ্য প্রাচীন আমলের কিছু কিছু বৃদ্ধা মহিলা এখনও তা আঁকড়ে রেখেছে। আমরা যখন ফিরে যাব তখন ইনশাআল্লাহ ঐ মূর্তি ভেঙে ফেলব।[৩] মুহারিব, গাসসান, গামিদ ও নাখ'আ-এর প্রতিনিধিদলও এ সময় আসে।[৪]

প্রতিনিধিদল নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে এসে দীন শিখত, ধর্মীয় জ্ঞান ও দীন বুঝত, মালা-মাসায়েল জানত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উন্নত ও মহান চরিত্র দেখত এবং সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্য ও সান্নিধ্য তাদের ভাগ্যে জুটত। অধিকাংশ সময় মসজিদে নববীর অঙ্গনে তাদের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হতো। তারা সেখানেই থাকত, কুরআন মজীদ শ্রবণ করত, মুসলমানদের সালাত আদায় করতে দেখত। তাদের মনে কোন কিছু মনে হলে অত্যন্ত সরল সোজা, খোলা মনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিত। তিনিও তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় ও হেকমতের সঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন, কুরআন মজীদ থেকে এর সাক্ষ্য পেশ করতেন। এসবে তাদের ঈমান আরও মযবুত হতো এবং আত্মিক ও তৃপ্তি লাভ ঘটত।

---

১. যাদুল-মাআদ, ২য় খ., ৪৩।

২. যাদুল-মাআদ, ২য় খ. ,৪৪-৪৭।

৩. প্রাগুক্ত, ৪৭ পৃ.।

৪. প্রাগুক্ত, ৪৭, ৫৫।

একজন জাহিল মূর্তি পূজারী ও নবী করীম ﷺ-এর কথোপকথন

কিনানা ইবন 'আবুদ য়ালীল ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল এখানে তা পেশ করা হচ্ছে :

কিনানা : ব্যভিচার সম্পর্কে আমাদের সমস্যা হলো, আমরা অনেক সময় নিঃসঙ্গ ও অবিবাহিত অবস্থায় থাকি।[১] কাজেই এ আমাদের জন্য অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ : এ তোমাদের ওপর হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ হলো,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَّسَاءَ سَبِيْلًا ـ

"অবৈধ যৌন সংযোগে যেয়ো না; এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"

[সূরা ইসরা : ৩২ আয়াত]

কিনানা : সুদ সম্পর্কে আপনি যা বলেন তাতে দেখা যায় আমাদের সমস্ত মালই তো সুদ আর সুদ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ: আসল পুঁজি তথা মূলধন নেবার অধিকার তোমাদের রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।" [সূরা বাকারা : ২৭৮, আয়াত]

কিনানা : শরাব (মদ)-এর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, এতো আমাদের যমীনের নিংড়ানো নির্যাস এবং আমাদের জন্য তা খুবই জরুরী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ : আল্লাহ তা'আলা একে হারাম ঘোষণা করেন এবং বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও পাশা (সবই) অপবিত্র শয়তানী কর্মের অন্তর্গত; অতএব, তোমরা এ সমস্ত ত্যাগ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" [সূরা আল-মাইদা : ৯ আয়াত]

---

১. সম্ভবত তারা বাণিজের উদ্দেশ্যে খুব বেশি সফর করত।

কিনানা : রাব্বা মূর্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

রাসূলুল্লাহ : একে ভেঙে ফেল।

কিনানা ও তার সহচরবৃন্দ: যদি রাব্বা জানতে পারে, আপনি তাকে ভাঙতে চাচ্ছেন তাহলে সে তার সকল পূজারীকে খতম করে দেবে।

এ সময় হযরত ওমর (রা) তাদের মাঝে বাধা দিয়ে বললেন, ইবন আবদ য়ালীল! তোমাদের সর্বনাশ হোক, তোমরা কত মূর্খ! তোমরা কি এও জান না রাব্বা একটি প্রস্তরখণ্ড ছাড়া কিছু নয়?

কিনানা ও তার সহচরবৃন্দ : ইবন খাত্তাব! আমরা তোমার কাছে আসিনি। এরপর তারা আবার রাসূলুল্লাহ -কে সম্বোধন করে বলল, আপনি ওকে ভেঙে ফেলুন, আমরা ভাঙতে পারব না।

রাসূলুল্লাহ : আমি তোমাদের ওখানে লোক পাঠাব। সে তোমাদের হয়ে এ কাজ করবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাদের বিদায় নেবার অনুমতি দিলেন এবং তাদের পূর্ণ সম্মান ও মেহমানদারী করলেন। তারা নিবেদন করল:হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের জন্য আমাদের কওমের কোন আমীর নিযুক্ত করে দিন। তিনি উছমান ইবন আবি'ল-আস (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি তাদের মধ্যে বয়সে সবার ছোট ছিলেন। কিন্তু ইলমে দীনের প্রতি তাঁর আগ্রহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ -এর জানা ছিল। তিনি সেখানে যাবার আগে কুরআন মজীদের আরও কিছু সূরাও মুখস্থ করে নিয়েছিলেন।[১]

প্রতিনিধিসমূহের আসার এ বছর আরবে মূর্তি পূজা ও মূর্তি পূজকদের উৎখাতেরও বছর ছিল।

যাকাত ও সাদাকা ফরয হলো

হিজরতের ৫ম বর্ষে যাকাত ফরয হয়।[২] যে সমস্ত এলাকায় ইতোমধ্যে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল রাসূলুল্লাহ সেসব এলাকায় আমীর ও আমিল (গভর্নর) নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন।

১. যাদুল-মাআদ, ২য় খ., ২৫।

২. হাফিজ ইবন হাজার-এর গবেষণা মুতাবিক (ফাতহুল-বারী)।

হাজ্জাতু'ল-বিদা' বা বিদায় হজ্জ
(যি'ল-হজ্জ ১০ হি./ফেব্রুয়ারী ৬৩২)

হাজ্জাতুল-বিদা ও এর সময় নির্বাচন

আল্লাহ্র ইচ্ছা পূর্ণ হলো। উম্মাহর আত্মাসমূহ মূর্তি পূজার আবর্জনা ও জাহিলিয়াতের আদত-অভ্যাস থেকে পাক-পবিত্র হলো এবং আলোকিত হলো ঈমানী রৌশনীতে। তাঁদের দিলে প্রেম ও ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হলো। আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা মূর্তি থেকে ও মূর্তির পূতিগন্ধময় আবর্জনা থেকে মুক্ত ও পাক-সাফ হলো। মুসলমানদের ভেতর (যারা বহু দিন হয় বায়তুল্লাহর হজ্জ ও যিয়ারত করেনি) হজ্জের প্রতি নবতর আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং প্রেম ও ভালবাসার পেয়ালা কেবল ভরেই ওঠেনি, বরং উছলে ও উপচে পড়বার উপক্রম হয়। অপরদিকে বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তও খুব কাছাকাছি ঘনিয়ে আসে। আর অবস্থার দাবিও হলো, উম্মাহকে বিদায় সালাম জানাতে হবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাবীব নবী করীম ﷺ-কে (১০ম হি.) হজ্জের অনুমতি দিলেন। ইসলামে এটি ছিল তাঁর প্রথম হজ্জ।

বিদায় হজ্জের দাওয়াতী, তাবলীগী ও তরবিয়তীর গুরুত্ব

তিনি মদীনা থেকে এই উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, তিনি বায়তুল্লাহর হজ্জ করবেন, মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হবেন, তাঁদেরকে দীনের তালীম দেবেন, হজ্জের নিয়ম-কানুন শেখাবেন, সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করবেন, আপন অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবেন, মুসলমানদেরকে শেষ উপদেশ দেবেন, তাঁদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নেবেন, জাহিলিয়াতের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলবেন এবং পায়ের তলে দাফন করবেন। এই হজ্জ হাজারো ওয়াজ-নসীহত, হাজারো দরস ও তালীমের স্থলাভিষিক্ত ছিল। এটি ছিল একটি চলতি ও ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা, একটি সক্রিয় ও গতিশীল মসজিদ এবং একটি চলন্ত ছাউনি যেখানে একজন মূর্খ জাহিল ইলম দিয়ে সজ্জিত হবে, গাফিল তার গাফলত থেকে সজাগ হবে, অলস চঞ্চল হবে, কমযোর শক্তিশালী ও বলবান হবে। রহমতের একটি মেঘ সফরে ও বাড়ী-ঘরে সকল অবস্থায় ও সব সময় তাঁকে ছায়া দান করত। এ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য, তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা, তাঁর প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বরূপী রহমতের মেঘ।

হাজ্জাতু'ল-বিদা'র ঐতিহাসিক রেকর্ড

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ন্যায় ও ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারিগণ এই সফরের নাযুক থেকে নাযুকতর দিক এবং নেহাতেই ক্ষুদ্র ঘটনার এমন একটি রেকর্ড আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন যার নজীর না রাজা-বাদশাহ কিংবা আমীর-উমারার সফরনামাগুলোতে পাওয়া যাবে, আর না পাওয়া যাবে উলামা ও মাশায়েখদের কাহিনীতে।[১]

বিদায় হজ্জের মোটামুটি পর্যালোচনা

আমরা এই হজ্জ সফরের সংক্ষিপ্তসার[২] এখানে পেশ করছি যাকে 'হাজ্জাতুল-বিদা', 'হাজ্জাতুল-বালাগ' ও 'হাজ্জাতু'ত-তামাম' নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে। আসলে এগুলোরই যোগফল ছিল এই হজ্জ, বরং এসবের চাইতেও ভিন্ন কিছু। এ সফরে তাঁর সঙ্গে এক লক্ষের বেশি সাহাবী শরীক ছিলেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে হজ্জ করলেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের এরাদা করলেন এবং দশম হিজরীর যি'ল-কা'দা মাসে লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন, তিনি এবার হজ্জে যাচ্ছেন। এ ঘটনা শুনে লোকেরা তাঁর সঙ্গে হজ্জে যাওয়ার আশায় প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

এ খবর মদীনার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে সব এলাকার লোকেরাও দলে দলে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে এত বিপুল সংখ্যক লোক কাফেলায় শামিল হয় যে, এর সংখ্যা নিরূপণও ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ ছিল যেন এক মানব সমুদ্র! সামনে পেছনে ডানে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু মানুষ আর মানুষ তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তিনি মদীনা থেকে ২৫ যিলকাদ রোজ শনিবার জোহর বাদ রওয়ানা হন। এর পূর্বে তিনি খুতবা দেন এবং এতে এহরামের ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহের বর্ণনা দেন।

---

১. উদাহরণস্বরূপ এসব বর্ণনায় এত দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়, তিনি এহরামের সময় কী ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন, কুরবানীর পশু চিহ্নিত করার জন্য দাগ দিয়েছিলেন, কোন্ পাশে ছিল তা। কোন্ ... তিনি বিছানা বিছিয়ে দিলেন, এমন কি মিনার রাতে এই বিশাল ভিড়ের ভেতর সাপ বের হওয়ার ... তার জীবন নিয়ে বেরিয়ে যাবার ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে এসব বর্ণনায়। এ ছাড়াও এই সফরে তিনি ... সমস্ত লোককে নিজের সঙ্গে আপন সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়েছিলেন (এঁদের সংখ্যা আটত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছে) তাঁদের নাম, এমন কি সেই ক্ষৌরকারের নামেরও উল্লেখ রয়েছে যিনি হুযূর (স)-এর ক্ষৌরকর্ম সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, কর্তিত চুল বণ্টন করার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, ডান পাশের চুল কাদের দেয়া হয়েছিল, বাম পাশের চুল কাদের দেয়া হয়েছিল। বিস্তারিত জানতে দেখুন শায়খুল হাদীছ মওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (র)-এর ...ع وجزء عمرات النبى ﷺ শীর্ষক গ্রন্থ এবং বর্তমান লেখকের প্রণীত গ্রন্থের ভূমিকা (বৈরূত সং.)।

২. আমরা এই সংক্ষিপ্তসার হাফেজ আল্লামা ইবনুল-কায়্যিম-এর যাদুল-মাআদ থেকে গ্রহণ করেছি।

৩. এই সংখ্যা এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার থেকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার পর্যন্ত বলা হয়েছে।

এরপর তিনি তালবিয়া পাঠ করতে করতে রওয়ানা হন।

لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك -

বিশাল জনসমুদ্র এই তালবিয়া কখনো সংক্ষেপে, কখনো বা কমিয়ে বাড়িয়ে বলছিল। কিন্তু এতে তিনি কাউকে কিছু বলেননি। তালবিয়া পাঠের সিলসিলা তিনি চালু রাখেন। অতঃপর তিনি 'আরজ নামক স্থানে পৌছে ছাউনি ফেলেন। এ সময় তাঁর সওয়ারী ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর সওয়ারী একই ছিল।

অতঃপর তিনি সামনে এগোলেন এবং আল-আবওয়া নামক স্থানে পৌছলেন। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে উসফান ও সারিফ উপত্যকায় পৌছান। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'যী-তুওয়া" নামক স্থানে মনযিল করলেন এবং শনিবার রাত সেখানে কাটান। সেদিন ছিল যিল-হাজ্জ মাসের ৪ তারিখ। ফজরের সালাত তিনি সেখানেই আদায় করেন। ঐদিনই তিনি গোসলও করেন এবং মক্কার দিকে রওয়ানা হন। তিনি দিনের বেলা উচ্চ ভূমি দিয়ে মক্কায় ঢোকেন। সেখান দিয়ে তিনি হারাম শরীফে ঢোকেন। এ সময় ছিল চাশতের ওয়াক্ত। বায়তুল্লাহর ওপর চোখে পড়তেই তিনি বলেন,

اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة -

"হে আল্লাহ! তোমার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা, তাজীম ও তাকরীম এবং ভীতিকর প্রভাব বাড়িয়ে দাও।" দস্ত মুবারক বুলন্দ করতেন, তাকবীর বলতেন এবং ইরশাদ করতেন,

اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام -

"হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় শান্তিদাতা আর তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি এসে থাকে। হে আমাদের রব! আমাদের শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখ।"

তিনি যখন হারাম শরীফে ঢুকলেন তখন সবার আগে কা'বা শরীফের দিকে ফিরলেন। হাজরে আসওয়াদ সামনাসামনি হতেই তিনি কোনরূপ বাধা ছাড়াই তাতে চুমু দিলেন। এরপর তাওয়াফের উদ্দেশে ডান দিকে ফিরলেন। এ সময় বায়তুল্লাহ তাঁর বাম দিকে ছিল। এই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে তিনি রাম্‌ল করেন।[১]

---

১. রাম্‌ল সম্পর্কে জানার জন্য হজ্জ ও যিয়ারত সম্পর্কিত কিতাবটি দেখুন।

তিনি দ্রুত গতিতে চলছিলেন। ছোট ছোট কদম ফেলে চলছিলেন। চাদর এক কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছিলেন, দ্বিতীয় কাঁধ ছিল খালি।[১] তিনি যখন হাজরে আসওয়াদ অতিক্রম করেছিলেন তখন সেদিকে ইশারা করে আপন ছড়ির সাহায্যে ইসতিলাম করছিলেন। তাওয়াফ শেষ হতেই তিনি মাকামে ইবরাহীমের পেছনে গেলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى এরপর তিনি এখানে দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে গেলেন এবং এতে চুমু খেলেন। এরপর সাফা পর্বতের দিকে তাঁর সামনের দরজা হয়ে চললেন। কাছাকাছি হতেই তিনি বললেন,

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ ابداء بما بداء الله به ـ

"সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আমি সেখান থেকে শুরু করছি যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন।"

এরপর তিনি এতে উঠলেন, এমন কি ততদূর পর্যন্ত উঠলেন যেখান থেকে বায়তুল্লাহ তাঁর চোখে পড়ছিল। অতঃপর তিনি কিবলার দিকে ফিরে আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়াত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিলেন :

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ـ لااله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ـ

"আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর আর সকল হাম্দ তথা প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নেই, তিনি এক; তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, আপন বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত দল ও উপদলকে একা নাস্তানাবুদ করেছেন।"

মক্কায় তিনি ৪/৫ দিন শনি, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার– এই কদিন থাকেন। বৃহস্পতিবার বেলা উঠতেই তিনি সকল মুসলমানকে নিয়ে মিনায় চলে যান। জোহর ও আসর সালাত তিনি এখানেই আদায় করেন এবং এখানেই রাত কাটান। এদিন ছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত জুমু'আর রাত। সূর্য উঠতেই তিনি

---

১. একে ইসলামী পরিভাষায় ইযতিবা (اضطباع) বলা হয়। বিস্তারিত জানতে হজ্জ সম্পর্কিত কিতাব দেখুন

আরাফাতের দিকে এগোলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এখানেই অবতরণ করলেন। বেলা ঢলে পড়তেই তিনি উটনী 'কাসওয়া'-কে প্রস্তুত করার হুকুম দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'আরাফাত প্রান্তরের মাঝখানে মনযিল করেন এবং আপন সওয়ারী পিঠে থেকেই তিনি এক ওজস্বিনী ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি ইসলামের বুনিয়াদসমূহ খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেন এবং শির্ক ও মূর্খতার বুনিয়াদ ধ্বংস করে দেন। এই ভাষণে তিনি সেই সব হারাম বস্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করেন যেগুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারে দুনিয়ার তাবৎ ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী একমত পোষণ করে। আর সেগুলো হলো : অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ধন-সম্পদ ছিনতাই করা, নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রম নষ্ট করা।

জাহিলিয়াতের তাবৎ বিষয় ও প্রচলিত কাজগুলো আপন পদতলে দাফন করেন। জাহিলিয়াত আমলের সুদ তিনি সমূলে খতম করেন এবং একে বিলকুল বাতিল বলে অভিহিত করেন। তিনি মহিলাদের সঙ্গে উত্তম আচার-আচরণের উপদেশ দেন এবং তাদের যে সমস্ত অধিকার রয়েছে, তারপর তাদের যিম্মায় যেসব অধিকার রয়েছে, তার বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, নিয়ম মুতাবিক আহার, পোশাক ও খোরপোশ তাদের অধিকার।

উম্মতকে তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার ওয়াসিয়াত করেন এবং বলেন, যতদিন তোমরা এর সঙ্গে নিজেদের ভালভাবে আঁকড়ে রাখতে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তিনি তাদেরকে সতর্ক করেন, তাদের কাল কিয়ামত দিবসে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তাদেরকে এর জওয়াব দিতে হবে। এ সময় তিনি উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করেন, তখন তাঁর সম্পর্কে কী বলবে এবং কী সাক্ষ্য দেবে? কম বেশি না করে পৌঁছে দিয়েছেন, আপন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কল্যাণ কামনার হকও আদায় করেছেন। এ কথা শুনে তিনি আসমানের দিকে আঙুল ওঠালেন এবং তিনবার আল্লাহ তা'আলাকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানালেন এবং তাদের এও হুকুম দিলেন, যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিত লোকদেরকে এ কথাগুলো যেন পৌঁছে দেয়!

খুতবা শেষ হতেই বিলাল (রা)-কে আযান দেবার হুকুম দিলেন। তিনি আযান দিলেন। এরপর তিনি জোহরের সালাত দুই রাকআত আদায় করলেন। ঠিক সেভাবে আসরেরও দুই রাক'আতই পড়লেন। দিনটা ছিল জুমু'আর দিন।

সালাত শেষ হতেই সওয়ারীতে উঠলেন এবং সেই উকূফের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন যেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আ করেছিলেন (জায়গাটি আজো আরাফাতে বিখ্যাত ও চিহ্নিত)। এখানে এসে তিনি তাঁর উটের ওপর বসলেন এবং সূর্যাস্ত

পর্যন্ত দু'আ ও মুনাজাত, শাহানশাহ রাজাধিরাজের সমীপে কান্নাকাটি, আপন দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের বিনীত প্রকাশের মাঝেই মশগুল থাকলেন। দু'আরত অবস্থায় তিনি তাঁর মুবারক হাত বুক পর্যন্ত তুলতেন যেন কোন ভিক্ষাপ্রার্থী ও অসহায় মিসকীন এক টুকরো রুটির যাচ্ঞা করছে। দু'আ ছিল এই,

اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى لا يخفى عليك شيئ من امرى انا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبى اسئلك مسالة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم انفه لك اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤفا رحيما يا خير المسئولين وياخير المعطين۔

"হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনে থাক এবং আমার জায়গাও তুমি দেখ। আমার গোপন ও প্রকাশ্য সব তুমি জান। তোমার কাছে আমার কোন কিছু গোপন বা লুক্কায়িত নেই, থাকতে পারে না। আমি বিপদগ্রস্ত, মুখাপেক্ষী, ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, অসহায়, আপন গুনাহর স্বীকৃতি প্রদান করছি, মেনে নিচ্ছি আমার সকল অপরাধ। তোমার সামনে অসহায় ভিক্ষুকের মত হাত পাতছি আর কাতরভাবে চাইছি যেভাবে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত গোনাহগার কাতরভাবে চাইতে থাকে। তোমার কাছে চাইছি যেভাবে চাইতে থাকে ভীত-শংকিত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি, তেমনিভাবে চাইছি যেমন নত মস্তকে চায় কেউ। আর তার চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে অশ্রুরাশি আর সমগ্র দেহমন দিয়ে যে তোমার দরবারে কাতর প্রার্থনা জানায় আর তোমার সামনে নাক ঘষতে থাকে। প্রভু হে! তোমার কাছে দু'আ কামনায় আমাকে ব্যর্থকাম কর না এবং আমার অনুকূলে তুমি বড়ই মেহেরবান ও দয়ালু হিসাবে ধরা দাও। ওহে সর্বোত্তম প্রার্থনা পূরণকারী ও সর্বোত্তম সর্বপ্রদাতা প্রভু!"

এই সময় এই আয়াত নাযিল হয়, [সূরা মাইদা : ৩]

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

সূর্যাস্তের পর তিনি 'আরাফাত থেকে রওয়ানা হলেন এবং উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি দৃঢ় প্রশান্ত চিত্তে ও ভাবগম্ভীর মর্যাদা সহকারে সামনে এগোলেন। উটনীর রশি তিনি এভাবে গুছিয়ে নিয়েছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তাঁর মস্তক মুবারক বুঝি উটনীর কুঁজ স্পর্শ করবে! তিনি বলে চলছিলেন, লোক সকল! নিরাপদ প্রশান্তির সঙ্গে চল। গোটা রাস্তা তিনি তালবিয়া পাঠ করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি মুযদালিফা গিয়ে পৌঁছেন। এ ধারা চলতে থাকে। মুযদালিফায় পৌঁছেই তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলেন। আযান দেয়া হলো। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উট বসানো ও সামান নামানোর আগে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। লোকেরা সামান নামালে তিনি সালাতুল-এশাও আদায় করলেন। এরপর তিনি আরাম করবার জন্য শুয়ে পড়লেন এবং ফজর পর্যন্ত ঘুমালেন।

আওয়াল ওয়াকতে তিনি সালাতুল-ফজর আদায় করলেন। এরপর তিনি সওয়ারীর পিঠে উঠে বসলেন এবং মাশ'আরুল-হারাম-এ আসেন এবং কেবলামুখী হয়ে দু'আ ও মিনতিভরা কান্না, তাকবীর-তাহলীল ও যিকর-এ মশগুল হন। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এতে মশগুল রইলেন। এ ছিল সূর্য ওঠার সময় অবস্থা। অতঃপর তিনি মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হন। ফযল ইবন আব্বাস (রা) এ সময় তাঁর উটনীর পিঠে তাঁর পেছনে বসে ছিলেন। তিনি বরাবরের মতই তালবিয়া পাঠ করছিলেন। তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে নির্দেশ দিলেন জামরায়ে আকাবায় পাথর ছোঁড়ার জন্য সাতটি পাথর কুড়িয়ে নিতে। ওয়াদীয়ে মুহাসসারের মাঝামাঝি পৌঁছতেই তিনি তাঁর উটনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং তা আরও দ্রুত করলেন। কেননা এটি সেই জায়গা যেখানে হস্তিবাহিনীর ওপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়েছিল। এভাবে তিনি মিনায় পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে জামরাতুল-আকাবায় তশরীফ নেন এবং সওয়ারীতে উঠে সূর্য ওঠার পর শয়তানের উদ্দেশে পাথর ছোঁড়েন এবং তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেন।

এরপর মিনায় ফিরে আসেন। এখানে তিনি একটি বগ্মিতাপূর্ণ খুতবা দান করেন। এতে তিনি কুরবানীর দিনের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সকলকে জানিয়ে দেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে এই দিনটির যে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তা বর্ণনা করেন। অপরাপর সমস্ত শহরের ওপর মক্কার যে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে তার উল্লেখ করেন এবং যে আল্লাহর কিতাব (কুরআনুল করীম)-এর আলোকে তাদের নেতৃত্ব দেবে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য তাদের ওপর ওয়াজিব বলে জানিয়ে দেন। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে তাঁর থেকে হজ্জ, কুরবানীর মাসলা-মাসায়েল ও নিয়ম-কানুন জেনে নিতে বলেন। তিনি লোকদেরকে এও বলেন, দেখ, আমার পর

তোমরা কাফিরদের মত হয়ে যেও না, তাদের মত পরস্পরের গলা কাটতে লেগে যেও না। তিনি আরও নির্দেশ দেন, কথাগুলোর অপর লোকদের পৌঁছে দেবে খুতবায় তিনি এও ইরশাদ করেন,

اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا اذا امركم تدخلوا جنة ربكم -

"আপন প্রভু প্রতিপালকের ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর, (রমযান) মাসের সিয়াম পালন কর, শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তির নির্দেশ পালন কর, আপন প্রভু প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর।"

সে সময় তিনি লোকদের সামনে বিদায়ী কথাও বলেন এবং এজন্যই এই হজ্জের নাম হয় "হাজ্জাতুল-বিদা" বা বিদায় হজ্জ।

অতঃপর তিনি মিনায় কুরবানীর স্থলে পৌঁছেন এবং তেষট্টিটি উট স্বহস্তে কুরবানী করেন। যতগুলো উট তিনি কুরবানী দিয়েছিলেন, হিসাব করে দেখা যায় তত বছরই তিনি হায়াত পেয়েছিলেন। এরপর তিনি থামেন এবং হযরত আলী (রা)-কে বলেন ১০০ পূরণ হওয়ার যতগুলো বাকী আছে তা পূরণ করতে। মোটের ওপর কুরবানী সম্পূর্ণ হতেই ক্ষৌরকার ডেকে পাঠান, মস্তক মুণ্ডন করেন এবং মুণ্ডিত কেশ মুবারক কাছের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এরপর তিনি মক্কায় রওয়ানা হন। তাওয়াফ-ই ইফাদা আদায় করেন যাকে তাওয়াফ-ই যিয়ারাতও বলা হয়। অতঃপর তিনি যমযম কূপের নিকট গমন করেন এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করেন। এরপর ঐদিনই মিনায় ফিরে আসেন এবং সেখানেই রাত কাটান। দ্বিতীয় (পর) দিন সূর্যাস্তের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। সূর্যাস্তের সময় হতেই তিনি সওয়ারী থেকে নামেন, পাথর ছোঁড়ার জন্য গেলেন এবং জামরা-ই উলা থেকে পাথর ছোঁড়া শুরু করেন। এরপর জামরা-ই উস্তা ও অতঃপর জামরাতে আকাবায় শেষ করেন। মিনায় তিনি দু'টি খুতবা দেন। তন্মধ্যে একটি দেন কুরবানীর দিন যার কথা আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, দ্বিতীয় কুরবানীটি পরদিন।

এখানে তিনি যাত্রা বিরতি করেন এবং আয়্যামুত-তাশরীক-এর তিন দিনই পাথর ছোঁড়েন। অতঃপর তিনি মক্কা যাত্রা করেন, শেষ রাতে বিদায়ী তাওয়াফ করেন, লোকজনকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন এবং মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন।[১]

---

১. এই অংশটি যাদুল-মাআদ থেকে সংক্ষেপে গ্রহণ করা হয়েছে (১৮০-২৪৯ পৃ., ১ম খণ্ড) এবং সে সব আলোচনা বাদ দেয়া হলো যেখানে লেখক বিস্তৃত বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। ফকীহ ও মুহাদ্দিছদের মত পার্থক্যও বাদ দেয়া হয়েছে।

পথে গাদীর-ই খুম[১] নামক স্থানে পৌঁছে তিনি একটি খুতবা[২] দেন এবং হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনা করেন। এ সময় তিনি বলেন,

من كنت مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ۔

"আমি যার প্রিয়, আলীও তার প্রিয় হওয়া উচিত। হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালবাসবে তুমিও তাকে ভালবাস আর যে তার সঙ্গে শক্রুতা পোষণ করবে তুমিও তার সঙ্গে শক্রুতা পোষণ কর।"

তিনি যুল-হুলায়ফা এসে রাত কাটান। সওয়াদ-ই মদীনার প্রতি নজর পড়তেই তিনি তিনবার তকবীর বলেন এবং পাঠ করেন,

لااله الاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ۔

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; তাঁরই জন্য সাম্রাজ্য এবং তাঁরই জন্য হাম্‌দ বা প্রশংসা আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

তিনি আরও পাঠ করেন,

ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ۔

"ফিরে আসছি তওবারত, অনুগত, সিজদারত, আমাদের প্রভু প্রতিপালকের দরবারে প্রসংসারত অবস্থায়। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সমস্ত দল-উপদলকে এককভাবে পরাজিত করেছেন।"[৩]

তিনি দিনের বেলায় মদীনা তায়্যিবায় প্রবেশ করেন।

---

১. গাদীরে খুম মক্কা ও মদীনার মাঝে একটি স্থান। হুজফা থেকে এর দূরত্ব দু'মাইল।

২. ইমাম আহমদ, নাসাঈর বর্ণনানুসারে এই খুতবা প্রদানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, কিছু লোক হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে অহেতুক অভিযোগ করেছিল এবং তাদের সাথে তাঁর কিছুটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এমন কিছু লোক আলী (রা) সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিল যারা য়ামানে তাঁর সাথে ছিলেন। তারা হযরত আলী (রা)-এর ইনসাফপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিল, তিনি পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন (ইবন কাছীর, ৪র্থ, ৪১৫-১৬)।

৩. মুসলিম, আবূ দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত। বর্ণনাটি জাফর সাদিক (র) মুহাম্মদ আল-বাকির (র) থেকে এবং তিনি হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবা

এখানে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরাফাত ময়দানে দেয়া খুতবার পূর্ণ অংশ পেশ করছি, ঠিক তেমনি আয়্যামুত'তাশরীকের মধ্যবর্তীতে তাঁর দেয়া খুতবাও আমরা নিম্নে পেশ করছি। কেননা এই দু'টি অমূল্য খুতবা সীমাহীন গুরুত্বের উপদেশে পরিপূর্ণ ও বহুল ফলপ্রসূ।

আরাফার খুতবা

ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ـ الا ان كل شئ من امر الجاهلية تحت قدمى موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وان اول دم اضعه من فقتلته هذيل ، وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله ، فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتمو هن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم مالم تضلوا بعده ان اعتصمتم به تشهد انك قد بلغت واديت ونصحت ، فقال باصبحعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات ـ

"তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ তেমনি পবিত্র ও সম্মানিত যেমন পবিত্র ও সম্মানিত তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাস ও তোমাদের এই শহর। মনে রেখ, জাহিলী যুগের সকল কিছুই আমার পদতলে পিষ্ট করা হলো এবং জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত সকল কিছুই আমার পদতলে দলিত করা হলো এবং জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত সকল রক্তপাত (খুনের বদলে খুন, প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড) আজ নিষিদ্ধ করা হলো এবং সর্বপ্রথম আমি (আমার বংশের) ইবন রবী'আ ইবনিল-হারিছের রক্তের বদলা বাতিল ঘোষণা করছি, যে বনী সা'দে লালিত-পালিত হয়েছিল এবং হুযায়ল গোত্র তাকে হত্যা করেছিল। জাহিলী যুগের সকল সুদ বাতিল ঘোষিত হলো এবং সর্বপ্রথম আমি (আমার বংশের) 'আব্বাস

ইবন 'আবদিল-মুত্তালিবের সুদ বাতিল ঘোষণা করছি। কেননা এর সবটাই বাতিল। নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের সতীত্ব-সম্ভ্রমকে আল্লাহ্‌র কালেমার বিনিময়ে তোমাদের জন্য হালাল করেছ। আর তোমাদের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে যেন তোমাদের শয্যাপাশে না আসতে দেয়। তারা যদি তা করে তবে তোমরা তাদেরকে প্রহার করবে, তবে এমনভাবে যেন তার চিহ্ন বাইরে ফুটে না ওঠে। আর তাদের ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা করবে। আর আমি তোমাদের কাছে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাক তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব। তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসা করা হবে সেদিন তোমরা তার কি জওয়াব দেবে? সাহাবায়ে কিরাম (রা) সমস্বরে উত্তর দিলেন, আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্‌র পয়গাম আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে শাহাদত অঙ্গুলি উঁচিয়ে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাক।"

আয়্যাম-ই তাশরীক-এর মধ্যবর্তীতে যে খুতবা দিয়েছিলেন তার বক্তব্য নিম্নরূপ :

يايها الناس هل تدرون فى اى شهر انتم وفى اى يوم انتم وفى اى بلد انتم ؟ فقالوا فى يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام ، قال : فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا وفى بلدكم هذا الى يوم تلقونه ، ثم قال : اسمعوا منى تعيشوا ، الا لا تظلموا ، الا لا تظلموا ، الا لا تظلموا انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه الا وان كل دم ومال ومأثرة كانت فى الجاهليه تحت قد مى هذه الى يوم القيامة ، وان اول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا فى بنى ليث فقتل هذيل ، ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع وان الله عز وجل قضى أن اول ربا

يوضع ربا العباس بن عبد المطلب ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولاتظلمون ، الا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموت والارض ثم قرأ : إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ، ألا لا ترجعوا بعدى كفراً يضرب بعكم رقاب بعض ، ألا ان الشيطان قدأيس أن يعبده المصلون ، ولكنه فى التحريش ينكم واتقوا الله فى النساء فانهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئا وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا ان لا يوطئن فرشكم أحد غيركم ، ولا يؤذن فى بيوتكم لاحد تكرهونه ، فان خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غيرمبرح ولهن رزقهن وكوتهن بالمعروف وإنما اخذتموهن بامانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من انتمنه عليها وبسط يديه وقال ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب ، فانه رب مبلغ اسعد من سامع ـ

"লোক সকল! তোমরা কি জান কোন্ মাস, কোন্ দিন ও কোন্ শহরে তোমরা আছ? জওয়াবে লোকেরা বলল : সম্মানিত দিনে, সম্মানিত শহরে ও সম্মানিত মাসে আমরা আছি। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের ইযযত-আবরূ কিয়ামত পর্যন্ত তেমনি পবিত্র ও সম্মানিত যেমন পবিত্র ও সম্মানিত আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর। অতঃপর বলেন, আমার কথা শোন যাতে তোমরা সহীহ-শুদ্ধ জীবন যাপন করতে পার। সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না; সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না, খবরদার! তোমরা জুলুম করবে না। আর

কোন মুসলমানের ধন-সম্পত্তি থেকে তার সম্মতি ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। সর্বপ্রকার রক্ত, সব ধরনের ধন-সম্পদ, যা জাহিলী যুগ থেকে চলে আসছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল ঘোষিত হলো। আর সর্বপ্রথম যে রক্ত (প্রতিশোধ হিসাবে) বাতিল ঘোষিত হচ্ছে তা রবীআ[১] ইবনুল হারিছ ইবন আবদিল-মুত্তালিবের রক্ত, যে বনী লায়ছ-এ প্রতিপালিত হয়েছিল এবং যাকে হুযায়ল (গোত্র)-র লোকেরা হত্যা করেছিল। জাহিলী যুগের সর্বপ্রকার সুদ রহিত করা হলো এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা, সর্বপ্রথম সেই সুদ রহিত করা হবে যা হবে আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তবে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবে। এ ব্যাপারে তোমরা নিজেরা অত্যাচারিত হবে না আর তোমরাও কারো ওপর জুলুম করবে না। আদিতে তিনি যখন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছিলেন, কালের আবর্তনে-বিবর্তনে আজ সেখানেই এসে পৌঁছেছে। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ .

"আল্লাহ্র নিকট গণনার মাস হিসাবে বার মাস সেদিন থেকে যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সময় হিসাবে; এর মধ্যে চারটি মাস পরম সম্মানিত। আর এটাই আল্লাহ্র সুস্পষ্ট দীন বা জীবন বিধান। অতএব, তোমরা এই মাসগুলোতে (অন্যায় হত্যাকাণ্ডে জড়িত হয়ে) নিজেদের ওপর জুলুম করো না।"

"আর হ্যাঁ, আমার পর আমার অবর্তমানে তোমরা পরস্পর মারামারি করে কাফির হয়ে যেও না। মনে রেখ! শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে, যারা সালাত আদায় করে তারা কোনদিন তার পূজারী হবে না। তবে হ্যাঁ, সে তোমাদের বিভিন্ন রকমের চক্রান্তের উস্কানি দেবে। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয়

---

১. সহীহ মুসলিম, সুনান আবী দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে রবী'আর পরিবর্তে ইবন রবী'আ বলা হয়েছে। আর এটাই এর মর্ম। কেননা রবীআ ইবনুল-হারিছ রাসূল (সা)-এর সম্পর্কিত ভাই। তিনি তাঁর ইনতিকালের পরও হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যে বর্ণনায় রবী'আ ইবনুল-হারিছ-এর রক্তপণের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো, তিনি পুত্র নিহত হারিছের রক্তপণের অভিভাবক বিধায় যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দাবি করার অধিকারী; আর তাই তাঁর নামে নেয়া হয়েছে। নববীকৃত মুসলিমের ভাষ্য, ১৮৩ পৃ.।

করবে। কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে। তারা নিজেদের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কিছু করতে সক্ষম নয়। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং তাদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো তারা আপন স্বামী ছাড়া তাদের শয্যায় কাউকে ঢোকার অধিকার দেবে না এবং তোমাদের অপসন্দনীয় কাউকে তোমাদের ঘরে অনুমতি দেবে না। যদি তাদের থেকে অবাধ্যতার আশংকা কর তাহলে তাদেরকে উপদেশ দাও, বোঝাও এবং তাদের শয্যা ত্যাগ কর, পৃথক করে দাও এবং তাদের হাল্কাভাবে প্রহার কর; আর তাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে খোরপোশ প্রদান কর। এ তাদের প্রাপ্য অধিকার। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নামে তাঁর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র নামে তাদের সতীত্ব-সম্পদ নিজেদের জন্য বৈধ করেছ। মনে রেখ, কারো কাছে অপর কারোর আমানত রক্ষিত থাকলে সে যেন আমানতকারীর নিকট তা ফেরত দেয়। এতদূর বলার পর তিনি আপন হস্তদ্বয় প্রসারিত করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? আমি কি পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? অতঃপর যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কেননা এমন অনেক অনুপস্থিত লোক আছে যারা উপস্থিত শ্রোতাদের তুলনায় অধিক ভাগ্যবান হয়ে থাকে।”

ওফাত

(রবী'উল-আওয়াল ১১ হিজরী)

দাওয়াত, তাবলীগ ও শারী'আর বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে : পরম প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের প্রস্তুতি

দীন ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ـ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনের পূর্ণতা দান করলাম, তোমাদের ওপর আমি আমার নে'য়ামাত পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে আমি মনোনীত করলাম।" [সূরা মাইদাহ : ৩ আয়াত]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়াতের পয়গাম মানুষকে পৌঁছে দিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অর্পিত আমানত এতটুকু কম বেশি না করে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, সত্যের পথে কুরবানী ও আত্মত্যাগের হক আদায় করেছেন এবং এমন এক উম্মত তৈরি করলেন যে উম্মত নবীর দায়িত্বে আসীন না হয়েও নবুওয়াতের যিম্মাদারী আদায় করতে পারে। তিনি তাদেরকে এই দাওয়াতের পতাকাবাহী ও এই দীনকে যাবতীয় বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার যিম্মাদার বানালেন। আল্লাহতা'আলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; মানব সমাজের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কর্মের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ করে থাক আর আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক।"

[সূরা আল ইমরান : ১১০ আয়াত]

এরই সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের, যা এই ধর্মের বুনিয়াদ এবং ঈমান ও য়াকীনের মূল উৎস, হেফাজত তথা রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়িত্বের যিম্মাদারীও গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ـ

"নিশ্চয় এই উপদেশ (কুরআন মজীদ) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষক।" [সূরা হিজর : ৯ আয়াত]

অপর দিকে তিনি এই ধর্মের দিকে সাধারণ মানুষের ফেরা এবং বড় বড় দল ও গোত্রের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আপন নবীর চক্ষু শীতল করেন এবং গোটা পৃথিবীতে এর বিস্তার ও প্রচার-প্রসারের চিহ্ন প্রকাশিত হতে থাকে এবং পরিষ্কারভাবে দেখাতে থাকে, দেখতে দেখতে এই ধর্ম (ইসলাম) দুনিয়ার অপরাপর সকল ধর্মের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং বিজয়ী হবে।

সূরা নাসরে আল্লাহতাআলা এরই প্রতি ইশারা করেছেন,

إِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ـ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসল এবং তুমি দেখলে লোক দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে। অতএব, তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের প্রশংসাগীতি সহকারে তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি বড়ই তওবা কবুলকারী।" [সূরা নাসর : ১-৩ আয়াত]

কুরআন মজীদের পুনরাবৃত্তি ও বর্ধিত ই'তিকাফ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল প্রতি রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। কিন্তু যেই বছর তিনি ইনতিকাল করেন সেই বছর এই ইতিকাফের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন এবং বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

হযরত জিবরীল (আ) রমযানের প্রতি রাতে এসে হযরত রাসূল আকরাম ﷺ -এর সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তিনি তাঁর (ফেরেশতা জিবরীল)-এর সাথে কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের পাঠ পুনরায় করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি বলেন, এবার তিনি একবারের জায়গায় দু'বার আসেন। এ থেকে আমার ধারণা হয়, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে!

এ সময় আল্লাহতাআলা তাঁর নবীকে তাঁর প্রভু প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর মিলনের অনুমতি দান করেন যাঁর চেয়ে বেশি তাঁর মোলাকাতের আগ্রহ আর কারো হতে পারে না। আল্লাহতাআলাও এই সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও খুব বেশী পরিমাণে আগ্রহী ও ইচ্ছুক ছিলেন এই সাক্ষাতের জন্য॥

আল্লাহতা'আলা সাহাবা-ই কিরাম (রা)-কেও তাঁর ইনতিকালের খবর শোনান এবং এই বিরাট আঘাত সইবার জন্য আগেই প্রস্তুত করেছিলেন যা না শুনে তাঁদের কোন উপায় ছিল না, অথচ রসূলপ্রেমিক হিসাবে সাহাবা-ই কিরাম (রা) চেয়ে সমগ্র যমীনের আর কেই-বা বেশি ছিলেন! এর আগে ওহুদ যুদ্ধে একবার তাঁর শাহাদাতের হঠাৎ খবর তাঁরা পেয়েছিলেন। পরে তাঁরা জেনেছিলেন, এটা ছিল শয়তানের একটি চক্রান্ত এবং তারই ছড়ানো একটি গুজব। আল্লাহতাআলা তাঁর নবীকে আয়াত-ই তায়্যিবা ও তাঁর সোহবত থেকে উম্মতকে উপকৃত হওয়ার আরেকটি সুযোগ দান করেছেন যদিও এ ঘটনা একদিন না একদিন ঘটবেই। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَاۡنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَـيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ۝

"আর মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল বৈ ত নন, তাঁর আগেও বহু রসূল গত হয়েছেন, তা তিনি যদি মারাই গিয়ে থাকেন কিংবা তিনি যদি শাহাদাতই লাভ করে থাকেন তবে কি তোমরা পলায়ন করবে? আর কেউ পলায়ন করতে চাইলে সে এ দ্বারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে সত্বর পুরস্কৃত করবেন।" [সূরা আল ইমরান : ১৪৪ আয়াত]

প্রথম যুগের এসব মুসলমান, যাঁদেরকে রাসূল ﷺ সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন, তাঁদের দিলকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং দুনিয়ার প্রত্যন্ত কোণে কোণে ও দূর-দূরান্তে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছাবার এক বিরাট ও পবিত্র কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি রাসূল ﷺ একদিন না একদিন এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে তাঁদেরকে রেখে যাবেনই এবং তিনি তাঁর এই দীর্ঘ অবিশ্রান্ত মেহনত ও অবিচল কুরবানীর সর্বোত্তম ফল ও পুরস্কার লাভের জন্য আপন প্রভু প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত হবেনই। যখন اذا جاء نصر الله والفتح এই আয়াত নাযিল হয় তখনই সাহাবা-ই কিরাম (রা)-বুঝে নিয়েছিলেন, এই আয়াত রাসূল ﷺ-এর ইনতিকালের পূর্বাভাস ঘোষণা করছে। কেননা নবুওয়াতের মিশন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে।[১]

---

১. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি যতদূর জানি, এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল বোঝানো হয়েছে। ইমাম আহমদ আপন সনদসহকারে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন اذا جاء نصر الله والفتح নাযিল হলো তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, "এই সূরায় আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে।" (দ্র. ইবন কাছীর)

উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে আমাকে মাথা ব্যথায় অসুস্থ দেখতে পেলেন। আমি তখন (ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম আর) বলছিলাম, আমার মাথায় কী যন্ত্রণা! তিনি বললেন : না, আমার মাথায় কত যন্ত্রণা! আয়েশা, আমার মাথায় কত কষ্ট![১] এরপর রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে সময় তিনি মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। তিনি এই ঘরেই তাঁর সকল স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের কাছে রোগাক্রান্ত অবস্থায় আয়েশা (রা)-এর ঘরে থাকার অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সকলেই সন্তুষ্টি চিত্তে অনুমতি দিলেন। তিনি পরিবারের দু'জন যাঁদের একজন ছিলেন হযরত ফযল ইবন আব্বাস ইবন আব্বাস (রা) ও অপরজন হযরত আলী (রা)-এর সাহায্যে সেখান থেকে বের হলেন। রাসূল ﷺ-এর মাথায় তখন পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি পা হেঁচড়ে চলছিলেন এবং এভাবেই হযরত আয়েশা (রা)-এ ঘরে যান।[২]

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যে রোগে তিনি ইনতিকাল করেন সেই রোগে অসুস্থ থাকা অবস্থায় এ কথা বলতেন, আয়েশা! সেই খাবারের কষ্ট এখন অনুভব করছি যা আমি খায়বারে খেয়েছিলাম। সেই বিষক্রিয়া[৩] এখন আমার শিরা (আবহুর)[৪] কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

শেষ অভিযান

রাসূল ﷺ জীবনের শেষ দিকে উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে একটি সৈন্যদলের আমীর নিযুক্ত করে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন, তাঁর ঘোড়া বালকা ও দারুম[৫] পর্যন্ত অবশ্যই যাবে। এটি ফিলিস্তীনের মধ্যে।

এই সৈন্যদলে তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রবীণ ও নির্বাচিত সাহাবীদের শামিল করেন যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত ওমর (রা)। রাসূল ﷺ ভীষণ রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তাঁদের সেখানে পৌঁছবার নির্দেশ দেন। এ সময় উসামার বাহিনী জুরুফ নামক স্থানে তাঁবু ফেলেছিল।[৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) হুযূর ﷺ-এর এই অন্তিম বাসনা পূরণের জন্য উসামা (রা) বাহিনীর অভিযান মুলতবি না করে বরং তা বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন।

---

১. ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৩৩।
২. সহীহ বুখারী (باب مرض النبى ﷺ وفاته)।
৩. সহীহ বুখারী; হাফিজ বায়হাকী হাকেম থেকে এবং তিনি যুহরী থেকেও বর্ণনা করেন। দ্র. ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৪৪৯।
৪. আবহুর সেই শিরাকে বলা হয়, যা পিঠ থেকে বের হয়ে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে মিলিত হয়। এটি ছিঁড়ে কিংবা কেটে গেলে মানুষ মারা যায়।
৫. ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৪২।
৬. ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৪৪১ পৃ.।

উসামা বাহিনীর প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও ইহতিমাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুভব করলেন, লোকে উসামা বাহিনীর ব্যাপারে কেমন যেন নিস্পৃহ! কেননা এর আগে কেউ কেউ এ ধরনের কথা বলেছিল, একজন নব তরুণকে জলীলুল-কদর সাহাবা এবং মুহাজির ও আনসারদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি মাথা ব্যথার কঠিন যন্ত্রণা ও তার জন্য মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থাতেও বাইরে তাশরীফ নেন এবং মিম্বরে বসেন। অতঃপর প্রথমে তিনি আল্লাহর উপযোগী হাম্‌দ ও ছানা পেশ করলেন। এরপর তিনি বললেন, লোক সকল! উসামার বাহিনী পাঠিয়ে দাও। আজ যদি তোমরা তার নেতৃত্বের ব্যাপারে কানাঘুষা কর তবে মনে রেখ, গতকালও তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও আপত্তি উঠিয়েছিলে। নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের উপযুক্ত এবং সে তার অধিকার রাখে যেমন তার পিতা এর অধিকার রাখত। এতটা বলে তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং লোকেরা দ্রুত এর প্রস্তুতিতে লেগে গেল।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পীড়া আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। অপরদিকে উসামা (রা) বাহিনীসহ রওয়ানা হয়ে যান এবং মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে 'জুরুফ' নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন যাতে বাকী লোক যারা আসতে চায় তারা সকলেই এখানে জমায়েত হতে পারে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ পীড়িত ছিলেন। আর উসামা (রা) ও তাঁর সাথীবৃন্দ সেখানে ছাউনি ফেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরবর্তী অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছায় তা দেখার জন্য গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।[১]

এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি মুসলমানদের অন্তিম উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেন, তারা যেন এই বাহিনী ঠিক সেভাবে পাঠায় যেভাবে তিনি পাঠাতেন এবং জাযীরাতুল আরবে তারা যেন দ্বিতীয় কোন ধর্মের অবকাশ না রাখে। তিনি এও বলেন, কাফির মুশরিকদের এখান থেকে বের করে দেবে।[২]

মুসলমানদের জন্য দু'আ এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য ব্যকুলতা ও গর্ব থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্কবাণী

অসুস্থ অবস্থায় কিছু সাহাবা-ই-কিরাম (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে একত্র হন। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁদের জন্য হেদায়াত, নুসরাত ও আল্লাহর তওফীক কামনায় দু'আ করেন। অতঃপর তিনি

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৫০, আরও দ্র. সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযী, যায়দ ইবন হারিছার যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়। এতে আরো আছে, যদি আজ তার নেতৃত্বের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তি থাকে তবে তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে এর আগেও তোমরা আপত্তি করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল, আমার প্রিয় ছিল এবং তারপর এ আমার প্রিয়তমদের।

২. সহীহ বুখারী مرض النبى ﷺ ووفاته শীর্ষক অধ্যায়।

বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে ওসিয়ত করছি এবং আমার পরে আল্লাহতা'আলাকেই তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করছি। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী ও সতর্ককারী। দেখো, আল্লাহর জনপদ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে অহংকার ও প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতায় মেতো না এজন্য যে, আল্লাহতা'আলা আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আগেই বলে দিয়েছেন,[১]

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"এটি পরলৌকিক আবাস আমি তাদের জন্য নির্মাণ করেছি যারা যমীনের বুকে প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষী নয় এবং যারা গোলযোগ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করতেও ইচ্ছুক নয়; আর আল্লাহভীরু (মুত্তাকীদের) জন্যই যাবতীয় পরিণাম।"

[সূরা কাসাস : ৮৩ আয়াত]

অতঃপর তিনি নিচের আয়াত তেলাওয়াত করেন :

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ -

"অহংকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম নয় কি?" [সূরা যুমার ঃ ৬০ আয়াত]

দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও অব্যয়িত অর্থের প্রতি বিতৃষ্ণা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন, "তিনি রাসূল ﷺ অসুস্থ অবস্থায় একবার জিজ্ঞেস করলেন : আয়েশা! সেই সোনার মোহরগুলো কি করেছ? আমি পাঁচ অথবা সাত কিংবা নয়-এর মত আশরাফী নিয়ে এলাম। তিনি সেগুলো হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমি এগুলোসহ আল্লাহকে কিভাবে মুখ দেখাব?[২] যাও, এগুলো আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দাও।"[৩]

সালাতের ইহতিমাম ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং তবিয়তও ভারি হয়ে উঠতে লাগল। এ অবস্থায় তিনি জানতে চাইলেন, লোকেরা সালাত আদায় করেছে কি না? আমরা জওয়াবে বললাম: না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলেই আপনার অপেক্ষা

---

১. বায়হাকী (ইবন কাছীরকৃত আস-সীরাতুন নাবায়্যি, ৪র্থ খ., ৫০২)।

২. হাদীছের মূল শব্দ ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده যার শাব্দিক অর্থ হলো, "মুহাম্মদ ﷺ-এর আল্লাহর সাথে কি ধারণা হবে যখন সে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করবে এমন অবস্থায় যখন এসব আশরাফী এ সময় তাঁর কাছে রয়েছে?"

৩. মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ৬ষ্ঠ খ., ৪৯ পৃ.।

করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য পানির পাত্রে পানি রেখে দাও। নির্দেশ পালিত হলো। তিনি গোসল করলেন। এরপর তিনি ওঠবার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। হুঁশ ফিরে পেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সবাই কি সালাত আদায় করেছে? সকলেই জানাল, না, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সকলেই আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। সে সময় সকলেই মসজিদে নববীতে চুপচাপ বসে এশার সালাতের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলে পাঠালেন সালাতের ইমামতি করতে। হযরত আবূ বকর (রা) খুবই নরম দিলের মানুষ ছিলেন। তিনি বললেন, ওমর! তুমি সালাতে ইমামতি কর। হযরত ওমর (রা) বললেন, এ বিষয়ে আমার তুলনায় আপনিই অধিক উপযুক্ত ও বেশি হকদার। এরপর পীড়ার দিনগুলোতে হযরত আবূ বকর (রা)-ই ইমামতি করতে থাকেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করতে থাকেন এবং শরীরও অনেকটা হাল্কা মনে হতে থাকে। তিনি হযরত আব্বাস (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে জোহরের সালাতের জন্য বাইরে তশরীফ নিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেই পেছনে আসতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইঙ্গিতে পিছিয়ে আসতে নিষেধ করলেন এবং হযরত আব্বাস ও আলী (রা)-কে বললেন, তাঁকে আবূ বকরের পাশে বসিয়ে দিতে। হযরত আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে সালাতের ইমামতি করতে থাকেন এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশে বসে সালাত আদায় করেন।

উম্মুল-ফযল বিনতুল-হারিছ (রা) বর্ণনা করেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাগরিবের সালাতে সূরা ওয়াল-মুরসালাত পাঠ করতে শুনেছি। এরপর আর কোন সালাতে তাঁর ইমামতি করা সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এ অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে তাঁর কাছে ডেকে নেন।[১]

বিদায়ী ভাষণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ থাকার দিনগুলোতে মিম্বরে বসে উম্মতের উদ্দেশে বেশ কিছু কথা বলেছিলেন[২] আর সে সময় তাঁর মাথায় ছিল পট্টি বাঁধা। এ সময় একবার তিনি এও বলেছিলেন,

ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عندالله ـ

১. বুখারী।

২. হাদীছের ধারাবাহিকতা থেকে বোঝা যায়,এটিই ছিল শেষ খুতবা।

"আল্লাহ বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে এ দু'টোর মধ্যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার এখতিয়ার দিলেন। আল্লাহর বান্দাহ তখন আল্লাহর কাছে যা আছে তাই বেছে নিলেন।"

উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার মর্ম বুঝে ফেললেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন, এ দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। আর এটা বুঝতে পেরে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, না! আমাদের জীবন ও সন্তান-সন্ততি সব কিছুই আপনার জন্য কুরবান!

তিনি বললেন : আবূ বকর! থাম, তাড়াহুড়া কর না। নিঃসন্দেহে এমন কেউ নেই যে তার জীবন ও সম্পদ দিয়ে আমাকে এতটা উপকৃত করেছে যতটা করেছে আবূ বকর (রা)। আর আমি যদি মানুষের মধ্যে কাউকে আমার বন্ধু বানাতাম তাহলে আবূ বকরকে আমার বন্ধু বানাতাম। কিন্তু ইসলামের সম্পর্ক ও ইসলামের প্রতি ভালবাসাই সবচেয়ে উত্তম।[১]

তিনি এও বলেন, (আমার মন চায়) আমার সামনের মসজিদের সকল জানালা[২] বন্ধ করে দিই, কেবল আবূ বকরের জানালা খোলা থাকুক।[৩]

আনসারদের সঙ্গে উত্তম আচরণের উপদেশ

হযরত আবূ বকর ও হযরত আব্বাস (রা) একবার আনসারদের এক মাহফিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, সকলে কাঁদছে। তাঁরা গিয়ে তাঁদেরকে তাঁদের কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ও তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলোর কথা মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে জানতে পেরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এ সময় তিনি তাঁর পবিত্র মস্তক চাদরের প্রান্তদেশ গিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি মিম্বরে বসলেন।[৪] এরপর আর কখনও তাঁর মিম্বরে বসার সুযোগ হয়নি। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানা পেশ করলেন যা তাঁর মর্যাদা ও শানের উপযুক্ত। এরপর তিনি বলেন,

"আমি তোমাদেরকে আনসারদের সঙ্গে উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। তারা দেহ ও আত্মার মত এবং তারা আমার আস্থাভাজন, আমার গোপন রহস্যের ধারক। তাদের ওপর যে দায়িত্ব ছিল তারা তা পুরোপুরিভাবে পালন করেছে। অন্যদের

---

১. বুখারী, কিতাবুস-সালাত, الخوخة والمعر فى الصلاة শীর্ষক অধ্যায়।

২. এখানে الخوخه শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ ছোট দরজা (জানালা)।

৩. বুখারী, কিতাবুস-সালাত, الخوخة والمعر فى الصلاة শীর্ষক অধ্যায়।

৪. অধিক নির্ভরযোগ্য মত হলো, এটাই তাঁর সেই শেষ খুতবা যা তিনি বৃহস্পতিবার দিন জোহর সালাত বাদ দিয়েছিলেন। এজন্য হাদীছ বর্ণনাকারী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, তিনি মিম্বরে উঠলেন এবং এ দিনের পর তাঁর আর কখনো মিম্বরে ওঠার সুযোগ ঘটেনি। এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা পেশ করলেন তাঁর শান মুতাবিক।

ওপর তাদের যে অধিকার তা এখনও রয়ে গেছে। এজন্য তোমাদের তাদের ভ
ও নেককার লোকদের পরামর্শ কবুল করবে এবং তাদের মধ্যে কেউ অন্যা
করলে তাকে মাফ করবে।"[১]

জামাতে কাতারবন্দী অবস্থায় মুসলমানদের প্রতি তাঁর শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ

হযরত আবূ বকর (রা) যথারীতি ইমামতি করতে থাকেন। সোমবার ফজরে
সালাত আদায়ের জন্য সাহাবা-ই কিরাম (রা) কাতার বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। এ
সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হুজরা মুবারকের পর্দা তুললেন এবং কিছুক্ষণ ধরে এই দৃ
দেখলেন, মুসলমানরা তাঁদের প্রভু প্রতিপালকের সামনে কিভাবে হাযির! তাঁর
দাওয়াত ও জিহাদ, তাঁর সারা জীবনের চেষ্টা-সাধনা কী রঙ নিয়ে এসেছে এবং এ
উম্মত কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে, যাঁরা সালাতের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়ভা
সম্পর্কিত এবং যাঁরা তাঁদের নবীর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে, বর্তমানে
অবর্তমানে উভয় হালতে একই রূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দে দরবারে ইলা
সমীপে বিনীতভাবে উপস্থিত। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে ও তাঁর জীবনব্যাপী সাধন
সাফল্য দেখে, যা তাঁর আগে আর কোন নবী কিংবা দাঈর ভাগ্যে জোটেনি, তাঁর
চোখ জুড়াল এবং তিনি নিশ্চিত হলেন, এই দিন ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
সাথে এই উম্মতের সম্বন্ধ চিরন্তন ও স্থায়ী যা তাঁর ইনতিকালের পরও শেষ হ
না। আল্লাহই ভাল জানেন, সে সময় তিনি কতটা খুশী হয়ে থাকবেন! এই দৃ
দেখে তাঁর চেহারা খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে। সাহাবা-ই কিরাম (রা) বলেন :

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর কামরার পর্দা তুললেন এবং দাঁড়ি
তাদের দেখতে থাকলেন। মনে হচ্ছিল, তাঁর চেহারা মুবারক যেন খোলা পৃষ্ঠা
ন্যায়! এরপর তিনি মুচকি হাসলেন। আমার ধারণা হলো : না জানি, আমরাও খু
দরুন পরীক্ষার সামনে পড়ি এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি! আমাদের এও ধার
হলো, সম্ভবত তিনি বাইরে তশরীফ আনবেন। তিনি ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে
সালাত শেষ কর। এরপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন এবং সেই দিনই ইনতি
করলেন।"[২]

**কবর পূজা এবং একে মসজিদ ও ইবাদতগাহে পরিণত করা সম্প
নিন্দা জ্ঞাপন**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ বাক্য ছিল :

قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد،
لايبقين دينان على ارض العرب ـ

১. বুখারী, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবা-ই কিরামের ফযীলত অধ্যায় ও ـــى ﷺ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم অধ্যায়।
২. বুখারী مرض النبى ﷺ ووفاته শীর্ষক অধ্যায়।

"আল্লাহতাআলা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ধ্বংস করুন! তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে ছেড়েছে। আরব ভূখণ্ডে একই সঙ্গে যেন দু'টো ধর্ম একত্রে সহ অবস্থান না করে (অর্থাৎ আরব ভূমি কেবল ইসলামের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে)।"[১]

হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন ইনতিকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল তখন একটি কালো পাড়যুক্ত চাদর তাঁর ওপর ছিল। এটি কখনো বা তিনি চেহারা মুবারকের ওপর ফেলছিলেন। বেশি কষ্ট হলে ফেলে দিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক! তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে (প্রার্থনাস্থলে) পরিণত করে ছেড়েছে। তিনি মুসলমানদেরকে এ থেকে সতর্ক করছিলেন।

অন্তিম উপদেশ

ইনতিকালের কাছাকাছি সময় তাঁর বেশির ভাগ ওসিয়াত ছিল এই, الصلاة وما ملكت ايمانكم "দেখো, সালাতের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং অধীনস্থ লোকের (দাস-দাসী ও চাকর-বাকরদের) প্রতি খেয়াল রাখবে।" এ কথা তিনি বারবার বলতে লাগলেন, এমন কি কথাগুলো মুখে উচ্চারণ করাও রাসূল ﷺ-এর কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। জানা যায়, বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো বারবার আওড়াবার চেষ্টা করেছেন।[২]

হযরত আলী কাররামাহুল্লাহু ওয়াজহুহ বর্ণনা করেন, তিনি এ সময় সালাত ও যাকাত আদায় এবং অধীনস্থ লোকজন ও দাস-দাসীদের সাথে উত্তম আচার-আচরণ ও ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন।[৩]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন, "আমি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দম করছিলাম। এমন সময় তিনি আসমানের দিকে চোখ তুলে চাইলেন এবং বললেন, فى الرفيق الاعلى ، فى الرفيق الاعلى "সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যে, সর্বোত্তম বন্ধুর নিকট।"

ঠিক এমনি মুহূর্তে আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর হাতে পীলু বৃক্ষের একটি তরতাজা ডাল ছিল। তিনি ডালটার দিকে এ নজর তাকালেন। আমি ধারণা করলাম, সম্ভবত তিনি এর দরকার মনে করছেন। তাঁর হাত থেকে ডালটা নিলাম এবং পাতাগুলো ঝেড়ে ফেলে মেসওয়াক বানিয়ে রাসূল ﷺ-কে পেশ করলাম। তিনি এটি নিয়ে খুব ভাল করে মেসওয়াক

---

১. ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৪৭১, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক সূত্রে বর্ণিত।

২. বায়হাকী ও আহমাদ (ইবন কাছীর, সীরাতুন্নাবাবিয়্যা, ৪র্থ খ., ৪৭৩)।

৩. ইমাম আহমদ (ইবন কাছীর, পূর্বোক্ত)।

করলেন যেমনটি তিনি সাধারণত করে থাকেন। এরপর তিনি মেসওয়াকটি আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু তা হাত থেকে পড়ে যায়।[১]

তিনি আরও বলেন, তাঁর (রাসূল আকরাম)-এর নিকট পানির একটি পাত্র ছিল। তিনি এতে হাত ডোবাচ্ছিলেন আর ভেজা হাত দিয়ে বারবার আপন চেহারা মুবারক মুছছিলেন আর বলছিলেন,

لا اله الا الله ، ان للموت لسكرات -

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিত সত্য।" এরপর তিনি তাঁর আঙুল ওপরের দিকে তুললেন এবং বলতে লাগলেন, فى الرفيق الاعلى ، فى الرفيق الاعلى। "সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যে, সর্বোত্তম বন্ধুর নিকট।" আর এভাবে বলতে থাকা অবস্থায় তাঁর রূহ মুবারক প্রিয়তম বন্ধুর কাছে পৌঁছে যায় এবং তাঁর হাত পানির ভেতর একদিকে ঢলে পড়ে।[২]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "ইনতিকালের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মস্তক মুবারক আমার উরুর ওপর ন্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণের জন্য তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। হুঁশ ফিরে পেতেই তিনি ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে চাইলেন এবং বললেন, اللهم الرفيق الاعلى। "হে আল্লাহ! সর্বোত্তম বন্ধু আমার। আর এটিই ছিল ইনতিকালের মুহূর্তে তাঁর মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ বাক্য।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ কী অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহজগত থেকে বিদায় নেন তখন গোটা জাযীরাতুল আরব তাঁর করতলগত। তৎকালীন দুনিয়ার তামাম শাসক, রাজা-মহারাজা ও আমীর-উমারা তাঁর ভয়ে ভীত-কম্পিত। সকলের অন্তরে মানসে তাঁরই প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর জন্য নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সব কিছু উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। এত সব সত্ত্বেও তিনি যখন এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নেন তখন তিনি তাঁর কাছে এক দীনার কিংবা এক দিরহাম, দাস-দাসী, এমন কি কোন কিছুই পেছনে রেখে যাননি। তাঁর কেবল সাদা রঙের একটি খচ্চর ছিল, অস্ত্রশস্ত্র ছিল (জিহাদের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য) আর ছিল এক টুকরো যমীন যা তিনি সাদাকা করে দিয়েছিলেন।[৩]

তাঁর ওফাতের সময় তাঁর জেরা (লৌহবর্ম)-টি এক ইয়াহুদীর কাছে তিরিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[৪] তাঁর নিকট তখন এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে তিনি

১. সীরাত ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৪৭৪, আরও দ্র. বুখারী।

২. বুখারী।

৩. বুখারী।

৪. প্রগুক্ত।

লৌহবর্মটি ছাড়িয়ে আনতে পারেন। আর এভাবেই তিনি এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।[১]

পীড়িত অবস্থায় তিনি চল্লিশজন ক্রীতদাস মুক্ত করেন। তাঁর নিকট ছয় / সাত দীনার ছিল। হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি সেগুলোও বিলিয়ে দেয়ার আদেশ দেয়া হলো।[২]

উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল হয় যখন আমার ঘরে এমন কিছু ছিল না যা জীবিত কোন প্রাণী খেতে পারে। অবশ্য সামান্য কিছু যব ছিল যা আমার তাকের ওপর রাখা ছিল। আমি এ থেকে কিছু খেয়েছি। অনেক দিন তা চলেছিল। তারপর একদিন তা মাপলাম। ব্যস! এরপর তাও শেষ হয়ে যায়।[৩]

তিনি ১১তম হিজরীর ১২রবীউল আওয়াল সোমবার দিন দুপুরের পর ইনতিকাল করেন।[৪] এ সময় তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। আর এই দিনটি ছিল সবচে' অন্ধকার ও ভয়াবহতম দিন, সবচে' বিষাদময় পরীক্ষার দিন আর গোটা মানবতার জন্য এই দিনটি ছিল বিরাট এক দুর্ঘটনা, যেভাবে তাঁর জন্ম তথা আবির্ভাবের দিনটি ছিল মানবতার ইতিহাসের সবচে' উজ্জ্বল ও বরকতময় দিন। হযরত আনাস ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় তশরীফ এনেছিলেন সেদিন মদীনার প্রতিটি বস্তু তাঁর আগমনে ধন্য, পূত-পবিত্র ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন সেদিন সব কিছুই যেন আঁধারে ঢাকা পড়ল! উম্মু আয়মনও কাঁদছিলেন। লোকে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে জানান: আমি জানতাম আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। আমি কাঁদছি এজন্য যে, ওয়াহয়ির ধারাবাহিকতা এই সাথে আমাদের থেকে চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল।[৫]

সাহাবায়ে কিরাম (রা) যেভাবে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেলেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের সংবাদ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ওপর বজ্রবৎ পতিত হয়। আর এর কারণ ছিল আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে তাঁদের প্রেম-ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক যার তুলনা মেলে না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর স্নেহছায়ায় থাকতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যেভাবে সন্তান তার

---

১. বায়হাকী, ৫৬২।

২. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩য় খ., ৩৮১ পৃ.।

৩. বুখারী ও মুসলিম, বুখারী, কিতাবু'র-রিকাক ও মুসলিম, কিতাবু'য-যুহ্দ।

৪. কোন কোন বর্ণনায় দুপুরের পূর্বে চাশতের সময় বলা হয়েছে (আল-ইস্তীআব)।

৫. আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৫৪৪-৪৬ পৃ.।

পিতামাতার স্নেহাঞ্চলের নিচে অবস্থান করে, বরং তার চেয়েও বেশি। এদিক দিয়ে তাঁদের ওপর তাঁর প্রভাবের কথা যতই বলা যাক, তা প্রকৃত অবস্থা থেকে কমই বলা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

"তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্যে একজন পয়গম্বর এসেছেন, তোমাদের জন্য কষ্টকর তা তাঁর জন্য দুর্বহ মনে হয় আর তিনি তোমাদের অতীব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, সদয়।" [সূরা তাওবা : ১২৮ আয়াত]

সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যেকেই মনে করতেন, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্নেহ-সদয় দৃষ্টিতে সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন। কোন কোন সাহাবী তো বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন! এঁদের মধ্যে প্রথমেই হযরত ওমর (রা)-এর নাম নেয়া যেতে পারে। যাঁরাই আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে দিতে চেয়েছেন তিনি তাঁরই ওপর কুপিত হয়েছেন। তিনি সরাসরি মসজিদে নববীতে আসেন এবং সকলের সামনে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন,

"মুনাফিকদের পরিপূর্ণরূপে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা নির্মূল করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের ইনতিকাল হবে না।"[১]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাহসী পদক্ষেপ

এ অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) [যাঁকে আল্লাহতাআলা নবুওয়াতের খিলাফত ও প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের হিম্মত ও প্রজ্ঞা দিয়ে তৈরি করেছিলেন]-এর মত সর্বোত্তম দৃঢ়তা, মনোবল ও পাহাড়সম হিম্মতের অধিকারী একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যিনি শত আঘাতেও টলবেন না। আবূ বকর (রা) এ সময় মদীনার অদূরে সানাহ নাম পল্লীতে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পেতেই তিনি দ্রুত চলে এলেন (বুখারী ৬৪০) এবং মসজিদে নববীর দরজা মুখে মুহূর্তের জন্য থামলেন। এ সময় হযরত ওমর (রা) [বেহুঁশপ্রায়] লোকজনেরর সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি কোন দিকে আদৌ না তাকিয়েই সরাসরি হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর শরীর মুবারক একখণ্ড চাদর দ্বারা তখন ঢাকা ছিল। তিনি চাদর সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারকে চুমু খেলেন এবং বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। মৃত্যুর স্বাদ যা আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন আপনি তা

১. সীরাত ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৫৪৪-৪৬।

চেখেছেন। এরপর আর কখনো সে স্বাদ আপনাকে চাখতে হবে না, আর কখনো আপনাকে মৃত্যু যাতনা সইতে হবে না। এরপর তিনি চাদর দিয়ে আগের মতই চেহারা মুবারক ঢেকে দিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে এলেন। হযরত ওমর (রা) তখনও কথা বলে চলছিলেন। তিনি ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, ওমর! থাম। কিন্তু বিষাদের আবেগে তাঁর কথা তিনি শোনেন নি। হযরত আবূ বকর (রা) যখন দেখতে পেলেন তিনি থামছেন না, তখন তিনি সমবেত জনতার দিকে অগ্রসর হলেন এবং নিজের কথা শুরু করলেন। তাঁকে কথা বলতে দেখে সকলেই হযরত ওমর (রা)-কে ছেড়ে তাঁর দিকে ছুটে এলেন। হযরত আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম আল্লাহ হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করলেন। এরপর বললেন :

"লোক সকল! যদি কেউ মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনুগত্য ও গোলামী করে থাক তবে সে জেনে রাখুক, নিশ্চিতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর যিনি আল্লাহর ইবাদত করেন তিনি (নিশ্চিত থাকুন এবং) জানুন, আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।" এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ -

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল বৈ নন! তাঁর আগেও অনেক রসূল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা শাহাদাত বরণ করেন তাহলে কি তোমরা পেছনের দিকে ফিরে যাবে? যারা পেছনের দিকে ফিরবে (ধর্মত্যাগী হবে) তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।"

যাঁরা এ সময় এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁরা বলেন : আল্লাহর কসম! হযরত আবূ বকর যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন তখন মনে হচ্ছিল এক্ষুণি বুঝি এই আয়াত নাযিল হলো আর আবূ বকর তাঁদের অন্তরের কথাই ব্যক্ত করলেন! হযরত ওমর (রা) বলেন, আবূ বকর (রা)-কে যখন এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম তখন আমি বিস্মিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার পায়ে তখন আদৌ যেন কোন শক্তি ছিল না! সে সময়ই কেবল আমি জানতে পারলাম, হুযূর ﷺ-এর ইনতিকাল হয়ে গেছে।[১]

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৫৫-৫৬, সহীহ বুখারী مرض النبي ﷺ ووفاته শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত

এরপর সকীফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে সক
খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। তাড়াতাড়ি করার কারণ হলো, শয়তান যে
মুসলমানদের মনে বিভেদের বীজ বপন করতে এবং তাঁদের ভেতর অনৈক্য
পরস্পরের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ না পায় এবং প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা যেন
মাথা তুলতে না পারে! আর হুযূর ﷺ তাঁর আখেরী সফরে যেন এভাবে রওয়ানা
হতে পারেন যে, মুসলমানরা একই সূত্রে সম্পর্কিত, তাঁরা পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ
একই রঙে রঞ্জিত, তাঁদের একজন আমীর আছেন যিনি তাঁদের সকল বিষয়
দেখাশোনা করছেন, এমন কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাফন-কাফন
আমীরুল-মুমিনীন ও খলীফাতুল-মুসলিমীনের হাতেই সম্পন্ন হোক!

মুসলমানরা তাঁদের রাসূল ﷺ-কে বিদায় দিল

এরপর লোকেরা শান্ত হলো। বিস্ময় ও বিষাদের মেঘ কেটে গেল এবং তাঁরা
নবীর প্রদত্ত তাঁদের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পাদনে তৎপর হলো।

আহলে বায়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাশ গোসল দেওয়ান এবং কাফন পরান।
এরপর তাঁর লাশ মুবারক জানাযার উদ্দেশে ঘরেই রেখে দেয়া হয়। এ সময়
হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে নবী
যেখানে ইনতিকাল করেছেন তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। যে বিছানায়
তিনি ইনতিকাল করেন তা উঠিয়ে দেয়া হয় এবং বিছানাস্থলে কবর খনন করা হয়।
হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) কবর খনন করেন।

এরপর লোকে দলে দলে আসতে শুরু করল। একদল আসত, জানাযা আদায়
করে চলে যেত, তারপর অপর দল আসত, জানাযা আদায় করত। প্রথম পুরুষেরা
জানাযা আদায় করেন। এরপর মহিলাদের অনুমতি দেয়া হয়। মহিলাদের পর
শিশুদের অনুমতি দেয়া হয়। তারাও জানাযা আদায় করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
জানাযায় কাউকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়নি।[১]

এই ঘটনা মঙ্গলবার দিনের।[২] এটি ছিল মদীনার মুসলমানদের জন্য একটি
শোকাবহ ও বিষাদময় দিন। হযরত বিলাল (রা) ফজরের আযান দিতে গিয়ে হুযূর
ﷺ-এর স্মৃতি মনে হতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ
দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা), যাঁরা আগে থেকেই শোকাচ্ছন্ন ছিলেন,
শোক ও দুঃখের আরও গভীর সাগরে নিমজ্জিত হন। তাঁরা তো এই আযান এ
অবস্থায় শুনতেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু
আজকের অবস্থা তা থেকে কত ভিন্ন!

---

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খ., ৬৬৩।

২. তাবাকাত ইবন সাদ (ইবন কাছীরকৃত, আস-সীরাতুন্নাবাবিয়্যাঃ, ৪র্থ খ., ৫১৭ পৃ.)।

উম্মুল-মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন, দিনটি ছিল আমাদের জন্য কী নিদারুণ কষ্টের! আমাদের যখন সেদিনের কষ্টের কথা মনে হয় তখন সব কষ্টই তার তুলনায় নেহায়েত তুচ্ছ ও সহজ মনে হয়।[১]

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন

"লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কারো মৃত্যুতে আঘাত পায় তখন আমার মৃত্যুতে আঘাতপ্রাপ্ত লোকদের থেকে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করবে। কেননা আমার মৃত্যুতে প্রাপ্ত শোকাবহ আঘাতের চেয়ে আমার উম্মতের ওপর কোন বড় আঘাত আসবে না।"[২]

সাহাবা-ই কিরাম (রা) যখন দাফন শেষে ফিরে আসেন তখন সাহাবী হযরত আনাস (রা)-কে লক্ষ্য করে রাসূল কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) বলে ওঠেন,

يا انس : اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله ﷺ التراب -

"আনাস! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহ মুবারক মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে তোমরা কিভাবে পারলে? তোমাদের মন কিভাবে তা মেনে নিল?"[৩]

---

১. পূর্বোক্ত, ৫৩৮-৩৯।

২. আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ৪র্থ খ., ৫৪৯, ইবন মাজা থেকে।

৩. সহীহ বুখারী, مرض النبى ﷺ ووفاته শীর্ষক অধ্যায়।

আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত

(পবিত্র নবী সহধর্মিণিগণ ও সন্তান-সন্ততিবর্গ)

পবিত্র নবী সহধর্মিণিগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সহর্মিণিগণের মধ্যে প্রথমেই হযরত খাদীজা (রা) বিনতে খুওয়ায়লিদের নাম আসে। নবুওয়াতের আগে হযরত খাদীজার বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তিনি রাসূল ﷺ-এর পত্নিত্ব বরণ করেন। নবুওয়াত লাভের পর রাসূল ﷺ-এর জীবনে যত দুর্যোগ ও বিপদ-আপদ নেমে এসেছিল তিনি তার সবটাতেই সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষাতেই তিনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রেম ও ভালবাসা, সাহায্য-সহানুভূতি, এমন কি আপন ধন-সম্পদসহ সর্বস্ব বিলিয়েও তাঁকে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি দেখাবার চেষ্টা চালিয়েছেন। হিজরতের তিন বছর আগে তাঁর ইনতিকাল হয়। সায়্যিদুনা ইবরাহীম (রা) ছাড়া হুযূর ﷺ-এর সকল সন্তান-সন্ততিই তাঁর গর্ভজাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় হযরত খাদীজা (রা)-এর প্রশংসা করতেন এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করতেন। কখনো এমনও দেখা যেত, বকরী যবাহ্ করা হলে এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে হযরত খাদীজা (রা)-এর (জীবিত) সখীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।[১]

তাঁর ইনতিকালের কিছুকাল পর হযরত সাওদা (রা) বিনতে যামআ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন। স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয়। উম্মাহর মহিলাদের মধ্যে ইলমে দীন ও ফিকহশাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। বড় বড় সাহাবা পর্যন্ত বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তাঁর শরণাপন্ন হতেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর ফতওয়া ও অভিমত জানতে চাইতেন। এরপর তিনি হযরত ওমর (রা) কন্যা হযরত হাফসা (রা)-কে বিয়ে করেন। এরপর তিনি হযরত যয়নব (রা) বিনতে খুযায়মাকে বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের দু'মাস পরই তিনি ইনতিকাল করেন। অতঃপর হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সহধর্মিণীদের মধ্যে উম্মু সালামা (রা) সবশেষে ইনতিকাল করেন। এরপর তিনি যয়নব (রা) বিনতে জাহ্‌শকে বিয়ে করেন। ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু উমায়মার কন্যা। এরপর বনূ মুস্তালিক গোত্রের

---

১. বুখারী-মুসলিম, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে খাদীজা (র)-এর মত আর কাউকে আমি এত বেশি ঈর্ষা করতাম না, অথচ তাঁকে আমি দেখিনি পর্যন্ত।

জুওয়ায়রিয়া (রা) বিনতুল-হারিছ-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। অতঃপর বিখ্যাত কুরায়শ দলপতি আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা, অতঃপর বনূ নাদীর গোত্রের দলপতি হুয়ায়্যি ইবন আখতাব কন্যা হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে বিয়ে করেন। হুয়ায়্যি ছিলেন হযরত মূসা (আ)-এর ভ্রাতা হযরত হারূন ইবন ইমরান (রা)-এর বংশধর। এরপর তিনি হারিছ আল-হিলালীর কন্যা মায়মুনা (রা)-কে বিয়ে করেন। স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ যিনি এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

এতে কোনই দ্বিমত নেই, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) ও হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা) তো হুযূর ﷺ জীবিতকালেই ইনতিকাল করেছিলেন! হযরত আয়েশা (রা) ছাড়া আর সকলেই ছিলেন পূর্ব বিবাহিতা (ও বিধবা)।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের সময় তাঁর দু'জন দাসী বর্তমান ছিলেন যাঁদের মধ্যে মারিয়া (রা) বিনতে শামউন ছিলেন অন্যতম। ইনি জাতিতে ছিলেন মিসরীয় কিবতী (কপ্ট) পরিবারের খৃস্টান। মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিস তাঁকে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। সায়্যিদুনা ইবরাহীম (রা) ছিলেন হযরত মারিয়া (রা)-এর গর্ভজাত। অপরজন রায়হানা বিনতে যায়দ (রা)[২] যিনি বনূ নাদীর গোত্রের ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং আপন স্ত্রীত্বে গ্রহণ করেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর মুসলমানদের জন্য তাঁর সহধর্মিণী-দেরকে বিয়ে করা আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেন। কেননা তাঁরা মুমিনদের মাতৃস্থানীয় (উম্মাহাতুল-মুমিনীন)। বিয়ে অবৈধ ঘোষিত না হলে সম্পর্কের এই পবিত্রতা রক্ষা পেত না, যে সম্পর্ক নবীর সঙ্গে উম্মতের চিরকালীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

"আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য শোভন নয় এবং এও শোভন নয় তারপর তার স্ত্রীদের কখনো বিয়ে করা। আল্লাহর নিকট এ এক গুরুতর অপরাধ।" [সূরা আহযাব : ৫৩ আয়াত]

---

১. যাদুল-মাআদ, ১ম খ., ২৬-২৯, সংক্ষেপিত।

২. এক বর্ণনায় তাঁকে কুরায়জা গোত্রীয়া বলা হয়েছে।

৩. ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৬০৪-৫।

ইবন কাছীর উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে লেখেন,

"আলিমগণ সর্ববাদিসম্মতভাবে একমত যে, তাঁর (রাসূলের) ইনতিকালের পর অপর যে কারো পক্ষে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণিগণকে বিয়ে করা হারাম। আর তা এজন্য যে, দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতেই তাঁর স্ত্রীগণ অপরাপর সকল মুমিনের মা।"[১]

রাসূল ﷺ -এর বহু বিবাহ : এক নজরে

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের একটি অংশ একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। আর এই সময়টি ছিল জীবনের সেই পঁচিশ বছর যা যৌবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত। তিনি একজন পরিপূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক আরব নওজোয়ানের সর্বোত্তম নমুনা ছিলেন। মরু আরবে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাবতীয় রোগ-ব্যাধি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আল্লাহ্ পাক তাঁকে হেফাজত করেছিলেন। অশ্বারোহণ ও পুরুষোচিত গুণাবলীর বিস্তর অংশ তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল আরবদের দৃষ্টিতে যার গুরুত্ব ছিল বিরাট। মনোবিজ্ঞানিগণও তা স্বীকার করেন।

সে যুগে তাঁর নিকৃষ্টতম দুশমনও (নবুওয়াতের আগে, যে যুগ তাঁর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক ছিল) তাঁর ওপর এ বিষয়ে সমালোচনা করবার এতটুকু সুযোগ পায়নি এবং নবুওয়াত লাভের পর আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করেনি চারিত্রিক সততা ও পবিত্রতা, দৃষ্টি ও আত্মার শুচি-শুভ্রতা এবং নিষ্পাপ সারল্যের তিনি ছিলেন সর্বোত্তম নমুনা। তিনি এমন সব দুর্বলতা থেকে বহু দূরে ছিলেন যা ছিল তাঁর যথাযথ মর্যাদার পরিপন্থী।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা)-কে বিয়ে করেন যাঁর বয়স ছিল তখন চল্লিশ বছর এবং যিনি ছিলেন একজন বিধবা। এর আগে তাঁর আরও দু'বার বিয়েও হয়েছিল এবং সে ঘরে তাঁর (খাদীজার) সন্তানাদিও ছিল। অতঃপর বিখ্যাত উক্তি মতে দু'জনের বয়সের মধ্যে পার্থক্য ছিল পনের বছরের। এরপর তিনি (রাসূল সা.) হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা)-কে বিয়ে করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। হযরত সাওদা (রা)-এর স্বামী আবিসিনিয়ায় মুহাজির অবস্থায় ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা) ছাড়া আর কোন কুমারী ও অবিবাহিতাকে বিয়ে করেন নি। এছাড়া যতগুলো বিয়ে তিনি করেছিলেন সব বিয়ের ক্ষেত্রে দীন ও দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্র সার্বিক কল্যাণ, বদান্যতা ও অন্তরের উদারতা প্রদর্শন, চারিত্রিক মহত্ব, মুসলমানদের কোন সার্বিক কল্যাণ কিংবা বিরাট কোন সামাজিক বিপদ ও অনাসৃষ্টি রোধ ছিল মূল উদ্দেশ্য। আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক আরবদের গোত্রীয় ও সমাজ

---

১. ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৪৯৩ পৃ.।

জীবনে যে গুরুত্ব বহন করত এতটা বোধ করি অপর কোন সমাজে ছিল না। এজন্যই নতুন আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী আদর্শ সমাজের ইতিহাসে, রক্তপাত রোধে ও আরব গোত্রগুলোর অনিষ্ট ও অপকারিতা থেকে আত্মরক্ষার প্রধান উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হতো।

এ ছাড়া এসব পবিত্র সহধর্মিণীদের সঙ্গে হযরত ﷺ-এর জীবন যাপন কোনরূপ আরাম-আয়েশ কিংবা ভোগ-বিলাসের জীবন ছিল না যা সাধারণত অনেকের বহু বিবাহের পেছনে লক্ষ্য হিসাবে থাকে। এই জীবন ছিল নিরাসক্ত ও উদাসীন যুহদ-এর জীবন, ছিল আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার জীবন, ছিল অল্পে তুষ্টির জীবন, যে ধরনের জীবন যাপনের সামর্থ্য প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বড় বড় উৎসাহী ও অটুট সংকল্পের অধিকারী খ্যাতনামা যাহিদের ভেতরও পাওয়া যাবে না। এর সামান্যতম ঝলক ও নমুনা 'আখলাক ও শামায়েল' অধ্যায়ে পেশ করা হবে; তথাপি একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান ব্যক্তির জন্য এখানে উদ্ধৃত কুরআন করীমের এই একটি আয়াত যথেষ্ট হবে :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ، وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন" (সূরা আহযাব : ২৮-২৯ আয়াত)

এই উচ্চতর মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, পবিত্র প্রেরণা, পাকসাফ মস্তিষ্ক এবং গভীরতর ও প্রজ্ঞাসুলভ প্রশিক্ষণের প্রভাব ছিল এটাই, আযওয়াজে মুতাহহারাত-এর সকলেই কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সামান্যতম ইতস্তত না করেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং পারলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর সেই জওয়াবই আশা করি যথেষ্ট হবে যা তিনি এ ব্যাপারে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তিনি এই আয়াত আমার সামনে তেলাওয়াত করার পর বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সামনে দু'টো বিষয় পেশ করেছেন এবং এর যে কোন একটি এখতিয়ার করার ব্যাপারে তোমাদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। এখন

তোমরাই বল? তোমরা কোন্‌টি অবলম্বন করবে, আর হ্যাঁ, ভেবেচিন্তে কিন্তু উত্তর দেবে, তাড়াহুড়া করবে না। প্রয়োজনে আব্বা-আম্মার সঙ্গেও পরামর্শ করে নেবে। উত্তরে তিনি বললেন, ভাল! এ ব্যাপারে আমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন কোথায়? আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং পারলৌকিক আবাস কামনা করি।[১] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অন্য সহধর্মিণিগণও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একই উত্তর দিয়েছিলেন।[২]

স্ত্রীদের সংখ্যা ও এর মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভাব ও চাহিদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের পথে লোকদের দাওয়াত প্রদানের মহান দায়িত্ব, দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার জীবন এবং মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো সম্পর্কে এক মুহূর্তের তরেও গাফিল করে দেয়নি, বরং এ দ্বারা তাঁর তৎপরতা, অদম্য মনোবল ও শক্তি-সাহস আরও বেড়ে গিয়েছিল। নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র জীবন সঙ্গিণিগণ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দীনের তালীম-এর মহান লক্ষ্য হাসিলে তাঁর সাহায্যকারী ও মদদগার ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে তাঁরা শরীক হতেন, আহত ও পীড়িতদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করতেন। রাসূল ﷺ-এর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এছাড়াও আরও বহুবিধ বিধি-বিধান ও শিক্ষা নবী সহধর্মির্ণিগণের অবদানে ধন্য। মুসলমানরা এসব তাঁদের থেকে শিখেছেন, স্মরণে রেখেছেন, অতঃপর তাঁরা অন্যদেরকে তা বলেছেন এবং শিখিয়েছেন।[৩]

এ ব্যাপারে কেবল হযরত আয়েশা (রা)-এর নাম নেয়াই আশা করি যথেষ্ট হবে যাঁর সম্পর্কে রিজালশাস্ত্র ও তাবাকাতের ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) তাঁর তাযকিরাতুল-হুফফাজ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন :

"তিনি ফিকহশাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর শরণাপন্ন হতেন। কাবীসা বিনতে যুওয়ায়ব (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা) মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞা ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণও তাঁর নিকট মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা কোন হাদীছ বুঝতে অসুবিধার সম্মুখীন হলে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং এ বিষয়ে তিনি অবশ্যই জানতেন।

---

১. বুখারী, আয়েশা (রা) বর্ণিত।

২. বুখারী, ইবন আবী হাতিম ও আহমাদ।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু বিবাহের পছন্দের গূঢ় রহস্য, এর উপযোগিতা ও এ সম্পর্কিত চাহিদার ব্যাপারে কাজী সুলায়মান মনসুরপুরীকৃত রাহমাতুল্লিল-আলামীন-এর ২য় খণ্ডে আলোকপাত করেছেন (পৃ. ১৪১-১৪৪)। মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ তাঁর عبقرية محمد নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

হাসসান (রা) বলেন, আমি কুরআন মজীদ, হালাল-হারাম, ফারায়েয ও বিধি-বিধান, কবিতাবলী, আরবের ইতিহাস ও আরবদের নসবনামা (বংশ-পরিচয়) সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ আর কাউকে পাইনি।"[১]

মহোত্তম চরিত্র, উন্নত মনোবল, দানশীলতা, মানুষের দুঃখ-কষ্টে সমবেদনা জ্ঞাপন ও সহানুভূতি দেখান এবং স্নেহ-মমতা বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে যতই বলা হোক তা কমই হবে। এ ব্যাপারে একটি বর্ণনা আশা করি যথেষ্ট হবে যা হিশাম তাঁর পিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর তা হলো, একবার হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর খেতমতে এক লক্ষ দিরহাম পাঠান। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, হযরত আয়েশা (রা.) সবটাই অভাবী লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। তাঁর দাসী তাঁকে বলল, যদি আপনি অন্তত এক দিরহাম দিয়েও গোশত খরিদ করতেন তাহলে কতই না ভাল হতো!

এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তখন তুমি আমাকে মনে করিয়ে দাওনি কেন? আর সে সময় তিনি রোযাদার ছিলেন।[২]

বিষয়টা নিয়ে পাশ্চাত্যের বহু প্রাচ্যবিদ মাথার ঘাম ঝরিয়েছেন। এটি তাঁদের মাথাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর এর পেছনে কারণ হলো তাঁরা আরব দেশগুলোতে ও ইসলামী শরীয়াতে দাম্পত্য জীবনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা, অবস্থা-অভ্যাস ও প্রথা-পদ্ধতির অনুগত ও অনুসারী বানাতে চেয়েছেন। তাঁরা পাশ্চাত্যের মাপকাঠিকে (যা একটি বিশেষ সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্ট ফসল) এই অবস্থার ওপর চাপিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন যা ছিল মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক প্রকৃতি ও আরব পরিবেশের অনুকূল যার পেছনে বিভিন্ন নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ চিন্তা কার্যকর ছিল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যার অনুমতিও ছিল। এটি আসলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য লেখকদের একটি দুর্বল দিক, তাঁরা প্রথমেই পাশ্চাত্যকে মানদণ্ড হিসাবে ধরে নেন। এরপর যা কিছুই এর বিরোধী তার বিরুদ্ধেই তাঁরা নির্মমভাবে তাদের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেন। তাঁরা নিজেরাই একটি সমস্যা দাঁড় করান যার কোন ভিত্তি থাকে না। এরপর তাঁরা তার সমাধানে হন্যে হয়ে ছোটেন। এটা তাঁদের জাতীয় অহমিকা এবং পাশ্চাত্যের মনভোলা চিন্তাধারা ও কষ্ট কল্পনার সীমাতিরিক্ত ভাল মানুষীর ফল।

ইংরেজ লেখক মি. বোদলে (R. C. Bodley) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সহধর্মিণিগণের বিষয়ে উল্লিখিত পাশ্চাত্য অনুভূতি ও চিন্তাধারার ওপর অত্যন্ত ন্যায়পরতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখছেন :

---

১. তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খ., ২৭-২৮।

২. তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খ., ২৮ পৃ.।

"মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনকে যেমন পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে যাচাই করার প্রয়োজন নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই সেই সব প্রথা ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার, যেগুলো খৃস্টবাদ জন্ম দিয়েছে। এঁরা পাশ্চাত্যের লোক নন, নন তাঁরা খৃস্টানও, বরং তাঁরা এমন এক দেশে ও এমন এক যুগে জন্ম নিয়েছিলেন যেখানে তাঁদের নিজেদেরই নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানের চল ছিল। এতদসত্ত্বেও আমেরিকা ও য়ূরোপের নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানকে আরবদের নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানের চেয়ে উত্তম ভাবার কোন কারণ নেই। পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যকে দেবার মত অনেক কিছুই আছে, কিন্তু নিজেদের জীবন পদ্ধতিকে উত্তম এবং নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানকে উন্নত প্রমাণিত করার জন্য তাঁদের এখনও অনেক অনুসন্ধান চালানো দরকার। অতএব, তাঁদের অপরের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কটুকাটব্য করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় বোধ করি।"[১]

এছাড়া স্ত্রী সংখ্যার সেই অনিষ্টতা যা আজ পাশ্চাত্য জগতে এক অবধারিত সত্যে পরিণত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যবাসী একে চোখ বন্ধ করে মেনে নিয়েছে, এমন কোন অনিষ্ট নয় যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এটি না কোন স্থিরীকৃত তাত্ত্বিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর না তা মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুকূলে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি খেয়ালী ও আবেগপ্রসূত অনিষ্ট যা উৎসাহী ও শক্তিশালী প্রচার-প্রোপাগান্ডার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং এর পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, কালের তীব্র গতি, অর্থনৈতিক, সামজিক ও প্রশিক্ষণমূলক প্রবণতা ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এর জোর কেবল কম হয়ে যাবে না, বরং চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

একজন পাশ্চাত্য লেখক (Alwin Toffler) তার Future Shock নামক গ্রন্থে, যিনি এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্যে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, এই মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিতও প্রদান করেছেন নিকট ভবিষ্যতে যার সম্ভাবনা বিদ্যমান।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান-সন্ততি

হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আল-কাসেম নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর কারণেই তিনি আবু'ল-কাসেম (কাসেমের পিতা) নামে পরিচিত হন। শৈশবেই তাঁর ইনতিকাল হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে হযরত যয়নব, হযরত রুকায়্যা, হযরত উম্ম কুলছুম ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর জন্ম হয়। পুত্রদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ, হযরত তায়্যিব ও হযরত তাহির (রা) সম্পর্কে মতভেদ

১. R.C.V. Bodley. The Messenger. The Life of Mohammad. London 19‥ 11.203-3.

২. Alwin Toffler, Future Shock, Bontom Books, New York, 1970.

রয়েছে। কেউ কেউ এঁদেরকে তিনজন গণ্য করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইবনুল-কায়্যিম (রা)-এর সুচিন্তিত অভিমত হলো তায়্যিব ও তাহির হযরত আবদুল্লাহর উপাধি ছিল। এঁরা সকলেই হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত।[১]

হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। তিনি হযরত ফাতিমা (রা) সম্পর্কেই বলেছিলেন, সে জান্নাতে নারীদের সর্দার হবে।[২] তিনি আরো বলেছেন, "ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ; যাতে তার কষ্ট হয় তাতে আমারও কষ্ট হয়।"[৩] আহলে বায়ত-এর সদস্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হন।

মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভে ইবরাহীম (রা) নামে তাঁর [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর] এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর ইনতিকাল হয় শৈশবেই দোলনায় থাকা অবস্থায়। তাঁর ইনতিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন :

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وانابك يا ابراهيم لمحزونون -

"চক্ষু অশ্রুসিক্ত, হৃদয় বিষাদক্লিষ্ট, কিন্তু আমি এমন কথা বলব না যা আমার প্রভু-প্রতিপালককে অসন্তুষ্টি করবে। হে ইব্রাহিম, আমি তোমার শোকে শোকাভিভূত![৪]

তাঁর ইনতিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়। সাহাবা-ই কিরাম (রা) বলাবলি শুরু করলেন, ইবরাহীম (রা)-এর ইনতিকালের দরুন সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তিনি এ সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে সমবেত করে তাঁদেরকে সম্বোধন করলেন এবং বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত দু'টো নিদর্শন। কারও মৃত্যুতে এর গ্রহণ হয় না অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সঙ্গে কারো মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।[৫]

অতি ভক্তি ও ব্যক্তিপূজার উচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ইহতিমামের সঙ্গে সাহাবা-ই কিরাম (রা)-কে সমবেত করে তাঁদেরকে সম্বোধন করলেন এবং খোলাখুলি বললেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ এবং সৃষ্টি জগতের যে কোন পরিবর্তনের সঙ্গে কারো জন্ম কিংবা মৃত্যুর সম্পর্ক নেই। জন্মগ্রহণকারী কিংবা মৃত্যুবরণকারীর সম্মান ও মর্যাদা যা-ই হোক না কেন

---

১. যাদু'ল-মাআদ, ১ম খ., ২৫-২৬ পৃ.।

২. তিরমিযী, ২য় খ., ৪২১।

৩. বুখারী ও মুসলিম।

৪. সহীহ মুসলিম, আসমা বিনতে য়াযীদ (রা) বর্ণিত।

৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-কুসূফ।

এবং প্রিয় থেকে প্রিয়তর কোন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকুক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এই আমল কল্পনা পূজা, বরং কারো প্রতি অতি ভক্তি ব সুধারণা ও ব্যক্তিপূজার জড় কেটে দিয়েছে। দুনিয়ার কোন ধর্ম প্রচারক, কোন নেতা, কোন আন্দোলনের পতাকাবাহী, কোন মানবসৃষ্ট দল কিংবা সংগঠনের নেতা হলে তিনি এক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু করতেন, তিনি এ ধরনের ধারণা বা বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান না করে চুপ করে থাকতেন এই আশায় যে, বিষয়টি আমাদের আন্দোলনের স্বার্থে যাচ্ছে। আমি তো কিছু বলিনি কিংবা কাউকে বলতেও বলিনি। এমনিতেই মানুষের মনে এই ধরনের ধারণার উদয় ঘটেছে, পয়গম্বর পুত্রের ইনতিকালে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এটি প্রত্যাখ্যান করা এমন কিছু জরুরী নয়।

একজন পয়গম্বর ও একজন অপয়গম্বরের মধ্যে মূলত এখানেই পার্থক্য। রাজনৈতিক মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী একজন মানুষ যেসব ঘটনা থেকে ফায়দা লুটতে প্রয়াস পান (চাই সেসব ঘটনা তার এখতিয়ারের বাইরেই ঘটুক না কেন), একজন পয়গম্বর সেক্ষেত্রে আকীদা-বিশ্বাসের বিপর্যয় ও ধর্মের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু মেনে নেবেন না। এ থেকে কোনরূপ ফায়দা হাসিল করাকে তিনি হারাম মনে করেন এবং একে তিনি তাঁর নবুওয়াতী পদমর্যাদার পরিপন্থী জ্ঞান করেন। এ সময় আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন কথা না বলে চুপ থাকতেন তবে এ দ্বারা দুনিয়ায় এমন কোন বিরাট বিপর্যয় দেখা দিত না বটে, তবে একথা নিশ্চিত, এর ফলে তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাসের ওপর এর প্রভাব পড়ত এবং ব্যক্তিপূজা ও সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক ধারায় হস্তক্ষেপের আশংকার দ্বার খুলে যেত। আর এটি মানবীয় মন-মানসের এমন বিপর্যয় যা খুবই বিপজ্জনক। একজন সত্য নবীর পক্ষে এর চিকিৎসা ও এর দ্বারবন্ধ করা খুবই জরুরী ছিল।

হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ে হয়েছিল হযরত খাদিজা (রা)-এর ভাগ্নে আবূল-আস ইবন রবী'র সঙ্গে। তাঁদের পুত্রের নাম ছিল 'আলী এবং কন্যার নাম ছিল উমামা (রা)। হযরত রুকায়্যা (রা)-এর বিয়ে হয়েছিল হযরত উছমান (রা)-এর সঙ্গে। তাঁর গর্ভে পুত্র আবদুল্লাহর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর প্রাঙ্গণে থাকাকালে হযরত রুকুয়্যা (রা) ইনতিকাল হয় এবং হযরত উসমান (রা.) তাঁর সেবাশুশ্রূষার মানসে মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন। পরে হযরত উছমান (রা)-এর বিয়ে হয় তাঁর বোন হযরত উম্মু কুলছুম (রা)-এর সঙ্গে। এজন্য তাঁকে 'যুন-নূরায়ন বা দুই জ্যোতির অধিকারী' বলা হয়। উম্মু কুলছুম (রা)-এর ইনতিকালও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হয়।

হযরত ফাতিমা (রা)-এর বিয়ে হয় আবূ তালিব-এর পুত্র ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিতৃব্য পুত্র হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হাসান (রা) যেজন্য তাঁকে আবূল-হাসান অর্থাৎ হাসানের পিতা বলা হয়। অপর পুত্রের নাম ছিল

হুসায়ন (রা) যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ রাসূল ﷺ বলেছিলেন, এরা দুনিয়ায় আমার দু'টো ফুল।[১] "এ দু'জন জান্নাতের যুবকদের সর্দার হবে।"[২]

আল্লাহ্ তাআলা এ দু'জনের সন্তান-সন্ততির ভেতর প্রচুর বরকত দান করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ তাঁদের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হন। তাঁদের ভেতর বিরাট বড় নেতা, ইলম ও দীন এবং জিহাদ, যুহদ ও তাকওয়ার ইমাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন এবং জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছেন। হযরত ফাতিমা (রা)-এর গর্ভে হযরত আলী (রা)-এর দুই কন্যা হযরত যয়নব ও হযরত উম্ম কুলছুম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। যয়নব (রা)-এর বিয়ে হয় তাঁর পিতৃব্য পুত্র আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) ইবন আবী তালিব-এর সঙ্গে যিনি ছিলেন আরবের কতিপয় দানবীরের অন্যতম। 'আলী ও আওন ছিলেন এঁদের দুই পুত্র। উম্ম কুলছুম (রা)-এর বিয়ে হয় হযরত ওমর (রা) ইবনুল-খাত্তাবের সঙ্গে। তাঁদের থেকে যায়দ নামক পুত্রের জন্ম হয়।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সন্তান-সন্ততির ইনতিকাল হয় তাঁর জীবদ্দশাতেই। কেবল হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকাল হয় তাঁর ইনতিকালের ছ'মাস পর।[৪]

---

১. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, মানাবিক আল-হাসান ওয়াল-হুসায়ন।

২. তিরমিযী, ২য় খ., ২৪১।

৩. সীরাত ইবন কাছীর, ৪র্থ খ., ৫৮১-৮২।

৪. যাদুল-মাআদ, ১ খ., ২৬ পৃ.।

আখলাক ও শামায়েল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেমন ছিলেন

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উন্নত চরিত্র ও ব্যবহার, মহান গুণাবলী ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে উম্মুল-মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর সন্তান এবং হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর মামা হিন্দ (রা) ইবন আবী হালা খুবই ব্যাপক ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা দান করেছেন। তিনি বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব সময় আখেরাতের চিন্তায় ও পারলৌকিক বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকতেন। এক্ষেত্রে তাঁর একটি ধারাবাহিকতা ছিল। এ চিন্তা তাঁকে সব সময় অস্থির করে রাখত। অধিকাংশ সময় তিনি দীর্ঘ নীরবতা পালন করতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথা বলতে শুরু করলে বেশ ভালভাবে উচ্চারণ করতেন[৩] এবং সেভাবেই শেষ করতেন। তাঁর আলোচনা ও বর্ণনা খুব পরিষ্কার, স্পষ্ট ও দু'রকম অর্থ থেকে মুক্ত হতো। কথা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ যেমন হতো না, তেমনি তা খুব সংক্ষিপ্তও হতো না (বরং পরিমিত হতো)। তিনি নরম মেযাজের ও নম্রভাষী ছিলেন, কর্কশ ও রূঢ়ভাষী ছিলেন না। তিনি কাউকে যেমন ঘৃণা কিংবা অবজ্ঞা করতেন না, তেমনি কেউ তাঁকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করুক তাও পছন্দ করতেন না অর্থাৎ তিনি দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন না যে, সব কিছুই মেনে নেবেন, বরং প্রভাবমণ্ডিত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নে'মতের বিরাট কদর করতেন এবং খুব বেশি মনে করতেন, চাই পরিমাণে যতই অল্প হোক না কেন, এমন কি তা চোখে না পড়ার মত বিষয়ও যদি হয় এবং এর ত্রুটি বা খুঁৎ ধরতেন না। খানাপিনার বস্তুর দোষ ধরতেন না যেমন, তেমনি প্রশংসাও করতেন না।

পার্থিব ও পার্থিব বিষয় সম্পর্কিত কোন বিষয়ের ওপর রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন হক নষ্ট হতে দেখলে সে সময় তাঁর জালাল তথা তেজস্বিতার সামনে কোন কিছুই তিষ্ঠতে পারত না যতক্ষণ না তিনি তার বদলা নিতেন। তিনি নিজের ব্যাপারে কখনও ক্রুদ্ধ হননি এবং কারো থেকে কখনও প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। ইশারা করতে হলে গোটা হাত কাজে লাগাতেন। কোন বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে একে উল্টে দিতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের তালুকে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে মেলাতেন। রাগের কিংবা অপছন্দনীয় কথা হলে শ্রোতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। খুশী হলে চোখ নামিয়ে ফেলতেন। তাঁর হাসি বেশির ভাগ সময় মুচকি হতো যার ফলে

---

৩. অর্থাৎ অহংকারীদের মত বেপরোয়া ও উদ্ধত ভঙ্গীতে কাঠখোট্টা কথা বলতেন না।

বৃষ্টিস্নাত মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দেবার মত তাঁর মুক্তার মত উজ্জ্বল শুভ্র দাঁতগুলো দেখা যেত।"

হযরত আলী (রা) ছিলেন তাঁর খান্দানেরই লোক। তিনি লেখাপড়া ও জানাশোনার ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিলেন এবং যাঁর দৃষ্টি মানুষের মনস্তত্ত্ব ও চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর গভীরে প্রবেশ করেছিল। তিনি ছিলেন তাঁর একান্ত নিকটজন ও কাছের মানুষ। এরই সাথে মানুষের গুণাবলী প্রকাশে ও দৃশ্য বর্ণনায় যিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম। তাঁর "মহান চরিত্র" (خُلُقٌ عَظِيْمٌ) সম্পর্কে তিনি বলেন :

"তিনি প্রকৃতিগতভাবেই খারাপ কথা বলা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা থেকে দূরে অবস্থান করতেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেও এমন কোন বিষয় তাঁর থেকে প্রকাশ পেত না। বাজারে তিনি কখনো উচ্চ স্বরে কথা বলেননি। মন্দের বদলা কখনো মন্দ দ্বারা নিতেন না, বরং ক্ষমা করতেন। তিনি কখনো কারো ওপর হাত তোলেন নি একমাত্র জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ছাড়া। কখনো কোন খাদেম কিংবা মহিলার ওপর হাত ওঠাননি। কোন প্রকার জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে কেউ কখনো দেখেনি যতক্ষণ না কেউ আল্লাহ্র নির্ধারিত হুদূদ বা সীমারেখা অতিক্রম করত এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঁচ পড়ত। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্তা'আলার কোন হুকুম নষ্ট করা হলে এবং তাঁর মর্যাদার ওপর আঘাত এলে তিনি এর জন্য সবচেয়ে রাগান্বিত হতেন। দু'টি জিনিষ সামনে এলে সহজতরটিকে বেছে নিতেন। যখন নিজের ঘরে তশরীফ নিতেন তখন সাধারণ মানুষের মতই দেখা যেত। নিজেই কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের সকল প্রয়োজন নিজেই আঞ্জাম দিতেন।

"নিজের যবান হেফাজত করতেন। কেবল তখনই মুখ খুলতেন যখন এর প্রয়োজন দেখা দিত। লোকের মন জয় করতেন, তাদের মনকে ঘৃণাসিক্ত করতেন না। কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিগোষ্ঠীর সম্মানিত লোকের আগমন ঘটলে তিনি তাঁর সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদামণ্ডিত আচরণ করতেন এবং তাঁকে ভাল ও উচ্চ পদে নিযুক্ত করতেন। লোকের সম্পর্কে সতর্ক ও মাপা মন্তব্য করতেন আপন হৃদ্যতা ও আখলাক দ্বারা মাহরূম না করেই। আপন সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। লোকদের থেকে বিভিন্ন লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

"ভাল কথার ভাল দিক বর্ণনা করতেন এবং একে শক্তি জোগাতেন। মন্দ কথার অনিষ্টকর দিক বলে দিতেন এবং একে দুর্বল করে দিতেন। তাঁর ব্যাপারগুলো ভারসাম্যময় ও একই রূপ। এক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন হতো না। কোন কিছুর প্রতি অলসতা কিংবা অবহেলা দেখাতেন না এই ভয়ে যে, না জানি

অন্যেরাও এই অলসতার শিকার হয়ে পড়ে এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে! প্রতিটি অবস্থা ও প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই তাঁর নিকট সেই অবস্থা মাফিক প্রয়োজনীয় সামান ছিল। সত্যের ব্যাপারে কোনরূপ কার্পণ্যের প্রশ্রয় দিতেন না, আবার সীমা অতিক্রমও করতেন না। যেসব লোক তাঁর কাছাকাছি থাকতেন তাঁরা হতেন সবচেয়ে ভাল ও নির্বাচিত লোক। তাঁর চোখে সর্বোত্তম লোক তিনি ছিলেন যিনি সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং যাঁর ব্যবহার ভাল। তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তিনি যিনি মানুষের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দানকারী, সহানুভূতিশীল এবং যিনি অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় সকলের আগে থাকেন। আল্লাহ্র যিকর করতে করতে দাঁড়াতেন এবং আল্লাহ্র যিক্র করতে করতে বসতেন। কোথাও তশরীফ নিলে যেখানে মজলিস সমাপ্ত হতো সেখানেই তশরীফ রাখতেন এবং এজন্য আদেশও করতেন। মজলিসে উপস্থিত লোকদের ও সাথীদের সবার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতেন এবং সকলের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। উপস্থিত সকলেই মনে করতেন, হযরত ﷺ-এর চোখে তাঁর চেয়ে বেশি আপন বুঝি আর কেউ নন!

যদি কেউ কোন বিশেষ প্রয়োজন বা উদ্দেশে রাসূল ﷺ-কে বসাতেন কিংবা কোন প্রয়োজনে কথা বলতেন তবে তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে তার সকল কথা শুনতেন যতক্ষণ না সে তার কথা শেষ করে নিজে থেকেই বিদায় নিত। যদি কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইত, সাহায্য কামনা করত, তবে তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। কিছু দিতে না পারলে কমপক্ষে তাকে মিষ্টি ও কোমল ভাষায় জওয়াব দিতেন। তাঁর উত্তম ব্যবহার সবার জন্যই উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি তাদের জন্য পিতার ভূমিকা পালন করতেন। সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের লোক সত্যের মাপকাঠিতে তাঁর চোখে সমান ছিল।

তাঁর মজলিস ইল্ম ও মারিফাত, লজ্জা-শরম, ধৈর্য ও আমানতদারীর মজলিস ছিল। এ মজলিসে কেউ উচ্চ কণ্ঠে কথা বলত না; কারও দোষ-ক্রটির চর্চা কিংবা চরিত্র হননও করা হতো না এ মজলিসে। কারুর সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঘাত হানা হতো না কিংবা কারো চারিত্রিক দুর্বলতাকে ঢোল পিটিয়ে প্রচারও করা হতো না। সকলেই ছিল সমান। কারো ওপর কারো মর্যাদা থাকলে তা একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই ছিল। ছোটরা বড়দের সম্মান করত আর বড়রা ছোটদের করতেন স্নেহ ও মায়া। অভাবী ও দুঃস্থ লোকদেরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতেন, মুসাফির ও নবাগতকে হেফাজত করতেন এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন।"

হযরত আলী (রা) আরও বলেন, "তিনি সব সময় হসিখুশী ও প্রফুল্ল থাকতেন। তিনি ছিলেন কোমল চরিত্রের ও নরম দিলের মানুষ। তিনি কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না, রূঢ় ও কঠোর ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি। মানুষের ওপর খুব সত্বর সদয় হয়ে যেতেন, খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে ক্ষমা

করে দিতেন। কারও সঙ্গে ঝগড়া করতেন না, বরং পরিপূর্ণ ভাব-গম্ভীর, শান্ত ও ধীরস্থির মেযাজের ছিলেন তিনি। চেঁচিয়ে কথা বলতেন না, সাধারণত ফালতু কথা বলতেন না আর নিম্ন মানের কথাও বলতেন না। কারও ওপর দোষ চাপাতেন না। সংকীর্ণচিত্ত ও কৃপণ ছিলেন না। যে কথা তাঁর পছন্দ হতো না তা তিনি উপেক্ষা করতেন, তা ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না। স্পষ্টভাবে সে সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করতেন না এবং এর জওয়াবও দিতেন না। তিনটি জিনিসের স্পর্শ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে চলতেন :

(১) ঝগড়া (২) অহংকার ও (৩) অনর্থক কথা ও কাজ। লোকদেরকেও তিনটি জিনিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন : (১) কারো ওপর দোষ চাপাতেন না, (২) কারো দুর্বল ও গোপনীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করে বেড়াতেন না এবং (৩) কেবল সেই কথাই বলতেন যে কথাতে সওয়াবের আশা করা যেত। যখন কথা বলতেন মজলিসে উপস্থিত লোকেরা সম্মানার্থে এমনভাবে মস্তক অবনত করে ফেলতেন যে, মনে হতো বুঝি সকলের মাথার ওপর পাখি বসে আছে, না জানি নড়াচড়াতে তা উড়ে যায়! যখন তিনি চুপ করতেন তখন তারা কথা বলত। তাঁর সামনে তারা কখনো ঝগড়ায় লিপ্ত হতো না। যদি তাঁর মজলিসে কেউ কথা বলত তখন আর সব লোক চুপ করে কথকের কথা শুনত যতক্ষণ না সে তার কথা শেষ করত।

রাসূল ﷺ-এর সামনে প্রত্যেক লোকের কথা বলার অধিকার ঠিক ততটুকুই থাকত যতটুকু থাকত তার পূর্ববর্তী লোকের যাতে সে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে তার কথা বলার সুযোগ পায় এবং ঠিক তেমনি সম্মান ও প্রশান্তির সঙ্গে তা শোনা হতো। যে কথায় সকলে হাসত, তিনিও তাতে হাসতেন। যে কথায় লোকে বিস্ময় প্রকাশ করত, তিনিও তাতে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। মুসাফির ও পরদেশীর বেআদবী সইতেন এবং সর্বপ্রকার যাচ্না, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এ ধরনের লোকদের মনোযোগ নিজেদের দিকে টেনে নিতেন যাতে রাসূল ﷺ-এর ওপর তা বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। তিনি বলতেন : তোমরা অভাবী ও প্রয়োজন মুখাপেক্ষী লোক পেলে তাদের সাহায্য করবে। তিনি সেই সব লোকের প্রশংসা ও স্তুতি কবুল করতেন যারা সীমার ভেতর অবস্থান করত। কারো কথা বলার সময় কথা বলতেন না, তার কথা মাঝপথে থামিয়েও দিতেন না। তবে হ্যাঁ, সীমা অতিক্রম করলে তাকে নিষেধ করতেন এবং মজলিস থেকে উঠে গিয়ে তার কথা থামিয়ে দিতেন।

"তিনি সবচেয়ে উদার মন ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং সামাজিক পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে বদান্য ছিলেন। যে তাঁকে প্রথম দেখত সেই ভীত ও কম্পিত হয়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে থাকলে

ও জানাশোনা হলে মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও অভিভূত হতো এবং যেই তাঁকে দেখত সেই বলত, তাঁর মত আর কাউকে এর আগে যেমন দেখিনি, তেমনি দেখিনি তার পর অন্য কাউকে। আমাদের নবী করীম ﷺ -এর ওপর আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহরাশি বর্ষিত হোক!"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার পোশাকে মণ্ডিত ও সজ্জিত করেছিলেন এবং তাঁকে ভালবাসা, আকর্ষণ, ভীতিকর প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের এক অপূর্ব প্রতিমূর্তি বানিয়েছিলেন! হিন্দ ইবন আবী হালা (রা) বলেন :

"তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন এবং অন্যের দৃষ্টিতেও খুবই মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মতই জ্বলজ্বল করত!"[২]

হযরত বারাআ ইবন 'আযিব (রা) বলেন :

"আল্লাহ্র রাসূল ﷺ মধ্যম আকৃতির ছিলেন; না বেশি লম্বা, না বেশি বেঁটে। আমি একবার তাঁকে লাল কোবা পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলাম। এর থেকে ভাল কোন জিনিস আমি কখনো দেখিনি।"[৩] হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "তিনি মধ্যম আকৃতির ছিলেন, এর থেকে কিছুটা লম্বা। তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের, ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু, মুখমণ্ডল অত্যন্ত মানানসই ও সুন্দর, দীর্ঘ চোখের পলক ও চওড়া কাঁধের অধিকারী।" শেষে তিনি বলেন, "তাঁর মত আর কাউকে এর আগেও যেমনি দেখিনি, তেমনি দেখিনি পরেও।"[৪]

হযরত আনাস (রা) বলেন : আমি রেশম ও রেশমী কিংখাবও তাঁর হাতের মত নরম পাইনি এবং তাঁর (শরীরের) খোশবু থেকে অধিকতর খোশবুও আমি আর শুঁকি নি।[৫]

আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রিসালাত দ্বারা ধন্য করেছিলেন, তাঁকে আপন মাহবুব বানিয়েছিলেন এবং উত্তম মনোনয়নে মনোনীত করেছিলেন, তাঁর অগ্র-পশ্চাতের সকল গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে সবচেয়ে বেশি উদ্যমী ও প্রয়াসী ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে আগ্রহী। হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) বলেন :

---

১. শামায়েল তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত।

২. প্রাগুক্ত, হিন্দ ইবন আবী হালা (রা)-এর সূত্রে হাসান (রা) কর্তৃক বর্ণিত।

৩. বুখারী-মুসলিম।

৪. আল-আদাবুল-মুফরাদ, ইমাম বুখারীকৃত।

৫. বুখারী ও মুসলিম; বুখারী, কিতাবুল মানাবিক।

“একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে গিয়েছিল। আরজ করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার আগে-পিছের যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে (তারপরও ইবাদতে এত বেশি কষ্ট করেন কেন?)। একথা শুনে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্র শোকরগুযার বান্দা হব না?”[১]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কুরআন পাকের একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে গোটা রাত কাটিয়ে দেন।[২] হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় সালাতের জন্য খাড়া হয়ে একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে ভোর হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল নিম্নরূপ:

وَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

“আর আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর আপনি তাদের ক্ষমা করলে আপনি তো অবশ্যই প্রবল পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ”[৩] সূরা আল মাইদা-১১৮ আয়াত। হযরত আয়েশা (রা) এও বলেন, তিনি এত বেশী সিয়াম (রোযা) পালন করতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি সম্ভবত সিয়াম আর খুলবেন না, সর্বদাই বুঝি রোযাদার থাকবেন। আবার যখন সওম খুলতেন তখন আমরা ভাবতান সম্ভবত তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না।”[৪]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, “যদি কেউ তাঁকে কিয়ামুল-লায়ল (তাহাজ্জুদ সালাত)-এ মশগুল দেখতে চাইত তবে তা দেখতে পেত। আবার ঠিক তেমনি কেউ যদি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইত তাহলে তাও সে দেখতে পেত।”[৫]

‘আবদুল্লাহ ইবনু’শ-শিখখীর (রা) বর্ণনা করেন, “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি সালাতে মগ্ন এবং কান্নার কারণে তাঁর বক্ষ মুবারক থেকে এমন আওয়াজ বের হচ্ছিল যেমন ডেকচি থেকে ফুটন্ত পানির শব্দ বের হয়।”[৬]

---

১. ইমাম বুখারী সূরা আল-ফাতহ-এর তাফসীরে এবং মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ ইহয়াউল্লায়ল অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

২. তিরমিযী।

৩. নাসাঈ ও ইবন মাজা।

৪. নফল সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫. বুখারী, কিতাবুত-তাহাজ্জুদ।

৬. শামায়েলে তিরমিযী।

সালাত ভিন্ন আর কোন কিছুতে তিনি সান্ত্বনা পেতেন না এবং মনে হতো সালাত আদায়ের পরও তিনি সালাতের আকাঙ্ক্ষী ও অপেক্ষমাণ। তিনি বলতেন: جعل قرة عينى فى الصلوة "আমার চক্ষুর শীতলতা সালাতের ভেতর রাখা হয়েছে।"[১]

সাহাবা-ই কিরাম (রা) বলেন, "যখন কোন সমস্যা-সংকট কিংবা পেরেশানীর কারণ দেখা দিত অমনি তিনি সালাতের দিকে মনোযোগী হতেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।"[২]

আবূদ-দারদা (রা) বলেন, "যখনই রাতের বেলা কখনো জোরে প্রবল বেগে বাতাস বইত তিনি মসজিদে আশ্রয় নিতেন যতক্ষণ না বাতাস থেমে যেত। যদি মহাকাশে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যেত, যেমন সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগহণ, তিনি সালাতে মনোনিবেশ করতেন। এ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় কামনা করতেন যতক্ষণ না গ্রহণ কেটে যেত এবং আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেত।"[৩] তিনি সব সময় সালাত আদায়ে আগ্রহী থাকতেন এবং সালাত ছাড়া তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন না। যতক্ষণ না তিনি সালাত আদায় করতেন তাঁর অস্থিরতা বিদ্যমান থাকত। কখনো বা তাঁর মুওয়াযযিন বিলাল (রা)-কে বলতেন, "বিলাল! সালাতের ইহতিমাম কর এবং আমার শান্তি ও তৃপ্তির ব্যবস্থা কর।"[৪]

পার্থিব সম্পদ ও এর প্রতি অনীহা

টাকা-পয়সা ও দুনিয়ার ধন-সম্পদ তিনি কোন্ নজরে দেখতেন তা কোন কথাশিল্পী কিংবা তুখোড় কোন বাগ্মীও বর্ণনা করতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন আর তা এজন্য যে, তিনি তো দূরের কথা, তাঁর ঈমানী ও রব্বানী মাদরাসার একজন পেছনের সারির ছাত্র এবং আরব ও অনারব বিশ্বের একজন ছাত্রের তস্য ছাত্রও টাকা-পয়সা কিংবা বিত্ত-সম্পদকে এক কানাকড়ির বেশি মূল্য দিতেন না এবং তাঁদের বৈরাগ্যসুলভ জীবন, পার্থিব সম্পদের প্রতি নিস্পৃহ মানসিকতা, অপরের জন্য সম্পদ ব্যয়ের আগ্রহ, নিজের মুকাবিলায় অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দানের, অল্পে তুষ্টি ও পরমুখাপেক্ষাহীনতার যেসব ঘটনা ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত দেখতে পাওয়া যায়, তাতে যে কোন মানুষের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটা বিচিত্র নয়![৫] যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন দাসানুদাসের তস্য দাসের এই অবস্থা, তখন এ থেকেই পরিমাপ করা যায়, তাহলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি এদের সবার ইমাম

১. নাসাঈ, হুকুকুন্নিসা' অধ্যায়।

২. আবূ দাউদ।

৩. তাবারানী।

৪. আবূ দাউদ, ফী সালাতিল-আতামাহ।

৫. বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন আবদুল্লাহ ইবন মুবারকের কিতাবুয-যুহদ, ইবনুল-জওযীর সিফাতুল-সফওয়া ও আবূ নুআয়ম-এর হিলয়াতুল-আওলিয়া।

ও পথ প্রদর্শক এবং যিনি প্রতিটি নেক ও কল্যাণ, মর্যাদা ও তাকওয়ায় তাদের মুরুব্বী ও শিক্ষক ছিলেন, তাঁর অবস্থা এ ব্যাপারে কী হতে পারে?

এজন্য আমরা এখানে এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি যা সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর মুখ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। কেননা সত্য ঘটনা থেকে বেশি প্রভাবশালী ও কার্যকর কোন কিছু নেই এবং এর চেয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও বাঙময় প্রতিনিধিত্ব কোন কথামালা দ্বারা হতে পারে না।

তাঁর সবচেয়ে প্রভাবমণ্ডিত ও বিখ্যাত উক্তি, যা তিনি হরফে হরফে মেনে চলতেন এবং যা ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, তা হলো ঃ

اللّٰهم لا عيش الا عيش الاخرة -

"হে আল্লাহ্! পারলৌকিক জীবনই তো আসল জীবন!"

তিনি বলতেন :

مالى وللدنيا وما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها -

"দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক তো এতটুকুই যেমন কোন মুসাফির পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে কোন গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসল, আরাম করল, তারপর ছায়া ছেড়ে গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলো।"[১]

হযরত ওমর (রা) একবার আঁ-হযরত ﷺ-কে চাটাইয়ের ওপর শোয়া অবস্থায় দেখতে পান, দেখতে পান পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ। এই দৃশ্যে হযরত ওমর (রা) কেঁদে ফেলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে হুযূর আকরাম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? ওমর (রা) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র সৃষ্ট জগতের ভেতর সর্বাধিক নির্বাচিত আপনিই, অথচ তাবৎ সুখ-সম্ভোগের অধিকারী রোম ও পারস্য সম্রাটেরা। এ কথা শুনে হুযূর আকরাম ﷺ-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "খাত্তাব পুত্র! এতে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে?" এরপর তিনি বললেন, "এরা তো তারাই যাদেরকে দুনিয়ার জীবনের সমস্ত মজাই এখানে দিয়ে দেয়া হয়েছে।"[২]

তিনি কেবল বিলাসী ও আরাম-আয়েশের জীবন নিজের জন্যই অপছন্দ করতেন তাই নয়, বরং আহলে আয়াত (নবী পরিবার)-এর জন্যও পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি দু'আ করতেন :

---

১. আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী।

২. বুখারী-মুসলিম।

اللّٰهم اجعل وزق ال محمد قوتا -

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ-এর পবিারবর্গের যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু রিযিকই দিও।"[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার জীবন! আল্লাহ্র নবী ও তাঁর পরিবারবর্গ কখনো পরপর তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে খেতে পারেন নি আর এ অবস্থায় তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন!"[২]

উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, "আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গের এক চাঁদ উঠে আর এক চাঁদ এসে যেত, অথচ আমাদের ঘরে চুলা জ্বলত না; কেবল খেজুর ও পানির ওপর আমাদের জীবন চলত।"[৩]

তাঁর লৌহবর্ম জনৈক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। তাঁর নিকট এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে তিনি তা ছাড়িয়ে আনতে পারেন। এ অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।[৪]

যখন তিনি জীবনের শেষ হজ্জ আদায় করেন সে সময় তাঁর সামনে ছিল মুসলমানদের জনসমুদ্র, সমগ্র আরব ভূখণ্ড ছিল তাঁর পদানত, অথচ তাঁর নিজের অবস্থা ছিল একজন দরিদ্রের ন্যায়; তাঁর গায়ে ছিল একটি চাদর মাত্র যার মূল্য চার দিরহামের বেশি ছিল না। সে সময় তিনি বলেছিলেন : হে আল্লাহ্! একে তুমি এমন এক হজ্জ বানাও যার ভেতর রিয়া (লোক দেখানো) ও খ্যাতির কামনা যেন না থাকে![৫]

যহরত আবূ যার (রা)-কে একবার তিনি বলেছিলেন, "আমি পছন্দ করি না, আমার কাছে ওহুদ পাহাড়সম স্বর্ণ থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক এবং তার ভেতর থেকে একটি দীনারও আমার নিকট অবশিষ্ট থাকুক। তবে কোন দীনী কাজে কিছু অবশিষ্ট থাকলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আমি সেগুলো এভাবে এবং এভাবে ডানে বামে ও পেছনে (যাকে পাব) বিলিয়ে দেব।"[৬]

হযরত জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, "কখনো এমন হয়নি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে আর তার জওয়াবে তিনি

---

১. বুখারী কিতাবুর-রিকাক, মুসলিম, কিতাবু'য-যুহ্দ।

২. বুখারী ও আহমাদ, মুসলিম, কিতাবুয-যুহ্দ।

৩. বুখারী ও মুসলিম।

৪. তিরমিযি।

৫. শামায়েলে তিরমিযী, আনাস (রা) বর্ণিত।

৬. বুখারী ও মুসলিম; শব্দসমষ্টি বুখারীর, কিতাবুর-রিকাক باب قول النبى ﷺ ما احب ان لى احدا ذهبا

'না' বলেছেন।"[১] ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বদান্যতা ও দানশীলতায় বেগবান বাতাসের চেয়েও অধিক দ্রুতগামী ছিলেন।"[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার এক লোক তাঁর (রাসূলের) নিকট কিছু চাইল। তিনি তাকে এক পাল বকরী ও ভেড়া দিয়ে দিলেন যা দু'টো পাহাড়ের মাঝে ছিল। লোকটি ভেড়া-বকরীর পাল হাঁকিয়ে তার গোত্রের লোকদের নিকট ফিরে গেল এবং বলতে লাগল: লোক সকল! ইসলাম কবুল কর। মুহাম্মদ ﷺ এভাবে বিলাচ্ছেন যে, দারিদ্র ও অভাব-অনটনের যেন কোন ভয় নেই! একবার তাঁর খেদমতে নব্বই হাজার দিরহাম পেশ করা হলো। দিরহামগুলো একটা চাটাইয়ে ঢালা হলো। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে তা বণ্টন করা শুরু করলেন। কোন প্রার্থীকেই তিনি ফেরাননি, এমন কি এক সময় তা সব শেষ হয়ে গেল![৩]

আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের সঙ্গে

কিন্তু ইবাদতের প্রতি এই আগ্রহ, দুনিয়া ও পার্থিব জগতের উপকরণাদির সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, পরিপূর্ণ যুহ্দ, আল্লাহতাআলার দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ এবং তাঁর দরবারে কান্নাকাটি, দু'আ ও মুনাজাতের ভেতর দিয়ে আত্মবিলোপ তাঁর সবচেয়ে উত্তম আখলাক, স্নেহ-ভালবাসা, অন্তররাজ্য জয়, স্নেহপূর্ণ আচরণ এবং প্রত্যেক মানুষকে তার বৈধ অধিকার প্রদানে ও তার সম্মান ও মর্যাদা মাফিক আচরণে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করত না। আর এ দু'টো এমন বিষয় যে, দু'টোকে একত্র করা অন্য কোন লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি বলতেন:

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً -

"আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে খুব কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।"

লোকের ভেতর তিনিই সবচেয়ে উদার হৃদয়ের ছিলেন, কোমল প্রকৃতির অধিকারী এবং খান্দানের দিক দিয়ে সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন না, বরং তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি-খুশীর সঙ্গে ও সহাস্য বদনে মিশতেন। তাঁদের বাচ্চাদের কোলে বসাতেন। স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস-দাসী, ফকীর-মিসকীন, সকলের দাওয়াতই তিনি কবুল করতেন। পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন, তা সে শহরের শেষ প্রান্তেই থাকুক না কেন!

---

১. বুখারী, কিতাবুল-আদাব।

২. গোটা হাদীছ বুখারী ও মুসলিমে দেখা যেতে পারে।

৩. বুখারী ও মুসলিম।

মা'যূর-এর ওপর কবুল করতেন।[১] সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর মজলিসে তাঁকে কখনো হাত-পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি যাতে অন্যের কোনরূপ কষ্ট হয়।

'আবদুল্লাহ ইবনুল-হারিছ (রা) বর্ণনা করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বেশি প্রফুল্ল ও হাসি-খুশী আর কাউকে দেখিনি।"[২] জাবির ইবন সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মজলিসে আমি শতবারের বেশি বসার সুযোগ পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাঁর সাহাবা-ই কিরাম (রা) একে অন্যের থেকে কবিতা শুনছেন, শোনাচ্ছেন এবং জাহিলী যুগের কোন কোন কথা ও ঘটনাসমূহের আলোচনাও করেছেন আর তিনি চুপ করে আছেন অথবা কখনো কোন হাসির কথা হলে তিনিও তাঁদের সাথে মুচকি হাসছেন।

শুরায়দ (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উমায়্যা ইবনুস-সালত-এর কবিতা শোনাবার জন্য বললেন। তারপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর কবিতা শোনালাম।"[৩]

তিনি অত্যন্ত কোমল অন্তঃকরণবিশিষ্ট, স্নেহ-ভালবাসা ও দয়া-মায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন। মানবীয় আবেগ ও সূক্ষ্মতর অনুভূতি তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতে সর্বোত্তম ও সুন্দরতম আকৃতিতে জেঁকে ছিল। আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বলতেন, আমার সন্তানদ্বয় (হাসান ও হুসায়ন রা.)-কে ডাক দাও। ডাক দিতেই তাঁরা দৌড়ে আসতেন। তখন তিনি তাঁদের দু'জনকে চুমু খেতেন এবং বুকে তুলে নিতেন।"[৪] "একবার তিনি তাঁর দৌহিত্র হাসান ইবন আলী (রা)-কে ডাকলেন। তিনি দৌড়ে এলেন এবং তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরপর তাঁর দাড়ি মুবারকের ভেতর আঙুল ঢোকাতে লাগলেন। এরপর তিনি তাঁর নিজরে পবিত্র মুখ খুলে দিলেন এবং তিনি (হাসান) আপন মুখ তাঁর (রাসূল) বরকতময় মুখের ভেতর ফেলতে লাগলেন।"[৫]

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, "যায়দ ইবন হারিছা (রা) [যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম ছিলেন] যখন মদীনায় এলেন তখন তিনি ঘরেই ছিলেন। সে ঘরে আসল এবং দরজায় আঘাত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই উঠে পড়লেন। সে সময় তাঁর শরীরের সর্বত্র কাপড় ঢাকা ছিল না, শরীর থেকে চাদর গড়িয়ে পড়ছিল। এ অবস্থায় তিনি তাঁকে (যায়দকে) দেখে জড়িয়ে ধরলেন, কোলাকুলি করলেন এবং চুমু খেলেন।"[৬]

---

১. আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত।

২. শামায়েলে তিরমিযী।

৩. আল-আদাবুল-মুফবাদ, বুখারী।

৪. তিরমিযী, মানাকিব অধ্যায়।

৫. আল-আদাবুল-মুফরাদ, বুখারীকৃত ৭৩।

৬. তিরমিযী।

উসামা ইবন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জনৈকা কন্যা তাঁকে পয়গাম পাঠালেন, আমার বাচ্চা মরণাপন্ন! মেহেরবানী করে আসুন। তিনি তাঁকে সালাম পাঠালেন এবং বললেন : সবই আল্লাহর যা তিনি নিয়েছেন এবং যা তিনি দিয়েছেন তাও আল্লাহরই। প্রতিটি বস্তু তাঁর দরবারে নামাঙ্কিত ও নির্ধারিত। অতএব, ধৈর্য ধারণ কর এবং পুরস্কারের প্রত্যাশী হও, আশায় বুক বাঁধো। কন্যা কসম দিয়ে বলে পাঠালেন যেন তিনি অবশ্যই একবার আসেন! তিনি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি সেখানে গিয়ে বসলে কোলে করে বাচ্চা সেখানে আনা হলো। তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। ঐ সময় তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এ দেখে তাঁর চোখ ফেটে অবিরল ধারায় চোখের পানি পড়তে লাগল। হযরত সাদ (রা) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি (আপনিও কাঁদছেন)? তিনি বললেন, এ স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ভেতর যাকে চান দান করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমদিল বান্দাদের ওপরই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।[১]

বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চাচা আব্বাস (রা)-ও (তখনও তিনি মুসলমান হননি) ছিলেন। অন্য যুদ্ধবন্দীদের মত তাঁকেও কষে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ফলে তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন আর তাঁর কাতরানির কারণে তিনি ঘুমাতে পারছিলেন না। জনৈক আনসার সাহাবী বিষয়টি বুঝতে পেরে হযরত আব্বাস (রা)-এর বাঁধন একটু ঢিলা করে দেন। আনসার সাহাবীর এই মমতা দেখানো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে উৎসাহিত করতে পারেনি, হযরত আব্বাস (রা)-ও একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দীর মধ্যে কোনরূপ ভিন্ন আচরণ করা হোক (ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইচ্ছা মতো অপরাপর বন্দীদের বাঁধনও অনুরূপ ঢিলা করে দেয়া হয়)। আনসার সাহাবী যখন দেখতে পেলেন, হযরত আব্বাস-এর বাঁধন ঢিলা করে দেয়াতে আল্লাহর রাসূল খুশী হয়েছেন তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁর চাচাকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হোক! কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই পরামর্শ কবুল করেননি।[২]

একবার জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগল : আপনারা কি আপনাদের ছেলেমেয়েদের স্নেহ করেন, মায়া করেন, ভালবাসেন? আমরা তো তাদের মায়া করি না, ভালবাসি না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি আল্লাহতাআলা তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি আর তোমাদের জন্য কি করতে পারি?[৩]

---

১. বুখারী, কিতাবুল মারদা, কিতাবুল-জানাইয, باب قول النبى ﷺ يعذب الميت ببكاء اهله

২. ফাতহুল বারী, ৮ম খ., ৩২৪ পৃ. মিসরীয় সংস্করণ।

৩. বুখারী, আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস, কিতাবুল-আদাব।

তিনি শিশুদের প্রতি খুবই সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে স্নেহপূ ও কোমল আচরণ করতেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার খেলাধুলায় মত্ত কতিপয় শিশুর পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন।[1]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে থাকতেন। আমার এক কনিষ্ঠ ভাইকে তিনি বলতেন : ওহে উমায়র! তোমার নাগায়র (একটু ছোট পাখী যা নিয়ে শিশুরা বেশী সময় খেলা করে থাকে)-এর কি হলো?”[2]

মুসলমানদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল ও সদয় ছিলেন। তিনি তাদের অবস্থায় খুব রেআয়েত করতেন। মানব স্বভাবে বিরক্তি ও ক্লান্তিবোধ করা এবং সাময়িকভাবে তাদের মাঝে ভীরুতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়! এসবের দিকে তিনি বরাবর লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যে ওয়াজ-নসীহত করতেন তা বিরতি দিয়ে করতেন এবং তা এজন্য করতেন যাতে আমাদের মাঝে তা বিরক্তি বা একঘেয়েমীর সৃষ্টি না করে। সালাত বা নামাযের সঙ্গে এতটা প্রেম ও আকর্ষণ সত্ত্বেও যদি কোন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন অমনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। তিনি নিজে বলেছেন : আমি সালাতে দাঁড়াই এবং চাই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তা আদায় করি। তারপর কোন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। অতঃপর এই ধারণায় আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করি যাতে তার মায়ের কোনরূপ উৎকণ্ঠা কিংবা মানসিক পীড়ার কারণ না হয়।[3]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) আরও বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মহল্লার ফজরের নামাযে কেবল এজন্যই হাজির হই না যে, অমুক লোক খুবই দীর্ঘ সালাত আদায় করে থাকে। এরপর তিনি যে ওয়াজ করলেন এর থেকে রাগান্বিত অবস্থায় আর কোন ওয়াজে তাঁকে আমি দেখিনি। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে সেই সব লোক রয়েছে যারা (ইবাদত ও সালাতের প্রতি) মানুষকে বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত করে তুলছে। তোমাদের মধ্যে যারা সালাতে ইমামতি করবে তাদের উচিত হবে তা সংক্ষিপ্ত করা। কেননা জামাতে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে দুর্বল লোক যেমন রয়েছে, তেমনি বৃদ্ধ ও জরুরত রয়েছে এমন লোকও রয়েছে।[4]

---

১. বুখারী।

২. আল-আদাবুল মুফরাদ।

৩. বুখারী, কিতাবুস-সালাত।

৪. প্রাগুক্ত।

এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, মহিলা যাত্রীদলে ছিল আনজাশা নামে জনৈকা সুরেলা কণ্ঠের অধিকারিণী যার সুরেলা আবৃত্তিতে উট দ্রুত গতিতে ছুটত। মহিলাদের এতে কষ্ট হতো। এই দেখে একদিন তিনি আনজাশাকে বললেন : "আনজাশা! একটু আস্তে। দ্রত গতির কারণে দুর্বল ও কোমল দেহের লোকগুলোর যেন কষ্ট না হয়!"[১]

আল্লাহতায়ালা তাঁর বক্ষ মুবারককে সব রকমের হিংসা-বিদ্বেষ ও অপরের ক্ষতি ও অমঙ্গল কামনা থেকে সযত্নে মুক্ত রেখেছিলেন। তিনি বলতেন : তোমাদের কেউ যেন আমার সামনে অপর কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ না করে। কেননা আমি চাই, তোমাদের সামনে আমি যেন এমনভাবে হাজির হতে পারি যে, তোমাদের প্রতি আমার দিল সাফ থাকে।[২]

মুসলমানদের পক্ষে তিনি ছিলেন স্নেহশীল পিতার মতই আর সমস্ত মুসলমান ছিল যেন সকলেই তাঁর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সকলের যিম্মাদারী যেন তাঁরই কাঁধে ন্যস্ত! তিনি তাদের ওপর এতটা সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন যতটা হয়ে থাকে একজন মা তার কোলের সন্তানের প্রতি। মুসলমানদের নিকট ধন-সম্পদ ও তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহতাআলা যে প্রাচুর্য দান করেছিলেন এর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাদের ঋণ ও তাদের পিঠের ওপর চাপানো বোঝা হাল্কা করে তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, কেউ সম্পত্তি রেখে মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারী তথা ওয়ারিছদের আর কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার।[৩] অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি বলতেন, এমন কোন মুমিন নেই যার দুনিয়া ও আখিরাতে আমার চেয়ে বড় কোন অভিভাবক আছে। যদি চাও এই আয়াত পড়তে পার :

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ـ

"নবী মুমিনদের জন্য তাদের জীবনের চেয়েও বেশি বন্ধু ও সুহৃদ হয়ে থাকেন।" (সূরা আল-আহযাব, ৬ আয়াত)

এজন্য কোন মুসলমান ইনতিকাল করলে এবং তার কোন পরিত্যক্ত সম্পদ থাকলে তা তার ওয়ারিছ ও নিকটাত্মীয়দের অধিকার হিসাবে গণ্য হবে, তা সে যেই হোক! কিন্তু যদি তার যিম্মায় কোন ঋণ থাকে, থাকে জমি-জায়গা, তবে সে যেন আমার কাছে আসে। তার অভিভাবক ও যিম্মাদার আমি।[৪]

---

১. আল-আদাবুল-মুফরাদ, এ ছাড়াও বুখারী ও মুসলিম।

২. কিতাবু'শ-শিফা, পৃ. ৫৫, আবূ দাউদ সূত্রে বর্ণিত।

৩. বুখারী, কিতাবুল-ইসতিকরায।

৪. বুখারী কিতাবুল-ইস্তিকরায।

স্বভাব-প্রকৃতিতে ভারসাম্য

আল্লাহতা'আলা তাঁকে যেই উন্নত স্তরের আখলাক এবং যেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত ভারসাম্য দান করেছিলেন তা ছিল ভবিষ্যত শতাব্দীগুলোর এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পূর্ণতম বিকাশ। একে আমরা স্বভাবের ভারসাম্য, সুস্থ প্রকৃতি, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা, ভারসাম্য ও সমগ্র ও কম বেশির বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত বলে ব্যাখা করতে পারি। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ দু'টো কাজের মধ্যে যখন কোন একটিকে প্রাধান্য প্রদান করতেন তখন সব সময় সহজতরটিকেই প্রাধান্য দিতেন। তবে এই শর্তে, এতে গোনাহর নাম-গন্ধও যেন না থাকে! যদি এতে গোনাহর সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যেত তবে তিনি এর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করতেন।[১]

তিনি বেশি লৌকিকতা, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যুহ্দ ও নির্লিপ্ততা এবং নফসের বৈধ অধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া থেকে অনেক দূরে ছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "দীন খুব সহজ; তবে কেউ যদি দীনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় এগিয়ে আসে দীন তার ওপর বিজয়ী হবে, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবে। এজন্য মধ্যম পন্থায় ভারসাম্যপূর্ণ পথে চল। কাছের দিকগুলোর রেআয়াত কর, সন্তুষ্ট থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও অন্ধকার রাতের ইবাদত থেকে শক্তি অর্জন কর।"[২]

তিনি এও বলতেন, "থাম, ততটুকুই কর যতটুকু করার শক্তি তোমার রয়েছে। আর তা এজন্য যে, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা তো ক্লান্ত হয়ে পড়বেন না, বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।" ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার নিকট কোন্ ধরনের দীন বা ধর্ম সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয়? তিনি বললেন, السمحة। الحنيفية। "সহজ ও নিষ্ঠাপূর্ণ দীনে ইবরাহীমী।"[৩]

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "বাড়াবাড়ি ও জোরযবরদস্তির সঙ্গে কাজ আদায়কারী ও খুঁৎ তালাশকারী ধ্বংস হয়েছে।"[৪]

তিনি যখন কোন কোন সময় কতক সাহাবীকে কোথাও কোন জায়গায় তা'লীম প্রদান ও ওয়াজ-নসীহতের জন্য পাঠাতেন তখন তাঁদেরকে বলতেন, "সহজ পন্থা

---

১. মুসলিম।

২. বুখারী, কিতাবুল-ঈমান, "দীন সহজ" শীর্ষক অধ্যায়।

৩. আল-আদাবুল-মুফরাদ, ১৮১ পৃ.।

৪. মুসলিম অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে যে জোরযবরদস্তি ও বাড়াবাড়ি করে।

অনুসরণ করবে, সংকীর্ণ করে তুলবে না; সুসংবাদ শোনাবে, হিংসুক ও ঘৃণ্য করে তুলবে না।" আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল-আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা তাঁর দেয়া নে'মতের বাহ্যিক প্রকাশ তাঁর বান্দার ওপর দেখতে পছন্দ করেন।"[১]

বাড়িতে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে

তিনি তাঁর বাড়িতে সাধারণ মানুষের মতই থাকতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা) নিজেই বর্ণনা করেছেন, "তিনি তাঁর কাপড়-চোপড়ও পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধও নিজ হাতেই দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।" সামনে এগিয়ে বলেন, "নিজের কাপড়ে তালি লাগাতেন, জুতা সেলাই করতেন এবং এভাবে আরও কাজ করতেন।" হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি তাঁর ঘরে কিভাবে থাকতেন? জওয়াবে তিনি বললেন, "তিনি ঘরে কাজে-কর্মের ভেতর থাকতেন। যখন সালাতের ওয়াকত হতো, তখন সালাত আদায়ের জন্য বাইরে চলে যেতেন।"[২]

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, "তিনি তাঁর নিজের জুতা মেরামত করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন যেমন তোমাদের কেউ কেউ নিজেদের বাড়ি-ঘরে করে থাকে।"[৩]

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, "তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কোমল ও সবার চেয়ে বেশি মহানুভব ছিলেন। আর হাসির সময় মুচকি হাসি হাসতেন।"[৪]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "আমি এমন কাউকে দেখিনি, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি অধিক সদয় ও স্নেহশীল।"[৫] হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট সর্বোত্তম এবং আমি আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"[৬]

---

১. তিরমিযী এই হাদীস আবওয়াবুল-আদাব-এ বর্ণনা করেছেন, باب ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যেসব নেয়ামতে ভূষিত করেছেন বান্দার জীবনে তার প্রকাশ ঘটুক তা তিনি দেখতে পছন্দ করেন। প্রাচুর্যের অধিকারী লোক দরিদ্র বেশে থাকুক-এ আল্লাহর নেমতের নাশোকরী এবং প্রয়োজনে ছাড়া আপন দারিদ্র্য প্রকাশ করা তেমনি তাঁর অপছন্দনীয়।

২. বুখারী, কিতাবুস-সালাত, আহমাদ ও আবদুর রাযযাক সূত্রে।

৩. মুসান্নিফ আবদুর-রাযযাক, হাদীস নং-২০৪৯২, ১১শ খ., ২৬০ পৃ.।

৪. ইবনে আসাকির।

৫. মুসনাদ আহমদ, আনাস (রা) বর্ণিত; মুসলিম।

৬. ইবন মাজা, باب حسن معاشر النساء;

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোন খাদ্য বস্তুর ভেতর দোষ খোঁজেন নি। যদি পছন্দ হয়েছে খেয়েছেন, পছন্দ না হলে তা খাননি।"[১]

আপন আহলে বায়ত, পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর চিরদিনের অভ্যাস ছিল, যে যেই পরিমাণ তাঁর নিকটবর্তী হতো, বিপদাপদ ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাকে সেই পরিমাণ সামনে রাখতেন এবং পুরস্কার-পারিতোষিক ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় তাকে সেই পরিমাণ পেছনে রাখতেন। যখন 'উৎবা রবীআ, শায়বা ইবন রবীআ ও ওলীদ ইবনে উৎবা (যারা ছিল আরবের নামী-দামী বীর পুরুষ ও রণনিপুণ সৈনিক) বদর প্রান্তরে কুরায়শদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে তাদের মুকাবিলার চ্যালেঞ্জ প্রদান করল এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করল, তখন তিনি আপন পিতৃব্য হামযা, পিতৃব্য-পুত্র আলী ও নিকটাত্মীয় উবায়দা (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন, অথচ তিনি মক্কার এসব বাহাদুর সৈনিকের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বেশ ভালই জানতেন। মুহাজিরদের মধ্যে এমন অনেক বীর পুরুষ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন যাঁরা তাদের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে অবতীর্ণ হতে পারতেন। বনূ হাশিমের এই তিনজন ছিলেন তাঁরাই যাঁরা রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে তাঁর সবচে' নিকটজন ছিলেন, ছিলেন সবচে' একান্ত প্রিয়জন। কিন্তু তাঁদেরকে এই বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি অন্যদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেননি, তাঁদেরকেই মুকাবিলায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহতাআলার কুদরত দেখুন, এই তিনজনকেই তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুকাবিলায় জয়যুক্ত করলেন এবং বিজয় দান করলেন। হযরত হামযা ও আলী (রা) সাফল্যের সঙ্গে বিজয়ী বেশে ও নিরাপদে ফিরে আসলেন। আর উবাদা (রা)-কে আহত অবস্থায় ময়দান থেকে উঠিয়ে আনা হলো।

তিনি যখন (বিদায় হজ্জের খুতবায়) সুদকে হারাম ও জাহেলী যুগের রক্তের বদলাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন তখনও তার সূচনা করলেন তাঁরই শ্রদ্ধেয় চাচা আব্বাস ইবন আবদুল-মুত্তালিব ও আপন ভাতিজা রবীআ ইবনুল-হারিছ (রা) ইবন আবদিল-মুত্তালিব-এর পুত্র থেকে। বিদায় হজ্জে দেয়া এই খুতবায় তিনি বলেন :

"জাহিলী যুগের সুদ আজ থেকে রহিত ও বিলুপ্ত করা হলো এবং প্রথম যে সুদ আজ আমি বিলুপ্ত করছি তা আমারই আপনজন আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। জাহিলী যুগের রক্তের প্রতিশোধও আজ বিলুপ্ত করা হলো আর সে ক্ষেত্রে প্রথম যে রক্তের প্রতিশোধ বিলুপ্ত করা হলো তা আমাদের রবীআ ইবনুল-হারিছ-এর সন্তানের রক্ত।"[২]

---

১. বুখারী-মুসলিম, বুখারী, কিতাবুল-আতইমা ও মুসলিম।

২. মুসলিম কিতাবুল-হজ্জ; আবূ দাউদ, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত; কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম ইয়াস ছিল।

পক্ষান্তরে আরাম-আয়েশ ও পুরস্কার কিংবা পারিতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ রাজা-বাদশাহদের কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের আচরণ ও অভ্যাসের বিপরীতে এই সমস্ত বুযুর্গের সব সময় পেছনে রেখেছেন এবং এঁদের মুকাবিলায় অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু বর্ণনা করেন, গম ভাঙতে ও যাঁতা ঘোরাতে ফাতিমা (রা)-এর খুবই কষ্ট হতো। সে সময় তিনি জানতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে বেশ কিছু দাসী এসেছে। তিনি পিতার খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর (ফাতিমার) খেদমতের জন্য, কাজে-কর্মে তাঁকে কিছুটা সাহায্যের জন্য একজন দাসী প্রদানের আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় ঘরে ছিলেন না। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে এর উল্লেখ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) এ কথা আল্লাহর রসূলের কানে তুললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে তশরীফ আনলেন। সে সময় আমরা ঘুমাবার জন্য বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখেই আমরা দাঁড়াতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে উঠতে নিষেধ করলেন। তাঁর কদম মুবারকের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করে বললেন, "আমি কি তোমাকে এর থেকে উত্তম কথা বলব না যার আবেদন তুমি করেছিলে? যখন তুমি ঘুমাতে যাও তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। আমার কাছে তোমরা যা চেয়েছিলে তার চেয়ে এটি ভাল।"[১]

অপর এক বর্ণনায় এ ঘটনার সাথে এও বলা হয়েছে, তিনি তাঁদেরকে বলেন, আল্লাহর কসম! তাহলে সুফফার সদস্যদের ক্ষুধায় পেট যখন পিঠের সাথে লেগে গেছে তখন (তাঁদের একটা ব্যবস্থা না করে) তোমাদের জন্য আমি কিছুই দিতে পারি না। তাঁদের খরচ চালাবার মত এ মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই। এদের (দাস-দাসীগুলো)-কে বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে তা ওঁদের জন্য ব্যয় করব।"[২]

সূক্ষ্মতর অনুভূতি, আবেগের মর্যাদা ও পবিত্রতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত তথা জীবন-চরিত নবুওত ও দাওয়াত-ই হকের মহান দায়িত্ব, মানবতার জন্য দরদ ও মর্মজ্বালা এবং সেই চিন্তা-ভাবনা ও কর্তব্যের তাগিদের সাথে সাথে, পর্বতের পক্ষেও যার ভার বহন করা সহজসাধ্য ছিল না, সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতি, পবিত্র ও সমুন্নত আবেগপূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করছিল সেই অস্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি, অনড় মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে যা আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম-এর চিহ্ন ও বিশেষ চরিত্র হয়ে থাকে এবং যাঁরা দাওয়াত ইলাল্লাহ ও আল্লাহর কলেমার অতি মর্যাদার পথে এবং তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করবার

১. বুখারী, কিতাবুল-জিহাদ।

২. আহমাদ; ফতহুল-বারী, ৭ম খ., ২৩-২৪।

ক্ষেত্রে কোন কিছুকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না এবং কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেন না। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সাথীদেরকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভোলেন নি যাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সত্যের পথে নিজেদের সব কিছু লুটিয়ে দিয়েছিলেন, যাঁরা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করেছিলেন, তাঁদের কথা তিনি বারবার আলোচনা করেছেন, তাঁদের জন্য দু'আ করেছেন এবং তাঁদের শেষ বিশ্রামস্থলে চলে গেছেন।

এই ভালবাসা ও আস্থা মানবীয় দেহ অতিক্রম করে সেই সব নিষ্প্রাণ পাথর, পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছিল যেখানে প্রেম ও বিশ্বস্ততা, কুরবানী ও আত্মার এই উৎসর্গের এই অপূর্ব দৃশ্য বিশাল বিস্তৃত আসমান দেখছিলেন এবং যেই উপত্যকা ভূমি তাঁদের অবস্থানস্থলে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, একবার তিনি ওহুদকে লক্ষ করে বলেছিলেন, هذاجبل يحبناونحبه "এই সেই পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও যাকে ভালবাসি।"[১]

আবী হুমায়দ (রা) বর্ণনা করেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলাম। আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি হলাম তখন তিনি বললেন :

هذه طابة وهذا جبل يحبناونحبه ـ

"এই মদীনা তায়্যিবা আর এই সেই পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরা যাকে ভালবাসি।"[২]

উকবা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন ওহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করতে গেলেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করলেন।"[৩] জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, আল্লাহর রাসূলের সামনে ওহুদের শহীদের সম্পর্কে কথা উঠল। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা ছিল আমিও যদি ওহুদের শহীদদের সাথে পাহাড়ে কোলে থেকে যেতে পারতাম! তিনি তাঁর প্রিয়তম চাচা ও দুধভাইয়ের শাহাদাতের বেদনায় ও শোকে (যিনি রাসূলের ভালবাসায়, টানে ও ইসলামের সাহায্য-সমর্থনে আপন জীবন বিলিয়ে দেন এবং তাঁর লাশ মুবারকের সঙ্গে যেই আচরণ করা হয়েছিল যা আর কারো সঙ্গে করা হয়নি) উলুল-আজম (সুদৃঢ় ধৈর্যের অধিকারী) পয়গম্বরদের ন্যায় ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ওহুদ থেকে মদীনায় ফিরলেন এবং বনী

---

১. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী।

২. প্রাগুক্ত, তাবুকের ঘটনা।

৩. প্রাগুক্ত।

আবদিল-আশহাল-এর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিছেলেন এমন সময় শহীদদের জন্য কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এল। আর এটাই তাঁর সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতিতে অনুরন সৃষ্টি করল, তাঁর চোখকে করে তুলল অশ্রুসিক্ত। তিনি বললেন, لكن حمزة لا بواكي له "কিন্তু হামযার জন্য কোন ক্রন্দনকারী নেই।"[১]

তথাপি এই ভদ্র ও উন্নত মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, নবুওয়াত ও ইসলামের দাওয়াতের মহান যিম্মাদারী, ঐশী সীমারেখার রেআয়েত ও হেফাজতের ব্যাপারে কোনরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি। সীরাত তথা জীবন-চরিতকার ও ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন, সাদ ইবন মুআয ও উসায়দ উবন হুদায়র (রা) যখন বনী আবদিল-আশহালের ঘরে ফিরে এলেন এবং তখন তাঁরা নিজেদের ঘরের মহিলাদের তৈরী হওয়ার জন্য হুকুম দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে গিয়ে পিতৃব্য সায়্যিদুনা হামযা (রা)-এর শাহাদাতে মাতম তথা শোক প্রকাশের জন্য বললেন। মহিলারা তাই করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ফিরে মহিলাদেরকে মসজিদে নববীর দরজায় কান্নারত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, "আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন! তোমরা যে যার ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের এখানে আসাটাই শোক প্রকাশের সমান হয়ে গেছে!" এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি হচ্ছে? তাঁকে বলা হলো, আনসাররা তাঁদের মহিলাদেরকে কোন উদ্দেশে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন এবং ভালভাবে ভদ্র ভাষায় সম্বোধন করে তাদেরকে বললেন, "আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না (যা তোমরা বোঝই, মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা আমি পছন্দ করি না)। এরপর তিনি তাদরেকে মাতম করতে নিষেধ করলেন।"[২]

এ থেকেও নাযুক মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল আল্লাহর সিংহ সায়্যিদুনা হযরত হামযা (রা)-এর ঘাতক ওয়াহশীর ক্ষেত্রে। মুসলমানরা মক্কা জয় করলে ওয়াহশীর কাছে গোটা পৃথিবী ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায় এবং সকল পথই সে অবরুদ্ধ দেখতে পায়। তার জন্য কুদরতিভাবেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। সে সিরিয়া, য়্যামান কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে লুকাবার ইচ্ছা করে। কিন্তু লোকে তাকে বলল, "আরে ভাল মানুষ! আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এমন কাউকেই হত্যা করেন না। যে তাঁর ধর্মে দাখিল হয় অর্থাৎ তিনি কোন মুসলমানকে হত্যা করেন না।" বিষয়টা এবার তার বুঝে ধরা পড়ল আর ধরা পড়তেই কলেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান হওয়ার পর সে যখন প্রথমবারের মত রাসূল পাক ﷺ-এর দরবারে হাজির হলো তখন তিনি তার ইসলাম গ্রহণকে কবুল করলেন এবং এমন কোন কথা বললেন না যা তার মনে ভীতির সঞ্চার হতে পারে। এরপর তিনি তার থেকে হযরত হামযা (রা)-র শাহাদতের বিবরণ শুনলেন অর্থাৎ হামযা (রা)-কে কিভাবে

---

১. ইবন কাছীর, ৩য় খ., ৯৫; ইমাম আহমদ এই হাদীস ইবন ওমর (রা) থেকে বর্ননা করেছেন।

২. প্রাগুক্ত, ৯২ পৃ.।

হত্যা করা হয়েছিল। বিবরণ পেশ করতে তাঁর ভেতর সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতি ও অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে থাকবে। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থা তাঁর নববী মেযায ও দায়িত্বের ওপর প্রাধান্য পায়নি, তিনি তার ইসলাম কবুল করবেন না কিংবা ক্রোধের বশে তাকে হত্যাই করবেন (না, এমনটি হয়নি, হতে পারে না)। কেবল তাকে এটুকু বললেন. "আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার সামনে এসো না। আমি চাই তুমি যেন আমার সামনে না পড়!" ওয়াহ্শী বলেন: এরপর থেকে আমি তাঁর সামনে যেতে চাইতাম না যাতে আমার ওপর তাঁর চোখ পড়ে যায়।' আর এভাবেই তাঁর নির্ধারিত ও প্রতিশ্রুত সময় এসে যায়।[১]

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে: আমার ওপর যখন তাঁর চোখ পড়ল তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কি ওয়াহশী?" আমি বললাম: হ্যাঁ (আমি ওয়াহ্শী)।

তিনি বললেন, "তাহলে তুমিই হামযাকে শহীদ করেছিলে?" আমি বললাম, "আপনি যা জেনেছেন তা সত্য।" তিনি বললেন, "তুমি কি এতটুকু করতে পার, তুমি আর আমার সামনে আসবে না?"[২]

এই প্রকৃতিগত ও মানবীয় অবস্থা ও অনুভূতি এবং উন্নত ও সূক্ষ্ম আবেগের ঝলক আমরা সেখানেও দেখতে পাই যখন তিনি মাটিতে মিশে যাওয়া একটি পুরনো কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে কেঁদে ফেললেন, এরপর তিনি বললেন : এ (আমার মা) আমেনার কবর। এ ছিল তখনকার কথা যখন তাঁর (মা আমিনার) ইনতিকাল হয়েছে বহু দিন গত হয়।

উদারতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

আল্লাহর রাসূল ﷺ সর্বোত্তম আখলাক ও চরিত্র, দয়া, বদান্যতা ও বিনয়ের ক্ষেত্রে সমগ্র মানবতার ইমাম ও অগ্রনায়ক ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"হে রাসূল! আপনি নিশ্চিতই মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" অপরদিকে আল্লাহর রাসূল স্বয়ং বলেছেন : ادبنی ربی فاحسن تادیبی

"আল্লাহ তাআলা আপনাকে প্রশিক্ষণ দান করেছেন এবং সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।"

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

ان الله بعثنى لتمام مكارم الاخلاق وكمال محاسن الافعال -

১, ইবন হিশাম, ২য় খ., ৭২ পৃ., বুখারী, কিতাবু'ল মাগাযী।

২. বুখারী।

"আল্লাহ তাআলা আমাকে সর্বোত্তম আখলাক-চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলীর পূর্ণতা দানের জন্য পাঠিয়েছেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আখলাক-চরিত্র কেমন ছিল? এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন : كان خلقه القران

"আখলাক-চরিত্রে তিনি কুরআনুল-করীমের বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন।" মুসলিম, আয়েমা (রা) থেকে বর্ণিত।

ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, প্রশস্ত হৃদয়ে ও সহলশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর যে অবস্থানগত মর্যাদা ছিল, সে পর্যন্ত মেধার অধিকারীর মেধা ও কবির কল্পনাও পৌঁছতে পারে না।

যদি এসব ঘটনা সেই নির্দিষ্ট পন্থায় বর্ণনা না করা হতো যা সকল সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে তাহলে লোকের মেধা ও মনন আজ তা কবুল করত না। কিন্তু এসব বর্ণনা এতখানি সঠিক, নির্ভুল ও অব্যাহত সনদ এবং একজন নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ রাবী থেকে আরেকজন নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ রাবী পর্যন্ত এরূপ সংযত ও সতর্কতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ সবের ভেতর এমন ধারাবাহিক সূত্র পাওয়া যায় যে, এর দরুন এসব বর্ণনা সেই নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল- দস্তাবেজের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই সুযোগে এই প্রসঙ্গে কতকগুলো ঘটনা আমরা বর্ণনা করব। তাঁর দয়া, দানশীলতা ও চরম থেকে চরমতম দুশমনের সঙ্গেও সৌজন্য প্রদর্শন ও সহানুভূতিমূলক আচরণের একটি নমুনা ছিল সেই ঘটনাটি যখন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যি ইবন সলূলকে কবরে নামানো হয়।[১] তিনি সেখানে গমন করেন এবং তাকে কবর থেকে বের করবার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তার লাশ হাঁটুর ওপর নিলেন, পবিত্র মুখের থুথু তার ওপর নিক্ষেপ করলেন এবং নিজের পরনের জামা তাকে পরালেন।[২]

আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চলছিলাম। সে সময় তিনি নাজরানের চাদর পরেছিলেন যার প্রান্তদেশ ছিল মোটা। পথিমধ্যে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাদর মুবারক ধরে জোরে টান দিল। আমি চোখ তুলে দেখতে পেলাম জোরে টান দেয়ার ফলে তাঁর গলায় দাগ পড়ে গেছে। এরপর সেই বেদুঈন বলল : ওহে মুহাম্মদ! আল্লাহর যে মাল আপনার কাছে রয়েছে তা আমাদের দেবার জন্য হুকুম দিন। তিনি তার দিকে

---

১. ৯ হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর যীল-কাদাহ মাসে তার মৃত্যু হয়। আয-যুরকানী, ৩য় খণ্ড, ১১২-১১৩ পৃ.।

২. বুখারী, কিতাবুল-জানাইয, সংক্ষিপ্ত।

ঘুরে দেখলেন এবং হাসলেন, তারপর তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দেয়ার জন্য বললেন।"[১]

যায়দ ইবন সু'না (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) রাসূল ﷺ -এর কাছে এল এবং তাকে ধার পরিশোধের দাবি জানাল যা তিনি তার থেকে নিয়েছিলেন। এরপর সে কাপড় ধরে তাঁর কাঁধে জড়িয়ে সজোরে টানা-হেঁচড়া করল, কাপড়ের প্রান্ত মুঠিতে ধরে রাখল এবং রূঢ় ভাষায় কথা বলল। সে এরপর আরও বলল: তোমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোক। বড় টালবাহানা কর তোমরা। হযরত ওমর (রা) সেখানে ছিলেন। তিনি লোকটার অশিষ্ট ও রূঢ় আচরণ লক্ষ্য করে তাকে ধমক লাগালেন এবং কড়া ভাষায় কথা বললেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে হাসি লেগেই ছিল। তিনি হযরত ওমর (রা)-কে বললেন, ওমর! আমি ও এই লোক তোমার কাছে অন্যরূপ ব্যবহার পাবার হকদার ছিলাম। দরকার তো ছিল, তুমি আমাকে সত্বর কর্জ পরিশোধের পরামর্শ দিতে আর তাকে বলতে নরম ও মোলায়েম ভাষায় তাগাদা দিতে। এরপর তিনি বললেন, তার ঋণ পরিশোধের এখনও তিন দিন সময় আছে। যা-ই হোক, তিনি হযরত ওমর (রা)-কে এই ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দেশ দিলেন এবং আরও বিশ সা' বেশি দেবার জন্য বললেন এজন্য যে, হযরত ওমর (রা) তাকে ভীত-শংকিত করে দিয়েছিলেন। আর এ কথাই তাঁর অর্থাৎ পাওনাদার লোকটির (যায়দ ইবন সুনার) ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।[২]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "একবার মক্কা থেকে ৮০ জন সশস্ত্র লোক তানঈম পাহাড় বেয়ে হঠাৎ নেমে আসে এবং প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। তিনি সবাইকে বন্দী করেন, কিন্তু কাউকে প্রাণে না মেরে সবাইকে জীবিত রাখেন।"[৩]

জাবির (রা) বর্ণনা করেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একবার নজদের দিকে অভিযান পরিচালনা করি। পথিমধ্যে দুপুর হয়ে গেল এবং আমরা বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন বোধ করছিলাম। তলোয়ার ছিল গাছের ডালে ঝোলানো। লোকেরা এদিক-সেদিক বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। এ অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে ডাক দিলেন। আমরা হুযূর ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে দেখি এক বেদুঈন তাঁর সামনে বসা। তিনি বললেন, আমি শুয়ে ছিলাম। এই লোক এসে আমার তলোয়ার টেনে নামায়। আমি জেগে দেখতে পেলাম সে তলোয়ার

---

১. বুখারী, কিতাবুল-জিহাদ, كان النبى ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم শীর্ষক অধ্যায়; এ ছাড়াও ইমাম আহমদ ৩য় খ., ১৫৩, শব্দের সামান্য পরিবর্তনসহ।

৩. বায়হাকী (বিস্তারিতভাবে); আহমাদ, ৩য় খ., ১৫৩ কিছুটা শাব্দিক পার্থক্যসহ।

৩. মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, আল্লাহর বাণী وهو الذى كف ايديهم منكم শীর্ষক অধ্যায়।

হাতে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। সে আমাকে বলল : এখন আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে বল? আমি বললাম : আল্লাহ! এরপর সে তলোয়ার খাপে বন্ধ করল এবং বসে পড়ল।[১]এই সেই লোক যে এখন তোমাদের সামনে বসা।" বর্ণনাকারী (হযরত জাবির) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাকে কোন শাস্তি দেননি।"[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অবস্থা ছিল এরূপ, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ধৈর্যও একত্রে তার সমকক্ষ হবে না, অথচ সাহাবায়ে কিরাম (রা) সকলেই ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। ওপরের সকল ব্যাপারে সকলের জন্যই তাঁর ভূমিকা ছিল একজন স্নেহশীল উস্তাদ, একজন রহমদিল ও মেহেরবান সংস্কারক মুরুব্বীর। এর একটি নমুনা আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় দেখতে পাই। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিল। লোকেরা তা দেখতে পেয়ে তেড়ে ফুড়ে এল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : তাকে তোমরা ছেড়ে দাও এবং যেখানে সে পেশাব করেছে সেখানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। মনে রেখ, তোমাদেরকে আসানী সৃষ্টিকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, দুর্বিষহ বিড়ম্বনা সৃষ্টিকারী হিসাবে নয়।"[৩]

মু'আবিয়া ইবনুল-হাকাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি জওয়াবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বললাম। লোকে আমাকে জওয়াব দিতে শুনে রাগে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি বললাম: তোমাদের মা তোমাদেরকে কাঁদাক! কী হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে এভাবে রেগে তাকাচ্ছ? শুনে লোকেরা তাদের নিজেদের রানের ওপর থাপ্পড় মারতে লাগল। যখন আমি বুঝতে পারলাম, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে তখন আমি চুপ করলাম। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় থেকে মুক্ত হলেন। আমার পিতামাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি এর আগে তাঁর মত মুরুব্বী ও শিক্ষক দেখিনি এবং এরপরও দেখিনি। আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি আমাকে শাসাননি, আমাকে ভাল-মন্দও কিছু বলেননি। কেবল এতটুকু বলেছেন, সালাত আদায়রত অবস্থায় সাধারণত মানুষ যেভাবে কথা বলে সেভাবে কথা বলা উচিত নয়। সালাত কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য।[৪]

আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ খুবই রহমদিল ছিলেন। তাঁর নিকট কোন অভাবী লোক কিংবা কোন লোক প্রয়োজন নিয়ে এলে

---

১. এখানে شام শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার দু'টো অর্থ হতে পারে। এক. সে তলোয়ার খাপে বন্ধ করল। দুই. সে তলোয়ার টেনে নিল এবং তা দেখল (মাজমাউ বিহারিল-আনওয়ার)।

২. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, মুস্তালিক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

৩. বুখারী, কিতাবুল-উযু।

৪. মুসলিম, 'সালাতে কথা বলা হারাম' শীর্ষক অধ্যায়।

তিনি অবশ্যই তাকে কিছু দেবার কথা দিতেন। কিছু থাকলে (দেবার মত) তখনই দিয়ে তার প্রয়োজন মেটাতেন। একবার সালাত দাঁড়িয়ে গেছে। এমন সময় জনৈক বেদুঈন সামনে এগিয়ে এলো এবং তাঁর কাপড় ধরে বলতে লাগল: আমার একটা মামুলী প্রয়োজন বাকী আছে। আমার ভয় হয়, না জানি আমি ভুলে যাই! তিনি তার সাথে গেলেন। সে তার কাজ শেষ করলে তিনি ফিরে এলেন এবং সালাত আদায় করলেন।"[১]

তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহ্য শক্তি, উদার হৃদয় ও অটুট ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তাঁরই খাদেম হযরত আনাস (রা)-প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যাবে। সে সময় তিনি খুবই অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি দশ বছর ধরে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খেদমত করেছি। তিনি কখনও 'হু' বলেননি এবং কখনও এও বলেন নি, অমুক কাজ তুমি কেন বরলে আর অমুক কাজ কেন করলে না?"[২]

সুআদ ইবন ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমার কাপড়ে জাফরানমিশ্রিত খোশবুর চিহ্ন ছিল। তিনি দেখে বললেন ورس ، ورس[৩] "ফেলে দাও, ফেলে দাও।" তারপর তিনি ছড়ি দিয়ে আমার পেটের ওপর আঘাত করলেন। এতে আমি কষ্ট পাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমার ওপর কিসাস (বদলা, বিনিময়) গ্রহণের অধিকার এসে বর্তেছে।" অমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেটের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, "কিসাস নিয়ে নাও।"[৪]

তাঁর বিনয়

তাঁর ভেতর অত্যধিক মাত্রায় বিনয় ছিল। কোন কিছুতেই ও কোন ক্ষেত্রেই তিনি বিশিষ্ট ও দীপ্তিমান হওয়া পছন্দ করতেন না এবং এও ভাল মনে করতেন না, লোকে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়ুক কিংবা তাঁর প্রশংসা ও স্তুতির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করুক যেমনটি অতীতের বহু উম্মত তাদের নবীদের বেলায় করেছে অথবা কেউ তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়া থেকেও তাঁর মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরুক তাও তিনি পছন্দ করতেন না। হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কিছু ছিল না। আমরা তাঁকে দেখতাম এবং এই ধারণায় দাঁড়াতাম না, তিনি তা পছন্দ করেন না।"[৫]

---

১. মুসলিম, কিতাবুল-ফাযাইল ﷺ حسن خلقه শীর্ষক অধ্যায়।

২. মুসলিম, কিতাবুল-ফাযাইল।

৩. এক ধরনের হলদে রঙ যা দিয়ে কাপড় রঞ্জিত করা হয়।

৪. কিতাবুশ-শিফা, প্রতিশোধের কামনায় নয়, ভালবাসার টানে বলেছিল।

৫. তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদ, ৩য় খ., ১৩২।

তাঁকে বলা হয়েছে, يا خير البرية অর্থাৎ সে সৃষ্টির সর্বোত্তম মানুষ! তিনি বললে, ذاك ابراهيم عليه السلام "এ মর্যাদা ইবরাহীম (আ)-এর জন্য সংরক্ষিত।"[১]

হযরত ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আমার প্রশংসা এভাবে বাড়িয়ে কর না যেভাবে খৃস্টানরা ঈসা ইবন মরিয়ম (আ)-এর সম্বন্ধে করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন বান্দা! তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।"[২]

আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনরূপ লোক-লজ্জা অনুভব করতেন না কোন গোলাম কিংবা বিধবার সঙ্গে পথ চলতে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে।"[৩] হযরত আনাস (রা) বলেন, "মদীনার দাসী-বাঁদীরা কেউ এসে তাঁর হাত ধরত এবং যা কিছু বলার বলত, যত দূর পারত হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত।"[৪]

আদী ইবন হাতেম আত-তাঈ (রা) যখন তাঁর খেদমতে হাজির হলেন তখন তিনি তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে নিলেন। একজন দাসী হেলান দেবার জন্য একটি বালিশ এগিয়ে দিল। তিনি বালিশটা নিয়ে 'আদী ও তাঁর মাঝে রেখে দিলেন এবং নিজে মাটির ওপর বসে পড়লেন। 'আদী (রা) বলেন, এ থেকেই আমি বুঝতে পারলাম তিনি কোন বাদশাহ নন।[৫]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ পীড়িতের সেবা করতেন, জানাযায় শরীক হতেন, গাধার ওপরও চড়তেন এবং ক্রীতদাসের দাওয়াতও কবুল করতেন।[৬]

জাবির (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ [চলার সময়] দুর্বল লোকদের কথা ভেবে চলার গতি শ্লথ করে দিতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন।[৭]

আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ যবের রুটি ও স্বাদ নষ্ট হতে যাচ্ছে এমন তরকারির দিকে দাওয়াত দেয়া হলেও তিনি তা কবুল করতেন।"[৮]

তাঁর থেকেই আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "আমি একজন দাস, দাসের মতই খাই এবং দাসের মতোই বসি।"[৯]

---

১. মুসলিম, কিতাবুল-ফাযাইল।

২. বুখারী, কিতাবুল-আম্বিয়া।

৩. বায়হাকী, রাসূলুল্লাহর বিনয় শীর্ষক অধ্যায়।

৪. মুসনাদ আহমাদ, ৩য় খণ্ড, ১৯৮-২১৫ ও জামউল-ফাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল-মানাকিব।

৫. যাদুল-মাআদ, ১ম খণ্ড ৪৩।

৬. শামাইল তিরমিযী, রাসূল ﷺ-এর বিনয়।

৭. মুনযিরীকৃত আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব।

৮. শামাইল তিরমিযী ও মুসনাদ আহমাদ, ৩য় খণ্ড- ২১১-২৮৯।

৯. আশ-শিফা', ১০১ পৃ.।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (রা) বর্ণনা করেন, "আমার এখানে তশরীফ নিলেন। আমি ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ তাঁর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি মাটির ওপরই বসে পড়লেন এবং বালিশটি আমার ও তাঁর মাঝে রেখে দিলেন।"[১]

"আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের ঘর নিজেই পরিষ্কার করতেন, উট বাঁধতেন, পশুর ঘাসপাতাও দিতেন, খেদমতগারে সঙ্গে বসে একই আসনে খানা খেতেন, আটা মারতে তাকে সাহায্য করতেন এবং বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সওদা নিজেই নিয়ে আসতেন।"[২]

বীরত্ব, সাহসিকতা ও লজ্জা-শরম

তাঁর চরিত্রে বীরত্ব, সাহসিকতা ও লজ্জা-শরম (যাকে অধিকাংশ মানুষ পরস্পরের বিপরীত মনে করে) একই রূপ ছিল। তাঁর লজ্জাশীলতা সম্বন্ধে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, "তিনি পর্দানশীন কুমারী বালিকার চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। কোন জিনিস তাঁর অপছন্দনীয় হলে তাঁর চেহারা তার প্রতিক্রিয়া দেখাতো।[৩] অতিরিক্ত লজ্জা-শরমের কারণে কারো মুখের ওপর এমন কথা বলতে পারতেন না যা তার নিকট বিষাদের কারণ হবে। এটির ভার অন্যকে করতেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মজলিসে জনৈক ব্যক্তির কাপড়ে হলদে রঙ বেশী দেখা যাচ্ছিল। যেহেতু তিনি কারো মুখের ওপর এমন কথা বলা পছন্দ করতেন না যা তার নিকট খারাপ লাগবে, এজন্য সে যখন উঠে পড়ল তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, খুবই ভাল ছিল যদি তোমরা তাকে হলদে রঙের কাপড় ব্যবহার করা ছেড়ে দেবার জন্য বলে দিতে।[৪]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "যখন তিনি কারো সম্বন্ধে খারাপ কিছু জানতে পেতেন তখন তিনি তার নাম ধরে এ কথা বলতেন না, সে এ কাজ কেন করল; বরং তিনি এভাবে বলতেন, লোকের কি হলো যে, তারা এ রকম বলে কিংবা এ রকম করে। তিনি তার বিরোধিতা করতেন বটে, কিন্তু করনেওয়ালার নাম প্রকাশ করতেন না।"[৫]

তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে শেরে খোদা আলী মুর্তাযা (রা)-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে বলে আশা করি। তিনি বলেন, "যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করত

---

১. আল-আদাবুল-মুফরাদ, ১৭২ পৃ,।

২. কিতাবুশ-শিফা, ১০১ পৃ.; বুখারীর বর্ণনা মতে।

৩. বুখারী. কিতাবুল-মানাকিব।

৪. শামাইল তিরমিযী।

৫. আবূ দাউদ।

এবং মনে হতো, চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুঁজে বেড়াতাম যাতে তাঁর আশ্রয় আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং দেখতে পেতাম তিনি শত্রু থেকে খুব বেশি দূরে নন অর্থাৎ সে সময় অন্যদের তুলনায় তিনিই শত্রুর কাছাকাছি থাকতেন। বদর যুদ্ধে আমাদের এই অবস্থায়ই ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশ্রয় নিচ্ছিলাম আর তিনি আমাদের সকলের তুলনায় শত্রুর সবচেয়ে বেশি কাছে ছিলেন।"[১]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ সকলের চেয়ে বেশি সুন্দর ও দীপ্তিমান, সবচেয়ে বেশি দানশীল, সবচেয়ে বেশি বীর-বাহাদুর ছিলেন। এক রাতে মদীনার লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল লোকেরা সেদিকে ছুটে গেল। পথিমধ্যে সকলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত। তিনি তখন ফিরে আসছিলেন। তিনি আওয়াজ পেতেই সকলের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলে চলছিলেন, ভয় পাবার কারণ নেই, কোন ভয় নেই। তিনি সে সময় আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ার পিঠে ছিলেন যার পিঠে জীনও ছিল না। তাঁর কাঁধে তখন তলোয়ার ঝুলছিল। তিনি ঘোড়ার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, আমি তাকে সমুদ্রের মত গতিশীল, প্রবহমান ও দ্রুত গতিসম্পন্ন পেয়েছি।"[২]

ওহুদ ও হুনায়ন যুদ্ধে যখন বড় বড় বীর-বাহাদুর শত্রুপক্ষের তীব্র আক্রমণে বিক্ষিপ্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল এবং রণক্ষেত্র ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল সে সময়ও তিনি তাঁর খচ্চরের ওপর তেমনি প্রশান্ত চিত্তে ও দৃঢ়তার সঙ্গে আপন অবস্থানে অটল ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন কিছুই হয়নি! তিনি তখন নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে চলেছিলেন :

انا النبى لا كذب * ان ابن عبد المطلب ـ

"আমি নবী মিথ্যা নই; আবদুল মুত্তালিবের বংশধর আমি (এও তেমনি মিথ্যা নয়)।"

স্নেহ-ভালবাসা ও সাধারণ দয়ামায়া

এই ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে সাথেই তিনি অত্যন্ত রহমদিল ছিলেন। তাঁর চক্ষু সহজেই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত।

দুর্বল মানুষ, এমন কি অবলা পশুর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্যও তিনি নির্দেশ দিতেন। শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহতা'আলা প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও কোমল আচরণের নির্দেশ

---

১. আশ-শিফা', ৮৯ পৃ.।

২. আল-আদাবুল-মুফরাদ, ৪৬ বুখারী-মুসলিমের বর্ণনাসূত্রে।

দিয়েছেন। এজন্য হত্যা করতে চাইলেও ভালভাবে কর, যবাহ্ করলেও ভালভাবে কর। তোমাদের কেউ পশু যবাহ্ করতে চাইলে সে যেন তার ছুরি ভালভাবে শান দিয়ে নেয় এবং যবাহ্‌র পশুকে যেন আরাম দেয়!"[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি বকরী যবাহ্‌র জন্য মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ছুরিতে শান দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে তাকে বললেন, "তুমি কি তাকে দু'বার মারতে চাও? তাকে শুইয়ে দেবার আগেই কেন তুমি ছুরিতে শান দিয়ে নিলে না?"[২]

তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে জীব-জানোয়ারকে ঘাসপাতা দেবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং তাদেরকে পেরেশান করতে ও তাদের পিঠে তাদের সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপাতে নিষেধ করেন। পশুর কষ্ট দূর করা ও তাদেরকে আরাম-আয়েশ দেয়াকে সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে মনে করেন। তিনি এর ফযীলতও বর্ণনা করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর তীব্র পিপাসা লাগে। তিনি একটু দূরে একটি কুয়া পেলেন এবং এতে নেমে পড়লেন। পানি পানের পর তিনি ওপরে উঠে এসে দেখতে পেলেন, একটা কুকুর পিপাসায় পানি না পেয়ে কাদা চাটছে। লোকটি মনে মনে ভাবলেন, পিপাসায় আমার যেই অবস্থা হয়েছিল এর অবস্থাও তাই। তিনি পুনরায় কুয়ায় নামলেন, নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করলেন, অতঃপর পানি ভর্তি মোজাটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ওপরে উঠে আসলেন এবং কুকুরটাকে পানি পান করালেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাঁর বিগত জীবনের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। লোকেরা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশু-পাখি ও জীব-জানোয়ারের ব্যাপারেও পুরস্কার রয়েছে? তিনি বললেন, সৃষ্টি জগতের এমন প্রতিটি বস্তুতে পুরস্কার রয়েছে যার প্রাণ রয়ছে, যা তরতাজা ও জীবন্ত।"[৩]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জনৈক মহিলাকে কেবল এজন্যই শাস্তি দান করা হয়েছিল যে, সে তার বিড়ালটাকে খেতে দেয়নি, বিড়ালটাকে বেঁধে রাখার কারণে কোন কিছু শিকার করেও খেতে পারেনি ফলে বিড়ালটা মারা গিয়েছিল।"[৪]

সুহায়ল ইবন আমর (অন্য বর্ণনায় সুহায়ল ইবনুর-রবী ইবন আমর) [রা] বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-একবার পথ চলতে একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উটটা অনাহারে থাকার দরুন শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিল এবং তার পেট

১. মুসলিম, الامر باحسان الذبح শীর্ষক অধ্যায়, কিতাবুয-যাবহ।
২. তাবারানী ও হাকিম-এর মতে হাদীস যেটি বুখারীর শর্ত মুতাবিক সহীহ।
৩. বুখারী, কিতাবুল-মুসাকাত; মুসলিম, পশুকে পানি পান করাবার ফযীলত শীর্ষক অধ্যায়।
৪. ইমাম নববী, মুসলিম বর্ণিত।

পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। এটা দেখে (উটের মালিককে ডেকে) তিনি বললেন : এসব অবলা পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এর পিঠে যখন উঠবে, তখন ভালভাবে উঠবে। যখন যবাহ্ করে তার গোশত খাবে তখনও যেন সে ভাল অবস্থায় থাকে!"[১]

"আবদুল্লাহ্ ইবন জাফর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসারীর ঘেরাও পাঁচিলের ভেতর প্রবেশ করলেন। ভেতরে একটি উট ছিল। রাসূল ﷺ -কে দেখতেই উটটা ডাকতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় পানি পড়তে লাগল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার কাছে গেলেন এবং তার কুঁজ ও পিঠের ওপর হাত বোলালেন। এতে উটটা শান্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উটটার মালিক কে? এমন সময় এক আনসারী যুবক এল এবং উটটা তার বলে জানাল। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহতাআলা যে পশুর ব্যাপারে তোমাকে মালিক বানিয়েছেন তাঁকে কি তুমি ভয় পাও না? সে তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ করছে, তুমি তাকে কষ্ট দাও এবং সব সময় তাকে কাজে লাগিয়ে রাখ।"[২]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যদি তোমরা সবুজ শ্যামল কোন জায়গা যাও তখন সেখানে জোরে হাঁটবে, যদি রাতে কোথাও ছাউনি ফেলতে হয় তবে রাস্তার ওপর ফেলবে না এজন্য যে, সেখানে জীব-জানোয়ারের চলাফেরা করে থাকে এবং পোকা-মাকড় আশ্রয় নেয়।"[৩]

ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে একবার সফরে ছিলাম। তিনি একটি জরুরী প্রয়োজনে সেখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যান। ইতোমধ্যে আমরা একটা ছোট্ট পাখি দেখতে পেলাম যার সাথে আরও দু'টো ছানা ছিল। আমরা ছানা দু'টো নিয়ে নিলাম। পাখিটা তা দেখে পাখা ঝাপটাতে লাগল। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ ফিরে এলেন এবং এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছানা দু'টো ছিনিয়ে এনে পাখিটাকে কে কষ্ট দিয়েছে? এরপর তিনি ছানা দু'টো যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। সেখানে আমরা পিঁপড়ার একটা ঢিবি দেখতে পাই এবং তা জ্বালিয়ে দিই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে জ্বালিয়েছে? আমরা বললাম, আমরা এ কাজ করেছি। তিনি বললেন, আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের।[৪]

---

১. আবূ দাউদ- ما يؤمر به من القيام على الدواب অধ্যায়।

২. আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত অধ্যায়।

৩. মুসলিম।

৪. আবূ দাউদ, কিতাবুল-জিহাদ।

খাদেম, চাকর-বাকর ও শ্রমিকদের সাথে, যারা আর পাঁচজন মানুষের মতই মানুষ, তাদের মনিব ও মালিকের ওপর তাদের রয়েছে, তিনি ভাল ব্যবহার করার যেই শিক্ষা দিয়েছেন তা এর অতিরিক্ত। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খেতে দাও, তোমরা যা পর তাদেরকেও তাই পরাও আর আল্লাহতাআলা মাখলুককে শাস্তিতে নিক্ষেপ কর না[১] যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীন করেছেন তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের খাদেম ও তোমাদেরই সাহায্যকারী মদদগার। যার ভাই যার অধীনে, তার উচিত হবে সে যা খাবে তাকেও তাই খাওয়াবে, যা নিজে পরবে তাকেও তাই পরতে দেবে। তাকে এমন কাজ করতে দেবে না যা তার শক্তির বাইরে। যদি তাকে এমন কাজ করতে দিতেই হয় তবে তুমি তার কাজে সহযোগী হবে, তাকে সাহায্য করবে।"[২]

আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এল এবং জিজ্ঞেস করল, "আমি আমার নওকরকে দিনে কতবার ক্ষমা করব? তিনি বললেন, "সত্তর বার।"[৩] বর্ণনাকারী আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার প্রাপ্য মজুরি দিয়ে দাও।"[৪]

বিশ্বজয়ী, পরিপূর্ণ ও চিরন্তন নমুনা

হযরতুল-উস্তাদ মওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'খুতবাতে মাদ্রাজ'-এর একটি অংশ উদ্ধৃত করার মাধ্যমে এই অধ্যায় শেষ করতে চাই যেখানে সায়্যিদ সাহেব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিপূর্ণ, বিশ্বজয়ী ও অবিনশ্বর জীবন-চিত্র, তাঁর ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতা, মানব জাতির সকল স্তর ও সকল শ্রেণীর, এছাড়াও সব রকমের পরিবেশ, সকল যুগ, সকল পেশা, মোটকথা সব ধরনের অবস্থা, জীবনের প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ের জন্য তাঁর পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক দিক নির্দেশনা ও মহোত্তম আদর্শ অত্যন্ত প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় অলঙ্কারপূর্ণ ভঙ্গীতে পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

"সব শ্রেণীর মানুষের জন্য সব অবস্থায় আদর্শ স্থানীয় এবং মানুষের সকল প্রকার বিশুদ্ধ মানসিকতার সুষ্ঠু বিকাশ, পূর্ণাঙ্গ আচার-পদ্ধতি ও চরিত্রের মিলনে যাঁর জীবন-চরিতে ঘটেছে তিনি একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া আর কেউ নন।

---

১. বুখারী, আল-আদাবুল-মুফরাদ, ৩৮ পৃ.।

২. বুখারী ও আবূ দাউদ।

৩. তিরমিযী ও আবূ দাউদ।

৪. ইবন মাযা, আবওয়াবুর-রুহুন, শ্রমিকের পারিশ্রমিক অধ্যায়।

আপনি যদি বিত্তশালী হয়ে থাকেন তবে মক্কার আদর্শ ব্যবসাপতি ও বাহরায়নের বিত্তবান মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করুন। দীনহীন দরিদ্র হয়ে থাকলে শি'বে আবূ তালিবের নিঃসহায় বন্দী ও মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারী মেহমানের হালচাল শুনুন। আপনি সম্রাট হয়ে থাকলে আরব সম্রাটের ইতিকাহিনী পাঠ করুন, শাসিত হয়ে থাকলে কুরায়শদের শাসিত শোষিত মুহাম্মদ ﷺ-এর দিকে একটু খেয়াল করুন। বিজয়ী হয়ে থাকলে বদর ও হুনায়ন বিজয়ী মহাবীর সেনাপতির দিকে লক্ষ্য করুন। পরাজিত হয়ে থাকলে ওহুদ যুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করুন। আপনি যদি উস্তাদ বা শিক্ষক হয়ে থাকেন, তবে সুফফা শিক্ষাগারের আদর্শ শিক্ষকের আদর্শ সামনে রাখুন। ছাত্র বা শাগরিদ হয়ে থাকলে জিবরাঈল রূহুল আমীনের সামনে বসে থাকা আদর্শ ছাত্রকে অনুসরণ করুন। আপনি যদি ওয়ায়েজ, উপদেশদাতা বা বক্তা হন, তবে মদীনার মসজিদের মিম্বরে দণ্ডায়মান মহাপুরুষের আদর্শ বাণী শুনুন।

নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থায় সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে যদি আপনি আগ্রহী হন, তবে মক্কার নিঃসহায় মহাপুরুষের আদর্শ আপনার সামনে রয়েছে। খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দুশমনকে পরাজিত ও প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে থাকলে মক্কাবিজয়ী মহাপুরুষের আদর্শ দেখুন। বিষয় সম্পত্তি ও পার্থিব ব্যাপারসমূহকে গোছানোর ব্যাপারে খয়বর, বনি নযীর ও ফাদাকের ভূ-সম্পত্তিসমূহের মালিকের আদর্শ আপনার সামনে রয়েছে। পিতৃহীন এতিমের জন্য রয়েছে আবদুল্লাহ ও আমেনার দুলালের আদর্শ, শিশু বালকদের জন্য রয়েছে হালিমার গৃহে প্রতিপালিত বালক মুহাম্মদের আদর্শ, যুবকের জন্য রয়েছে মক্কা রাখাল যুবকের আদর্শ।

আপনি যদি ব্যবসার উদ্দেশে সফরে থাকেন তবে বসরার বিদেশী বণিকের দৃষ্টান্ত আপনার সামনে রয়েছে। আপনি যদি আদালতের বিচারপতি অথবা পঞ্চায়েতের সালিসী হন, তবে ভোরের সূর্য ওঠার আগে কাবায় প্রবেশকারী বিচারকের প্রতি লক্ষ্য করুন হাজরে আসওয়াদকে কাবার এক কোণে কেমন করে রেখেছিলেন। মদীনার খেজুর পাতায় ছাওয়া মসজিদে বসা বিচারপতিকে লক্ষ্য করুন আইনের বেলায় যার কাছে বাদশাহ-ভিখারী ও আমীর-গরীবের মধ্যে পার্থক্যের কোন বালাই নেই।

আপনি স্বামী হয়ে থাকলে খাদীজা ও আয়েশা পুণ্যাত্মা স্বামীর আদর্শ চরিত পাঠ করুন। আপনার সন্তান-সন্ততি থাকলে ফাতেমার জনক ও হাসান-হুসায়নের নানার আদর্শ আপনার সম্মুখে রয়েছে। মোটকথা, আপনি যে কেউ হোন না কেন, সবক্ষেত্রে আপনার জীবন পথে চলার জন্য আদর্শ ও আলোর দিশা মুহাম্মদ ﷺ

-এর ব্যাপক জীবন-চরিতে নিহিত রয়েছে। এজন্য সকল শ্রেণীর আদর্শ অনুসন্ধিৎসু ও নূরে ঈমানের তলবগারদের জন্য একমাত্র মোস্তফা-চরিতেই আলোর দিশা ও মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে। মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনাদর্শ যার সম্মুখে রয়েছে একাধারে নূহ, ইবরাহীম, আইয়ূব, ইউনূস ও মূসা-ঈসা মহাপুরুষবর্গের আদর্শ জীবন-চরিতসমূহ তার চোখের সামনে রয়েছে। অন্য সকল নবীর জীবন-চরিতসমূহ যেন একই ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর বিপণীমালা আর মহানবী ﷺ -এর আচার-ব্যবহার ও জীবন-চরিত দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপণীকেন্দ্র, যেখানে সকল ধরনের ক্রেতা ও সব রকমের পণ্যসামগ্রীর ছড়াছড়ি রয়েছে।”[১]

১. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী কর্তৃক অনূদিত “খুতবাতে মাদ্রাজ”-এর বাংলা অনুবাদ “নবী চিরন্তন” থেকে গৃহীত- অনুবাদক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের কথা। তখন ব্যাপক হারে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি এই মানুষ আত্মহত্যার জন্য কেবল উদ্যতই ছিল না, বরং উন্মত্ত এক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। আত্মহত্যার প্রতি তাদের প্রবণতা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এ আত্মহত্যাই মানুষের জীবন সবচেয়ে চাওয়া-পাওয়া? আত্মহত্যার জন্যে সে যেন মানত করেছে, কসম খেয়েছে। সে কসম যেন কোনক্রমেই ভাঙা যাবে না! পবিত্র কুরআন সে ভয়াবহ পরিস্থিতিরই চিত্রাঙ্কন করেছে অত্যন্ত নিপুণভাবে, যে চিত্রাঙ্কন অসম্ভব কোন সুদক্ষ শিল্পী, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক কিংবা ঐতিহাসিকের পক্ষে,

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ـ

"আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ। তোমরা অবস্থান করেছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন।" [সূরা আল ইমরান : ১০৩]

ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিতকারদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন! জাহেলী যুগের সঠিক ও যথার্থ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতে তারা সক্ষম হননি। আসলে এজন্য তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাদের প্রতি আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ। কেননা তখনকার সেই অবর্ণনীয়, ভয়াবহ ও সঙ্গীন পরিস্থিতির সঠিক চিত্রাঙ্কন কলমের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল ভাষা ও সাহিত্যের নাগালের বাইরে। সুতরাং একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে তার যথার্থ চিত্রাঙ্কন কিভাবে সম্ভব?

মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাবকালে জাহেলী যুগের সদস্যের কি শুধু সামাজিক বিশৃঙ্খল অবস্থা ও নৈতিক অবক্ষয়ের সমস্যা ছিল? শুধু মূর্তি পূজার সমস্যা ছিল? শুধু মদ-জুয়া, অশ্লীলতা, নগ্নতা, জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচারের সমস্যা ছিল নাকি জালিম শাসকের জুলুম ও অর্থনৈতিক শোষণের সমস্যা ছিল? সে সমস্যা কি শুধু নিরপরাধ ও নিষ্পাপ নবজাত কন্যা সন্তানতকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার সমস্যা ছিল? না, বরং আসল সমস্যা ছিল গোটা মানবতাকে মাটি চাপা দিয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করার সমস্যা।

অন্ধকার যুগ পেরিয়ে গেছে। সে যুগের হিংস্র মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মাটির নিচে। সেই লোমহর্ষক চিত্র এখন দৃষ্টির আড়ালে। এখন কি করে আমরা তার চিত্রাঙ্কন করব? কিভাবে তা অনুভব করা যাবে এবং স্পষ্ট করে তুলে ধরব? শুধু বলতে পারি, সে ছিল জাহেলী যুগ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পৃথিবী! সভ্যতা-সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন এক আঁধার দুনিয়া। সে যুগের সে পৃথিবীর বাসিন্দা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না সে যুগকে। ভাল করে বুঝতে পারবে না সে যুগের ভয়াবহতাকে। কোন চিত্রশিল্পী যদি এখন একটি ছবি আঁকে, যাতে গোটা মানব জাতিকে এক দারুণ সুন্দর মানুষের আকৃতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সমস্ত সৃষ্টিলোকের ভেতরে যার সৌন্দর্যের অপূর্ব ঝলক নজরে পড়েছে, যাকে আল্লাহ খেলাফতের তাজ পাঠিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টিলোকের মাঝে, যার আগমনে এই উজাড় ও বিরান পৃথিবী পরিণত হয়েছে বসন্তের উদ্যানে। অতঃপর চোখের সামনে ভেসে উঠল আরেকটি চিত্র। একটু আগের সেই মানুষটি ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হচ্ছে এক গভীর পরিখায় যেখান থেকে বের হচ্ছে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত। ঝাঁপ দেবার জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, এক্ষুনি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কয়েক মুহূর্ত পেরুতে না পেরুতেই ঝাঁপিয়েও পড়ল। হারিয়ে গেল ভয়ংকর অন্ধকার, অনন্ত মৃত্যু বিভীষিকায়! তাহলে সম্ভবত চিত্রশিল্পীর এই চিত্রাংকনে রাসূলের আবির্ভাবকালীন জাহেলী যুগের কিছুটা চিত্র ফুটে উঠতে পারে। এই বাস্তবতার দিকে ইশারা করেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে অত্যন্ত সংক্ষেপে, অথচ ই'জাযপূর্ণভাবে :

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ـ

"আর তোমরা ছিলে জাহান্নামের এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে, সেখানে থেকে তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।"

এই বিষয়টি নবুওয়াতের ভাষায় আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "আমার এই দাওয়াত ও হিদায়াতের উপমা যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্বলিত করল, যখন তার আলো আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল তখন পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অনুরূপ তোমরাও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত আর আমি তোমাদের বাহু ধরে তোমাদেরকে বাঁচাতে চাই।" (সহীহ বুখারী) আসলে মানবতার কিশতিকে নিরাপদে পাড়ে ভেড়ানোই ছিল মূল সমস্যা। কেননা মানুষ যখন সঠিক অবস্থায় ফিরে আসবে, যখন তার জীবনে আসবে স্বস্তি; শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মূর্তিমান হয়ে বিকশিত হবে তাদের সামনে যাদের আছে যোগ্যতা, যারা মানবতার বন্ধু ও মদদকারী। এদিক থেকে বলা যায়, গোটা মানবতাই নবী-রাসূলদের কাছে ঋণী

তাঁরাই তো মানবতাকে উদ্ধার করেছেন সেই মহাবিপদ থেকে, যা নাঙ্গা তলোয়ারের মত মানবতার মাথার ওপর এক চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল!

দুনিয়ার কোন বিদ্যাপীঠ, কোন দর্শন এবং কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারবে? সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমান পৃথিবী ও সাম্প্রতিক বিশ্বও তাঁদের কাছে ঋণী। কারণ তাঁরা মানবতাকে উদ্ধার না করলে কে পেত জীবনের স্বাদ ও স্বাধীনতার সুখ? কেননা পরিস্থিতি এমন নাযুক আকার ধারণ করেছিল যে, মানুষ নীরব ভাষায় এ অবস্থার কথা বারবার শুনিয়ে দিয়েছে, সে এই পৃথিবীতে বসবাসের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। তার হৃদয় এখন পাষাণ, দয়ামায়াশূন্য! মানবতার জন্য এখন সে বহন করে না কোন করুণা ও রহমতের পয়গাম। সে নিজের বিরুদ্ধে এখন নালিশ জানাচ্ছে মহাপ্রভুর আদালতে, সাক্ষ্য দিচ্ছে নিজের বিরুদ্ধে, চূড়ান্ত রায়ের জন্য মোকদ্দমার কাগজপত্র পুরো প্রস্তুত। এক কঠিন শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করেছে, বেছে নিয়েছে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

সভ্যতা-সংস্কৃতি যখন স্বাভাবিক সীমারেখা অতিক্রম করে, বিস্মৃতি হয়ে পড়ে চারিত্রিক উৎকর্ষের কথা, বরং আরো এক ধাপ সামনে বাড়িয়ে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করে বসে চারিত্রিক উৎকর্ষের অবদানকে, যখন মানুষ গাফেল হয়ে যায় যাবতীয় মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে, যখন সে জাগতিক কিছুকে বুকে আঁকড়ে ধরে উপেক্ষা করে অন্য সব বাস্তবতাকে, যখন সে পাশবিকতার দিকচিহ্নহীন দিগন্তে লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়ায়, যখন সে সকল প্রকার মানবীয় গুণের বদলে হিংস্র শ্বাপদের আকৃতি ধারণ করে, যখন তার মাঝে জন্ম নেয় এক কাল্পনিক উধর, যখন সে স্বীকার করে নেয় নফসে আম্মারার পূর্ণ বশ্যতা, যখন মানবতাকে ঘিরে ফেলে পাগলামির ঘোর আচ্ছন্নতা, তখনই প্রয়োজন (মানবতার সেই মহাদুর্দিনে) অপারেশন ও অস্ত্রোপচার, সমূলে কেটে ফেলেন বিষাক্ত অংশ, দূর করে দেন পাগলামির নেশা। কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকৃতি ও বিলুপ্তি দেশ ও রাজ্য হারানোর চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়াবহ।

এক দুর্বল রোগী যদি পাগল হয়ে যায়, তাহলে তার কারণে আশেপাশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো গোটা মানবতাই যদি পাগল হয়ে যায়, যদি ভেঙে যায় হাজার বছরের লালিত সভ্যতা-সংস্কৃতি, দলিত-মথিত হয়ে যায় মানবতা ও ইনসানিয়াতের সবুজ কোমল দূর্বাগুলো, তবে সীমা থাকবে কি অশান্তি ও নৈরাজ্যের?

সম্ভব হবে কি এর কোন চিকিৎসা?

বিশ্বাস করুন! জাহেলী যুগে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সুস্থ নগর জীবনের ওপরই শুধু বিপর্যয়ের ধ্বস নেমে আসেনি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নগর জীবন পরিণত হয়েছিল

এক বিকৃত গলিত লাশে। মানুষ মানুষকে শিকার করত হিংস্র নেকড়ের ন্যায় তারপর তার হৃদয়হীনতার সামনে যখন সে মানুষটি মৃত্যুর সাথে লড়াই করত, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করত তখন এই অমানবিক করুণ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও মজা লুটত তার নিষ্ঠুর দৃষ্টি-পাষাণ হৃদয়, ঠিক সেভাবে যেভাবে আমাদের কারো হৃদয়-ফুল বাগান ও গাছপালার মনোরম দৃশ্যে ও ছায়া-ঘেরা পরিবেশে আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

এবার দৃষ্টি ফেরান রোমান ইতিহাসের দিকে। দেখবেন তাদের বিজয় গাথা ও বীরত্বের ইতিহাস আলো ঝলমলে। মন কেড়ে নেয় তাদের সুচারু ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ রাজ্য পরিচালনা। সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও পিছিয়ে নেই তারা। কিন্তু অপর দিকে কেমন করে তাদের অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরেছেন একজন য়ূরোপিয়ান ঐতিহাসিক তাও একটু পড়ে দেখুন।

"রোমানদের কাছে সবচেয়ে বেশি মজাদার ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হতো সেটি, যখন তরবারির যুদ্ধে দুই স্বগোত্রীয় পাহলোয়ানের মধ্যে পরাজিত ব্যক্তি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তে লাল হয়ে ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে আর তার মুখ থেকে শেষবারের মত উচ্চারিত হতো মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের ব্যথা-করুণ গোঙানি। তখন তাদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না। মনে হতো তারা যেন তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এই মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে মজাদার দৃশ্য দেখেছে! হাসি-উল্লাসের বিকৃত ধ্বনি তুলে তারা একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত বিকৃত আনন্দে। এই মৃত্যু পথযাত্রী অসহায় মানুষটির গোঙানি তাদের কানে যেন মধু ঢালছে অপূর্ব সংগীতের সুর লহরীর মত! এদিকে শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর কিছুই করার থাকত না। সব কিছু বেসামাল হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। (দ্র. মি. Leeky প্রণীত History of European Morals)

মোটকথা তখন মানুষ ছিল না, ছিল মানুষের খোলস। মানবতার মোকদ্দমা চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় ছিল আল্লাহর আদালতে। ঠিক তখনই প্রেরিত হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর ঘোষণা এল :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ـ

"হে নবী! তোমাকে আমি জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব :

এক নতুন পৃথিবী

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগ ও সেই সঙ্গে আগামী দিনের অনাগত যুগ সম্পূর্ণরূপে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব, তাঁর ব্যাপকভিত্তিক চিরন্তন দাওয়াত ও তাঁর চেষ্টা, সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কাছে ভীষণভাবে ঋণী। তিনি নাঙ্গা তলোয়ারের নিচ

থেকে মানবতাকে উদ্ধার করেছেন। অতঃপর মানবতার হাতে তুলে দিয়েছেন এক নতুন উপহার যা মানবতাকে দান করেছে এক নতুন জীবন, নতুন উদ্যম, নতুন শক্তি, নতুন সম্মান ও নতুন করে পথ চলার হিম্মত ও পাথেয়, আর সেই উপহারের বদৌলতেই মানবতা তাহযীব-তমদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সর্বোপরি ন্যায়নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতা, চরিত্র ও সমাজ দর্শনের মাপকাঠিতে নতুন করে মানুষ গড়ার কত হাজারো মঞ্জিল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে!

আমরা এখন ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মুহাম্মদ ﷺ অবদানের কথা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করব যা মানব জাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, সংশোধন ও সংস্কারের পথ বাতলে দিয়েছে, গোটা মানব সম্প্রদায়ের মাঝে জাগ্রত চেতনাবোধ সৃষ্টি করেছে এবং মানব ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, জন্ম দিয়েছে এমন এক বিশ্ব ও সমাজ ব্যবস্থা, ফেলে আসা পৃথিবীর সাথে কোন কিছুতেই যার বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুস্পষ্ট তাওহীদের আকীদা

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ও অনুগ্রহ হলো, তিনি দুনিয়াকে দান করেছেন তাওহীদের আকীদা। স্বচ্ছ, পবিত্র ও নজীরবিহীন এক বিপ্লবী আকীদা। এই আকীদা শক্তি ও বিশ্বাসে ভরা জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হয়। এই আকিদা পাল্টে দেয় সব প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি, বিনাশ করে দেয় বাতিল প্রভুদের রাজত্ব।

এই আকিদা আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে কেউ দিতে পারেনি, পারবে না কেয়ামত পর্যন্ত। এই মানুষের ইতিহাস এক দীর্ঘ ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, রাজনীতিতে যার রয়েছে প্রভূত দাবি-দাওয়া, যে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে অসংখ্যবার গোলাম বানিয়েছে, যে মরুর বুকে পাথুরে জমিনের বুক চিরে বইয়ে দিয়েছে কত ছলছল ঝরনাধারা, মাঝে মাঝে আবার দাবি করে বসেছে প্রভুত্বেরও। এই মানুষ মাথা ঠেকাত অতি সামান্য জড় বস্তুর সামনে, যার নেই উপকার কিংবা অপকার করার কোন ক্ষমতা এবং দেয়া ও ছিনিয়ে নেয়া ছিল যার পক্ষে অসম্ভব।

وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.

নিজ হাতে গড়া মূর্তির পূজা করত তারা, ভয় করত সেই মূর্তিকে, মঙ্গল কামনা করত তার কাছে। এই মানুষ জাহেলী যুগে পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, গাছপালা, জীবজন্তু, আত্মা-প্রেতাত্মা, মানুষ ও শয়তানের সামনেই শুধু সেজদায় লুটিয়ে পড়ত না, বরং ছোট্ট ছোট্ট কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত তার আরাধ্যে পরিণত

হয়েছিল। তার জীবন কাটত অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনায়, অবাস্তব ধ্যান-ধারণায়, নিরর্থক আশা-আকাঙ্ক্ষায় যার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল কাপুরুষতা ও দুর্বলতা, চিন্তা-চেতনার দৈন্য ও মানসিক অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাসশূন্যতা ও অস্থিতিশীলতা। তখনই এলেন আল্লাহর রাসূল, দান করলেন তাদের স্বচ্ছ-সুন্দর পবিত্র সাহস ও হিম্মতে ভরপুর জীবন ও শক্তিসঞ্চারী এক আকীদা! তাওহীদের আকীদা!

নিষ্কৃতি পেল তারা তাগূতের ভয় ও শংকা থেকে। তারা এখন ভয় করে শুধু আল্লাহকেই। জন্ম নিয়েছে তাঁদের অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস, উপকার ও অপকার এবং দেয়া ও ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর, শুধু তিনিই পারেন মানুষের প্রয়োজন পুরা করতে। তাদের কাছে পৃথিবীকে এখন আর আগের মত মনে হয় না। তাওহীদের এই নতুন আবিষ্কার ও এই নতুন পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সব কিছুই এখন তাদের সামনে বদলে গেছে। দাসত্বের শৃঙ্খলা থেকে তারা আজ মুক্ত ও স্বাধীন। তাদের হৃদয়ে নেই সৃষ্টির ভয়, নেই সৃষ্টির কাছে তাদের কোন চাওয়া ও পাওয়া। তাদের হৃদয় জুড়ে আজ প্রশান্তি আর প্রশান্তি! তার চিন্তা-চেতনায় আর কোন গোলমাল নেই। সৃষ্টিলোকের ভেতরে নিজের অবস্থান সম্পর্কে আজ তারা পূর্ণ সচেতন। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তাঁরই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, পৃথিবীর সরদার ও আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। প্রতিপালকের অনুসরণ ও মানবতার সেবার ভেতরেই আজ তারা খুঁজে পায় আপন অস্তিত্বের সার্থকতা। মহান স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নই এখন তাদের মহান দায়িত্ব ও একমাত্র ব্রত, যার ভেতর নিহিত রয়েছে মানবতার চিরন্তন বিজয় ও সাফল্য, দীর্ঘকাল ধরে যা থেকে পৃথিবী ছিল বঞ্চিত।

মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাবের পর সারা পৃথিবী জুড়ে গুঞ্জরিত হলো তাওহীদের আকীদা (অথচ ইতোপূর্বে এই আকীদাই ছিল পৃথিবীর অন্যান্য আকীদার চেয়ে সবচেয়ে বেশি মজলুম ও অপরিচিত), পৃথিবীর সমস্ত দর্শন ও মতবাদ এবং চিন্তা ও ভাবধারার ওপর বিরাট প্রভাব পড়ল এই নতুন আকীদার।

যে সব বড় বড় মাযহাব বা ধর্ম শির্ক ও একাধিক উপাস্যের স্লোগানে মুখর ছিল, শেষ পর্যন্ত আকীদায়ে তাওহীদের প্রভাবে অনুচ্চ কণ্ঠে ও ফিসফিস করে হলেও এই নতুন আকীদার প্রভাবে তাদেরকে এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে, "আল্লাহ এক, তাঁর কেন শরীক নেই।" শুধু তাই নয়, রাতারাতি তারা শিরকের অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের শিরকী মতবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে লাগল এবং তাকে আকীদায়ে তাওহীদের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধানের কসরত চালাতে লাগল। ধর্মগুরুরা শিরকের কথা মুখে আনতে বেশ লজ্জাবোধ করতে লাগলেন। তখন সারা শিরকী পদ্ধতির ধারক-বাহকগণই চিন্তা-চেতনায় এবং বিশ্বাস ও অনুভূতিতে হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছিল। তাই মুহাম্মদ ﷺ-এর আকীদায়ে তাওহীদের এই উপহার ছিল বিশ্বমানবতার জন্য সবচেয়ে দামী উপহার।

ঐক্য ও সাম্য

নবীজীর দ্বিতীয় অনুগ্রহ হলো, শতভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত মানব সম্প্রদায়কে ঐক্য ও সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর আসার আগের চিত্র একটু কল্পনা করুন। এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। সবার মাঝে সম্পর্কহীনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে। জাতীয়তাবাদ বন্দী হয়ে আছে সংকীর্ণতার শেকলে। পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবধান ও পার্থক্য ছিল মানুষ ও প্রাণী, স্বাধীন ও গোলাম এবং সাম্যের কোন ধারণাই তাদের ছিল না। তারপর নবীজী সবাইকে শুনিয়ে দিলেন সুদীর্ঘকালের নীরবতাকে ভেঙে দিয়ে এবং স্তরে স্তরে জমে থাকা অন্ধকারকে ভেদ করে সেই বিপ্লবী ঘোষণা, যা হতবাক করে দিল মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আর পরিস্থিতি মোড় নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে!

ايها الناس ان ربكم واحد وإن اباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب ـ ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، وليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوى ـ

"হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতৃপুরুষও এক। তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে। কোন অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোন আরবের কেবল তাকওয়া ছাড়া।" [কানুযল-উম্মাল]

এই ঘোষণার রয়েছে দু'টি দিক যার ওপর নির্ভর করে শান্তি ও নিরাপত্তা সবকালে সব স্থানে। একটি হলো আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। আর দ্বিতীয়টি হলো মানুষের উৎসস্থল এক, অদ্বিতীয়। সুতরাং মানুষ মানুষের ভাই দুই দিক থেকে। প্রথমত, তাদের প্রতিপালক এক আর এটিই মূল। দ্বিতীয়ত তাদের পিতৃপুরুষ এক।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

"হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ—সব কিছুর খবর রাখেন।"

বিদায় হজ্জের বিশাল জনসমুদ্রে নবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এই চিরন্তন বাণী।

সত্যি কথা বলতে কি, নবীজী যখন এই মহান ঐতিহাসিক ঘোষণা শোনানোর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তখন এই স্পষ্ট ও বিপ্লবী ঘোষণা শোনার জন্যে পৃথিবীর একেবারেই 'মুড' ছিল না। কেননা ভূমিকম্প থেকে এই ঘোষণা মোটেই কম বিধ্বংসী ও কম মারাত্মক ছিল না। কারণ কিছু কিছু জিনিস এমন যার প্রতিক্রিয়া আমরা ধীরে ধীরে সয়ে নিতে পারি অথবা আড়াল থাকার কারণে কোন প্রতিক্রিয়াই অনুভূত হয় না। যেমন বিদুৎ প্রবাহের কথাই ধরুন। আমরা যদি সরাসরি তা স্পর্শ করি তাহলে নিমিষেই আমাদেরকে ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে আর যদি আবরণের ওপর দিয়ে স্পর্শ করি তাহলে কোন বিপদের আশংকাই নেই। আজ মানুষ পেরিয়ে এসেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং চিন্তা ও গবেষণার এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা। কিসের বদৌলতে? ইসলামী দাওয়াতের বদৌলতে, সর্বজনীন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বদৌলতে, ইসলামের অগণিত দাঈ, সংস্কারসেবী ও প্রশিক্ষণদাতাদের হাজারো ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানীর বদৌলতে। এসব কিছুর বদৌলতেই আজ এই বিপ্লবী ও ব্যতিক্রমী ঘোষণা নিত্য দিনের বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে, যে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই আজ জাতিসংঘের মঞ্চ থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্যাপী সবখানেই ধ্বনিত হচ্ছে মানবাধিকার ও সাম্যের কথা। এই বাস্তবতার কথা আজ কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় একটু নজর দিলে দেখা যায়, পৃথিবীতে প্রাক-ইসলামী যুগে এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল আসমান-যমীন। কোন কোন বংশ নিজের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছিল চন্দ্র-সূর্যের সাথে, কেউ বা আবার স্বয়ং আল্লাহর সাথে।

تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ـ

আল-কুরআন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে ইয়াহুদী-নাসারাদের ভ্রান্ত আকীদার কথা এভাবে :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ ـ

মিসরীয় ফেরাউনরা নিজেদেরকে সূর্য দেবতার অবতার বলত আর হিন্দুস্তানের কতিপয় সম্প্রদায় নিজেদেরকে বলত সূর্য বংশ ও চন্দ্র বংশ। ইরানী বাদশাহগণ (যাদের উপাধি ছিল কিসরা) দাবি করত, তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রয়েছে খোদায়ী রক্তের ধারা। ইরানীদের কাছে তাদের গুণাবলী এভাবে পরিবেশিত

হয়েছিল, "উপাস্যদের মধ্যে রয়েছে এমন মানুষ যার কোন বিলুপ্তি নেই এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে এমন উপাস্য যার কোন দ্বিতীয় নেই। সমুচ্চ হোক তার কথা, উন্নত হোক তার সম্মান ও মর্যাদা! তিনি সূর্যের সাথে উদিত হন সূর্যালোক হয়ে আর ছাপিয়ে তোলেন অন্ধকার রাতকে উজ্জ্বল আলোকমালায়।"

অনুরূপ রোম সম্রাটদের মধ্যেও হতো অনেক ইলাহ। তাদের যেই মসনদে আসীন হতেন, তিনিই তথাকথিত 'ইলাহ'-এ পরিণত হয়ে যেতেন আর তার 'লকব' হতো AUGUST আর চীনারা নিজেদের অধিপতিদেরকে মনে করত ইবনুস-সামা'– আসমানের পুত্র। তাদের ধারণা ছিল, আসমান পুরুষ এবং যমীন নারী আর এই দু'য়ের সম্মিলনেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিলোক।

আরবরা নিজেদের ছাড়া অন্য সবাইকে ভাবত 'আজম'। কুরায়শরা মনে করত তারাই আরব গোত্রসমূহের মধে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। তারা সবক্ষেত্রেই নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলত। কোন আনুষ্ঠানিকতায়ই অন্য কোন গোত্রের সাথে তারা অংশ নিত না। হাজীদের সাথে প্রবেশ করত না আরাফাতে, বরং হারামে থেকে যেত এবং মুযদালিফায় অবস্থান করত আর বলত, আমাদের কথা ভিন্ন। আমরা আহলুল্লাহ!

মানুষের সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা

মানব জাতির প্রতি রসূলে আরাবির তৃতীয় অনুগ্রহ হলো, তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন মানবতার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের শিক্ষা। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ ও মানবতা অপমান ও লাঞ্ছনার এক দুর্বিষহ জীবনের ওপর দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে গুণছিল নাজাত ও মুক্তির প্রহর। এই মানুষের চেয়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত, ধিকৃত ও অবহেলিত কোন জীব আর পৃথিবীতে ছিল না। দেবতা মনে করে যেসব জীব-জানোয়ার ও গাছপালার পূজা করা হতো, কিছু মনগড়া বিশ্বাস ও অনুভূতিকে বলি দেয়া হতো। শুধু তাই নয়, এসব কল্পিত উপাস্যদের জন্য অনেক নিষ্পাপ মানুষকে বলি দেয়া হতো। তাদের তাজা খুন ও গোশত পেশ করা হতো নৈবেদ্য হিসাবে দেবতার সামনে, তবু তাদের হৃদয় একটু কাঁপত না। তাদের পাষাণ হৃদয়ে উদ্রেক হতো না সামান্য মানবতাবোধ। কেনই বা বলছি সেই চৌদ্দ শ' বছর আগের কথা। বিংশ শতাব্দীর এই সভ্য যুগেও তো হিন্দুস্তানসহ সভ্য হিসাবে কথিত দেশগুলোতে আমরা দেখে চলেছি এমন জঘন্য, বর্বর, লোমহর্ষক ও অমানবিক সব চিত্র।

তখন সেই জাহেলী যুগে এলেন আল্লাহর নবী। উদ্ধার করলেন মানবতাকে অপমান ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে, ফিরিয়ে দিলেন গৌরব ও হারিয়ে যাওয়া সম্মান-মর্যাদা, ফিরিয়ে দিলেন তার আত্মসম্মানবোধ ও গ্রহণযোগ্যতা। দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এই পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড় ও মহান আর কিছু নেই। মানুষ

সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। প্রেম-ভালবাসা পাওয়ার অধিক হকদার অন্য কিছু নয়, কেবল মানুষ!

মানুষই হেফাজতের অধিক দাবিদার। আল্লাহ নিজে বাড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান। ফলে এই মানুষই অর্জন করেছে তাঁর খলীফা ও প্রতিনিধি হওয়ার গৌরব।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِىْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

"তিনি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে।" মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সমস্ত সৃষ্টির নেতৃত্ব দেয়ার ও সভাপতিত্ব করার অধিকার একমাত্র মানুষের।"

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ـ

"নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি। তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" মানুষের সম্মান ও মাহাত্ম্যের জীবন সাক্ষী হয়ে আছে আল্লাহর নবীর এই বাণী :

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله ـ

"সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই প্রিয়তম যে তার পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ করে।"

সামনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত মহানবী ﷺ-এর যে হাদীসটি বর্ণিত হচ্ছে মানবতার মাহাত্ম্যের ওপর কত বড় দলীল এবং মানবতার সেবায় নিজেকে পেশ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এত বড় প্রমাণ আর নেই! লক্ষ্য করুন হাদীসের কথা ও মর্ম। তিনি বলেন :

কেয়ামতের দিন আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা-যত্ন করনি।" বান্দা আরজ করবে, "হে আল্লাহ! এ কেমন করে সম্ভব? আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক!" তিনি বলবেন, "তুমি কি জান না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা-যত্ন করনি? তার পাশে দাঁড়ালে সেখানে তো তুমি আমাকে পেতে!"

"হে আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে অন্ন দাওনি।" বান্দা তখন আরজ করবে, "প্রভু হে! কিভাবে সম্ভব, আপনি তো রব্বুল-আলামীন!" আল্লাহ বলবেন, "আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল। তুমি তাকে খেতে দাওনি।

তোমার কি জানা ছিল না, তাকে খাওয়ালে আমাকে কাছে পেতে?" "হে আদম সন্তান! আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তোমরা আমায় পানি দাওনি।" বান্দা আরজ করবে, "হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আপনাকে পানি পান করাব? আপনি তৃষ্ণা থেকে পবিত্র?" আল্লাহ বলবেন, "আমার অমুক বান্দা পিপাসার্ত ছিল, তুমি তার পিপাসা নিবারণ করনি। তোমার কি জানা ছিল না, তার পিপাসা মেটালে তা আমায় কাছে পেতে?" মানবতার মাহাত্ম্যের ও তার উন্নত অবস্থানের সাক্ষ্য বহনকারী এই ঘোষণার চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও পরিষ্কার কোন ঘোষণা কি কল্পনা করা যেতে পারে? এমন উন্নত অবস্থান ও মহান মর্যাদা মানুষ কি লাভ করতে পেরেছে সে কালের কিংবা এ কালের কোন ধর্ম দর্শনের অনুসারী হয়ে? আল্লাহর রহমত লাভ করতে হলে সৃষ্টিলোকের ওপর রহম করতে হবে। আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন :

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء -

"যারা রহম করে তাদের প্রতিই রহমানের রহমত বর্ষিত হয়। পৃথিবীতে যারা আছে তোমরা তাদের প্রতি রহম কর, তবে আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করবেন।" একটু ভেবে দেখুন তো, ইসলামপূর্ব যুগে মানবতার এই মুক্তি সংগ্রামে, মানুষের মাঝে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এই জিহাদে বের হওয়ার পূর্বে কী ছিল পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি! একজন মানুষের কিছু মাতাল ইচ্ছার মূল্য ছিল হাজার হাজার প্রাণের চেয়েও বেশি। একেজন রাজ্যপাল ও সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট বের হতো আর দেশকে কব্জা করে সেখানে বইয়ে দিত অমানবিকতার ঝড়ো হাওয়া। তাদের ইচ্ছার কাছে কত আযাদ মায়ের আযাদ সন্তানদের নিমিষেই বরণ করে নিতে হতো গোলামী-পরাধীনতার শৃঙ্খল!

আলেকজান্ডার শুরু করল অভিযান যেন কাবাডি খেলতে খেলতে হিন্দুস্তান পর্যন্ত পৌঁছে গেল আর চলতি পথে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল কত সভ্যতা, সংস্কৃতি! বেরিয়ে এল সিজার হিংস্র শ্বাপদের জিঘাংসা নিয়ে আর 'কাবাব' করে দিলো কত মানুষের ছন্দময় জীবন!

এই আমাদের চোখের সামনেই তো ঘটে গেল দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়কাণ্ড! এই যুদ্ধ দু'টোর তাণ্ডবলীলায় স্তব্ধ হয়ে গেছে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের জীবন স্পন্দন।

জাতীয়তাবাদের মিথ্যা বড়াই, রাজনৈতিক অহংকারবোধ, ক্ষমতা লিপ্সা ও বিশ্ব বাজারের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের উদগ্র বাসনাই কি এই যুদ্ধ টেনে আনেনি?

হৃদয়ে হৃদয়ে ছেয়ে গেল আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধের দীপ্তি

আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে মানুষ নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তাদের মাঝে জন্ম নিয়েছিল 'নিখুঁত মানব প্রকৃতি' সম্পর্কে এক রকম পাপবোধ। এই ধারণা মানুষের মনে বেশ ভালভাবেই ঠাঁই করে নিয়েছিল, মানুষ জন্মগতভাবেই পাপী ও অপরাধী।

মূলত মানুষের নিখুঁত মানব-প্রকৃতি ও সুকুমার বৃত্তির এই দৈন্যদশা সৃষ্টি হওয়ার জন্য কাজ করছিল এক সঙ্গে এশিয়ার কয়েকটি প্রাচীন ধর্ম এবং য়ূরোপ, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বিকৃত খৃস্ট ধর্ম। হিন্দুস্তানের প্রাচীন ধর্মগুলো মানুষের সামনে পেশ করেছিল 'তানাসুখ'[১]-এর দর্শন আর খৃস্ট ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছিল এই স্লোগান, "মানুষ আসলে জন্মগতভাবেই পাপী আর ঈসা মসীহ হলেন তাদের পাপ কাফফারা ও প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।"

এই জঘন্যতম আকীদা দু'টির প্রসার ঘটিয়ে তৎকালীন দুনিয়ায় সে আকীদার অনুসারী লাখো কোটি মানুষকে আপন সত্তা ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভীষণভাবে সন্দীহান করে তোলা হয়েছিল এবং তাদের ভবিষ্যত, পরিণাম ফল ও আল্লাহর রহমত লাভের আশা-ভরসাকে তাদের মন থেকে মুছে দেয়া হয়েছিল। তখনই মুহাম্মদ ﷺ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি একটি নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ফলকের ন্যায়, আগে যাতে ছিল না কোন ধরনের লেখা ও চিহ্ন। পরে মানুষ তাতে আঁকে চোখ জুড়ানো সব নক্‌শা ও চিত্র অর্থাৎ মানুষ নিজেই চেতনা-সঞ্চার করে তার জীবন। আগামী দিনের কর্ম বিচারেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে, আপন কর্মগুণেই তার বিচার হবে। সে হবে জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী। অন্যের কর্মের ব্যাপারে সে মোটেই দায়ী নয়। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এই কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে, মানুষ কেবল নিজের কর্ম সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে।

اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى -

১. তানাসুখ (জন্মান্তরবাদ) ঃ হিন্দুদের মাঝে ও প্রাচীন ধর্মের অন্য অনুসারীদের মাঝে প্রচলিত একটি 'আক্বীদা' যার মূল কথা হলো, মানুষের মৃত্যুর পর তার রূহু বা আত্মা অন্য প্রাণীর রূপ ধারণ করে। আর এই রূপান্তর ঘটে থাকে মৃত ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের শাস্তি কিংবা পুরস্কার হিসাবে। তবে যে প্রাণীতে মানুষের রূহ রূপান্তরিত হবে তা মৃতের চেয়ে মর্যাদায় বড়ও হতে পারে, আবার ছোটও হতে পারে।

"কিতাবে আছে, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।" (সূরা নজম : আয়াত-৩৮)

স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে এই ঘোষণা আবার ফিরিয়ে আনল তার হারানো বিশ্বাস ও অনুভূতি। ফলে সে এগিয়ে গেল সমুখ পানে– দৃঢ় বিশ্বাস ও সংকল্প নিয়ে, বীরত্বব্যঞ্জক উদ্যমী মনোভাব নিয়ে, এগিয়ে গেল নির্ভীক ও নিঃশংক হয়ে, মানবতার এক নতুন পৃথিবী আবাদ করার লক্ষ্য নিয়ে। সুযোগের সদ্ব্যবহারে এখন সে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত নয়, সন্দিগ্ধ নয়। মুহাম্মদ ﷺ অপরাধ ও গোনাহকে ভুল-ক্রটি ও পদস্খলনকে মানুষের জীবনের একটি আকস্মিক অবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন যাতে সে লিপ্ত হয়ে পড়ে কখনো অজ্ঞতাবশত, কখনো অসতর্কতাবশত, আবার কখনো বা শয়তানের ধোঁকার শিকার হয়ে নইলে সততা, সততার যোগ্যতা, অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া মানব স্বভাবের প্রকৃত দাবি ও ইনসানিয়াতের অলংকার। কোন ভুল হয়ে গেলে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাওয়া, আবার তা না করার দৃঢ় সংকল্পে বুক বাঁধা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ, তার মৌলিকত্বের বড় নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশ, সর্বোপরি তা হযরত আদম (আ)-এর উত্তরাধিকার।

মুহাম্মদ ﷺ গোনাহগার ও পাপীদের সামনে, পাপাচার ও অনাচারে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের সামনে খুলে দিয়েছেন তওবার এক প্রশস্ত দরজা। ব্যাপকভাবে ডেকেছেন তাদেরকে তওবার দিকে। তুলে ধরেছেন তাদের সামনে তওবার ফযীলত ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা, যে বিস্তৃতি বুঝে শুনে করে আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি, তিনি দীনের এই বিশেষ ও মহান রুকনটিকে উম্মতের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাই তাঁর অন্যান্য সুন্দর নামের মধ্যে একটি হলো نبى التوبة (তওবার নবী)। কেননা বিগত জীবনের ক্রটি-বিচ্যুতি ও গুনাহ খাতার জন্য একমাত্র বাধ্যগত পন্থা হিসাবেই শুধু মানুষকে তিনি তওবার দিকে ডাকেননি, বরং তওবার শান ও মাহাত্ম্যকে তুলে ধরেছেন উম্মতের সামনে। ফলে তওবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও স্বল্প সময়ের মধ্যে 'বিলায়াতে'র দরজা লাভ করার জন্য এক শ্রেষ্ঠ ইবাদতে পরিণত হয়ে গেছে, অথচ এই বিলায়াতই আবেদ-যাহিদ-এর কাছে ও আল্লাহর নেক বান্দাদের নিকট চিরকালের ঈর্ষার জিনিস।

আল-কুরআনেও আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন তওবার ফযীলত এবং তাঁর রহমতের বিস্তৃতির কথা। তওবা করলে গোনাহগারের গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে এমন মনোহর করে বয়ান করা হয়েছে এবং অবাধ্য ও গোনাহগার বান্দাদেরকে, কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে যুদ্ধে হেরে-যাওয়া হৃদয়গুলোকে আল্লাহর রহমতের দামান আঁকড়ে ধরার এবং দয়া ও করুণার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য

এমনভাবে ডেকেছেন এবং তাঁর সর্বত্র বিদ্যমান রহমতকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় আল্লাহ পাক শুধু সহনশীল, দয়ালু ও দানশীলই নন, বরং তিনি ভীষণ ভালোবাসেন (যদি আমার এই প্রকাশভঙ্গী ঠিক হয়) তওবাকারীদেরকে।

এবার পড়ুন কুরআনের আয়াতগুলো, বুঝতে চেষ্টা করুন তাঁর দয়া, করুণা ও মহব্বতের সেই সীমাহীনতা, যা আয়াতের শব্দে শব্দে ঝরে পড়ছে, আলো ছড়াচ্ছে।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ـ

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা যুমার : আয়াত ৫৩]

অপর এক আয়াতে গুনাহগার পাপী মানুষের উল্লেখ প্রসঙ্গে নয়, বরং অত্যন্ত শক্তিশালী, উত্তম চরিত্রের জান্নাতী মানুষের আলোচনা প্রসঙ্গে গুনাহ থেকে তওবাকারী মানুষের উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ـ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ـ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ص وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ـ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ـ

"তোমরা দ্রুত যাও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমনকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ সৎ কর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তা আবার করে না।

"ওরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত যার পাদদেশ নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!"

এই আয়াতের চেয়েও আরো মরনারম পদ্ধতি চোখে পড়ে নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ এই আয়াতে তাঁর পুণ্যবান বান্দাগণের এক নূরানী তালিকা তৈরি করেছেন আর তা উদ্বোধন করেছেন আবেদ-যাহিদের বদলে তওবাকারীদের দিয়ে:

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السّجِدُوْنَ
الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগুযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সেজদা আদায়কারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী ও আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হিফাজতকারী (এরা মুমিন) এবং (হে পয়গাম্বর!) আপনি মুমিনদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

[সূরা তওবা : আয়াত ১১৩]

গোনাহ করার পর তওবাকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে তার যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয় তা ফুটে উঠেছে তাবুক যুদ্ধে কোন সংগত কারণ ছাড়াই পিছিয়ে পড়া তিন সাহাবীর তওবা কবুল করার কুরআনী ঘোষণায়। আয়াতে উক্ত তিন সাহাবীর আলোচনার আগে খোদ আল্লাহর নবী ও সেই সব আনসার-মুহাজিরের আলোচনাও করা হয় যারা তাবুক অভিযানে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তারপর যুদ্ধে পিছিয়ে পড়া তিনজনের কথা উল্লেখ করা হয়। কারণ হলো, এই তিনজন যাতে নিজেদেরকে একাকী না ভাবেন এবং কোন প্রকার হীনমন্যতা ও নীচ অনুভূতি তাদেরকে কষ্ট না দেয় আর দুনিয়াবাসীর কাছেও যাতে কেয়ামত পর্যন্ত একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, এই তিনজনও সেই মুবারক জামাতেরই সদস্য। সুতরাং লজ্জার কিছু নেই।

আছে কি ধর্ম, চরিত্র, প্রশিক্ষণ ও সংস্কার-সংশোধনের কোন ইতিহাসে তওবা করার এমন চিত্তাকর্ষক, সুন্দর, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী কোন নমুনা?

এবার লক্ষ্য করুন কুরআনী আয়াত :

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُهُمْ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ـ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ـ

"আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে অনুসরণ করেছিল যখন তাদের একদলের মনের বিকারের উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি; নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময় এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা বুঝতে পেরেছিল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা তওবা : আয়াত ১১৭-১১৮]

আল্লাহ আরো ঘোষণা করেছেন, তাঁর রহমত সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ـ

"আমার রহমত প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত" [সূরা আরাফ : আয়াত ১৫৬]

এক হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছে,

ان رحمتى سبقت غضبى ـ

"নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী।"

আল্লাহ নিরালা হওয়াকে কুফুরী, মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার শামিল হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছেন, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ভাষায় :

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ـ

"নিশ্চয়ই কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরা য়ূসুফ : আয়াত ৮৭)।

অন্যত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلاَّ الضَّالُّوْنَ -

"পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কে নিরাশ হয়?" (সূরা হিজর : আয়াত-৫৬)।

এভাবে মুহাম্মদ ﷺ তওবার ফজিলত বয়ান করে এর প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করে ঘোষণা করলেন আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতি ও ব্যাপক হওয়ার এবং আল্লাহর ক্রোধ ও জালালিয়াতের ঘোষণা ও তার বিস্তারে ভীত-সন্ত্রস্ত, নিরাশ ও উদ্যমহারা হৃদয়গুলোকে শোনালেন এক নয়া যিন্দেগীর পয়গাম। হতাশায় ঘেরা জীবনে সঞ্চার করলেন এক নতুন স্পন্দন, নতুন তৎপরতা। লাঞ্ছনা ও অভিশপ্ত দুনিয়ার আঁধার থেকে বের করে তাদেরকে নিয়ে গেলেন সম্মান-মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপনের এক উজ্জ্বল নতুন পৃথিবীতে।

সমন্বয় সাধনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

প্রাচীন ধর্মগুলো, বিশেষত খৃস্ট ধর্ম মানব জীবনকে দু'ভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, দীন ও দুনিয়া। আর ভূমণ্ডলকে ভাগ করেছিল দু'টি স্তরে। এক স্তরে কিছু সংখ্যক মানুষ মশগুল থাকবে কেবল দীন নিয়ে, অপরদিকে কিছু লোক ব্যস্ত থাকবে শুধু দুনিয়া নিয়ে।

এই দু'টির স্তর শুধু পরস্পর বিচ্ছিন্নই ছিল না, উভয়ের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিরাট বাধা ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এক দলের সাথে আরেক দলের কোন যোগাযোগ ও মিল ছিল না, বরং পারস্পরিক যুদ্ধ-কলহ ও হানাহানির এক সিলসিলা বিরাজ করছিল, বিরাজ করছিল একে অপরের রক্তে হাত লাল করার এক উন্মত্ত জিঘাংসা। এদের প্রত্যেকেই দীন-দুনিয়ার একত্রীকরণ ও সহঅবস্থান অসম্ভব মনে করত। তাই যখনই কোন মানুষ এই দু'টি পক্ষের কোন একটিকে গ্রহণ করতে চাইত নিশ্চিতভাবেই তখন তাকে অপর পক্ষ থেকে পুরোপরিভাবে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন হয়ে পড়তে হতো, বরং অপর পক্ষের বিরুদ্ধে তাকে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করতে হতো। এ যেন একই সঙ্গে দুই নৌকায় পা রাখা! দুনিয়াদারদের মনোবল ছিল, আসমান যমীনের স্রষ্টার দিক থেকে মুখ না ফেরালে এবং পরকাল সম্পর্কে বেখবর না হলে অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধন ও সমৃদ্ধি সাধন কোনভাবেই সম্ভব নয়। মন থেকে আল্লাহর ভয় না তাড়ালে এবং নৈতিক, চারিত্রিক ও দীনী শিক্ষা বর্জন না করলে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতাই টিকে থাকতে পারে না।

আর অপর দল মনে করে, "বৈরাগ্যবাদকে আঁকড়ে না ধরলে ও দুনিয়ার সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন না করলে দীনদার হওয়ার প্রশ্নই আসে না।" বলা বাহুল্য, যা কিছু সহজ মানুষ তাই পছন্দ করে এবং প্রকৃতিগতভাবে তা মেনে নিতেও তৈরী হয়ে যায়। দীনের অর্থ যদি এই হয়, দুনিয়ার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ থেকে মোটেই ফায়দা হাসিল করা যাবে না, তবে তা মানব প্রকৃতির সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না, বরং তা হবে নির্দোষ ও নির্মল মানব প্রকৃতিকে গলা টিপে হত্যা করার শামিল। আর দীনের এই তথাকথিত ব্যাখ্যার পরিণতিতেই তৎকালীন যুগের সভ্য, ধীমান, যোগ্য ও শিক্ষিত সমাজের একটি বিরাট অংশ দীনের বদলে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় এবং দুনিয়াদারী নিয়ে ভীষণভাবে মেতে ওঠে।

ফলে অদৃশ্য হয়ে যায় তাদের হৃদয়-মন থেকে আধ্যাত্মিকতায় সফলতা ও উন্নত নৈতিক গুণ অর্জনে সমস্ত আশা-ভরসা। যারা ব্যাপক হারে দীন ত্যাগ করেছিল তারা এই ভেবে বসেছিল, বাস্তবিকই দীনের সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক। আর গির্জাকেন্দ্রিক ইচ্ছামত চাপিয়ে দেয়া কর্মকাণ্ড যে দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে এমনটি ভাবতে মানুষকে বাধ্য করেছিল তা বলাই বাহুল্য। ফলে প্রশাসন ক্রমশই ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল দীনের প্রতিনিধিত্বকারী এই গির্জার প্রতি। তখন মানুষ হয়ে পড়েছিল বাঁধনমুক্ত মুক্ত হাতির ন্যায় আর সমাজ ব্যবস্থা হয়েছিল দিকচিহ্নহীন মরুর বুকের লাগামহীন উটের ন্যায়।

দীন ও দুনিয়ার মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান ও তার অনুসারীদের দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলেই দরজা খুলে যায় ধর্মহীনতা ও আল্লাহদ্রোহিতার যার প্রথম ও প্রধান শিকার ছিল পাশ্চাত্য দুনিয়া এবং সেই সব সম্প্রদায় যারা চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যকে মুরুব্বী হিসাবে গ্রহণ করেছিল কিংবা পাশ্চাত্যের গোলামী শর্তহীনভাবে মেনে নিয়েছিল।

আর আগেই বলা হয়েছে, এর জন্য সর্বতোভাবেই দায়ী ছিল সীমালংঘনকারী ও কট্টরপন্থী ফাদার ও পাদ্রীরা যারা মানুষকে দীন সম্পর্কে ভুল তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করে দীনের এক অবাস্তব, অসঙ্গত, হিংস্র ও ভয়ানক চিত্র তুলে ধরে মানুষকে দীন সম্পর্কে ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

এই নাযুক পরিস্থিতিতেই আবির্ভাব ঘটল হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর। ঘোষিত হলো, মানুষের সঠিক কর্মকাণ্ডের সাথে দীনের কোন বিরোধ নেই, থাকতে পারে না। মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের বুনিয়াদই হলো মানুষের মূল লক্ষ্য। ইসলাম এই বিষয়টিকেই একটি ছোট ও গভীর অর্থবহ শব্দে প্রকাশ করেছে। শব্দটি হলো 'النية। নিয়ত' লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى ـ

"নিয়তের ওপরই সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে। মানুষ যা নিয়ত করবে তারই ফল সে লাভ করবে।"

মানুষের সব কাজের উদ্দেশ্যই যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর হুকুম পালন, তাহলে এসব কাজ তাকে পৌঁছে দেবে আল্লাহর কাছে, ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সর্বোচ্চ চূড়ায়। ফলে তার সমস্ত কর্মই হবে তখন 'খালিস দীন' হিসাবে। পার্থিব মলিনতার সামান্যতম ছোঁয়া তাতে থাকবে না, হোক না সে কাজ জিহাদ ও লড়াই? হোক না সে কাজ দেশ শাসন ও রাজ্য পরিচালনা? হোক না সে দুনিয়ার বৈধ বস্তুসমূহ থেকে খিদমত গ্রহণ কিংবা মনের চাহিদা পূরণ কিংবা জীবিকার তাগিদে চাকরি খোঁজার চেষ্টা-তদবির কিংবা দাম্পত্য জীবনের সুখ-সম্ভোগের! নিয়ত ঠিক থাকলে এ সবই বিবেচিত হবে ইবাদত হিসাবে। পক্ষান্তরে নিয়ত ঠিক না থাকলে বড় বড় ইবাদত, যথা: নামায, রোজা, হিজরত, তাসবীহ-তাহলীল সবই গণ্য হবে দুনিয়াবী কাজ হিসাবে। তার জন্য কোন ছওয়াব তো মিলবেই না, বরং এই ইবাদতই তার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে!

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পঞ্চম অনুগ্রহ হলো, তিনি দীন ও দুনিয়ার মধ্যকার এই দু' স্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন দল দু'টিকে অবিরাম হিংসা, হানাহানি ও জিঘাংসা থেকে মুক্ত করে গলায় গলায় মিলিয়ে দিয়েছেন, বেঁধেছেন ভালোবাসা ও সম্প্রীতির এক সুগভীর দৃঢ় মজবুত বাঁধনে, উপহার দিয়েছেন শান্তি ও ঐক্যের এক নতুন পৃথিবী।

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে বাশীর (সুসংবাদ প্রদানকারী) ও নাযীর (ভীতি প্রদর্শনকারী)। তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন এই মহান দু'আ :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে বাঁচাও জাহান্নামের আযাব থেকে।" তিনি আরো ঘোষণা করেছেন:

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু কেবল জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশেই নিবেদিত।"

মানব জীবন কিছু বিচ্ছিন্ন ও বিপরীতমুখী এককের যোগফল নয়, বরং তা হলো এমন এক সত্তার নাম জীবনের ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও অবিচল আস্থা বাস্তব জীবনের হাজারো কর্মব্যস্ততা মোটেই যা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং নিষ্ঠা থাকলে, নিয়ত সহীহ থাকলে, আল্লাহর সন্তুষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য হলে আর এ সবই নবী-রসূলগণের আনীত মাপকাঠিতে উতরে গেলে প্রমাণিত হবে, আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি নবীজীর কাছ থেকে একতা ও সাম্যের শিক্ষা। নবীজী মিটিয়ে দিয়েছেন দীন ও দুনিয়ার মধ্যকার সকল বাধা-ব্যবধান। তিনি মানুষের গোটা জীবনকে ইবাদতে পরিণত করেছেন আর সমগ্র পৃথিবীকে পরিণত করেছেন ইবাদতগাহে। পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু মানবতার হাত ধরে তিনি তাদের নিয়ে গেছেন নিষ্ঠা ও সততার এক প্রশস্ত অঙ্গনে।

সেই পুণ্য কাফেলায় রয়েছেন ফকীর-মিসকীনের পোশাকে কত রাজা-বাদশাহ! আবার রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারার লেবাসে রয়েছেন কত আবেদ যাহিদ ও আল্লাহর পেয়ারা বান্দা!

এঁরা ধৈর্য ও সহনশীলতার সুউচ্চ পর্বতমালা। ইল্‌ম ও জ্ঞানের উচ্ছল ঝরনাধারা! এঁদের রজনী ভোর হয় ইবাদত-বন্দেগীর নিবিড়তায় আর দিবসে হয় এঁরা শাহসওয়ার! আল্লাহর পথের সৈনিক। কিন্তু কোথাও কোন বিরোধ নেই, কোন জটিলতা নেই, নেই কোন শূন্যতা।

মনযিলে মকসুদ

মুহাম্মদ ﷺ-এর ষষ্ঠ অনুগ্রহ কিংবা তাঁর ঘটানো ষষ্ঠ বিপ্লব হলো, তিনি মানুষকে উপযুক্ত ও সম্মানজনক এক মনযিলের পথ দেখিয়েছেন যেখানে ব্যয় হবে তার সমস্ত শক্তি। তিনি তাদেরকে সন্ধান দিয়েছেন এক বিশাল বিস্তৃত মহাশূন্যের, যেখানে সে উড়ে বেড়াবে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায়। নবীজীর আগমনে মানুষ নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। সে জানত না কোথায় যেতে হবে তাকে এবং কোথায় শেষ হবে তার এই যাওয়া। সর্বোত্তম ও বাস্তবভিত্তিক এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি যেখানে অনায়াসে বিলিয়ে দেয়া যেতে পারে তার শক্তি-ক্ষমতা, চেষ্টা-সাধনা ও তার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা প্রতিভা? না, কিছুই সে জানত না। সে বন্দী ছিল মনগড়া, কল্পিত, মরীচিকাময় কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থ ও হীন উদ্দেশ্যের শেকলে। সে ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পৃথিবীর এক বাসিন্দা। এই জীবনকে কেন্দ্র করেই ব্যয়িত হতো তার সকল শক্তি ও মেধা। বিপুল অর্থবল, অসীম শক্তিবল, কিছু সংখ্যক মানুষের ওপর মোড়লিপনা ও আধিপত্য লাভ এবং কোন ভূখণ্ডের মালিক হতে পারাই ছিল সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর একজন বাসিন্দার সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া। জাহিলী সমাজে সেই গণ্য হতো একজন সর্বোচ্চ সফল ব্যক্তি

হিসাবে। বল্গাহারা জীবনের বাঁধনমুক্ত আমোদ-প্রমোদ, নারী কণ্ঠের মধুঢালা সুর লহরী, উপাদেয় ও বিলাসী খাবার, বুলবুলির মিষ্টি আওয়াজ, ময়ূরের পেখমের নজরকাড়া সুন্দরতা এবং চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যাওয়াই ছিল তার স্বপ্নসাধ।

অপরদিকে কিছু মানুষ ধরনা দিয়ে ঘুরে বেড়াত তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের কাছে। তাদের বুদ্ধি ও মেধা উৎসর্গীকৃত হতো তাদের নৈকট্য লাভের পেছনে এবং তাদের কাল্পনিক প্রশস্তি গেয়ে। অত্যাচারী শাসকগণের নাচের পুতুল হয়ে তারা কেবল নাচত। কিছু মূল্যহীন অর্থহীন সাহিত্যিকে বুকে চেপে রেখে তারা লাভ করত সান্ত্বনা। তখন এলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নির্ধারিত করে দিলেন মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মানুষের মাঝে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করলেন, তার চেষ্টা-সাধনা, তার বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভা, তার উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তার স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হলো আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর গুণাবলী, তাঁর কুদরত ও হিকমত এবং তাঁর বিশাল-বিস্তৃত ও অন্তহীন সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য ও চিরন্তনতার পুরোপুরি পরিচিতি লাভ, তাঁর প্রতি অবিচল ঈমান ও দৃঢ় আস্থা রাখা, তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিতে আসে বিজয় ও সাফল্য এই কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করা, সব সময় সন্তুষ্ট থাকা তাঁর প্রতি, বিশ্বাস রাখা তাঁর সীমাহীন কুদরতের প্রতি, তাঁর সেই একত্বের প্রতি যা মিলন ঘটাতে পারে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অগণিত অংশের ভেতর, কখনো বিপরীতমুখী অংশের মাঝে এবং নিজের রূহ বা আত্মাকে সব সময় তাঁর যিকিরে সজীব ও শক্তিশালী রাখা। তারপর এই সবের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে নৈকট্য ও ইয়াকীনের মহিমান্বিত জগতে প্রবেশ করা, সবশেষে পৌঁছা সেই স্থানে যেখানে নূরের ফেরেশতারাও পৌঁছতে পারে না। এটাই মানুষের আসল সৌভাগ্য, তার পূর্ণতার শেষ ধাপ, তার হৃদয় ও আত্মার মিরাজ।

জন্ম হলো নতুন পৃথিবী– নতুন মানুষ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের বরকতে ও তাঁর মহান শিক্ষার বদৌলতে বদলে গেল পৃথিবী, বদলে গেল পৃথিবীর রসম-রেওয়াজ ও প্রশাসনিক কাঠামো। মানবতার উত্তরণ ঘটল গ্রীষ্মের খরতাপ, লু-হাওয়া, প্রচণ্ড দাহ ও দুর্ভিক্ষ-ঘেরা এক ভয়ংকর ঋতু থেকে, এমন এক ঋতুতে যেখানে গলাগলি করছে ফুল আর বসন্ত, যেখানে উদ্যান ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছলছল প্রবাহের উচ্ছল ঝরনাধারা। তাঁর আগমনে পাল্টে গেছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের হৃদয়গুলো আপন প্রতিপালকের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। মানুষ ব্যাপকভাবে ছুটল আল্লাহ্‌র পানে। মানুষ সন্ধান পেল অপরিচিত এক নতুন স্বাদের, অজানা এক নতুন রুচির, অজ্ঞাত এক নতুন ভালোবাসার!

আগের সেই নিস্তেজ ঘুমন্ত হৃদয়গুলো জেগে উঠল ঈমানের উষ্ণতায়, মায়া-মমতার পরশে। সবার মাঝে দেখা যাচ্ছে নতুন উদ্যম, নতুন তৎপরতা। মানুষ দলে দলে বেরিয়ে এসেছে সিরাতুল-মুস্তাকমের তালাশের জন্য। দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সকলেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য ব্যাকুল, উন্মুখ। আরব, আজম, মিসর, তুরকী, ইরান, খোরাসান, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, হিন্দুস্তান, আলজেরিয়া, পূর্ব হিন্দুস্তানের সবাই এই জগতের ইশক-মুহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসায় বেকারার দেওয়ানা। মনে হচ্ছে, মানবতা যেন চেতনা ফিরে পেয়েছে, দীর্ঘ ও গভীর ঘুম শেষে চোখ মেলে তাকিয়েছে!

কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকাকালীন যে সুদীর্ঘ সময় কেটে গেল তার ক্ষতিপূরণ তাহলে কিভাবে হবে? আর তা যেন না হলেই নয়! হ্যাঁ, এই ক্ষতি পূরণের ধারাবাহিকতায়ই তখন মানবতার একেকটি গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিলেন আল্লাহর পথের অসংখ্য দাঈ, রব্বানী, মুখলিস, নিষ্ঠাবান মুজাহিদ, সংস্কারক, প্রশিক্ষক, আরিফে রব্বানী, আবেদ-যাহিদ, সৃষ্টির শোক-ব্যথার সমভাগী, মানবতার কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এবং আরো এমন সব মনীষী ও ব্যক্তিত্ব, নূরের ফেরেশতাকুলের কাছেও যাঁরা ঈর্ষার কারণ। তাঁরা সবাই মিলে কী করলেন? বিরান ও অনাবাদ হৃদয়গুলোকে আবাদ করলেন আল্লাহ প্রেমের মশাল জ্বেলে। বইয়ে দিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও হিকমত-মারেফাতের হাজারো সালসাবিল! নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করলেন জুলুম-নিপীড়ন, অন্যায়-অবিচার এবং দুশমনী ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক প্রচণ্ড দ্রোহ। নির্যাতিত, অবমানিত ও লাঞ্ছিত মানবতাকে শিক্ষা দিলেন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আর উপেক্ষিত, বিতাড়িত ও অসহায় মানবগোষ্ঠীকে টেনে নিলেন সেই বুকে, যা আবাদ হয়ে আছে শুধু প্রেম, ভালোবাসা ও মায়া-মমতায়।

মানবতার সেবায় নিবেদিত এই মুবারক জামাত থেকে পৃথিবী কখনো বঞ্চিত হয়নি। এঁরা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন সব সময়, সব জায়গায়। সংখ্যায় এঁরা অগণিত অথবা এঁদের সংখ্যা নিরূপণই অসম্ভব। এঁদের সংখ্যার কথা বাদ দিয়ে আসুন এঁদের কোয়ালিটির আলোচনায়। উল্টে যান ইতিহাসের পাতা, দেখবেন তাঁদের উন্নত চিন্তা, জাগ্রত বিবেকবোধ, প্রশান্ত আত্মা, তীক্ষ্ণ ধী ও নির্মল স্বভাব-চরিত্র। আরো দেখবেন কেমন করে এঁরা আর্ত মানবতার ব্যথায় ব্যথিত হতেন এবং নিজেকে তাদের সেবায় বিলিয়ে দিতেন। সৃষ্টিলোকের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁদের পবিত্র আত্মারা বিগলিত হতো সমবেদনায়-সহমর্মিতায়। মানবতার মুক্তির স্বার্থে নিজেদেরকে যে কোন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতেন তাঁরা হাসিমুখে। আর তাঁদের আমীর ও শাসকগণ ছিলেন পূর্ণ দায়িত্বসচেতন ও আমানতদার।

একদিকে রাত জেগে জেগে ইবাদত-বন্দেগীতে থাকতেন মশগুল, অপরদিকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিও রাখতেন সতর্ক দৃষ্টি। শাসক-শাসিতের মাঝে কোথাও কোন অমিল বা বিরোধ ছিল না। সবাই তাঁদের অনুগত। আরেকটু উল্টে যান ইতিহাসের পাতা। অবাক হবেন তাঁদের ইবাদত, দুনিয়াবিমুখতা, দু'আ ও মুনাজাত, চারিত্রিক উৎকর্ষ, মাহাত্ম্যবোধ, ছোট ও দুর্বলদের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমবোধ, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তঁদের মধুর বিনম্র আচরণ, দয়া ও করুণা এবং জানের দুশমনকে অকপটে ক্ষমা করে দেয়ার কাহিনী পড়ে। মনে হবে কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয় তাঁদের উর্বর কল্পনা ও তাঁদের বিরল প্রতিভার সিঁড়ি বেয়ে সেই চূড়ায় উপনীত হওয়া, যেখানে উপনীত হয়েছিলেন এঁরা বাস্তবতার সিঁড়ি বেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, অবিচ্ছিন্ন সূত্র ও সনদ আমাদের সংরক্ষণে না থাকলে এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সাক্ষ্য না পেলে অনায়াসে এই সত্য ঘটনাকে কল্পকাহিনী ও উপকথা বলে চালিয়ে দেয়া হতো। সত্যি, এই মহান ইনকিলাব, এই গৌরবদীপ্ত নতুন যুগের সূচনা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রধান মুজিযা এবং তাঁর এক মহাঅনুগ্রহ। সর্বোপরি তা ইলাহী রহমতের এক মহাদান যা সীমাবদ্ধ নয় স্থান-কাল-পাত্রের কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে। মহান আল্লাহ সত্যি বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি!" [২১ : ১০৭]

সমাপ্ত

পরিচিতি
গ্রন্থ : গ্রন্থকার : অনুবাদক

গ্রন্থ

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী-র আরবী গ্রন্থ আস-সীরাতুন-নববীয়্যা-এর মুহাম্মদ আল-হাসানীকৃত উর্দূ অনুবাদ 'নবীয়ে রহমত' বর্তমান বিশ্বের সীরাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। প্রাচীন ও আধুনিক উৎসসমূহ থেকে সতর্কতার সাথে ইলম ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে আধুনিক যুগ-মানস ও যুগ-জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে এরূপ আরেকখানি গ্রন্থ কোনও ভাষায় লিখিত রয়েছে কি না অন্তত আমার তা জানা নেই। এ শুধু তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার, পরম শ্রদ্ধা নিবেদন, উত্তম সাহিত্য ও জীবনালেখ্য নয়, বরং এ সব কিছুরই সমাহার, অথচ বর্ণনায় বাড়াবাড়ি নেই, স্বচ্ছ ও ঝরঝরে লেখা একখানা সুখপাঠ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ গ্রন্থ। হিন্দী, ইংরেজী, ইন্দোনেশীয়, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে আরব-আজম ও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দেশে দেশে ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছে।

গ্রন্থকার

মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরুল-মুমিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (রহ)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ 'সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ' লিখে তরুণ বয়সেই উর্দূ সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন, তারপর বিগত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে চলেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াতে ও আযীমত' তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। উর্দূ থেকে তাঁর আরবী রচনাই যেন অধিকতর অনবদ্য! তাঁর "মা-যা খাসিরাল-আলামু বি-ইনতিহাতিল-মুসলিমীন" (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে।

'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও অতি সম্প্রতি রচিত "আল-মুরতাযা" নামে হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিক খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার

অধিকারী অন্য কোনও আলেম আছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কারতুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশাহ ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে 'রাবেতায় আলমে ইসলামী'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল-উলামা'-এর রেকটর এবং ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড'-এর সভাপতি। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এক বিরাট নেয়ামত।

তাঁর বেশ ক'টি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত সাত খণ্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীই নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে! তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মওলানা আশরাফ আলী থানুবীর তাক্ওয়া। সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) ও মওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা।

অনুবাদক

মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শেষ ডিগ্রী নিয়ে যখন মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন (১৯৭৮)। তখনো তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না। সিলেটের আল্লামা মুহাম্মদ মুশাহিদ বাইয়মপুরী (র)-এর সুকঠিন উর্দূ গ্রন্থ "ফাৎতুহুল-করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল-আমীন"-এর বঙ্গানুবাদ ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর প্রথম প্রবেশ। অতঃপর একে একে 'ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল' ['মহানবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে ২য় সং. প্রকাশিত], 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' (৩ খণ্ড), 'ঈমান যখন জাগলো', 'খালিদ বিন ওয়ালীদ', 'মুহাম্মদ বিন কাসিম' প্রভৃতির মত কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ তিনি পাঠক সমাজকে উপহার দেন। এ পর্যায়ে তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ পাঠক সমাজকে উপহার দেন 'নবীয়ে রহমত'। এমন একটি গ্রন্থের অনুবাদে যেটুকু যোগ্যতা ও নিষ্ঠা প্রয়োজন তা যে আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর ছিলো বক্ষমাণ গ্রন্থে পাঠক নিজেই তাঁর পরিচয় পাবেন। অনুবাদক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের পরিচালক ও বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদর সদস্য-সচিবরূপে দেশের বয়োবৃদ্ধ সুধীদের যে মূল্যবান সাহচর্য পেয়েছেন তা তাঁকে যে কতটুকু পরিশীলিত ও যোগ্য করে তুলেছে "নবীয়ে রহমত"-এর পাতায় পাতায় তার পরিচয় রয়েছে। গত ৩রা রমযান, ১৪৩১ হি. ১৫ আগস্ট, ২০১০ইং তারিখে ইনতিকাল করেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

আমরা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার ও অনুবাদকের জন্য দোয়া করি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন তাঁদেরকে জান্নাতের উত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন!

Bibliography (গ্রন্থপঞ্জী)

- ابو داؤد
- اثار المدينة المنورة
- اخبار مكة
- ادب الكاتب
- الادب المفرد
- اركان اربعة
- الاستيعاب فى معرفة الاصحاب
- اسد الغابة
- اسفار عهد جديد
- اسفار عهد عتيق
- الاصابة فى تمييز الصحابة
- اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين
- الامتاع
- اناجيل اربعة
- انجيل
- الاحرام
- البداية والنهاية
- البعث الاسلامى
- بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب
- بنو اسرائيل فى القران والسنة
- بيهقى
- تاريخ ابن خلدون
- تاريخ الأمم الاسلامية
- تاريخ ايران
- تاريخ التشريع الاسلامى التمهيد
- تاريخ جيش النبى (ص)
- تاريخ الخميس
- تاريخ طبرى
- تاريخ العرب العام

- تاريخ العرب قبل الاسلام
- تاريخ مكة
- تلمود
- تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية و صدر الاسلام
- تذكرة الحفاظ
- التراتيب الادارية
- الترغيب و الترهيب
- ترمذى
- تفسير ابن كثير
- تفسير طبرى
- جديد مفتاح التقويم
- جغرافية جزيرة العرب
- جمع الفوائد
- حجة الله البالغة
- حسن المحاضرة
- حلية الاولياء
- حماسه
- الحياة
- خاتم النبيين
- الخصائص الكبرى
- الخضرى
- خطط الشام
- دارمى
- دائرة المعارف للبستانى
- دائرة المعارف الاسلامية
- الرسول القائد
- روائع من ادب الدعوة فى القران والسنة
- روح المعانى
- الروض الانف
- زاد المعاد
- سبع معلقات
- سنن ابن ماجة

- سنن ابو داؤد
- سنن بیہقی
- سنن نسائی
- سیافی
- سیرۃ ابن کثیر
- السیرۃ النبویۃ
- السیرۃ الحلبیۃ
- سیرۃ النبی
- شرح السنۃ
- شرح مسلم
- شرح مشکوۃ
- شرح معانی الاثار
- شرح المواھب الدنیۃ
- شمائل ترمذی
- صحیح بخاری
- صحیح مسلم
- صفۃالصفوۃ
- طبری
- طبرانی
- طبقات ابن سعد
- طحاوی
- عبقریۃ محمد
- عقد الفرید
- عمدۃ القاری
- غزوۃ الاحزاب
- غزوۃ بنی قریظۃ
- غزوۃ بنی قینقاع
- فتح الباری
- فتوح البلدان
- الفصول
- فقہ الزکاۃ
- فقہ اللغۃ

- قصيدة بانت سعاد
- كامل ابن الاثير
- كتاب الاصنام
- كتاب الاموال
- كتاب الزهد
- كتاب الشعر و الشعراء
- كتاب الشفاء
- كتاب مقدس
- كتب مقدسة
- كنز العمال
- الكنز المرصود فى قواعد التلمود
- لسان العرب
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين
- مجمع بحار الأنوار
- مجموعة مباحث علمية
- مجموعة الوثائق السياسية
- المجسطى
- المخصص
- مزامير داؤد
- مسند امام احمد
- مسند ابى داؤد
- مشكل الآثار
- مشكوة المصابيح
- المثنا
- مصنف ابن ابى شيبة
- مصنف عبد الرّزاق
- مصنف قران
- معجم البلدان
- معجم الشعراء
- المغازى
- المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام
- مكة و المدينة فى الجاهلية و عهد الرسول (ص)

- منزل الوحی
- مآثر شهداء یہود
- مؤطا امام مالکه
- النجوم الزاهرة
- نصب الراية
- نور النبراس
- نهاية الادب
- وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفی
- الهلال
- الیهود فی بلاد العرب

Urdu Books

- انسانی دنیا پر مسلمانوں کی عروج و زوال کا اثر
- اهل کتاب صحابة وتابعین
- ایران بعهد ساسانیان
- حدیث دفاع
- دائرة المعارف الاسلامية
- رحمة اللعلمین
- سیرة محمدی دعاؤں کے آئینه مین
- بائبل
- صحابه وتابعین
- عرب وہند کے تعلقات
- عربوں کی فتح مصر
- تفسیر ماجدی
- عهد نبوی کی میدان جنگ
- مطالعه قران کے اصول ومبادی
- معرکه مذهب وسائنس
- منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین

- منو شاستر = মনু সংহিতা
- مہابھارت = মহাভারত
- ہندوستانی تمدن
- یہود تلمود کی روشنی مین

English Books

- A History of Abyssinia.
- Apology for Muhammad and the Quran.
- Appendix-c.
- Islam in the world.
- Encyclopaedia Britannica.
- Ancient India.
- Ancient Iraq.
- A short history of the world.
- Popular Hinduism : the religion of the masses.
- History of European morals.
- Jewish Encyclopaedia.
- The Roman world.
- The life of Mohammad.
- The Messenger the life of Mohammad.
- The making of humanity.
- The history of christianity in the light of modern knowledge.
- The Arab conquest of Egypt.
- Discovery of India.
- Decline and fall of the Roman Empire.
- Psalms. গীত সংহিতা

- Civilization : past and present.
- Selection from the Koran.
- Arab's conquest of Egypt and the last thirty years of Roman Dominion.
- Arabia before Mohammad.
- Future shock.
- Mohammad and Mohammadanism.
- Muhammad & the rise of Islam.
- Muhammad & the Jews.
- Muhammad, prophet and statesman.
- Muslim rule in India.
- From Christ to Constantine.
- New Catholic Encyclopaedia.
- Histoire de la Turquie.
- History of mediaeval Hindu India.
- History of Syria.
- History of Philosophy.
- Historian's history of the world.